ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৪৩ হইতে আষাঢ়, ১৩৪৪

সম্পাদক—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পরিচয়

সূচিপত্র

ষষ্ঠ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; মাঘ, ১৩৪৩—আষাঢ়, ১৩৪৪

লেখকগণের বর্ণানুক্রমিক সূচি।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৪৩

পরিচয়

জেরার্ড্ ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্স্ *

স্বতন্ত্র প্রতিভার আবশ্যিক নিগ্রহই যদিচ হতভাগ্য কবিযশঃপ্রার্থীদের একমাত্র আশ্বাস, তবু সাহিত্যের ইতিহাসে স্বকীয়তার প্রাধান্য অবিসংবাদিত ; এবং শেক্স্‌পীয়র-উপেক্ষার যে-উপকথা একদিন উদীয়মান লেখকদের ভাবপ্রবণ বক্তৃতার বিষয় জোগাতো, অধুনাতনী গবেষণা তার ছায়াটুকুও অবশিষ্ট রাখেনি ; সেই উনিশ শতকী উৎকেন্দ্রিক বিকল্পনা ঝেড়ে ফেলে আধুনিক পণ্ডিতেরা বরং বলতে সুরু করেছেন যে অত অল্প সময়ের মধ্যে ও-রকম সর্ব্বতোমুখী সাফল্য শেক্স্‌পীয়র ছাড়া আর কারো কপালে জুটেছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য চ্যাটর্টন্ ও কীট্‌স্ এর প্রতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমালোচকদের অবিচারেই এখনো অপদার্থ সাহিত্যিকের আত্মপ্রসাদ প্রশ্রয় পায়। কিন্তু কাঁচা বয়সে চলনসই কবিতা লিখেছিলেন ব'লে আজ আর আমরা চ্যাটর্টন্-সম্বন্ধে কৌতুহলী নই, ওয়ল্পোল্-এর মতো পাকা মানুষকে ঠকাতে পেরেই তিনি আমাদের ঔৎসুক্য জাগান ; এবং কীট্‌স্-সম্পর্কে সাবেকী মনোভাব কেবল তাঁর কাব্যের গুণেই বদ্‌লায়নি, একে একে তাঁর বিক্ষিপ্ত পত্রাবলী কুড়িয়ে ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর পরবর্ত্তীরা ক্রমশঃ বুঝছে যে এ-মহাকবি চারিত্র্যেও সেই খামখেয়ালী আবেষ্টনের বহির্ভুক্ত। উপরন্তু চ্যাটর্টন্ বা কীট্‌স্-এর জন্ম শ্রমবিভাগের আগে ; তখনো সংবাদসরবরাহের উপর একটা বিশেষ পেশার ছাপ পড়েনি। অর্থাৎ সে-যুগের সকল মানুষই অবসরবিনোদনের খাতিরে গুজব রটাতো বটে, কিন্তু ক্যামেরা বাগিয়ে, পেন্‌সিল শাণিয়ে বাণীর সন্ধানে কেউ দেশে দেশান্তরে ছুটে

* The Note-books and Papers of Gerard Manley Hopkins—Edited with Notes and a Preface by Humphry House, (Oxford University Press. 25/-).

বেড়াতোনা। ফলত সে-কালের মূক মিল্‌টন্-রা অখ্যাতির অন্তরালেই মরতো, সুন্দরীরা রূপের ঋণ অপরিশোধনীয় জেনে সাবানওয়ালাদের দপ্তরে হাতচিঠি পাঠাতোনা, প্রাত্যহিক ছবিতে ও সাক্ষাৎকারে অনাবশ্যক নির্ব্বুদ্ধিতা না-ফুটলেও রাষ্ট্রনেতাদের অমিত প্রতাপ অক্ষুন্ন থাকতো। কিন্তু অর্ব্বাচীন পরিমণ্ডলে সেই অনিকাম ঔদাস্যও অসম্ভব; ধ্বনিতরঙ্গের সনাতনী গয়ংগচ্ছে ধৈর্য্য হারিয়ে আমাদের পরচর্চ্চা ইদানীং বেতারের শরণ নিয়েছে; এবং যে-দূত সেকেণ্ডে সাত বার পৃথিবী ঘুরে আসে, সে যেকালে স্বভাবতই দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য, তখন কেবল মল্লবীরের মুখে সালসার গুণকীর্ত্তন শুনেই সাম্প্রতিকদের নিস্তার নেই, প্রসাধন-সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে সাহিত্যরথীদের হস্তলিপি দেখতেও তারা বাধ্য।

উল্লিখিত অবস্থায় প্রতিভাবানের অজ্ঞাতবাস তো অভাবনীয় বটেই, এমনকি মাধ্যমিক মানুষের পক্ষেও উচ্চকিত বাইরন্-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সহজ; এবং কবি হিসাবে জেরার্ড্ ম্যান্‌লি হপ্‌কিন্স্ সর্ব্বোচ্চ স্তরে স্থান পান বা না-পান, তাঁর অদ্বিতীয় চমৎকারিতা যেহেতু তর্কাতীত, তাই যারা তাঁকে ১৯১৮ সাল পর্য্যন্ত লোকচক্ষুর অগোচরে লুকিয়ে রেখেছিলো, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। কে বলতে পারে, হপ্‌কিন্স্-এর রচনাবলী সময়মতো লেখক ও পাঠকদের হাতে পড়লে এলিয়ট্ কাব্য ভুলে প্রত্নতত্ত্বের প্রলোভনে প্রাক্‌সামরিক মরুভূমি খুঁড়তেন কিনা। তবে প্রতিভা অনেকের মতে কালোপযোগিতার নামান্তর; এবং হপ্‌কিন্স্ যখন টেনিসন্-এর আমলে জন্মে শেক্স্‌পীয়র-এর পদাঙ্কে চলেছিলেন, তখন তাঁর মনীষা প্রশংসনীয় কি উচ্ছৃঙ্খলতা দণ্ডযোগ্য, তা হয়তো অনিশ্চিত। কিন্তু এ-কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা যে সে-দিনকার সাহিত্যে দুর্ব্বোধ্যতা একা হপ্‌কিন্স্-এরই একচেটিয়া সম্পত্তি ছিলো। কারণ মালার্মে তাঁর সমসাময়িক; এবং সেই ফরাসী কবি যদি ছন্দের অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন, ভাষার ধাতুগত প্রয়োগ, জটিলতার অপর্য্যাপ্ত অপব্যবহার সত্ত্বেও রাসিন্-পন্থীদের সাধুবাদ কুড়িয়ে থাকেন, তবে ঐতিহ্যভ্রষ্ট ইংলণ্ডে, ব্রাউনিং ও মেরিডিথ্-এর প্রতিবেশে, ডান্-এর বংশধর হপ্‌কিন্স্-এর ভাগ্যে অতখানি লাঞ্ছনা অহৈতুক। অবশ্য ব্রাউনিং বা মেরিডিথ্, প্যাট্‌মোর বা ফ্রান্সিস্ টম্প্‌সন্ শুধু উৎকট বিষয়কে উদ্‌ভট ছন্দে বেঁধে দুষ্পাঠ্য কবিতা লেখাতেই হাত পাকাননি, বাগ্বিস্তারেও তাঁদের প্রতিযোগী মেলা ভার; এবং হপ্‌কিন্স্ উচ্ছ্বাস অপছন্দ করতেন, সংযম ও চিত্ত-শুদ্ধিকে কাব্যের অপরিহার্য্য লক্ষণ ব'লে ভাবতেন, কায়মনোবাক্যে মানতেন যে

কবির কাছে অবিকল্প অকপটতা লোকরঞ্জনের অগ্রগণ্য। কিন্তু এই স্বাবলম্বন ও সংক্ষিপ্ত রচনারীতির জন্যেই তিনি বিস্মৃতির বিবরে তলিয়ে যাননি, তাঁর বন্ধুস্থানে গ্রহঝষ্টি ঘটাতেই অনুকম্পায়ীরাও আজ অবধি তাঁর পূর্ণ পরিচয়ে বঞ্চিত।

অথচ কবিরাজ ব্রিজেস্ হপ্‌কিন্স্-এর হাতে-গড়া মানুষ, হপ্‌কিন্স্-এর উপদেশেই তাঁর বাচালতা কাব্যের পর্য্যায়ে উঠেছিলো, হপ্‌কিন্স্-এর বরাভয় ও বন্ধুবাৎসল্যই তাঁকে সংশয় ও নৈরাশ্য থেকে বাঁচিয়েছিলো, হপ্‌কিন্স্-এর দৃষ্টান্তেই তিনি শিখেছিলেন বিনয় ও ক্ষমা, নিরাসক্তি ও আত্মবেদ, বিচার ও বদান্যতা ইত্যাদি বহুপ্রচলিত শব্দের আসল অভিধা কি। কিন্তু সংসর্গগুণে স্বভাব বদ্‌লালেও কবি-প্রতিভার অনটন মেটাতে পারেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা; এবং ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অপ্রতিম হলেও হপ্‌কিন্স্ যেহেতু অসাধ্যসাধনের মন্ত্র জানতেননা, তাই বিশ বৎসরের অধ্যাপনায় তিনি ব্রিজেস্-এর কলাকৌশলই শুধরেছিলেন, অন্তঃপ্রেরণার দৈন্য ঘোচাননি। তবে অনবদ্য কলাকৌশলও খুব সুলভ নয়; এবং দ্বৈপায়ন আত্মরতির প্রকোপে ফ্লোবেয়র-এর নাম সুদ্ধ তদানীন্তন ইংলণ্ডে অপ্রচারিত থাকাতে ব্রিজেস্-এর কোনো সমবয়সীই শিল্পের সঙ্গে সঙ্কল্পের সহোদর সম্পর্ক ধরতে পারেননি, সকলেই ভেবেছিলেন উদ্বেল হৃদয়াবেগই সৌন্দর্য্যের একমাত্র উপকরণ। সুতরাং ব্রিজেস্-এর নিখুঁৎ কারুকর্ম্মও সুবিবেচকের বরণীয় লেগেছিলো; এবং এ-কথা সম্ভবত সত্য যে রসবস্তুর অতখানি অভাবে ও-রকম লোভনীয় রূপের আরোপ সংস্কৃত সাহিত্যের বাইরে আজ পর্য্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু নির্ব্বাণ আর মোক্ষের মধ্যে বাছতে দিলে সাধারণ মানুষের মন কোন্ দিকে ঝুঁকবে, তা সহজেই অনুমেয়; এবং সেইজন্যেই ব্রিজেস্ অবিলম্বে বুঝেছিলেন যে লোকে একবার হপ্‌কিন্স্-কে চিনলে তাঁর নিজের প্রতিপত্তি আর মুহূর্ত্তকাল টিঁকবেনা। কাজেকাজেই হপ্‌কিন্স্-এর অকাল মৃত্যুর পরে সেই কবির প্রায় সমস্ত লেখাই হাতে পেয়েও তিনি সেগুলির প্রকাশে বিন্দু-বিসর্গ উৎসাহ দেখাননি। সৌভাগ্যক্রমে হপ্‌কিন্স্ ব্রিজেস্ ছাড়া আরো পাঁচজনকে চিঠিপত্র পাঠাতেন, এবং সেইসঙ্গে তাঁর দু-চারটে কবিতার প্রতিলিপিও কয়েক জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। ফলত তাঁর মৃত্যুর চার বছর পরে যখন মাইল্‌স্-এর সম্পাদনায় ঊনবিংশ শতাব্দীর বিরাট কাব্যসঞ্চয় বেরোয়, সে-সময় তার থেকে হপ্‌কিন্স্-কে একেবারে ছেঁটে ফেলা ব্রিজেস্-এর সাধ্যেও কুলায়নি। তাহলেও সরল রসপিপাসুরা যাতে হপ্‌কিন্স্-এর কুহকে না-মজে, সে-চেষ্টা ব্রিজেস্ একাধিক

বার করেছিলেন; এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিগত বন্ধুর বিবিধ কাব্যসংগ্রহের প্রস্তাবনায় যে-সমস্ত মারাত্মক কথা লিখেছিলেন, তা প'ড়েও আমাদের ঔৎসুক্য যেকালে বেড়েছে বই কমেনি, তখন হপ্‌কিন্স্‌-এর উৎকর্ষ নিশ্চয়ই নিঃসন্দেহ।

অবশ্য আমি আবাল্য ব্রিজেস্‌-বিদ্বেষী; এবং সহজাত বৈরিতার প্রাদুর্ভাবে যাঁরা আপাতত আমার মতো একদেশদর্শী নন,—যেমন চার্লস্‌ উইলিয়ম্‌স্‌ অথবা কলিয়র এবট্‌—তাঁরা এজন্যে ব্রিজেস্‌-এর দোষ ধরেননি; উল্‌টে তাঁর তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি ও অব্যর্থ কালজ্ঞানের গুণ গেয়েছেন। তাঁদের বিবেচনায় মৃত বন্ধুর ছিদ্রান্বেষণে জীবন কাটিয়ে এবং তাঁর ছন্দসংক্রান্ত আবিষ্কারসমূহকে সকলের অজ্ঞাতসারে নিজের নিরাপদ কবিতাবলীর মধ্যে আশ্রয় দিয়ে ব্রিজেস্‌ নাকি স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়াস পাননি, হপ্‌কিন্স্‌-এর জন্যেই আসর জমাচ্ছিলেন। নচেৎ 'দি স্পিরিট অফ্‌ ম্যান্‌'-এর পারিজাতকাননে হপ্‌কিন্স্‌-এর মতো জেস্যুইট্‌ পিশাচের নির্ব্বিবাদ প্রবেশ তিনি অম্লানবদনে সইতেননা, নতুবা হপ্‌কিন্স্‌-কাব্যের ভূমিকায় স্বরচিত সনেট্‌ জুড়ে পরবর্ত্তী কবিতাগুলিকে "প্রীতির উত্তরাধিকার" বলার সার্থকতা থাকতোনা, নয়তো চল্লিশ বছর আগেকার ছেঁড়া কাগজ ঘেঁটে হপ্‌কিন্স্‌-এর একতরফা চিঠিপত্র প্রকাশের ভার পড়তোনা অধ্যাপক এবট্‌-এর উপরে। কিন্তু কোনো অচেনা কবির রচনাসম্পাদনের সময়ে সহজ কবিতা-কটা স্বেচ্ছায় ছেঁটে ফেলে, তার প্রথম পরিচয়ে এ কথা লেখা নিশ্চয়ই অন্যায় যে তাকে বুঝতে চাওয়া পণ্ডশ্রম, তার অবদান এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ; এবং এই মন্তব্য যদি শুধু পরিপক্ক জীবন্মুক্তির চিহ্ন হয়, তবুও চার্লস্‌ উইলিয়ম্‌স্‌-এর ন্যায় একজন নাতিপ্রৌঢ় সম্পাদকের পক্ষে এ-রকম ইঙ্গিত নিছক সত্যভাষণের খাতিরেও মার্জ্জনীয় নয় যে 'এপিথেলেমিয়ন্‌'-নামক কবিতাখণ্ডের স্নাতক কাপড় ছাড়ার আগে জুতো খুলে প্রমাণ করেছে যে তার মানসপিতার দৃষ্টি সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু অভ্রান্ত নয়, আর সেইজন্যই হপ্‌কিন্স্‌ মহৎ পথে চললেও কখনো মহত্ত্বে পৌঁছননি। উপরন্তু ব্রিজেস্‌-এর উভয় অনুগামীই এ-প্রসঙ্গে একমত যে তাঁর পৃষ্ঠপোষণ ব্যতীত হপ্‌কিন্স্‌-এর কোনো কীর্ত্তিস্তম্ভই দাঁড়াতে পারেনা, সুতরাং ব্রিজেস্‌-এর পদলেহন প্রত্যেক হপ্‌কিন্স্‌-ভক্তের আশুকৃত্য। হয়তো সেই কারণেই এবট্‌ সাহেব হপ্‌কিন্স্‌-এর চিঠির সঙ্গে ব্রিজেস্‌-এর দু-দুখানি ছবি ছেপেছেন; এবং তাঁর পাদটীকায় যেমন পত্রোক্ত ব্যক্তিদের যুনিভার্সিটি ডিগ্রির ফর্দ্দ ছাড়া আর বিশেষ কোনো খবর নেই, তেমনি তাঁর পরিশিষ্টে ব্রিজেস্‌-

প্রশস্তি দুস্তর ও ক্লেশকর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আসল চিঠিগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য এই মনোভাবের বিরুদ্ধে ; এবং সেগুলি যাঁকে উৎসর্গিত তিনি যে দাম্ভিকশিরোমণি, তার উত্তর সাক্ষ্য ব্রিজেস্-এর তৎকালীন কবিতার বর্ত্তমান রূপে। শুনলে অবাক লাগে, তবু না-মেনে উপায় নেই যে হপ্‌কিন্স্-এর জীবদ্দশায় তাঁর প্রস্তাবিত যত সংশোধন ব্রিজেস্-এর অহংজ্ঞানে বেজেছিলো, তাঁর দেহান্তের পরে সেগুলোর অঙ্গীকারে ব্রিজেস্-এর মিতভাষী বিবেক কোনো আপত্তি তোলেনি। অতএব আমার কাছে হর্বার্ট্ রীড্-এর অনুমানই সমীচীন ঠেকে ; অর্থাৎ আমিও ভাবতে প্রস্তুত যে নিজের ক্ষুদ্রতা ঢাকতেই ব্রিজেস্ তাঁর দিকের পত্রাদি পুড়িয়েছিলেন, এবং বাহ্যত তাঁর আত্মপ্রসাদের খোরাক না-যোগালে হপ্‌কিন্স্-এর চিঠিগুলোকে তিনি জমিয়ে রাখতেন কিনা বিবেচ্য।

বলাই বাহুল্য, এতখানি অন্যায় তিনি জ্ঞানত করেননি ; এবং মনোবিকলনের যুগে অবচেতন পরশ্রীকাতরতার অপরাধে কোনো মানুষের শাস্তিবিধান হঠকারিতার পরাকাষ্ঠা। তৎসত্ত্বেও আমি এই পরীবাদ এড়িয়ে যেতে পারলুমনা ; কারণ আমার ধ্রুববিশ্বাস যে স্বকীয়তার আসল মূল্য যাই হোকনা কেন, সেজন্যে অন্তত সাম্প্রতিক কবিদের কেউ কখনো উপেক্ষার বোঝা বননি ; এবং হপ্‌কিন্স্-এর ছন্দস্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যাকরণবিভ্রাট রসেটি, হল্ কেন্, গস্ প্রভৃতি ভদ্রলোকের মন পায়নি বটে, কিন্তু তাঁর পরীক্ষাদি সমস্তই যেহেতু সদুদ্দেশ্যে—অর্থাৎ সুইন্‌বর্নী অতিস্ফীতি থেকে প্রকৃত কাব্যের উদ্ধারকল্পে, তাই সাধারণ পাঠকের পক্ষপাত স্বভাবতই তাঁর দিকে। কিন্তু হপ্‌কিন্স্-এর কাছে শুধু সে-কালের কাব্যই কৃত্রিম ঠেকেনি, তিনি বুঝেছিলেন যে সাময়িক সমাজও কপটতার উপরে প্রতিষ্ঠিত ; এবং কবিরা যেমন লৌকিক ভাষার বহিরাবরণ বজায় রেখেও তার আভ্যন্তরীণ যাথার্থ্যে ঘুণ ধরিয়েছেন, তেমনি সমাজপতিরাও সমাজরক্ষার অছিলায় সাধারণ্যের সর্ব্বনাশ সাধছেন। ফলত তিনি প্রায় কৈশোরান্তেই কাব্যকৈবল্যের মোহ কাটিয়ে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ ঐক্যসাধনের প্রয়াস পান এবং বিস্তর আত্ম-জিজ্ঞাসার পরে স্বধর্ম্মে নিধন অধর্ম্মের চূড়ান্ত বিবেচনায় অগত্যা ভয়াবহ পরধর্ম্মেরই শরণ নেন। কেননা হপ্‌কিন্স্ কথা আর কাজের বৈষম্য সইতে পারতেননা ; এবং উভয়সঙ্কটে পড়লে তাঁকে যদিও প্রজ্ঞাই চালাতো, তবু তাঁর আবাল্য অভ্যাস ছিলো সর্ব্বান্তঃকরণে অভিপ্রেত কর্ত্তব্যপালন। কাজেকাজেই তাঁর বুদ্ধি ও বিশ্বাস আদর্শ

আর আচারের চিরন্তন ব্যবধানে সায় দিলেনা ; ক্যাথলিক্‌দের মধ্যেও একা জেস্যুইট্‌-রাই কায়মনোবাক্যে নির্দ্বন্দ্ব ব'লে তিনি স্বেচ্ছায় সেই সুশাসিত সংঘের অধীনে এলেন। কিন্তু যুক্তরাজ্যে শুধু আধ্যাত্মিক একাগ্রতাই বিধিবিরুদ্ধ নয়, সেখানকার কর্ম্মজীবনে ঐকান্তিক ন্যায়নিষ্ঠারও প্রবেশ নিষিদ্ধ ; এবং অনীহা ইংরেজদের এমনি মজ্জাগত যে ন্যুম্যান্-এর বিশ্বাসঘাতকতা সাময়িক সমাজে পরচর্চ্চার বন্যা বওয়ালেও, ভিক্টোরিয়ার পরিতৃপ্ত প্রজারা ভাবতে পারেনি যে তাঁর দৃষ্টান্ত আবার কাউকে মাতিয়ে তুলবে। উপরন্তু নরকযাত্রীদেরও মাত্রাজ্ঞান হারানো অনুচিত ; এবং বিবেকের কুমন্ত্রণায় ধর্ম্ম বদ্‌লালেই লোকায়ত আর লোকোত্তরের মাল্যবিনিময় অবশ্যম্ভাবী নয়। সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্-এর চিঠিতে সাম্যবাদের অঙ্কুরোদ্‌গম দেখে রক্ষণশীল ব্রিজেস্ তিন বছর নিরুত্তর থেকেছিলেন ; সেইজন্যেই তাঁর বিজ্ঞানসচেতন মনে ধারণা জন্মেছিলো যে হপ্‌কিন্স্-এর ক্যাথলিক্ কুসংস্কারগুলো আন্তরিক নয়, মৌখিক ; সেইজন্যেই 'ডয়েচল্যাণ্ড্' তাঁর অনুকম্পা জাগায়নি, তিনি ঠাউরেছিলেন যে নৈর্ব্যক্তিক কবির পক্ষে অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি নিতান্ত নিন্দনীয়।

কিন্তু ইংরেজমাত্রেই জন্মান্ধ নয়। অন্তত যারা বিগত মহাযুদ্ধের পরিবর্দ্ধিত সংস্করণে নিজেদের নাম দেখতে অনিচ্ছুক, তারা অনেক ঠেকে আজ শিখেছে যে শ্রমবিভাগে বিধ্বস্ত ও অধিকারভেদে বিকল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য যদি ব্রিজেস্-এর মতো আত্মম্ভরি অভিভাবকদের হাত থেকে বাঁচে, তবেই রোমান্ চার্চ্চের অন্তর্ভৌম ষড়যন্ত্র তাকে রসাতলে পাঠাবে। তাই উত্তরসামরিক ইংরেজ আর জেস্যুইট্‌দের কুটিল সম্প্রদায়কেও ভয় পায়না, বোঝে যে তাদের ঐকান্তিক বিশ্ববীক্ষার আশীর্ব্বাদেই হপ্‌কিন্স্ সঙ্কীর্ণ দেশ-কালের গণ্ডিমুক্ত। অবশ্য এই বিশ্ববীক্ষাই যে অভ্রান্ত এমন বিশ্বাসপোষণে সে অপারগ। কিন্তু এ-সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ যে নেই মামার চেয়ে কাণা মামাও ভালো এবং কোনো ধর্ম্মে আস্থা রাখলে সে-ধর্ম্মের সার্ব্বত্রিক নিয়োগেই সাধুতা সার্থক। সেইজন্যে সে আর হপ্‌কিন্স্-কে শুধু রবার্ট্ ব্রিজেস্-এর বন্ধু হিসাবেই শ্রদ্ধা করেনা অথবা ক্যাথলিক্ চক্রান্তের নিমিত্তমাত্র ব'লে করুণাযোগ্য ভাবেনা, সে জানে তিনি নিজগুণেই আমাদের নমস্য এবং প্রায় সকল সমসাময়িক সাহিত্যিকের অগ্রগণ্য। কারণ তিনি আকস্মিক আবেগের বশে গোটাকয়েক মর্ম্ম-স্পর্শী কবিতা লিখেই খুশি হননি, মিল্‌টন্-আদি প্রাতঃস্মরণীয়দের মতো সমগ্র সত্তা ও আমরণ সাধনার দ্বারা সারা জগৎকে কাব্যশৃঙ্খলায় বেঁধেছিলেন কিম্বা বাঁধতে

চেয়েছিলেন। সে-বিশ্ববিলোকন যে নেহাৎ সহজ নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন ; এবং বিধাতা হপ্‌কিন্‌স্-কে অক্ষয় পরমায়ু দিলেও তাঁর অমেয় সংযোজনার অধিকাংশই হয়তো কূপমণ্ডুকের কাছে আতিশয্যময় ঠেকতো। সুতরাং হপ্‌কিন্‌স্-এর আধুনিক ভক্তেরা তাঁর দুরূহ রচনারীতির দায় আর অকাল মৃত্যুর উপরে চাপায়না, হপ্‌কিন্‌স্-কাব্য হাতে নিয়ে পল্লবগ্রাহিতার লোভ ছাড়ে ; এবং আশ্চর্য্য এই যে মানসিক আলস্য কাটার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিজেস্-বিজ্ঞাপিত ব্যাসকূটগুলোও তাদের সুবোধ্য লাগে, তারা ম্যানে যে পরিবৃদ্ধির খাতিরে যে-কবি নিজের একাধিক লেখা নির্ম্মম হৃদয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, আমাদের নিরবকাশ অবধানে তাঁর দাবি অবশ্যস্বীকার্য্য। এর পরে এ-কথা বলতে তাদের জিভে বাধে যে হপ্‌কিন্‌স্-এর অনুর্ব্বরতা জেসুইট্ শোষণের অমোঘ পরিণাম ; বরং তারা বিস্মিত চোখে সে-অনুষ্ঠানের দিকে তাকায়, যার আনুকূল্যে হপ্‌কিন্‌স্ বাক্যবাগীশ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যন্তে জন্মেও সংযমে সতেরো ও আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবিদের সমকক্ষ।

সম্ভবত সেইজন্যেই হপ্‌কিন্‌স্-এর সর্ব্বশেষ সম্পাদক হম্‌ফ্রি হাউস্ তাঁর সঙ্কলনগ্রন্থখানি জেসুইট্ সংসদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। উপরন্তু হপ্‌কিন্‌স্-এর জীবনবৃত্তান্ত ও রচনাসমষ্টির গবেষণায় নেমে তিনি দেখেছেন যে হপ্‌কিন্‌স্-প্রতিভার বাদ সাধা দূরের কথা, সাম্প্রদায়িক সহকর্ম্মীদের তত্ত্বাবধানে না-এলে তাঁর ধর্ম্মবিষয়ক সন্দর্ভসমূহ, অলঙ্কারসংক্রান্ত বক্তৃতাদি, এমনকি অনেকগুলি কবিতাও, স্বাধীনচেতা বন্ধু-বান্ধবদের অযত্নে হয়তো একেবারে হারিয়েই যেতো ; এবং এ-সব লেখা হপ্‌কিন্‌স্-এর পূর্ণ পরিচয়ের পক্ষে যেমন অপরিহার্য্য, সাহিত্যসৃষ্টি হিসাবেও তেমনি অত্যুৎকৃষ্ট। উদাহরণত তাঁর সর্মন্ উল্লেখযোগ্য ; এবং সেগুলির বিষয়-বস্তু যদিচ এতই মধ্যযুগীয় ও খৃষ্টানভাবাপন্ন যে তাতে আমার মতো বাঙ্গালীর প্রবেশ স্বতোব্যাহত, তবু তাঁর প্রভাস্বর গদ্যের ওজ আর প্রসাদ, ন্যায় আর ঋজুতা, সম্বেগ আর বাহুল্যবর্জ্জন অন্তত কিছু কাল কোল্‌রিজ্-বর্ণিত উপায়ে নাস্তিকের প্রতর্ককেও ঠেকিয়ে রাখবে। আসলে এগুলির সঙ্গে তাঁর কাব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; এবং তিনি শুধু সেই কবিজাতির অন্তর্গত নন, যাদের সকল সৃষ্টিই একটা বৃহত্তর সামঞ্জস্যের অংশভাক, অধিকন্তু নিদ্রায় জাগরণে, সুখে দুঃখে, চিন্তায় কর্ম্মে ঐশী মহিমার সঙ্কীর্ত্তনই ছিলো তাঁর অবিচল লক্ষ্য। এই অন্তরতম দৈবানুগত্যই তিনি তাঁর গদ্যে ও পদ্যে একই প্রকারে ফুটিয়েছেন : উপমার জীবন্ত জৌলসে, প্রতীকের

অনির্ব্বচনীয় গৌরবে, প্রচ্ছন্ন পাণ্ডিত্যে, অপ্রযুক্ত শব্দের হৃদয়সম্বেদ্য বিলাসে, অভাবনীয় ছন্দকৌশলের চমৎকার অভিঘাতে এই অলৌকিক উপলব্ধির বিচিত্র ব্যঞ্জনাই তাঁর সাহিত্যজীবনের মূলসূত্র। এ-সত্য হাউস্ সাহেবের সুবিদিত; এবং হপ্‌কিন্স্‌-এর সাহিত্যসাধনায় ফাদার লেহি-র মতো তিনি কেবল জেস্যুইট্ কীর্ত্তিকলাপের নির্ঘণ্ট খোঁজেননি বটে, তবু আক্রোশের বশে অধ্যাপক এবট্-এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে এমন মিথ্যাও তিনি রটাননি যে হপ্‌কিন্স্‌-এর শোকাবহ ট্র্যাজেডি হচ্ছে পরিপুষ্ট পুরোহিতের নিষ্পেষণে অপরিণত কবির অপঘাত।

পক্ষান্তরে হাউস্ জানেন যে হপ্‌কিন্স্‌-এর সৃজনীশক্তি অনেক সময়েই তুচ্ছ কাজের ভিড়ে চাপা পড়তো; কিন্তু এটাও তাঁর অজ্ঞাত নয় যে এই আত্মত্যাগের পথে হপ্‌কিন্স্ নির্ব্বিচারে পৌঁছননি এবং কাব্যামোদী বন্ধুদের সনির্ব্বন্ধ প্রতিবাদের উত্তরে তিনি নিজেই বারবার লিখেছিলেন যে কবিতা তাঁর শোচনীয় ব্যসনমাত্র, তাঁর ব্রত প্রত্যাদ্দিষ্ট কর্ত্তব্যপালনে নিরবশেষ আত্মসমর্পণ। এর পরে হপ্‌কিন্স্‌-প্রসঙ্গে আর এ-রকম ব্যর্থ প্রশ্ন উত্থাপনের কোনো মানে নেই যে তাঁর মতিগতি বদ্‌লালে তিনিও বন্ধু ব্রিজেস্-এর মতো কাব্যলক্ষ্মীকে বিশ্ববিধাতার শূন্য সিংহাসনে বসিয়ে বৃদ্ধবয়সে আধিদৈবিক মর্য্যাদাবোধের বন্দনা গাইতেন কিনা; এবং হাউস্ সাহেবও সে-ধরণের অযথা একদেশদর্শিতায় পাতা ভরাননি, প্রথিতযশা সম্পাদকদের উদ্বৃত্ত কুড়িয়ে নির্লিপ্ত ভূমিকা ও সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্য-সমেৎ যে-সঙ্কলনখানি আমাদের সামনে ধরেছেন, তা অবিলম্বে হপ্‌কিন্স্‌-পরিচিতির প্রামাণ্য গ্রন্থ রূপে পরিগণিত হবে। অথচ বইখানি হপ্‌কিন্স্‌-এর জীবনচরিত নয়, তাঁর উপেক্ষিত রচনারাশির সুনির্ব্বাচিত নিদর্শন; এবং এতে যদিচ হপ্‌কিন্স্‌-এর রোজনামা স্থান পেয়েছে, তবু সে-দিনলিপি এতই নিরহঙ্কার যে তা দেখে হাউস্ সাহেবও সম্পাদকসুলভ আত্মশ্লাঘার মোহ কাটিয়েছেন। ফলত সুলিখিত মুখবন্ধে অগ্রজের প্রতিধ্বনি ক'রে তিনি একবারও বলেননি বটে যে মিত্রাক্ষরের লোভ সাম্‌লাতে পেরে তাঁর নিসর্গনিরীক্ষা হপ্‌কিন্স্‌-এর চেয়ে সূক্ষ্মতর, কিন্তু পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় হপ্‌কিন্স্‌-এর অসাধারণ লিখনপদ্ধতির সবিশেষ পরিচয় দিয়ে, কৌতূহলীর না-হোক, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানপিপাসা তিনি কার্পণ্যব্যতিরেকেই মিটিয়েছেন। উপরন্তু এই সংকলন থেকে হপ্‌কিন্স্‌-প্রতিভার কোনো বিকাশই বাদ পড়েনি; এবং তাঁর জীবনরহস্য যেহেতু মুখ্যত

আধ্যাত্মিক, আদৌ আধিভৌতিক নয়, তাই তাঁকে পূরোপুরি চেনার জন্যে এই সঞ্চয়ন ব্যতীত অন্য কোনো অভিজ্ঞানপত্র অনাবশ্যক।

তাহলেও হাউস্-সম্পাদিত সংগ্রহে ধর্ম্মরচনা অপ্রচুর, দিনানুদৈনিক সংসার-যাত্রার খুঁটিনাটিই বেশি; এবং হপ্‌কিন্স্-সম্বন্ধে ধর্ম্মাত্মা-বিশেষণটা যদিও বিশেষভাবে প্রযোজ্য, তবু তিনি আগে কবি, তার পরে সাধক। সুতরাং তাঁকে ক্র্যাশ, ভন্, ব্লেক্, এমনকি এমিলি ব্রন্টি-রও, পর্য্যায়ে ফেলা অন্যায়; এবং পারমার্থিক রহস্যকথনে তিনি অনেক সময় রামপ্রসাদ বা কবিরের মতো সাধারণ জীবনের সাজ-সরঞ্জামকেই রূপকার্থে ব্যবহার করতেন বটে, কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের বিখ্যাত সনেটসমূহের সঙ্গে মরমী গীতিকবিতার কোনো আত্মীয়তা নেই, সেগুলির প্রতিমান ডান্-এর আধ্যাত্মিক কবিতাবলী। অবশ্য ডান্-এর প্রতিপত্তি আমাদের জীবদ্দশাতেই সুরু হয়েছে; এবং হপ্‌কিন্স্-এর পুঁথিপত্রে এমন কোনো ইঙ্গিত নেই যা সেই শেষ এলিজাবীথান্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সাক্ষী। তবুও এঁদের রচনারীতিই সমধর্ম্মী নয়, এঁদের চরিত্রগত সাদৃশ্যও বৈসাদৃশ্যের চেয়ে স্পষ্টতর। ডান্-এর ইন্দ্রিয়পরায়ণতা আর ইন্দ্রিয়ার্থের উপরে হপ্‌কিন্স্-এর অগাধ বিশ্বাস, ডান্-এর বুদ্ধিবাদ আর শ্রুতি-স্মৃতির টীকা-টিপ্পনীতে হপ্‌কিন্স্-এর দুর্দ্দমনীয় স্বাতন্ত্র্য, উভয়ের উপরে বৈরাগ্যের নিরন্তর আকর্ষণ, চিরাচারের প্রতি উভয়ের সফল অবজ্ঞা, উভয়ের দর্শনানুরাগ ও গাম্ভীর্য্য—এ-মিলগুলো একবার মানলে এমন সিদ্ধান্তের সমর্থন খুবই শক্ত যে নির্ব্বিকল্প সমাধি নিরুপাধিক জেনেই হপ্‌কিন্স্ লক্ষণাবৃত্ত ছেড়ে ব্যঞ্জনাবৃত্ত ধরেছিলেন অথবা উপমার বদলে উৎপ্রেক্ষা চালিয়েছিলেন। আসলে তিনি ঐশ্বর্য্যময় পৃথিবীকেই ভালোবাসতেন, তাঁর সমস্ত অবসর কাটতো এই মর্ত্ত্যমহিমার বিস্মাপনব্যাখ্যানে; এবং সেইজন্যে যেমন এক দিকে তাঁর কৃতজ্ঞ হৃদয় এই অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টিকর্ত্তাকে মুহূর্ত্তেকও ভুলতে পারতো না, তেমনি অন্য দিকে তাঁর জাগ্রত বুদ্ধি সৌন্দর্য্যবিনাশী যন্ত্রশিল্পের বিপুল বিসর্পণে প্রতিনিয়ত ভয় পেতো। আমার বিশ্বাস, এই অন্তর্দ্বন্দ্বই তাঁর বিশিষ্ট ধর্ম্মানুরক্তির প্রাণ ও কারণ; এবং এ রকম দোটানা যখন আধুনিক সভ্যতারই দারুণ দুর্লক্ষণ, তখন পুরাকালীন সুসমঞ্জস সমাজব্যবস্থায় জন্মালে তিনি হয়তো সংসারের ভিতরেই সত্য, শিব, সুন্দরের আকাশবাণী শুনতেন। কিন্তু তা ঘটেনি ব'লেই, বর্ত্তমানের বেসুর বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি দূরে স'রে গিয়েছিলেন ব'লেই, তাঁর উপরে ভীরু-নামের আরোপ ন্যায়সঙ্গত

নয়; এবং যে-পলায়নপ্রবৃত্তি একদিন উইস্‌মা-কে ক্যাথলিক্ চার্চ্চে এনেছিলো অথবা এলিয়ট্-কে আজ রোমের সকাশে পাঠিয়েছে, হপ্‌কিন্‌স্-এর কর্ম্মঠ জীবনে সে-দুর্ব্বলতার হিমস্পর্শ কখনো লাগেনি। তিনি আবাল্য বুঝতেন যে শুধু মুখের কথায় চিঁড়ে ভেজেনা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সকাল সন্ধ্যা লাঙল ধরলে, তবেই মরু-ভূমিতে ফসল ফলে। হয়তো সেইজন্যেই আজকালকার বামাচারী ইংরেজ কবিদের উপরে এই জেস্যুইট্ পুরোহিতের প্রভাব এত প্রবল।

সে যাই হোক, অন্তত এতে সন্দেহ নেই যে হপ্‌কিন্‌স্-এর সেবাধর্ম্ম থেকেই "স্প্রাং রিদম্-"এর উৎপত্তি; এবং ইংরেজী ছন্দ-সম্বন্ধে বিদেশীর বাক্যব্যয় যদিচ অসমসাহসিক অনধিকারচর্চ্চা, তবু পূর্ব্বেই বলেছি যে প্রচলিত কাব্য তাঁর কাছে অবাস্তব ঠেকাতেই হপ্‌কিন্‌স্ সে-কলার শোধনে হস্তক্ষেপ্ করেছিলেন। তিনি জানতেন, সাহিত্যের এই বিভাগটাই প্রাচীনতম, প্রাথমিক মনুষ্যগোষ্ঠীর ঐকাত্মিক সুখ-দুঃখই আগে নৃত্য ও তারপর নৃত্যজনক ধ্বনিবিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছিলো। সেইজন্যে এই শিল্পে মুষ্টিমেয় বিদ্যাভিমানীর উদ্ধত একাধিপত্য তিনি সইতে পারেননি, ধারাবাহিক কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত্তি দাবিয়ে, আট বছর ধ'রে বিভিন্ন লোক-সাহিত্যের মধ্যে প্রাকৃত ছন্দের স্বরূপ খুঁজেছিলেন; এবং ফলে তাঁর মনে হয়েছিলো যে ইংরেজী ভাষার ধ্বনিবিজ্ঞান অক্ষর বা 'সীলেব্‌ল্'-গণনার মুখাপেক্ষী নয়, তার ভিত্তি 'ষ্ট্রেস্' বা স্বরাঘাত। কারণ ভাষা ক্ষিতিজ ভাবের প্রতিবিম্ব, এবং দেশে ও কালে ভাবের প্রলেপ সমমাত্রিক নয়, বিষয়বিশেষে তার গভীরতার তারতম্য ঘটে; সুতরাং বাক্যের মধ্যে সেই শব্দসমূহই সজোরে উচ্চারণীয়, যেগুলোর অর্থগৌরব স্বভাবত বেশি; এবং প্রথাসিদ্ধ উপায়ে পদ্যের ছন্দোলিপি বানিয়ে সমাক্ষর চরণের নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঘা মারলে নির্ব্বাক পাঠকের চাক্ষুষ অভিনিবেশ হয়তো চিড় খায়না, কিন্তু উৎকর্ণ সহানুভূতির তাল নিশ্চয়ই ভেঙে যায়। বলাই বাহুল্য, ইংরেজী ছন্দের এই মূলগত কৃত্রিমতা একা হপ্‌কিন্‌স্-এর কাছেই ধরা দেয়নি; এবং পাশ্চাত্য কাব্যসমুদ্র ছেঁকে তিনি 'স্প্রাং রিদম্'-এর যত উদাহরণ জমিয়েছিলেন, তা হাউস্-সম্পাদিত সঙ্কলনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু হপ্‌কিন্‌স্-এর কারয়িত্রী প্রতিভা এই নেতিবাচক আবিষ্কারে থামেনি, তাঁর বিবর্ত্তনবুদ্ধি পূর্ব্ব-গামীদের ব্যতিক্রমগুলোকে নিয়মের নিগড়ে বেঁধেছিলো; এবং তিনি বুঝেছিলেন যে দুটো স্বরাঘাত পরপর এলে ইংরেজদের কান যখন মধ্যবর্ত্তী অক্ষরবিলোপে

আপত্তি তোলেনা, তখন অর্থের ইমারতে গোলা পায়রার জন্যে খোপ খালি রাখা অনাবশ্যক, তাতে পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গের লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে না, জঞ্জালের বহর দেখে আমন্ত্রিতেরাই দূরে পালায়। তবে পাকা বাড়িতে জনসমাগম নিরাপদ, বিশেষ উপলক্ষ্যে একজনের স্থান সেখানে দশজনে নেয়; এবং সাহিত্যের অন্যান্য শাখা-প্রশাখার মতো পদ্যেরও প্রধান কর্ত্তব্য যেহেতু অতিথিসৎকার, তাই স্থিতিস্থাপকতাই তার অঙ্গের ভূষণ, অবস্থানুরূপ ব্যবস্থায় সেও গদ্যের প্রতিপক্ষ।

তত্রাপি গদ্য ও পদ্য কখনো এক নয়, এবং ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্-এর প্রতি সহজ পক্ষপাত সত্ত্বেও হপ্কিন্স্ পঠদ্দশাতেই কোল্রিজ-এর নির্দ্দেশে মেনেছিলেন যে শব্দসমূহের শ্রেষ্ঠ বিন্যাসই যদিও গদ্য-পদ্যবাচ্য, তবু কাব্যের উদ্ভব শ্রেষ্ঠ শব্দাবলীর পরম সমন্বয়ে। সেইজন্যেই তাঁর লঘুতম রচনা থেকেও ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্-এর জলবৎ তারল্য চিরনির্ব্বাসিত। কারণ হপ্কিন্স্ যেমন সাধারণ পাঠকের উদ্দেশেই কাব্য লিখতেন, তেমনি মানুষ-সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধা-সমাদরের অন্ত ছিলোনা; তিনি জানতেন যে সুবিধার অভাবেই ইতর-অবরদের হৃদিস্থিত বররুচি আজ পর্য্যন্ত জেগে ওঠেনি, সুযোগ পেলেই অন্ত্যজের উপনয়নে অপ্রাকৃত জাতিবিচার ঘুচবে। উপরন্তু তিনি বুঝতেন যে ব্যক্তিস্বরূপ স্তরভেদের পোষ্যপুত্র নয় এবং জগতের মূল যতই অবিভাজ্য হোকনা কেন, বিশ্ব আর বৈচিত্র্য সমার্থবাচক। সুতরাং অভিজ্ঞতার আত্মনেপদকে পরস্মৈপদে পরিবর্ত্তনের চেষ্টাও তাঁর কাছে হাস্যকর লাগতো, তিনি ভাবতেন যে ভাবের পিছনে যেকালে সর্ব্বগোচর বস্তুসংসার বিদ্যমান এবং তার সামনে লৌকিক ভাষার অবাধ প্রসার, তখন ঐকান্তিক উপলব্ধির আদান-প্রদান তো নিশ্চয়ই সুসাধ্য, এমনকি স্বগত অনুভূতি বেঁটে বেঁটে সভ্যতার বিস্তার বাড়ায় ব'লেই শিল্পীরা সমাজের অগ্রণী। তাহলেও স্বকীয়তা আর জন্মান্তররহস্য পৃথক ধাতুতে গঠিত; এবং ঘরে ব'সে চোখ বুজলে চর্ব্বিতচর্ব্বণ অনায়াসে চলে বটে, কিন্তু নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্তে আসে না। সেজন্যে দরকার উন্নিদ্র চৈতন্য ও অক্লান্ত অধ্যবসায়; এবং কি পরিমাণ দৃক্শক্তির সঙ্গে কতখানি কল্পনা মিশলে, তথ্য ও তত্ত্বের, ভাব ও ভাষার, সংবেদনা ও অনুষঙ্গের, অধুনা ও অতীতের কোন্ রকম সংমিশ্রণ ঘটলে মুখ্য কবিদের সমপংক্তিতে পাদপীঠ মেলে, তার চরম নিষ্পত্তি হপ্কিন্স্-এর দিনপঞ্জিকা। গত বছর শেক্স্পীয়র-এর চিত্রকল্প-সম্পর্কে অধ্যাপক স্পর্জন্-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বইখানি না-বেরুলে হয়তো

সে-দিক্‌পতিকেও স্বর্ব্বভুক কৌতূহলে হপ্‌কিন্স্‌-এর নিচে নামাতে হতো; এবং আজ আর তেমন আধিক্যের অবকাশ না-থাকলেও এমন অনুমান আদৌ অসঙ্গত নয় যে এই ডায়ারি-কটি প'ড়ে কেবল সাহিত্য-ব্যবসায়ীদেরই চোখ ফুটবে না, সঙ্গীতসেবী, স্থপতি ও চিত্রকর, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নিরুক্তকার, উদ্‌ভিদ্‌-শাস্ত্রবিদ্‌ ও বায়ুবিজ্ঞানী, ভৌগলিক ও ভূতবিদ্যাজ্ঞ, এঁদের সকলেই সমান উপকার পাবেন। ধন্য হাউস্‌ সাহেবের পাণ্ডিত্য যে তাঁর বিশ্বকোষী পাদটীকা এই সর্ব্বমুখী দিনলিপির অগণ্য অলি-গলিতে আমার মতো দিশাহারার যাতায়াতও সুকর ক'রে দিয়েছে।

হপ্‌কিন্স্‌-এর সাহিত্যসেবা মিল্‌টনী একনিষ্ঠার প্রতিযোগী, তাঁর কবিতা ডান্‌-প্রণীত অধ্যাত্মকাব্যের সদৃশ, তাঁর চিঠিগুলি কীট্‌স্‌-লিখিত পত্রাবলীর অনুরূপ, এবং উভয়ের দৈনন্দিন রচনা থেকে তুল্যমূল্য পাঠোদ্ধার ক'রে হাউস্‌ সাহেব দেখিয়েছেন যে হপ্‌কিন্স্‌-এর ডায়েরি আর কোল্‌রিজ্‌-এর নোটবুক এক সূত্রে বাঁধা, একই জিজ্ঞাসায় অনুপ্রাণিত। এ ছাড়াও খুঁজলে দুজনের আরো অনেক মিল বেরুবে: যথা, কাব্যসৃষ্টির জন্যে বুদ্ধি ও কাব্যপাঠের পক্ষে বোধির প্রয়োজন-সম্বন্ধে উভয়ের মতৈক্য এবং কাব্যপিপাসুর মনে আবেশ ও অর্থের পৌর্ব্বাপর্য্য-সম্পর্কে দুজনের নিরুক্তি, প্রচলিত ছন্দশাস্ত্রের উপরে উভয়ের অনাস্থা এবং নূতন ছন্দঃপ্রকরণে অন্তত খানিক দূর—অর্থাৎ 'কুষ্টাবেল্‌'—পর্য্যন্ত দুজনের সহগমন, এক-একটা কবিতার উপাদান সংগ্রহে উভয়ের বহু বৎসরব্যাপী প্রযত্ন এবং আরব্ধ কর্ম্মের সমাধানে দুজনের অক্ষমতা। এতগুলো মিল নিশ্চয়ই দৈবাৎ নয়, এবং শ্রেষ্ঠ কবিদের নিগূঢ় সামান্যতা বুঝলেও এ-সমীকরণের রহস্য চোকেনা। তাহলেও হপ্‌কিন্স্‌ সম্ভবত কোল্‌রিজ্‌-এর সহধর্ম্মী নন; এবং সুন্দরের অভ্যাঘাতে উভয় মনে সমানুপাতিক বিস্ময়বোধ জাগতো বটে, কিন্তু কোল্‌রিজ্‌-এর ক্ষেত্রে যেটা ধরতো স্বয়ংসম্পূর্ণ তন্ময়তার আকার, হপ্‌কিন্স্‌-এর বেলা সেটা বোমার মতো ফেটে তাঁর শুদ্ধচৈতন্যকে দিতো বস্তুবিশ্বের সঙ্গে মিশিয়ে। হয়তো সেইজন্যেই হপ্‌কিন্স্‌ নিজে ওয়াল্ট্‌ হুইট্‌ম্যান্‌-কেই তাঁর দোসর বলেছেন; এবং যে-কবি অজস্র অনুচিন্তন ও অসংখ্য পরিবর্ত্তন ব্যতিরেকে সামান্য দিনপঞ্জিকা সুদ্ধ লিখতে চাইতেননা, তাঁর সঙ্গে সেই মার্কিনী বাক্‌জীবনের তুলনা যদিচ আপাতত অগ্রাহ্য, তবু এমন ধারণা বোধহয় পোষণীয় যে হুইট্‌ম্যান্‌-এর বিরাট সাধনা—প্রত্যক্ষ পৃথিবীর

অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারে বিশ্বমানবের উদ্বোধন—সে-সাধনা একা হপ্‌কিন্স্-এর কাব্যরচনাতেই সিদ্ধ। হয়তো বা এই মর্ম্মান্তিক বিষয়াসক্তির জন্যেই হপ্‌কিন্স্ আজ ধ্যানরসিক য়েট্‌স্-এর বিচারে নিন্দনীয়; এবং রুচিভেদের কথা না-তুললে এ-সিদ্ধান্ত মোটেই অস্বীকার্য্য নয় যে য়েট্‌স্ কেবল হপ্‌কিন্স্-এর কাব্য প'ড়ে যে-অভিমতে পৌঁছেছেন, তাঁর রোজনামচা ও রেখাচিত্র হাতে পেয়েও আমরা সেই অনুসারেই মানতে বাধ্য যে তিনি নিজে না-জেনেও ফরাসী ইম্প্রেশনিষ্ট্-দের শিষ্য, তাঁর শিল্পও প্রকৃতির অবিকল প্রতিলিপি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে হপ্‌কিন্স্-এর ব্যাকরণবৈশিষ্ট্য উক্ত ইম্প্রেশনিষ্ট্ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বিজড়িত; এবং যেহেতু যথাযথ প্রতিকৃতি চিনতেও শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজন, তাই তাঁর বস্তুসাপেক্ষ ব্যাকরণ অনভ্যস্ত পাঠকের কাছে প্রথম প্রথম দুর্ব্বিষহ লাগে। কিন্তু শেক্স্‌পীয়রী উপমাসঙ্কর যাঁদের নখদর্পণে তাঁরা জানেন যে ওই উপায়ে কেবল বৃথা বাক্যব্যয়ই কমেনা, উপায়ান্তরে একাধিক অনুভূতির স্বাভাবিক তাৎকাল্য অপ্রকাশ্য। অর্থাৎ সভ্যতার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের গ্রন্থি বাড়ায় আমরা যদিও অগত্যা ভাষার মধ্যে ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় দিয়েছি, তবু মানবচৈতন্যের নিবিদ সমগ্রতা এখনও ঘোচেনি, এবং কোনো আদিম বিভক্তিবিহীন শব্দসমষ্টি আজ চলুক বা না-চলুক, অন্তর্দ্দর্শীমাত্রেই বোঝে যে প্রাগৈতিহাসিক উপজ্ঞার পরিচর্য্যায় তার পঞ্চেন্দ্রিয় যুগপৎ ব্যতিব্যস্ত। উপরন্তু এটা শুধু আত্ম-সন্ধানীর আবিষ্কার নয়; যেখানে বিশ্লেষণবৃত্তি কদভ্যাসে শিকড় গাড়েনি—যেমন অশিক্ষিত জনগণের নিত্যনৈমিত্তিক ভাষায়—সেখানে বিধেয়বাক্য অনেক সময়ে সর্ব্বনামের বালাই চুকিয়ে প্রায় বিশেষণের মতো মূল কর্ত্তৃকারককে আঁকড়ে ধরে।* কিন্তু যে আসলে জটিল, সরলতার অভিনয়ে সে কুটিলও বটে; এবং ভাবের দৈন্য ভাষার ঐশ্বর্য্যে ঢাকাই গর্হিত নয়, প্রকৃত বৈচিত্র্যের স্বল্পাঙ্গ অভিব্যক্তিও অক্ষমতা-সূচক, এমনকি সততার পরিপন্থী। সুতরাং আজকালকার সাত্ত্বিক শিল্পীর দায়িত্ব

* ফলত হপ্‌কিন্স্-এর "Holiest, lovliest, bravest, Save my hero, O Hero savest." অথবা "...Patience who asks/Wants war, wants wounds ;..." ইত্যাদি পংক্তিগুলোর স্বপক্ষে এলিজাবেথীয় কাব্যের দোহাই দেওয়া অনাবশ্যক, এ-প্রসঙ্গে শুধু এইটুকুই স্মর্ত্তব্য যে আজও ইংরেজ দাস-দাসীরা ব'লে থাকে—"There's a man come says he's to mend the pipes."

তার পিতৃপুরুষদের দ্বিগুণ। বুদ্ধির আধিক্যবশত সে অখণ্ড অভিজ্ঞাকে না-ভেঙে আয়ত্তে আনতে পারেনা, অথচ ভগ্নাংশগুলো না-জুড়ে দর্শকদের হাতে দিলে তাদের অভাব অপূর্ণ থাকে। এ-ক্ষেত্রে হপ্‌কিন্স্‌-তুল্য কবির পক্ষে চিত্রকর মানে-র দৃষ্টান্তই শিরোধার্য্য; এবং যাঁরা সেই উর্দ্ধশ্বাস পটুয়ার বৈদ্যুতিক রেখাপাত নির্নিমেষ নেত্রে দেখেছেন, তাঁদের কাছে হপ্‌কিন্স্‌-এর বিস্ফোরক দীর্ঘসূত্রতা আর অহৈতুক ঠেকবেনা; তাঁরা মানবেন যে উভয়ের অপরিচ্ছন্নতা, অবিন্যাস বা অসমাপ্তি নিতান্ত বাহ্য, প্রাণপাত পরিশ্রমের ফলেই দুজনে উদ্বায়ী উপলব্ধির এ-রকম হুবহু নকল করতে পেরেছেন। তবে কৃতিত্ব হয়তো হপ্‌কিন্স্‌-এরই কিছু বেশী। কারণ আলেখ্যে বাস্তবিকতার প্রবেশ যত অনায়াস, সাহিত্যে তেমন নয়; এবং সামান্য জ্যামিতিক রূপকল্পের প্রতিবিম্বনে যখন দিনের পর দিন কাটে, একটা তুচ্ছ টুপি আঁকতে যখন পটের পর পট উৎসন্নে যায়, তখন একজন আশুবেদন মানুষের মানস-প্রতিক্রিয়ার বর্ণনায় নৈয়ায়িক পদপরিচয়ের অবমাননা ক্ষমণীয়ই নয়, অনিবার্য্যও। এ-কথা হেন্‌রি জেম্‌স্‌-এর অবিদিত ছিলোনা; তাই তিনিও প্রত্যাশিত পদের স্থানে অপ্রত্যাশিত গুণবাচক বাক্যাংশ ঢুকিয়ে ক্রোধান্ধ বৈয়াকরণদের অভিশাপ কুড়তেন; এবং মালার্মে-র কবিপ্রতিভা ওই রকম নিপট যাথার্থ্যের মুখপাত্র ব'লেই তিনি বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতম দ্বারপাল।

শুনেছি খৃষ্টান ধর্ম্ম প্লেটো-পরিকল্পিত তিতিক্ষার সাংসারিক প্রয়োজনা, কিন্তু খৃষ্টীয় তত্ত্ববিদ্যায় এরিষ্টটল্‌-এর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট; এবং অক্স্‌ফোর্ডে থাকতে হপ্‌কিন্স্‌ পেটর-এর প্ররোচনায় যে-সৌন্দর্য্যসংবাদ লিখেছিলেন, তার রূপ প্লেটোনিক হলেও মীমাংসা যেহেতু হেগেলী, তাই তাঁর সৃষ্টিপ্রণালীর পিছনে সমন্বয়সাধক ডায়ালেক্‌-টিকের অনুসন্ধান হয়তো আকাশকুসুমচয়নের মতো পণ্ডশ্রম নয়। অন্ততপক্ষে এটা নিশ্চয় যে হপ্‌কিন্স্‌ যদিও বস্তুস্বাতন্ত্র্য মানতেন, তবু বাস্তবিকতার পরিণামী প্রকর্ষে তাঁর অনাস্থা ছিলোনা; এবং তিনি বুঝতেন বটে যে ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ ভিন্ন মর্ত্ত্যমানুষের গতি নেই, কিন্তু তাই ব'লে ঐহিক ও পারমার্থিকের অনাদ্যন্ত অনৈক্য তাঁর চোখে ধরা দিতোনা, উল্‌টে তিনি ভাবতেন যে অসম্পূর্ণ লোকায়ত আর অনধিগম্য লোকোত্তর শিল্পের অনির্ব্বচনীয় অতিভূমিতেই অন্তঃপ্রবিষ্ট এবং সে-জগতে নিঃশ্রেয়সের সান্নিধ্য না-মিললেও রূপকার সেখানে অদ্বৈত ভূমার অনুবর্ত্তী। সুতরাং তুলনামূলক বিচারে হপ্‌কিন্স্‌ আর জোলা-র বস্তুবিলাস ঐকপদিক নয়;

বরং যে-চিত্রকরকে আবিষ্কার ক'রেও জোলা যাঁর উদ্দেশ পাননি, সেই সেজান্-এর সঙ্গে হপ্‌কিন্স্-এর সাদৃশ্য যেন বংশগত ; এবং সেজান্ যেমন শঙ্কু বা গোলক বা সমবর্তুলের দৌত্যেই বিশ্বপ্রকৃতির অভিসারে এগুতেন, হপ্‌কিন্স্ তেমনি জানতেন যে কবি অভিধানের আজ্ঞাবাহী, শব্দই তার রসপ্রতিপত্তির একমাত্র সহায়। কিন্তু রোজর ফ্রাই দেখিয়েছেন যে সেজান্-এর সংস্কারমুক্ত মন কোনো স্বতঃসিদ্ধ প্রতিসাম্যের ধার ধারতোনা ; আত্যান্তিক অভিনিবেশের ফলে তাঁর চিত্তপটে পারিপার্শ্বিকের যে-আনুপূর্ব্বিক প্রতিভাস ফুটে উঠতো, সেই নৈরাত্ম বর্ণসঙ্গতির যথাযথ অনুবাদই তাঁর অলোকসামান্য বহিরাশ্রয়িতার বীজমন্ত্র। অনেকের মতে এইখানেই বস্তুবাদের উপসংহার ; এবং ডায়ালেক্‌টিক সংঘাতে ভঙ্গুর জ্ঞেয় ও নশ্বর জ্ঞাতার পার্থক্য চুকিয়ে যেখানে সত্যসত্যই অখণ্ড জ্ঞানের উৎপত্তি ঘটে, সেখানে কেবল ন্যায়ের নির্ব্বন্ধে অমৃতের অস্বীকার নির্ব্বুদ্ধিতার চূড়ান্ত। কারণ ন্যায় নিষ্ঠারই অনুচর, এবং গতানুগতিক বৈদগ্ধ্যও যখন সেজান্-ভক্তদের চক্রবৃদ্ধি থামাতে পারেনি, তখন হপ্‌কিন্স্-এর প্রভাব যে কালে কালে বাড়তেই থাকবে, তা একরকম নিঃসন্দেহ। ইতিমধ্যে হাউস্-সংগৃহীত রচনাবলী পড়লে আমরা সকলেই একবাক্যে বলবো যে কবিযশ খেয়ালী ভাগ্যবিধাতার অধিকারবহির্ভূত।

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

আবর্ত্ত

৮

'কে? সুজন?'

রমা দেবী ডেক্-চেয়ার ছেড়ে উঠতে যান, সুজনের পিছনে খগেন বাবু·· একদৃষ্টে তিনি চেয়ে থাকেন। ধড় মড় করে উঠে পড়েন, পাশের টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়ান ···আলো ঢিমে হয়, চোখ নেমে টেবিল-কভারের নক্সায় আশ্রয় নেয়। নমস্কার করা চাই বুঝি, হাত তুলে নমস্কার করেন, পরক্ষণেই টেবিলের ধারে হাত নামে। 'বসুন' শুনে আবার বসেন বাঁহাতে কাঠ ছুঁয়ে···বড় রোগা ...সুজন বুঝি কথা কয়···

'উনি আজই এলেন···নিয়ে এলাম।' মোটরের ঘড়ির কাঁটা শূন্যে দাঁড়ায় কাঁপতে কাঁপতে···এঞ্জিন থেমে গেলে মোটর হয় বোকা···ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকায়।

'আপনি কাশী এলেন কবে?'

'তা প্রায় অনেক দিন···সুজন আনলে। বিজন ভালই আছে শুনছিলাম।'

রমা দেবী সুজনের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ তাই শুনছি।'

'আপনি?'

'অমনি। আপনি?'

'কেমন দেখছেন?'

'ভালই একটু···রোগা।'

'রমাদি, আমাকে চা দেবে না বুঝি?'

'দিই'···রমলা দেবী পাশের ঘরে যান। ষ্টোভের চাপা শব্দ, পিয়ালা পিরিচ চামচের ঠুং ঠাং কানে আসে···আবার থেমে যায়, একটু যেন দেরী হয়, থালার ওপর কেৎলী পেয়ালা সাজিয়ে আনেন, দুটি পেয়ালা, যদি কেউ খায়, আটখানা বিস্কুট, যদি না বাধা থাকে···সন্ন্যাসীদের খেতে নেই কিছু, কিন্তু গায়ে আল-খাল্লা নেই, মাথার কাপড় খুলে যায়, দেওয়া যায় না, হাত ভরা। সুজন এনেছে, না আনলেই

পারত নিজের যখন ইচ্ছে নেই। সময় এলে আপনি আসবেন লিখেছেন, কিন্তু কিসের সময়? যখন দুর্ব্বলতা ঝরেছে বসন্তের প্রারম্ভে পাকাপাতা ঝরার মতন? না বর্ষা-অন্তের? গাছপালা বড় রোগা হয় তখন।

'আপনি?'

'দিন। অনেক দিন খাই নি।'

'বিস্কুট?'

'না।'

'একখানা।'

'আচ্ছা, দিন। মাসীমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'সুজন যায়। আমার সুযোগ হয়েও হোল না।'

সুজন জিজ্ঞাসা করলে, 'অনেক দিন পরে কাশী কেমন লাগছে?'

'কোলাহল বেশী।'

'তা একটু মনে হবেই। কোলকাতা থেকে এসে আমারই মনে হয়েছিল। সেখানে শব্দ আছে, কোলাহল নেই। এখানকার মেয়ে পুরুষে বড় চেঁচিয়ে কথা কয়, সেটা ট্রাম বাসের ঘড়ঘড়ানির চেয়ে অসহ্য। যন্ত্র ব'লে খানিকটা মাপ করা যায় তবু। আপনি পাহাড়ে বেড়িয়ে এলেন, তাই প্রথমটা বেশী বাজছে।'

'নাঃ কষ্ট আর তেমন কি। বরঞ্চ প্রথম প্রথম হিমালয়ের নীরবতাই যেন বুক চেপে ধরত…'। কথার অভ্যাস গিয়েছে, সংযমের ফলে বাক্য চিন্তার নীচের স্তরে ভাসে, সুজনের অনুনিবেশের ক্ষমতায় সেটি ওপর স্তরে উঠে আস'তে চায়, সেখানে বরফ ভাসে। রূপ পায় না চিন্তা, তাই প্রেতাত্মার মতন উত্তর ঘুরে বেড়ায়… জড় নয় হিমালয়, নতুন সৃষ্টি, তাই তার বুকে এই পৃথিবীরই মাটি, ফাঁকে ফাঁকে, সেখান থেকে গাছপালা জন্মাচ্ছে, ঝরণা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, শৈবালগুল্মের অন্তরালে কীট পতঙ্গ ঝিম্ ঝিম্ করছে, নানা রঙ-বেরঙের পাখী ডাকছে, আদিম ও অফুরন্ত জীবন, এ ওকে মারছে, ও এর আশ্রয়ে বাড়ছে, প্রতিযোগ ও সহযোগের সহবাসে হিমালয়, যেমন যৌবন, একধারা নয়, বহুধারা। তার তুলনায় মহাপ্রস্থানই নীরস…। সুজনের মনে চিন্তার রেশ লাগে, দোয়াকির কণ্ঠে সুরের মতন, তাই সে বলে— অনেক স্থানে গাছপালা জন্মায় না শুনেছি।'

'আমি সেখানে যাই নি'।

'দশ বার হাজার ফুটের ওপরে শুনেছি সব পাথর ?'

'তার ওপরে বরফ।'

'তুষারাবৃত হিমালয় শুনেছি ইতর জনকে দূরে রাখে ?'

'হাঁ, সে এক প্রকার যুদ্ধ।'

'সেখানে নাকি, অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বরফের মধ্যে বস-বাস করেন ?' খগেন বাবুর মুখে অবিশ্বাসের হাসি লক্ষ্য করে সুজন আবার নিজেই বলে, 'অবশ্য যাঁরা বরফে থাকতে পারেন ও চান তাঁরা নিশ্চয় সাধু।'

'বেশী উঁচুতে মানুষের সব প্রবৃত্তিগুলো গলে খসে যায়। কোনো রকম ইচ্ছাই থাকে না, বাঁচবারও নয়।'

রমলা দেবীর হাতের কেৎলী থেকে খানিকটা গরম জল পড়ে গেল, সুজন ব্যগ্র হয়ে কোথাও পুড়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে রমলা দেবী হাসলেন। কিন্তু অসোয়াস্তির আবহাওয়া ঘুচল না। খগেন বাবু লক্ষ্য করলেন যে রমলা দেবীর ডান হাতের ওপরটা লাল হয়েছে। সেই ধারে চেয়ে রয়েছেন দেখে রমলা দেবী হাতটা আঁচলে ঢাকলেন।

'চা খাব না, আর।'

রমলা দেবী চেয়ারে বসলেন।

'আমি অত ওপরে উঠিনি। একবার মাত্র…তাও ঠিক বলা যায় না। চা জুড়িয়ে গেছে।'

রমলা দেবী পেয়ালার চা ফেলে তাতে নতুন চা ঢাললেন।

'একবার আমরা চলেছি একদল, সন্ধ্যায় এক চটিতে আশ্রয় পেলাম। আমার এক তত্ত্বজিজ্ঞাসু সঙ্গী চটিওয়ালাকে সাধুর বিষয় প্রশ্ন করছেন শুনে একজন কুলি বল্লে যে সে ঐ অঞ্চলের লোক, তার গ্রাম মাত্র মাইল খানেক দূরে, মাস কয়েক পূর্ব্বে তার গ্রামের কাছ এক গুহার মধ্যে একজন সাধু বাবা এসে বাস করছিলেন সে শুনেছে, তবে তিনি আছেন কিনা সে জানে না। একবার ছুটি পেলে খোঁজ নিতে পারে। আমার সঙ্গী তখনই যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, আমিও গেলাম। কুলিটার গ্রাম পর্য্যন্ত পথ রয়েছে। গ্রামে পৌঁছে দিয়েই সে উধাও। বোধ হয় দেখা করতে গেল। আমরা চটিতে ফিরলাম।'

সুজন প্রশ্ন করল, 'তবে দেখা হয় নি ?'

খগেন বাবু বল্লেন, 'পরের দিনও আমাদের সেখানে থাকতে হয়—আমার সঙ্গীর অসুস্থতার জন্য। কুলিটা সন্ধ্যার দিকে চটিতে ফিরল। তার বাড়ীর খবর নিলাম। তার স্ত্রী আর ছোট্ট একটি ভাই আছে। সে যাই হোক,—খবর পেলাম যে গুহার মুখে গ্রামের লোক যে সব মিঠাই রাখে সেগুলো কেবলই জমছে। আমার কিন্তু মনে কেমন কৌতূহল হোল।'

'গেলেন না কেন?'

'তখনও ঠিক ভোর হয়নি, বেরিয়ে পড়লাম হাতে টর্চ্চ ও লাঠি নিয়ে। অনেক ঘুরতে ঘুরতে আমাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে সে বাড়ীর দিকে চলে গেল। টর্চ্চ জ্বেলে দেখলাম গুহার মুখে শালপাতার ছড়াছড়ি। ভেতরে যেতে ইচ্ছেও হচ্ছিল, ভয়ও করছিল, এতদিন পরে আবার গুহায় কখনও ফেরা যায়! সাহসভরে ঢুকলাম, এক রকম জোর করেই। ভিতরে প্রবেশ করার হাত পাঁচেক পরেই ডান দিকে একটা সুড়ঙ্গ রয়েছে। হাঁটু গেড়ে যাওয়া চলে। একটা একটানা গোঁয়ানি শব্দ কানে এল। লাঠির ফলাটা সুড়ঙ্গের মুখে ধরে আলো ফেল্লাম। কি একটা রয়েছে যেন সন্দেহ হোল। শব্দটা সেখান থেকেই আসছে। আর যেতে সাহস হোল না, সেখানে থাকতেও পারলাম না। সূর্য্য তখনও ওঠে নি—চুপি চুপি তাঁবুর লোকালয়ে ফিরলাম।'

'ব্যাপারটা কি?'

'যোগীর ওঁকারও হতে পারে, আহত কোনো জানোয়ারের কাৎরানিও হতে পারে।'

রমলা দেবী হেঁসে উঠলেন, সুজন অপ্রস্তুতে পড়ে চেয়ে রইল। রমলা দেবী আস্তে আস্তে মন্তব্য করলেন, 'তাঁবুও নিরাপদ নয়।'

'নিরাপদ তোমাদের একমাত্র রান্নাঘর, নেহাৎ না হয় নিজের বাড়ী। আচ্ছা রমাদি, তোমার কি রকম বাড়ীতে থাকতে ইচ্ছে করে।'

'ইচ্ছে করে? ভাবিনি।'

'বল না।'

'তুমি তৈরী কর, অতিথি হব।'

'আমার আর বাড়ী!'

রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আবার বোরোবেন?'

'আবার ? এখনও ঠিক করিনি।'

সুজনের হঠাৎ মনে হল যে, সে রাত সাড়ে ন'টার শোতে বায়োস্কোপে যাবে। 'একটু খেয়ে নিই গে। আপনি বসুন।'

'না, চল যাই।'

'কাল কোথায় কাজ আছে ?'

'না, তেমন কই। আচ্ছা সুজন, তুমি যাও।'

সুজন চলে যাবার পর রমলা দেবী অন্য ঘরে গেলেন। যখন ফিরে এলেন তখন চুলের একটা গোছা ভিজে, আলো পড়ে চক্ চক্ করছে। খগেন বাবু চোখ নামিয়ে নিলেন। খানিকক্ষণ নীরবে বসে থাকবার পর খগেন বাবু বল্লেন, 'আমার চিঠিগুলো ?

'আছে।'

'আমাকে দিন।'

'না।'

'কেন ?'

'জানেন না ?'

'কয়েকটি দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাস—'

'অন্যের দুর্ব্বলতা দেখতে আমার ভাল লাগে।'

'নিতান্ত স্বার্থপর।'

'স্বার্থপর নই। নিজে দুর্ব্বল হয়ে প্রতিদান দিই।'

'কিন্তু লগ্ন চলে যায়।'

'একটা মাত্র লগ্ন ?'

'যেটা শুভ সেটা অদ্বিতীয়। ছোঁড়া তীর ফিরিয়ে আনা যায় না এই জানি।'

'যায়।'

'যায় না।'

'আমি বলছি, বলছি যায়, খুব যায়। লগ্ন যায় নি।'

'দেখা যাক।'

'সহজ ভাবে দেখতে পারবেন ? না, সাধু সন্ন্যাসীদের উপদেশের পরকলা পরে দেখবেন ?

'বোধ হয় পারব। কারণ নিজের ভুল বুঝেছি।'

'ভুল, আর ভুল! কিসের ভুল? এর নাম সহজ! কেউ ভুল করে না। সকলে সব সময় ঠিক কাজ করে। অত পাপের জ্ঞান কিসের?'

'ভুল করেছি চিঠি লিখে।'

'কোনো অন্যায় করেন নি। যা মনে এসেছে তাই করেছেন।'

'সেটাও সতত্তা।'

'যেটা ভাসে সেটাই কি প্রকাশ্য। না বাছাটাই বোকামি।'

'যেটা তলায় পড়ে থাকে সেটাই বুঝি মিথ্যে?'

'নির্ব্বাচন করেন নি জীবনে? যা খেয়াল হয়েছে তাই করেছেন?'

'আমি আর কি কবে করেছি? তবে···নয়ত···।'

'নয়ত কি?'

'নয়ত ঘরণী গৃহিণী হতাম।'

'সেই বা মন্দ কি হত!'

রমলা দেবীর কঠিন দৃষ্টিতে খগেন বাবুর মুখ বন্ধ হল।

তিনি উঠতে যাচ্ছেন দেখে রমাদেবী বল্লেন, 'বসুন। ভেবেছিলাম, আজ কোনো কথা কইব না, কইতে পারব না, কেবল শুনব—কিন্তু তা আপনি দেবেন না। বসুন। সিগারেট খান না? তা হোক, আনিয়ে দিই।'

সিগারেট এল। রমলা দেবী টিন নিজ হাতে খুলে সামনে রাখলেন। খগেন বাবু নিলেন না, প্রশ্ন করলেন, 'কি বলবেন?'

'কেন চলে গেলেন বলুন?'

'ও-সব কথা তুলবেন না। ভুলে যান আপনি, আমিও ভুলেছি। আমার কেমন তখন ওলট পালট হয়ে যায়।'

'অস্বাভাবিক নয় কিছু।'

'সেই সময় আপনার স্নেহ যত্ন পেলাম···মনে হোল—আর কেন সে-সব কথা?'

'চলে যেতে কষ্ট হল না?'

'কি মনে হয়? চিঠি পড়ে?'

'নিজের দুর্ব্বলতা থেকে পালানো পুরুষের লক্ষণ?'

'আমার মধ্যে হয়ত সবটা পুরুষ নয়, যেমন হয়ত, এই ধরুন, আপনার মধ্যে সবটা স্ত্রী নয়। কিন্তু আমার শিক্ষা দীক্ষা স্বভাবের দিক থেকে অন্য কি গতি ছিল? কোলকাতায় থাকলে কি করতে কি করে ফেলতাম! আপনিও ত আত্মীয়ের অসুখের ছুতো করে চলে গেলেন!'

'আচ্ছা, আর যাব না।'

'এখন আর যাবার প্রয়োজন কি রইল! আমি এইখানেই—কাশীতেই থাকব।'

'সে আপনার অভিরুচি। থুড়ি, অভিলাষ। উল্লাসিত হলাম।'

খগেন বাবুর গম্ভীর মুখ লক্ষ্য করে হাল্‌কা সুরে রমা দেবী বল্লেন,—'সময় যেদিন আসবে সেদিন নিজেই আসবেন লিখেছিলেন, কিন্তু থাকবার কথা জানান নি কেন? আমি এখন কোথায় রাখি! মাথায় রাখলে উকুনে খাবে আবার মাটিতে পিঁপড়ে।'

হাসির হিল্লোল দেহে পরিব্যাপ্ত হয়। খগেন বাবু হঠাৎ হাত যোড় করে বললেন, 'অনুরোধ করছি…'

'অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। নিজেকে অত ভয়!'

'নিজকে নয়, নিজের দুর্ব্বলতাকে।'

'সেও নিজের, অত্যন্ত নিজের, এত বেশী নিজের যে সে ছাড়া আর কিছুই নেই। নিজকে ঘৃণা করা শোভা পায় না। আপনি নিজেকে ছাড়া বোধ হয় আর কাউকে কখনও চোখ খুলে দেখেন নি, কারুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি।'

'বোধ হয় সত্যি। কিন্তু প্রথম দিনেই অপমান করতে মায়া হচ্ছে না?'

'মায়া! রসিকতা শিখেছেন আশ্রমে বুঝি?'

রমা দেবী খিল খিল করে হেসে উঠলেন, সে হাসি থামে না কিছুতে। খগেন বাবু চোখ নীচু করে বল্লেন, 'যে দুর্ব্বল তাকে আপনি অপমান করবেন না জানি।'

'আমার প্রতি অগাধ বিশ্বাস দেখছি! দুর্ব্বলতা! দুর্ব্বলতা নয় এ, নিছক ভয়।'

'তাও জানি।'

'যে ভয়কে ভয় বলে জানে সে কেবল বাঁচতে চায়, আর যে ভয় সত্ত্বেও ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেই বাঁচে। আপমান আমি করিনি আপনাকে। সকলেই বরঞ্চ আমাকে অপমান করতে উদ্‌গ্রীব। গায়ে মাখি না।' রমলা দেবী রাজহংসীর মতন গা থেকে জল যেন ঝেড়ে ফেল্লেন।

'অপমান কে করলে?'

'কে নয়! আপনিই সর্ব্বপ্রথমে।'

'আপনাকে আমি বরাবর সম্মানই দেখিয়েছি। আপনার সম্মান রক্ষার জন্যই আমি চলে যাই। না হলে, কি হোত ভাবুন দেখি!'

'ভাবতে পারি না···আপনি বসুন, উঠবেন না। আমার সম্মান? নেই সমাজে, সেজন্য তাকে দোষ দিই না; কিন্তু—আপনি বসুন একটুখানি, আমি এলাম বলে।'

রমলা দেবী এলেন, চুল ভিজে, ব্লাউজের গলা ভিজে, সাড়ির আঁচল ভিজে লট পট করছে।

'আপনার রাত হোল, বাড়ি যান। মাসীমা আপনার জন্য বসে আছেন খাবার কোলে নিয়ে। তিনি আমাকে এক রাতের জন্য, মাত্র একটি রাতের জন্যও তাঁর ঘরে আশ্রয় দেন নি। আপনার মাসীমা হবার উপযুক্ত। থাক গে—আজ আমি আর কথা কইতে পারছি না আমার মাথা ঘুরছে।'

'কাল আসতে পারি?'

'মাসীমা ছেড়ে দিলে এবং ইচ্ছে হোলে আসবেন।'

'আসব।'

'তা হলে একটু বসুন।' রমলা দেবী চারধার চেয়ে হঠাৎ খগেন বাবুর কাছে এসে বল্লেন, 'বসুন না···আপনাকে বকি···বড্ড ইচ্ছে করছে বকতে আপনাকে। এই নিন্, সিগারেট খান, কেউ টের পাবে না, কাউকে বলে দেব না। ভাল লাগছে অনেক দিন পরে? জানি ভাল লাগবে। আমার কথাও মধ্যে মধ্যে শুনতে হয়—কেবল মাসীমারই কথা শুনবেন চিরকাল? সাবিত্রী কেন মরেছে বুঝেছি। সে চেয়েছিল একজন পুরুষ, পেয়েছিল শিশু। স্বামীর বদলে ছেলে সব সময় ভাল লাগে কি! বুঝেছেন? বোঝেন নি। বলছি, বসুন। ভয় নেই, খেয়ে ফেলব না। কাশীর লোকগুলো এত দুষ্টু কেন বলুন ত?'

'চঞ্চল না হয়ে যদি কথা কইতে পারেন তবে বসি।'

'এই দেখুন নখ্যি হলাম। কাশীর লোকেরা ভাবে যে আমি পালিয়ে এসেছি। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়? যে পালাল সে হোল সাধু—ভারি মজা, নয়? আপনার মাসীমাও তাই ভাবেন।'

'আপনি তাঁকে জানেন? এই শুনলাম পরিচয় হয় নি!'

আছে। আমি এখানেই থাকব কিছু দিন। কাশী ছেড়ে যাব না। নিজেও সুখী হলাম না, অন্যকেও পারিনি। যদি যাই, আপনার অনুমতি নিয়ে যাব।'

'আর কি পরীক্ষা করবেন? পরীক্ষার্থী হোতে ভাল লাগে? অপমান বোধ হয় না?'

'হয়। কিন্তু উপায় নেই। নিজেই পরীক্ষক এই যা বাঁচোয়া। পরে বলব। আপনি, আমার অনুরোধ, একটু সহজ হোন।'

'সহজ! আমাকে সহজ হোতে দেবেনা এরা। আমি মেয়ে মানুষ—আমি বুঝতে পারি। আপনার মাসীমাই আপনাকে এখানে আসতে বাধা দেবেন, বারণ করবেন। আপনি স্নেহের খাতির রাখবেনই রাখবেন। আপনি যে নিতান্ত ভদ্র! তারপর মুকুন্দ···সুজন। সে কি করবে আমি কিছুই জানি না।'

'সুজন! কেন? সুজন ত চায় যে আমি আপনার সঙ্গে মেলামেশা করি।'

'তাই ত চাইত। এখন কি করবে সেই জানে। সেও সংস্কারমুক্ত নয়।'

'কেন? কি করে জানলেন?'

'আমি জানি···। আমাকে ক্ষমা করুন। প্রথম দিনে কত বাচালতা করলাম ···কিন্তু আমি জানতাম না কিছুই···আমাব যেন কি হয়েছিল! রোজ রোজ অমন ···একলা একলা বসে থাকা...'

'আচ্ছা আমি আসব। আজ যাই?···কেমন?'

খগেনবাবু বাড়ী ফিরলেন রাত এগারটায়। মুকুন্দ দরজা আগলে বসে আছে। কিছু খাবেন না শুনে দরজা ঝনাৎ করে ভেজিয়ে নীচে গেল।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মান ও মানান্ত

মধুর-রসের প্রগতির পর্ব্বের আলোচনায় অভিসারিণী শ্রীরাধার অনুসরণ করিয়া গতবারে পথের শত বিঘ্ন বাধা পার হইয়া আমরা সঙ্কেতিত কুঞ্জ-কুটীরে উপনীত হইয়াছিলাম—

সংকেত বেণু নাদে রাধা এল কুঞ্জদ্বারে
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে

তারপর রাধা-কৃষ্ণের সঙ্গম ও সম্ভোগ অলক্ষ্যে থাকিয়া আমরা সখী-ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। আমরা দেখিয়াছিলাম - শ্রীকৃষ্ণ

রাত্রি দিন কুঞ্জ ক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে

ঐ রভসে ঐ ecstacy-তে নিত্য জোয়ার—ভাঁটা নাই, বিরাম নাই—উহা 'নবরে নব নিতুই নব' 'নৌ বো নৌ'—উহা 'তাজা বো তাজা'—fresher and fresher —অর্থাৎ 'Nor custom stale her infinite veriety.'

দুহুঁ জন নিতি নিতি নব অনুরাগ
দুহুঁ রূপ নিতি নিতি দুহুঁ হিয়ে জাগ
দুহুঁ মুখ চুম্বই দুহুঁ করু কোর।
দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ ভেল ভোর॥
দুহুঁ দোঁহা যৈছন দারিদ হেম।
নিতি নব নৌতুন নিতি নব প্রেম॥
নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস।
নিতি নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥

এইরূপ কুঞ্জ-ক্রীড়ায় কিছুদিন বেশ গেল কিন্তু—'But the course of true love never runs smooth'—প্রেমতরঙ্গে নানা রঙ্গ—প্রেমের গতি কোন্‌দিন সরল রেখায় গিয়াছে?

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ

—শ্রীরূপ গোস্বামী

একদিন রাধিকা বাসকসজ্জা ক'রে নিশে জেগে বসিয়া আছেন—'সেজ বিছাইয়া ফুলে' এবং 'মন্দির করি আলা' অপেক্ষা করছেন—কৃষ্ণ এলেন না !

সখীরে ! শ্যাম না এল !
অবশ অঙ্গ শিথিল কবরী
বুঝি বিভাবরী অমনি গেল।

*   *   *

গগনে গরজে ঘন নিশি আঁধিয়ারী
কুঞ্জহিঁ সেজ রচয়ে বরনারী
মীলব নাগর বর অভিলাষে
অঙ্গহিঁ রচয়ে বিভূষণ বাসে
তাম্বুল কর্পূর গন্ধ অপার
মলয়জ চন্দন করু ফুলহার
মনহিঁ মনোরথ কত অনুমান
চিন্তয়ে কাহে না মিলল কাণ

রাধা ভুলিয়া গেছেন—তিনি 'বহুবল্লভ কাণ'

'তোমার চপল মতি, না হয় একত্র স্থিতি' (চরিতামৃত)

—ভুলিয়া গেছেন, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র 'পুরুষ,' আর সবাই তাঁর 'প্রকৃতি'—তাই 'মহিলা-সহস্র-ভরিত' তাঁহার হৃদয়। সেই হেতু রাধার আক্ষেপ—

কানুর লাগিয়া জাগি পোহাইলুঁ
এ ঘোর আন্ধার রাতি।
এত দিনে সই নিচয়ে জানিলুঁ
নিঠুর পুরুষ জাতি ॥
মেঘ ডুরু ডুরু দাদুরীর বোল
ঝিঝাঁ ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ার পুতলি দোলে ॥
যতনে সাজালুঁ ফুলের শেজ
গন্ধে মোহ মোহ করে।

অঙ্গ ছটফটি　　সহনে না যায়
দারুণ বিরহ জরে ॥
মনের আগুনি　　মনে নিভাইতে
যেমন করয়ে প্রাণে।
কানুর এমন　　নিঠুর চরিত
এ দাস অনন্ত ভণে ॥

এদিকে—

চন্দ্রাবলী সনে কুসুম শয়নে
সুখেতে ছিলেন শ্যাম
প্রভাতে উঠিয়া ভয়ে ভীত হৈয়া
আসিলা রাধার ঠাম।

তখন তারার আলো নিভে আসছে—পূর্ব্বাকাশে অরুণ রাগ ফোট ফোট হয়েছে—এমন সময় 'রজনী-জনিত গুরু জাগর-রাগে' কষায়িত নেত্রে শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জদ্বারে উপনীত—

গলে পীতবাস করিয়া সাহস
দাঁড়াল মানিনী আগে।

রজনী জনিত গুরু জাগর রাগ কষায়িতমলসনিমেষং
বহতি নয়নম্ অনুরাগমিব স্ফুটম্ উদিতরসাভিনিবেশম্
—জয়দেব

রাধা বলিলেন—একি ?

নীলোৎপল মুখমণ্ডল,　ঝামর কাহে ভেল।
মদন শরে তনু তাতল,　জাগিয়ে নিশি গেল ॥
নখে ক্ষত, ক্ষত ক্ষত বক্ষসি, দেওল কোন নারী।
কণ্টকে তনু ক্ষত বিক্ষত, সিন্দুর অলকা পরি ॥
নীলাম্বর পরিতোহিরিণী, পীতাম্বর ছোড়ি।
অগ্রজ সহ পরিবরতন,　নন্দালয়ে ভরি ॥
অঞ্জন কাহে গণ্ডস্থলে,　রদ-খণ্ডন অধরে।
উত্তর প্রতি-উত্তর দিতে পরাজয় শশিশেখরে।

রাধা সখীকে বলিতেছেন—

সখি ! শ্যাম নাগর দেখ
রজনী জাগরে অরুণ লোচন
হৃদয়ে নখর-রেখ
কটি আভরণ নীল বসন
আনহিঁ আনহ বেশ
বকুল মাল ভ্রমরী জাল
সৌরভে ভরল দেশ
অধর অরুণ অমিয় বরণ
রসবতী রস লেল
নয়ন কমলে মধু পিবইতে
ভ্রমর-বরণ ভেল।

ওঃ বুঝেছি—

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, সারা নিশি পোহাইলে
প্রভাতে আসিলে কালা ! দিতে প্রাণে যন্ত্রণা !

* * *

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস
বিহানে পরের বাড়ী কোন লাজে আইস
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ।
কোন কলাবতী আজি পাইয়াছিল লাগ॥
নখ-পদ বিরাজিত রুধিরে পূরিত।
আহা মরি কিবা শোভা করিলে ভূষিত॥
কপালে সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল।
সে ধনী বিরহে তোমার আঁখি ছল ছল॥

* * *

ভাল হইল আরে বন্ধু আইলা সকালে।
প্রভাতে দেখিলু মুখ দিন যাবে ভালে॥
বন্ধু ! তোমার বলিহারি যাই।
ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদমুখ চাই॥
আই আই পড়িছে রূপ কাজরের শোভা।
ভালে সে সিন্দুর তোমার মুনির মনলোভা॥

খর নখ-দশনে অঙ্গ জর জর।
ভালে সে কঙ্কণ-দাগ হিয়ার উপর॥
নীল পাটের শাড়ী কোঁচার বলনি।
রমণী-রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনি॥
সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে।
এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাজে॥

ইহাকেই বলে 'খণ্ডিতা'। শ্রীকৃষ্ণ মানিনীর মান ভাঙাইতে কত সাধিলেন, কত কাঁদিলেন, কত 'protest' করিলেন—

সুন্দরি! কাহে কহসি কটু বাণী!
তোহার চরণ ধরি　　শপথি করিয়ে করি
তুহুঁ বিনে আর নাহি জানি
তোহে বিমুখ দেখি　　ঝুরয়ে যুগল আঁখি
বিদরয়ে পরাণ হামার
তুহুঁ যদি অভিমানে　　মোহেঁ উপেখবি
হাম কাঁহা যাচব আর?
হামারি মরম তুহুঁ　　ভাল রীতে জানসি
তব্ কাহে কহ বিপরীত?
ঐছন বচনে　　দ্বিগুণ ধনী রোখয়ে
জ্ঞানদাস চিতে ভীত

শ্রীকৃষ্ণ ঐ মত কত না 'চটুল চাটু পটু' বাক্য বলিলেন—

ইতি চটুল চাটু পটু বচনং মুরবৈরিণঃ (জয়দেব)

—বলিলেন,

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভব-জলধিরত্নং
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততম্ অনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়ম্ অতিযত্নম্ (জয়দেব)

সুরসিক একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন—

সত্যমেবাসি যদি সুদতি! ময়ি কোপিনী
দেহি খর নখর শরঘাতং

ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং
তেন মে ভবতু সুখজাতং।
তোহে ছাড়ি হাম যদি পরশব কোয়
তুয়া হার-নাগিনী কাটব মোয়
হামারি বচনে যদি নহ পরতীত
বুঝিয়া করহ শাস্তি যে হয় উচিত
ভুজপাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি
পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি
উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি
বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি

—শেষে নিরুপায় হইয়া প্রথামত* রাধার চরণ ধরিলেন—

স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবম্ উদারং
জলতি ময়ি দারুণো মদন কদনানলো
হরতু তদুপাহিত বিকারং—জয়দেব

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ
করযোড়ে মাধব মাগে পরসাদ
নয়নে গলয়ে লোর গদগদ বাণী
রাইক চরণে পরাবল পাণি
চরণ যুগল ধরি করু পরিহার
রোই রোই বচন কহই নাহি পার
মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান
পদতলে লুটয়ে নাগর কাণ
চরণ ঠেলি চলি যাওত রাই
বলরামদাস কানু মুখ চাই।

---

* প্রথামত—কেন না, কবি কালিদাসের মুখে আমরা শুনিয়াছি—

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতু রাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানং তে চরণপতিতং যাবদ্ ইচ্ছামি কর্ত্তুম্
—মেঘদূত

—কিন্তু এততেও মানিনীর সেই দুর্জ্জয় মান ভাঙিল না। রাধার সেই এক কথা—

যা তুহু চন্দ্রাবলীর ধাম
তোহে পুন না হেরব হাম।
—হরি হরি যাহি মাধব যাহি
কেশব! মা বদ কৈতব বাদং
তাম্ অনুসর সরসীরুহ-লোচন!
যা তব হরতি বিষাদং (জয়দেব)
মাধব! কাহে কান্দায়সি হামে
চলি যাহ সো ধনী ঠামে
তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী
তাকর চরণ যাহ সেবি
যো যাবক তুয়া অঙ্গ
ততহিঁ করহ পুন রঙ্গ
সোই পূরব তুয়া কাম
কী ফল মুগধিনী-ঠাম
এত কহুঁ গদ-গদ ভাষ
ভণ রাধামোহনদাস

তখন—

এতহি মিনতি যব, করলহি মাধব
তবু ধনী না দেখে বয়ান
গোবিন্দদাস মিছা আশ করল
রোই রোই তব চলনু কাণ।

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা বলেন—'মান'

স্বরূপ কহে, প্রেমবতীর এইত স্বভাব
কান্তের ঔদাস্য লেশে হয় ক্রোধ ভাব
—চরিতামৃত

মান কি? মান Spiritual jealousy—ভক্তের সময় সময় মনে হয়,—'আমার এত ভক্তি, তবু আমার দুর্গতি' ভগবান্ অপরের প্রতি সদয়, তার এত

অভ্যুদয়। তিনি তার প্রতি প্রসন্ন—আমার উপর বিষণ্ণ—God favours another and neglects me! এই 'feeling of being neglected breeds temporary repulsion' কিন্তু হৃদয়ের সে প্রত্যাখ্যান অচিরস্থায়ী। যে একবার তার স্পর্শ লাভ করিয়াছে, সে কতদিন তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? আবার তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে—আবার কাতর হইয়া তাঁহাকে চায়! রাধার কাহিনীতে আমরা এই গভীর আধ্যাত্মিক সত্যেরই সাক্ষাৎ পাই; কারণ, দেখি দুই চারি দিন রাধার মানের বন্যা বেশ উজান বহিয়া ছিল—তিনি পণ করিলেন 'কাল আর দেখিব না'—এমন কি 'কাল সখী যে যে আছে, আসে না আমার কাছে'—নীল আকাশে আর দৃষ্টি দেন না—পাছে নীলমণিকে মনে পড়ে—মেঘ উঠিলে ঝরকা বন্ধ করিয়া দেন—পাছে সেই 'নূতন জলধররুচি'কে স্মরণে জাগে—কিন্তু কয়দিন?—ইহার পরই 'বিপ্রলম্ভ'।

আমরা বলিলাম—'দুই চারিদিন'। কিন্তু পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস রাধাকে ঐটুকুও credit দিতে রাজি নহেন। তিনি বলেন—

যব শুনে শ্যামরায় করল পয়ান
এমনি উঠিল ধনী বলি 'শ্যাম শ্যাম'**
সখীরে পুছয়ে তবে কাঁহা মঝু নাহ
কহইতে বাড়য়ে বিরহক দাহ।

রাধা বলিতেছেন—

যা কর চরণ— নখর রুচি হেরইতে
মুরছিত শত কোটি কাম
সো মঝুপদতলে ধরণী লোটায়ল
পালটি না হেরলুঁ হাম!
সজনি! কি পুছসি হামার অভাগি?
ব্রজকুল নন্দন চাঁদ উপেখনু
দারুণ মানের লাগি। —গোবিন্দদাস

* * *

পরিহরি সো গুণ-রতন নিধান
যতনহি যো হাম রাখলু মান
সো অব কাল অনল সম হোয়

দগধই নিরস দারু হিয়া মোয়
এ সখি ! যতহুঁ মিনতি পহুঁ কৈল
সো সব অব তহিঁ আহুতি ভেল।
জানলু দৈব বিমুখ যাহে হোয়
তাকর তাপ না মীটই কোয় !

*　　*　　*

সজনি ! কাহে মোহে দুর্ম্মতি ভেল
দগধ মান মঝু　　বিদগধ মাধব
রোখে বিমুখ ভৈ গেল।
গিরিধর-নাহ　　বাহু ধরি সাধল
হাম নাহি পালটি নেহারি
হাতক লছিমি　　চরণ পর ডারলু
অব কি করব পরকারি ?

*　　*　　*

এ সখি ! কিয়ে করব পরকার
সোঙরিতে নিকষয়ে জীবন হামার
হামার বচন দঢ় কণ্টকে জারি
বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি
মুঞি অতি পাপিনী কলহে বিরাজ
জানি মোহে তেজল নাগররাজ
দারুণ প্রাণ রহ কণ্ঠহি লাগি
বুঝলু এক মঝু করম অভাগী

রাধা আবার বলিতেছেন—

দারুণ মানের ভরে করেছি তার অপমান
বিচ্ছেদে জ্বলিছে প্রাণ সখি ! তারে ডেকে আন।

দেখ—

যো হাম মান　　বহুত করি মানলু
কানুক মিনতি উপেখি
সো অব মনসিজ　　শরে ভেল জর জর
তাকর দরশ না দেখি।

সীদতি সখি ! মম হৃদয়ম্ অধীরং
যদভজমিহ নহি গোকুল বীরং
—জয়দেব

কাজেই—

টুটল মান, ভেল বিরহ তরঙ্গ
গৃহমাঝে বৈঠল সহচরী সঙ্গ

রাধা সখীকে বলিলেন—বিরহ তরঙ্গ আর আমার সহ্য হয় না—ইচ্ছা করে নিজেই উপযাচিকা হইয়া যাই—কিন্তু ভয় হয় –

চলাইতে চাহি তাঁহা আদর ভঙ্গ
সহিতে না পারিয়ে বিরহ তরঙ্গ

সখীদের মধ্যে যে সুচতুরা সেই যাক—

সখীগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী
তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী
মধু এত আরতি সো জনি জান
ইথে লাগি তুয়াপদে সোঁপলু পরাণ
অব বিরচহ তুহুঁ সো পরবন্ধ
কাণুকো যৈছে হোয়ে নিরবন্ধ

লীলার সঙ্গিনী সহচরী বাহির হইলেন—কৃষ্ণকে আনিতে—

শুনইতে ঐছন রাইক বাণী
নাহ নিকটে সখী করল পয়ানি
কুঞ্জর বর গতি মন্থর গমন করত নারী
বংশীবট যাবটতট বনহি বন হেরি ।

* * *

দূরে হেরি নাগর চতুরিণী সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়
যেন আন কাজে চলে বর রঙ্গিণী
ডাইনে বামেতে চায়

সখীকে দূর হইতে দেখে কৃষ্ণ ভাবছেন—

কিয়ে অতি সদয় হোয়ত মঝুপর
সহচরী ভেজল কি রাই ?

কিয়ে আন কাজে চলত বর রঙ্গিণী
কারণ পুছই বোলাই

দূতী সহজে ধরা দেন না—

হেরইতে নাগর আয়লি তাঁহি
কি করহ এ সখি! আয়লি কাহি
হামারি বচন কছু কর অবধান
তুহুঁ যদি কহসি সে মানিনী ঠাম।

দূতী কৃষ্ণকে অনেক ভৎর্সনা করিলেন—করিবারই কথা!

মাধব! নিপট কঠিন মন তোর
হাত হাত হাম বাত শিখায়লু
বাত না রাখলি মোর।
সো বর নাগরী সহজেই সুন্দরী
কোমল-অন্তর বামা
বহুত যতন করি তোহে মিলায়লুঁ
কাহে উপেখলি রামা।
তুহুঁ অতি লম্পট কয়লহি বিপরীত
প্রেমকি রীত না জানি
হাতক লছিমি চরণ পরে ডারলি
কৈছে মিলায়ব আনি?

বন্ধু! ধিক্ তোমার রুচি!

শুন শুন মাধব! নিরদয়-দেহ
ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ
কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেত বাত।
যামিনি বঞ্চলি আনহি সাথ॥
কপট নেহ করি রাইক পাশ।
আন রমণি সঞে করহ বিলাস॥
কো কহে রসিক-শেখর বর-কান।
তুহুঁ সম মুরুখ জগতে নাহি আন॥
মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ।
সুধা সিন্ধু তেজি খারে পিয়াস॥

আর রাধার সহিত পুনর্মিলন ? এ সম্পর্কে সখী অনেক হেরফের ক'রে শেষে বলিলেন—

দূতী কহত পুন কৈছল পীরিতি
এ রীতি বুঝই না পারি
সো যদি মান গরবে তুঁহে ছোড়ল
তুহুঁ কাহে আয়লি ছোড়ি ?

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব হ'তেই অবস্থা হয়েছিল—একবার ডাকের অপেক্ষা—যেন 'সেধো ! খাবি—না, হাত ধোবো কোথা ?' এখন,

দূতীক বচন শুনি অবনত বদনে
আওল মানিনী পাশে
দুটি চরণ তবে ধরি পুনঃ দুই করে
মাধব আঁখিনীরে ভাসে ।*

ভগবানের ইহাই ত' স্বভাব তিনি ভক্তের সত্য সখা, নিত্য সখা—দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া—ডাকিলেই আসেন ! Lo ! I knock at the door and stand—নিজেকে force করেন না—বলাৎকারে প্রবেশ করেন না। 'মনোদ্বার ভঞ্জন' নিজেকেই করিতে হয়—অর্থাৎ open the shutters of the soul and then the Divine Presence will enter in। কি সুলভ উপায় !—কেবল ডাকের অপেক্ষা !

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি
পরশিতে চাহি তুয়া চরণের ধূলি
অভিমান দূর করি চাহ একবার
দূরে যাক সব মোর হিয়ার আঁধার
রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগলি
বিধি নিরমিল তোহে পিরীতি পুতলী
এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ
জ্ঞানদাস কহে কিবা জানিবে মরম !

---

* শুকদেব এই সব দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন—ইহাত' আর কিছু নয়—কামিনাং দৈন্যং স্ত্রীণাকৈব দুরাত্মতা। তাই নাকি ? সর্ব্বজ্ঞ হইলে কি হয়—শুকদেব যে আজন্ম ব্রহ্মচারী !

পদকর্ত্তা যদুনন্দন বলেন—

যাঁহা বসি রাধিকা সুন্দরী
সম্মুখে কহয়ে কর জোড়ি
ক্ষম ধনি ! মঝু অপরাধ
হেন প্রেমে না করহ বাদ
হাম তুয়া অনুগত কাণ
কাহে করসি মোয়ে মান
এত কহি চরণে ধরিয়া
সাধয়ে অবনী লোটাইয়া
কাতর দেখিয়া ধনী রাই
করে কর ধরে মুখ চাই
দূরে গেল মানিনী মান
এ যদুনন্দন গুণ গান।

বৈষ্ণবেরা ইহাকেই বলেন 'কলহান্তরিতা' (Reconciliation)। নরোত্তম দাস ভাবনেত্রে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া লিখিয়াছেন—

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু
উথলিল মন মাহা আনন্দ সিন্ধু
টুটল মান ভেল রোদনহি ভোর
কানু কমলকরে মুছই লোর।

তখন—

—নিকুঞ্জের মাঝে দুহু কেলি-বিলাস
দূরহি দূরে রহু নরোত্তম দাস।

কলহান্তরিতার অনেক মনোহর পদ আছে—একটি উদ্ধৃত করি।

ছি ! ছি !
কি ছার দারুণ　　মানের লাগিয়া,
বঁধুরে হারায়াছিলাম।
শ্যামল সুন্দর,　　মধুর মূরতি
নিরখি পরাণ পেলাম॥
কি জানি কি ক্ষণে　　কুমতি হওল,
গরলে ভরিয়া গেলাম।

তোমা হেন নিধি, হেলায় হারায়ে,
ঝুরিয়ে ঝুরিয়ে মলাম ॥
সখি, জুড়াল আমার হিয়া !
শ্যাম অঙ্গের, শীতল পবন,
তাহার পরশ পাইয়া ॥
নিজ সুখ রসে, পাপিনী পরশে,
না জানে পিয়কে সুখ।
কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার,
মনেতে উঠিছে দুঃখ ॥

ভক্ত উদ্ধবদাসের একটি পদ শুনুন—

দূরে গেল মানিনী মান
রাই-কোরে মগন ভেল কান
অরুণ উদয় ভেল দেখি অতিভীত
নাগর নাগরী চমকিত চিত
শ্যাম করে ধরি ধনী কহে মৃদু বোল
নিজ গৃহ চল অব নহ উতরোল
রসিকশেখর তুহ বিদগধ কান
হাম অবলা গুণহীন মতি বাম
কঠিন বচন হাম যে কহলু তোয়
ইথে কছু অপরাধ না লহবি মোয়
ঐছন রসময় দুহুঁক চরিত
উদ্ধবদাস হেরি হরষিত চিত।

খণ্ডিতার মান ও কলহান্তরিতার প্রেম-বৈচিত্র্যের কথা এখানেই সাঙ্গ করি। ইহার পর মাথুরের কথা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পার্টির শেষ

(গ্রেহ্যাম্ গ্রীন-এর ইংরাজি হইতে)

পিটার মর্টন চমকে জেগে ভোরের প্রথম আলোয় চোখ মেল্‌ল। বরফে ঢাকা জানলার ফ্রেম মনে হচ্ছিল যেন রূপোর পাত দিয়ে মোড়া। তারই ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল বাইরের পাতা-ঝরা গাছের নুয়ে-পড়া ডাল। শার্সির উপর টপটপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। সেদিনকার তারিখ ছিল ৫ই ফেব্রুয়ারি।

ঘরের মধ্যে দুটি খাট, মাঝখানে একটি টেবিল, তার উপর একটা মোমবাতি ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে নিবে গিয়েছিল। একটি খাটে পিটার নিজে শুয়ে, আর একটিতে ফ্রান্‌সিস্ মর্টন। পিটার শুয়ে শুয়ে ফ্রানসিস্-এর দিকে তাকিয়ে ভাবছিল, 'বেশ মজা, এ যেন আয়নায় নিজেরই চেহারা দেখছি, চুল, চোখ, ঠোঁট, সবই একেবারে অবিকল একরকম।'

একটু পরেই তার মনে পড়ল অন্য কথা, অর্থাৎ সেই দিনকার, ৫ই ফেব্রুয়ারি-র, যা স্মরণীয় ব্যাপার তাই। কিছুতেই তার বিশ্বাস হচ্ছিল না যে কলিন-এর মা যে ছোট ছেলেমেয়েদের পার্টি দিয়েছিলেন, সে ঠিক এক বছর আগে।

ফ্রান্‌সিস্ হঠাৎ পাশ ফিরে শুতে হাতের আড়ালে তার নাক পড়ল চাপা। পিটার এর বুকে কে যেন ধাক্কা মারল—আনন্দের নয়, অস্বস্তির। ধড়ফড় ক'রে উঠেই সে চেঁচিয়ে ফ্রান্‌সিস্‌কে ডাকল। ফ্রান্‌সিস্ ন'ড়ে চ'ড়ে একটু মোড়ামুড়ি ছেড়ে যেমন চোখ বুজেছিল তেমনি রইল। পিটার-এর মনে হোলো প্রকাণ্ড একটা পাখি যেন ডানা মেলে নেমে এল, আর ঘরটা গেল অন্ধকারে ভ'রে। 'এই ওঠোনা' ব'লে আবার সে চেঁচিয়ে উঠল। ভোরের আলোয় আবার ঘর ছেয়ে গেল, আবার সে শুনতে পেল শার্সির উপর টপ্‌টপ্ বৃষ্টির শব্দ। চোখ রগড়াতে রগড়াতে ফ্রান্‌সিস্ জিজ্ঞাসা করল, 'আমায় ডাকছিলে নাকি?'

'তুমি একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলে'—পিটার এমনভাবে এই কথা বলল যেন সে নিজেই দেখেছে। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার থেকে সে জানত ভাইয়ের মনের সব খবর

কতদূর তার মনে পৌঁছায়। এই দুটির মধ্যে পিটার ছিল দু-চার মিনিটের বড়। এই যে সামান্য ব্যবধান, এইটুকু বেশি সময় সে যে পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলতে পেরেছিল, আর তার ভাই ততক্ষণ অন্ধকারে ছট্‌ফট্‌ করছিল—তারই ফলে সে পেয়েছিল নিজের উপর বিশ্বাস, আর তার ছোট ভাইটি, যার ভয়ের অন্ত ছিলনা, তাকে আগলে রাখার সহজাত প্রবৃত্তি। যেন ভগবান তাকে এই দায়িত্ব দেবার জন্যই আগে পাঠিয়েছিলেন।

ফ্রান্‌সিস্‌ বল্‌ল, 'স্বপ্ন দেখলাম যেন মরে গিয়েছি।' 'কি রকম?'

ফ্রান্‌সিস্‌ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ঠিক মনে করতে পারছি না'। ব্যাপারটির আবছায়া স্মৃতি তার মন থেকে মিলিয়ে আসছিল। সে আর মনে করার চেষ্টা না করে দিনের আলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌ল।

'তুই একটা মস্ত পাখি দেখেছিস্‌।' 'হবে।' ফ্রান্‌সিস্‌ বিনা তর্কে তার দাদার কথা মেনে নিল। দুইজনে পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে, দুজনের অবিকল একরকম চোখ, বড়ির মতন নাক, ঈষৎ ফাঁক ঠোঁট, আর ঠিক বড়দের মতন টানা চিবুক। পিটার-এর আবার মনে পড়ল, আজ ৫ই ফেব্রুয়ারি, আর নানা রকম ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল—কতরকম খাবার, ছেলেমেয়েদের দৌড়ের প্রতিযোগিতা, আরো কত কি।

হঠাৎ ফ্রান্‌সিস্‌ বল্‌ল, 'আমি যাব না। কখ্‌খোনো না। জয়েস্‌, মেবেল এরা তো সব যাবে, বাপরে।' এই দুটির সঙ্গে এক পার্টিতে যোগ দেওয়া তার পক্ষে যেন ফাঁসির সামিল। বয়সে দুজনেই তার চাইতে বড়। জয়েস্‌-এর বয়স তেরো, আর মেবেল-এর পোনেরো। বেণী দুলিয়ে কি রকম ছেলেদের চালে তারা হাঁটে। আর সব চাইতে অসহ্য যে তারা মেয়ে হয়েও কি রকম অবজ্ঞার সঙ্গে তাকে দেখে, বিশেষত সে যখন চামচে ক'রে ডিম তুলে দৌড়ের সময় ডিম আর চামচ নিয়ে ফ'াপড়ে পড়ে। আর গত বৎসর...তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সে পিটারের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

পিটার জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে?'

'কিছু না। তেমন ভালো লাগ্‌ছে না। বোধ হয় সর্দ্দি হয়েছে। পার্টিতে বোধ হয় না যাওয়াই ভালো।'

পিটার তো অবাক! 'কিন্তু, সত্যি কি তেমন বেশি সর্দ্দি হয়েছে?'

'পার্টিতে গেলে বেশি হবে বৈকি। হয়তো মারা যাব।'

পিটার এমনি জোরের সঙ্গে বল্‌ল, 'তাহলে তোকে যেতে হবে না', যেন যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করছে তারই কথার উপর। ফ্রান্‌সিস্‌ও যেন তার দাদার ঘাড়ে সব দায়িত্ব চাপিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কিন্তু মনে মনে খুব কৃতজ্ঞ হ'লেও দাদার দিকে সে ফিরে চাইল না। তার গালের লাল রঙ আর মনের লজ্জা তখনো মিলায়নি। অন্ধকার বাড়িতে গত বৎসরের সেই লুকোচুরি খেলা, হঠাৎ মেবেল-এর হাত গায়ে পড়তে কি চীৎকারই না সে করেছিল! সে মেবেলের আসা মোটে বুঝতেই পারেনি। মেয়েরা ঐ রকমই, ওদের জুতো পর্য্যন্ত মচমচ করে না, চল্‌লে পায়ের তলায় কাঠের উপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হয় না, একেবারে বেড়ালের চলা!

ইতিমধ্যে গরম জল নিয়ে নার্স এসে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্‌সিস্‌-এর মুখে কথা নেই। পিটার-এর উপর সব ভার চাপিয়ে সে নিশ্চিন্ত শুয়েছিল।

পিটার নার্সকে ডেকে বল্‌ল, 'ফ্রান্‌সিস্‌-এর সর্দ্দি হয়েছে।'

নার্স জবাব দিল, 'কালকের আগে ধোবা বাড়ির কাপড় আস্‌ছেনা। তোমার রুমাল ফ্রান্‌সিস্‌কে দিও, নাক মোছার জন্যে।'

'কিন্তু ফ্রান্‌সিস্‌-এর পক্ষে শুয়ে থাকাই ভালো না?'

'ওকে সকালে খুব এক চোট বেড়িয়ে নিয়ে এলে বাতাসে সর্দ্দির বীজ সব উড়ে যাবে। এখন দুজনেই উঠে পড়ো তো'—এই ব'লে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে নার্স গেল বেরিয়ে।

ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে পিটার-এর ভারি মায়া হোলো। বেচারি ফ্রান্‌সিস্‌! মুখ দিয়ে তার যেন আতঙ্ক ফুটে বেরোচ্ছে। পিটার তাকে অভয় দিয়ে বল্‌ল, 'তুই শুয়ে থাক্‌, আমি মাকে বুঝিয়ে বল্‌ব যে তোর অসুখ করেছে, উঠতে পারছিস্‌না।'

কিন্তু নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এমন শক্তি ফ্রান্‌সিস্‌-এর ছিল না। তা ছাড়া শুয়ে থেকে লাভ কি? জিভ্‌ দেখে, মুখে থার্ম্মোমিটার গুঁজে, বুকে টোকা মেরে, ওরা ধ'রে ফেলবেই যে ওর অসুখ-টসুখ সব বাজে। অবিশ্যি ওর অবস্থা হয়েছিলো খুবই সঙ্গিন—বুক ধড়ফড় আর পেট যেন কি রকম খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু এর কারণ যে শুধু ভয় তা ও ভালো ক'রেই জানত—পার্টিতে

যাওয়ার ভয়, আর সব চাইতে ভয় অন্ধকারে একলা লুকিয়ে থাকতে হবে, সঙ্গে পিটার থাকবেনা, একটি মোমবাতি পর্য্যন্ত জ্বল্‌বে না।

হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে সে বল্‌ল, 'আচ্ছা, আমি উঠ্‌ছি। কিন্তু পার্টিতে আমি যাচ্ছিনা, কিছুতেই না।' ব'লে মনে সে বেশ বল পেলো। মুখের কথা যখন সে ব'লে ফেলেছে, তখন কি ক'রে তা ভাঙে? অত বড় পাপ ভগবান কিছুতেই তাকে করতে দেবেন না। একটা না একটা পথ তিনি বাৎলে দেবেনই। সমস্ত সকাল আর দুপুর রয়েছে—তার মধ্যে একটা কিছু হবেই। এই তো সবে ভোর, রাতের শিশিরে মাঠের ঘাস এখনো ভিজে রয়েছে, এরই মধ্যে এত ভাবনার কি হয়েছে? কত কি ঘটতে পারে, পড়ে গিয়ে খুব কেটে যেতে বা পা ভাঙতে পারে, কিম্বা সত্যি খুব সর্দ্দি লাগতে পারে। ভগবান তো আছেন, ভয় কি?

ভগবানে তার এমনই অগাধ বিশ্বাস ছিল যে খাবার সময় মা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি, ফ্রান্‌সিস্‌, তোর নাকি সর্দ্দি হয়েছে?' সে হেসেই তা উড়িয়ে দিল।

মা বল্‌লেন, 'তা তো বটেই। কিন্তু পার্টি না থাকলে বাছার সর্দ্দিটা বুঝি সত্যি লাগত।' ফ্রানসিস্‌ বোকার মতন হাসতে লাগল, আর মার তার সম্বন্ধে কি রকম ভুল ধারণা এই কথা ভেবে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেল।

যাহোক, তবু সে খানিকটা বেশ নিশ্চিন্ত মনে কাটালো এবং আরও বেশ খানিকক্ষণ কাটাত, কিন্তু বেড়াতে গিয়ে হবি তো হ একবারে শ্রীমতী জয়েস্‌ বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নার্স-এর সঙ্গে সে তখন একলা ছিল, কেননা পিটার গিয়েছিল খরগোসের ফাঁদ পাততে। পিটার সঙ্গে থাকলে বিশেষ ভাবনার কারণ ছিল না। নার্স তো শুধু তার নয়, পিটার-এরও। কিন্তু এখন পিটার নেই, সুতরাং নার্স-এর কাজ শুধু ওকেই আগ্‌লানো, কারণ একলা ওকে সাহস ক'রে ছেড়ে দেওয়া যায় না। জয়েস্‌ মাত্র দুবছরের বড়, কিন্তু সে দিব্যি একলা বেড়ায়।

বেণী দুলিয়ে আর লম্বা লম্বা পা ফেলে জয়েস্‌ ওদের কাছে এসে ফ্রান্‌সিস্‌-এর দিকে এমন ভাবে তাকালো যেন সে কুকুর বেড়াল গোছের একটা কিছু, তারপর খুব আড়ম্বর ক'রে নার্সকে জিজ্ঞাসা কর্‌ল, 'ওকে আজ পার্টিতে নিয়ে আসছ তো? আমি আর মেবেলও আসছি।' ব'লেই সে অত্যন্ত গম্ভীর চালে মেবেল-এর বাড়ির দিকে প্রস্থান করল। নার্স একেবারে মুগ্ধ! 'খাসা মেয়ে।' কিন্তু বেচারি

ফ্রান্‌সিস্‌-এর মুখে কথাটি নাই, তার বুকে কে যেন হাতুড়ি পিটোচ্ছে। হায়রে! পার্টির সময় যে দ্রুত এগিয়ে আসছে, ভগবান যে একটা ব্যবস্থা করবেন তার তো এখন পর্য্যন্ত কোনোই লক্ষণ নেই।

সত্যি, পার্টির সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিল, এত দ্রুত যে বেচারির মাথা গেল গুলিয়ে, কি ক'রে পালানো যায় তার একটা ফিকিরও মনে পড়ছিল না, এমন কি মনকে এই সঙ্কটের জন্যে যে প্রস্তুত করবে তারও সময় ছিল না।

শীতের দিন। দেখতে দেখতে অন্ধকার হ'য়ে গেল। বাড়ির মধ্যে চাকরেরা খাবার জায়গা করছে। খাবার লোক আজ শুধু দুটি—মা আর বাবা। কনকনে হাওয়া বইছে। একেবারে গলা পর্য্যন্ত বোতাম এঁটে ফ্রান্‌সিস্‌ বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে। নার্স-এর হাতের টর্চ্চ-এর আলো অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্‌সিস্‌ ভয়ে প্রায় আত্মহারা। এক একবার তার ইচ্ছে হচ্ছিল দৌড়ে গিয়ে মাকে চেঁচিয়ে বলে, 'আমি যাব না, কিছুতেই না, তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।' অন্ধকারে তার যে কি রকম ভয় করে মা বাবা জানেন না, তাই তার এই দুর্গতি। মা বাবার এই অজ্ঞতা সে ঘুচিয়ে দেবে, পরিষ্কার করে জানিয়ে দেবে কেন সে যেতে চাচ্ছে না। 'আমার ভয় করে, অন্ধকারে লুকোনোর ভয়, আমি খালি চীৎকার করব,' এই কটি কথা মা-বাবাকে বলবে ব'লে সে বারবার মনে মনে আওড়াতে লাগল। কল্পনায় সে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেল এই কথা শুনে তার মার মুখে কি রকম বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠ্‌বে আর তারপর তাকে ধমক দিয়ে তিনি যখন বলবেন, 'ছিঃ, যেতেই হবে, একবার যাব ব'লে না গেলে ওঁরা কি বলবেন?' —এই কথাগুলিও সে পরিষ্কার শুনতে পেল। কিন্তু তবু ওকে জোর করে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। ও বলবে, 'তোমরা না হয় বোলো আমার অসুখ করেছে। আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। অন্ধকারে আমি ভীষণ ভয় পাই।' মা আবার বলবেন, 'কি বোকামি করছিস্‌। অন্ধকারে ভয় পাবার কি আছে?' বোকামি তো বটেই! মরতে ভয় পাওয়াও নাকি বোকামি, কিন্তু সবাই তো এই বোকামি করে। যাই হোক, পার্টিতে সে যাচ্ছে না। 'চেঁচিয়ে ফাটিয়ে দেব না।'

'ফ্রান্‌সিস্‌, চলে এস।' বাগানের ওপার থেকে নার্স তাকে ডাকছিল। চারদিকে অন্ধকার, শুধু নার্স-এর হাতের টর্চ্চের আলো গাছে আর ঝোপে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। ফ্রান্‌সিস্‌ হতাশ ভাবে জবাব দিল, 'আসছি।' তারপর দরজার

আলো ছেড়ে সে এগিয়ে চল্‌ল। শেষ পর্য্যন্ত মাকে ওর মনের গোপন কথা, অন্ধকারকে যে কি রকম ভয় পায় তা, কিছুতেই বলবার সাহস ওর কুলোলো না।

যাহোক, কলিন-এর মার কাছে সব ব'লে একবার শেষ চেষ্টা করা যাবে।—ওদের অভ্যর্থনার জন্য তিনি যখন তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন তখন এই কথা ভেবে ফ্রান্‌সিস্‌-এর মনে একটু আশার সঞ্চার হোলো। বুক এদিকে দপ্‌ দপ্‌ করছে, কিন্তু কষ্টে গলার স্বর স্বাভাবিক করে সে বল্‌ল, 'আপনি যে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন সে জন্যে অনেক ধন্যবাদ।' মুখে বাঁধা-ভদ্রতার বুলি, কোনো রকমে মাথা তুলে সে চাইছে—একেবারে থুড়থুড়ে বুড়ো। সত্যিই সে প্রায় বুড়োর সামিল ছিল। কেননা, অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে বিশেষ মিশত না। যমজ কিনা, তাই সে ছিল অনেকটা মা-বাবার এক ছেলেরই মতন। পিটার-এর সঙ্গে কথা বলা যেন প্রায় আয়নাতে নিজের ছায়ার সঙ্গে কথা বলা—যা একটু তফাৎ তা ঐ আয়নার দোষে বা গুণে। অর্থাৎ সে ঠিক যেমনটি তা না হ'য়ে যেমন হ'তে চায়, পিটার যেন অবিকল তাই ঃ অন্ধকারকে সে অযথা ভয় পায় না, কিম্বা অচেনা লোকের পায়ের শব্দ বা সন্ধ্যার পর বাগানে বাতুড়ের পাখার ঝট্‌পট্‌ শুনে সে চমকে ওঠে না।

পার্টি ততক্ষণে পুরো দমে সুরু হয়ে গেছে। মহা হৈ চৈ, চামচে ক'রে ডিম তুলে দৌড়, পায়ে পায়ে বেঁধে দৌড়, আরো নানা মজার ব্যাপার, অর্থাৎ অন্য সকলের পক্ষে—ফ্রান্‌সিস্‌-এর পক্ষে শুধুই লাঞ্ছনা। মাঝে মাঝে একটু ফুরসৎ পেলেই ও যতদূর পারে মেবেলের কাছ থেকে স'রে নিরিবিলি একটা কোণ বেছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিল কি করে নিস্তার পাওয়া যায়। যাহোক, খাবার সময় যতক্ষণ না আসছে ততক্ষণের মতন নিরাপদ। কিন্তু খাবার সময় যেই এগিয়ে এল আর তাদের বন্ধু কলিন-এর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে বিপুল কেক তৈরি হয়েছিল তারই গায়ে বসানো দশটা মোমবাতির উজ্জ্বল আলোয় গিয়ে ও যখন বসল, তখন ওর টনক নড়ল। আর রক্ষে নাই, এইবার! হুড়মুড় ক'রে একসঙ্গে নানা ফিকির মাথার মধ্যে এসে যেন ওকে আরো ঘাবড়ে দিল। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ভাবছে কি করে, এমন সময় তার কানে এল জয়েস্‌-এর গলা, 'খেয়ে উঠেই লুকোচুরি খেলা, একেবারে অন্ধকারে।'

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে পিটার খানিকটা বুঝতে পারল ওর অবস্থা,

ভারি তার দুঃখ হোলো, সে বলল, 'কি হবে লুকোচুরি খেলে—বছর বছরই তো খেলি।'

মেবেল ছাড়বার পাত্রী নয়। 'বাঃ, তাই তো ঠিক আছে, আমি নিজে দেখেছি, একেবারে কাগজে কলমে লেখা, আগে খাওয়া, তারপরেই অন্ধকারে লুকোচুরি খেলা, কলিন-এর মার পিছন থেকে উঁকি মেরে দেখেছি।'

প্রোগ্রামে যদি থাকে তবে তা হবেই, সুতরাং পিটার আর তর্ক করল না। আরও খানিকটা খাবার চেয়ে নিয়ে সে খুব ধীরে ধীরে খেতে সুরু করল, যত ধীরে ধীরে পারে, মৎলব অন্তত খানিকটা, এই মিনিট পোনেরো, দেরি করিয়ে দিতে যদি পারে, হয়তো ফ্রান্‌সিস্ সেই অবসরে পালাবার একটা উপায় খুঁজে বের করবে। বৃথা চেষ্টা! ছেলেমেয়ের দল ইতিপূর্ব্বেই খাওয়া শেষ ক'রে খেলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এই তৃতীয়বার ওর ভাইকে বাঁচাবার চেষ্টা নিষ্ফল হোলো। ওর চোখের সামনে যেন আর একটি মনের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল, সে আবার দেখল মস্ত একটা পাখি ডানা মেলে নামছে, আর তারই কালো ছায়া পড়েছে ওর ভাইয়ের মুখের উপর।

আপন মূঢ়তার জন্যে সে নীরবে নিজেকে ধিক্কার দিল। তারপর খাওয়া শেষ ক'রে উঠবার সময়ে 'অন্ধকারে আবার ভয়ের কি আছে?' গুরুজনদের এই আশ্বাসবাণী মনে প'ড়ে তার মনে তবু একটু উৎসাহের সঞ্চার হোলো। কলিন-এর মা ততক্ষণে হল-ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যগ্র দৃষ্টিতে সবাইকে খুঁজছিলেন। সকলের শেষে সেখানে গিয়ে হাজির হোলো দুটি ভাই।

'তাহলে এবার', তাঁর কথা পরিষ্কার তাদের কানে এল, 'সবাই মিলে অন্ধকারে লুকোচুরি খেলা, কেমন?'

পিটার দেখল—ঠিক্ যা ভেবেছিল—ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ওর ভাই দাঁড়িয়ে। ও জানত যে ফ্রান্‌সিস্ একেবারে প্রথম থেকে এই মুহূর্ত্তটিকে ভয় ক'রে এসেছে, আর তার সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছে যাতে ভয় না পায়। কিন্তু না পেরে অবশেষে দিয়েছিল হাল ছেড়ে। ছেলের দল ততক্ষণ চেঁচামেচি সুরু করেছে। 'বেশ বেশ'! 'কিন্তু, দল করতে হবে।' 'আচ্ছা বাড়ির যে-কোনো জায়গায় লুকোতে পারি তো?' পিটার কিন্তু বেশ বুঝতে পারল যে আর সকলে যে-খেলার আমোদে

একেবারে মেতে উঠেছিল কি ক'রে তা এড়ানো যায় তার উপায় বাৎলে দেবার জন্যে ফ্রান্‌সিস্ অধীরভাবে ভগবানকে ডেকেছিল।

ফ্রান্‌সিস্ ভাবল, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। কলিন-এর মাকে গিয়ে বল্‌ল, 'দেখুন, আমার বোধ হয় না খেললেই ভালো। নার্স আমাকে একটু পরেই নিতে আসবে।'

ইতিমধ্যেই জন কয়েক উৎসাহী ছেলেমেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে আরম্ভ করেছিল। হাত তালি দিয়ে তাদের কাছে ডাকতে ডাকতে কলিন-এর মা জবাব দিলেন, 'তাতে কি হয়েছে ফ্রান্‌সিস্? নার্স না হয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবে। মা তাতে কিছু বলবেন না।'

ব্যস্, ফ্রান্‌সিস্-এর বুদ্ধির দৌড় ঐ পর্য্যন্ত। এমন একটা ছুতো, অত কষ্টে যা ওর মাথার থেকে বেরিয়েছে, তা যে একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে, ও তা ভাবতেই পারে নি। 'আমার বোধ হয় না খেলাই ভালো'—শুধু এই কটি কথা সে একবার বল্‌ল, তাও এমন বুড়োমানুষি সুরে যে অন্য সব ছেলেমেয়েরা তাতে হাড়ে চ'টে গিয়ে ভাবল, 'কি দেমাক্! আমাদের সঙ্গে উনি খেলতেই চান্ না।'

আতঙ্কে ফ্রান্‌সিস্ একেবারে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যদিও মুখে তার ভয়ের কোনো চিহ্নই ছিল না। কিন্তু ভাইয়ের আতঙ্কের কথা ভেবে, শুধু ভেবে নয়, যেন তারই ছায়াতে, পিটার-এরও মন উঠেছিল অস্থির হ'য়ে। সব আলো যাবে নিবে, তারপর অন্ধকারের মাঝখানে একলা দাড়িয়ে সে শুনবে অদৃশ্য পদসঞ্চার, নানা অপরিচিত মূর্ত্তির আনাগোনা—এই কথা মনে ক'রে ভয়ে সে প্রায় ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিল। পরক্ষণেই মনে পড়ল, এ ভয় তো তার নিজের নয়, ভাইয়ের।

হঠাৎ সে কলিন-এর মাকে ব'লে ফেল্‌ল, 'দেখুন, ফ্রান্‌সিস্-এর না খেলাই ভালো। অন্ধকারে ও ভীষণ ভয় পায়।' ব্যস্, অম্‌নি একপাল ছেলেমেয়ে 'আরে ভীতু, ভীতুরাম' বলে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। কি যন্ত্রণা! অসহ্য! ফ্রান্‌সিস্ ভাইয়ের দিকে না ফিরেই সটান বল্‌ল, 'কে বল্‌ল আমি ভয় পাই? কখ্‌খনো না। নিশ্চয় আমি খেলব।' কে কার কথা শোনে? তার যন্ত্রণার কারণেরা ওখান থেকে ততক্ষণে সরে প'ড়েছিলেন। সুতরাং একেবারে একলাটি দাঁড়িয়ে যে ঘোরতর মানসিক যন্ত্রণা তার কপালে ঘনিয়ে আসছে ফ্রান্‌সিস্ তারই

কথা ভাববার অবসর পেল। ছেলেমেয়েরা কলিন-এর মাকে নানা প্রশ্নে অস্থির করে তুলেছিল। তিনি সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন, 'যেখানে ইচ্ছা লুকোবে, আর যতক্ষণ পারো লুকিয়ে থাকবে। সব আলো নিবিয়ে দেব। বুড়িটুড়ি কিছু নেই।'

পিটারও একলা দাঁড়িয়ে। ভাইকে কি রকম বোকার মতন সে সাহায্য করতে চেষ্টা করেছিল এই কথা ভেবে সে খুব লজ্জা পাচ্ছিল। মাথার শিরায় শিরায় সে অনুভব করল, এরকমভাবে অপদস্থ করার জন্য ফ্রান্‌সিস্ তার উপর কি চটাই না চটেছে।

ধুপধাপ করে কয়েকটি ছেলেমেয়ে সোজা উপরে গিয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে উপর তলার আলো গেল নিবে, আর বাদুড়ের পাখার মতন অন্ধকার সিঁড়ির মাঝ পথে এসে থমকে রইল। অন্য আলো গুলোও টপ্‌টপ করে নিবতে সুরু করল, শেষে বাকি রইল শুধু হলঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড ঝাড়ের আলো। ছেলেমেয়েরা সব সেখানে জড় হয়েছিল, আর তাদের চারদিকে একদল কালো কালো বাদুড় যেন উবু হয়ে বসে অপেক্ষা করছিল কখন ঐ ঝাড়ের আলো নিববে।

লম্বা একটি মেয়ে বল্‌ল, 'তুমি আর ফ্রান্‌সিস্ লুকোবার দলে।' বলতে না না বলতে ঝাড়টাও গেল নিবে। পিটারের পায়ের তলার কার্পেটটা অসংখ্য পায়ের আনাগোনায় কেঁপে কেঁপে মুখর হয়ে উঠল, যেন সব ক্ষুদে ক্ষুদে হিম হাওয়ার তাল ঘরের আনাচে কানাচে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

সে ভাবছিল, 'ফ্রান্‌সিস্ কোথায়? আমি তার কাছে যেতে পারলে এই সব শব্দে ওর অত ভয় করবে না।' শব্দগুলি সত্যি যেন নীরবতারই ঢাকনার মতন —কোথাও বা একটা ঢিলে কাঠের কঁ্যাচ কঁ্যাচ, কোথাও সন্তর্পণে গা আলমারির দরজা বন্ধ করার শব্দ, কোথাও বা দেওয়ালের গায়ে সামান্য একটু খস্‌খস্ মাত্র।

ঘরের মেজের ঠিক মাঝখানে একেবারে একলা দাঁড়িয়ে পিটার অপেক্ষা করছিল—তার ভাইটি কোথায় লুকিয়েছে চট্ ক'রে তার মাথায় কখন তা এসে যাবে। ফ্রান্‌সিস্ ছিল গুড়ি মেরে ব'সে, দুই হাতে কান ঢেকে, জোরে চোখ বন্ধ ক'রে। অন্ধকার তাকে একেবারে গ্রাস করেছে, এর বাইরে যে কিছু আছে তার ধারণা করা নিতান্তই কষ্ট-কল্পনার ব্যাপার। হঠাৎ কে বল্‌ল, 'আসছি।' পিটার চমকে লাফিয়ে উঠল, ভয়ে সে হয়েছিল এমনই অপ্রকৃতিস্থ।

কিন্তু এ ভয় তার নিজের নয়। যে ত্রাসের জ্বালা তার ভাইয়ের মন একেবারে পুড়িয়ে দিচ্ছিল, আর এই হুতাশনে যা ইন্ধন যোগাতে পারে তা ছাড়া আর কোনো চিন্তা মনে ঢোকবার পথ করেছিল বন্ধ—সেই একই ত্রাসে সেও হয়েছিল অধীর, কিন্তু একেবারে তা পরকীয়, তাতে তার বিচারশক্তি এতটুকু খর্ব্ব হয়নি।

'আচ্ছা, আমি যদি ফ্রান্‌সিস্ হতাম, তাহলে কোথায় লুকোতাম' পিটার-এর এই প্রশ্ন মনে হোলো। আর যেহেতু ঠিক ফ্রান্‌সিস্ না হ'য়েও সে ছিল প্রায় তারই প্রতিচ্ছবি, সুতরাং চট্ ক'রে এই প্রশ্নের জবাবও তার মাথায় এল,'ঐ বইয়ের সেল্‌ফ আর ঐ সোফা—ঠিক ঐ দুটির মাঝখানে।' কিন্তু পিটার নিজের প্রশ্নের এই দ্রুত জবাবে মোটেই বিস্মিত হোলো না। এমনি সহজেই তাদের দুজনের মনের কথার বিনিময় হোতো, তার জন্য কোনো অলৌকিক উপায়ের প্রয়োজন ছিল না। মায়ের জঠরে তারা দুটি ভাই ছিল পাশাপাশি, এখন কি ক'রে তারা পৃথক হবে?

পিটার মর্টন পা টিপে টিপে ফ্রান্‌সিস্ যেখানে লুকিয়েছিল সেই দিকে এগিয়ে চল্‌ল। জুতো জোড়ার একটু মস্‌মস্ শব্দ হচ্ছিল। তার ভয় হোলো পাছে অন্ধকারে নিঃশব্দে যারা তাদের খোঁজ করছে তাদের কারও কাছে ধরা পড়ে। তাই জুতো জোড়া সে খুলে ফেল্‌ল। একটা ফিতের মাথার পেতল মেজেতে ঠুন্ ক'রে লাগতেই তার শব্দ পেয়ে অনেকগুলি পা তার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু ততক্ষণে সে সেখান থেকে সড়ে প'ড়ে মনে মনে 'কেমন জব্দ' ব'লে প্রায় হাসতে সুরু করেছে, এমন সময়ে তার ছাড়া জুতো জোড়ায় পা ঠেকে একজন হোঁচট খেতে তার মন উঠল ছ্যাঁক ক'রে আর একজনের মনের সাড়ায়।

অতঃপর বিনা বিপত্তিতে সে নিঃশব্দে তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেল। তার মনের ভিতর থেকে কে যেন ব'লে উঠল, 'দেওয়ালের কাছে এসে পড়েছ'। অমনি হাত বাড়িয়ে দিতেই ভাইয়ের মুখে গিয়ে আঙ্গুল ঠেকল।

ফ্রান্‌সিস্ একেবারে তেমনি চুপ। কিন্তু পিটার-এর বুক যে ভাবে আচমকা দপ্ দপ্ ক'রে উঠল, তাতে ভাইয়ের অবস্থা সে ভালোই বুঝতে পারল। 'ভয় নাই —আমি।' পিটার ফ্রান্‌সিস্-এর গায়ে হাৎড়ে হাৎড়ে তার হাত ধরার চেষ্টা করছিল। অবশেষে ফ্রান্‌সিস্-এর মুষ্টিবদ্ধ হাতে তার হাত ঠেকতে সে জোরে

তা চেপে ধ'রে শুনল তার ঐ একটি কথায় চারদিকে যেন ঝরনার স্রোতের মতন অসংখ্য ফিস্‌ফাস্ শব্দ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে। পিটার-এর মাথার কাছে বই-এর তাকের উপর একটা হাত এসে ঠেকল। সে বেশ বুঝতে পারল তার সান্নিধ্য-সত্ত্বেও ফ্রান্‌সিস্-এর ভয় দূর হয়নি, হয়তো অনেকটা কমেছে, হয়তো কোনো রকমে ফ্রানসিস্ তা সহ্য করছে, কিন্তু তবু তা একেবারে যায়নি। এ ভয় যে সম্পূর্ণ তার ভাইয়ের, একেবারে তার নিজের নয়, তা সে খুব পরিষ্কার বুঝতে পারল। তার কাছে অন্ধকার মানে শুধু আলোর অভাব, তার চেয়ে ভয়ানক কিছু না। আর তাকের উপর ঐ হাতের ছোঁওয়া, খুব চেনা কোনো ছেলে বা মেয়ের—তাতে ভয় পাবার কিছু নাই। ধৈর্য্য ধ'রে সে প্রতীক্ষা করছিল কখন ধরা পড়ে।

আর একটি কথা সে বলেনি। ভাইকে সে ছুঁয়ে রয়েছে—তার বেশি কি দরকার? এই দুটি প্রাণীর মধ্যে মনের কথার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ বাহন ছিল স্পর্শ। তাদের হাতের ছোঁওয়ায় ভাবের আদান প্রদান হোতো এত দ্রুত যে মুখের কথা তার নাগাল পেত না। পিটার ভাইয়ের মনের ভাব একেবারে প্রথম থেকে উপলব্ধি করতে পারল—সেই আকস্মিক স্পর্শের আচমকা ত্রাস, তারপর একটানা একঘেয়ে ভয়ের স্পন্দন, একেবারে রক্তচলাচলের মতন, তার আর বিরাম নাই।

সমস্ত শক্তি দিয়ে পিটার ভাবছিল, 'এই যে আমি এখানেই আছি। মিছে ভয় পেয়োনা। এক্ষনি আবার সব আলো জ্বলবে। ঐ খস্‌খস্ শব্দ, ও কিছু নয়, শুধু জয়েস্, শুধু মেবেল।' সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল 'ভয় নাই, ভয় নাই' এই চিন্তা দিয়ে ঐ নুয়ে-পড়া দেহটাকে আচ্ছন্ন করে। কিন্তু কই, তবু ভয় দূর হচ্ছিল না। 'ঐ যে ওরা সব ফিস্‌ফাস্ ক'রে জটলা করছে, আমাদের খুঁজে খুঁজে একেবারে হয়রান হ'য়ে গেছে। এক্ষণি আলো জ্বলবে। আমাদেরই হবে জিৎ। ভয় নাই। ও কিছু নয়, সিঁড়ি দিয়ে কে নামছে, বোধ হয় কলিন-এর মা। ঐ শোনো, ওরা আলোর সুইচ খুঁজছে।' আবার কার্পেটের উপর খস্‌খস শব্দ—কে যেন দেওয়াল ঘেঁষে চলেছে, কোথায় যেন একটা খিল খোলা হচ্ছে, একটা গা-আলমারির দরজা ধ'রে কে টানছে। কার হাতের ছোঁয়ায় মাথার উপর তাকে একটা বই একটু স'রে গেল। 'ভয় নাই, ভয় নাই'—পিটারের মনের এই আশ্বাস একেবারে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে, এমন সময় হঠাৎ ফলভরা গাছের মতন ঝাড়ের সবগুলি আলো একসঙ্গে উঠল জ্বলে।

সেই উজ্জ্বল আলো বিদীর্ণ ক'রে বহু শিশুকণ্ঠের তীব্র চীৎকার শোনা গেল, 'পিটার কোথায়?' 'উপরতলায় খোঁজ করা হয়েছে?' 'ফ্রান্‌সিস্ কই?'

কলিন-এর মা সবাইকে চুপ করতে বল্‌লেন।

ভাইয়ের হাতের ছোঁওয়া লাগা মাত্র ফ্রান্‌সিস্ যেখানে দেওয়ালের গায়ে এলিয়ে পড়েছিল, সে যে সেখানে তেমনি অসাড় হ'য়ে আছে, এই ব্যাপার সব প্রথম তিনি যে লক্ষ্য করেছিলেন তা নয়। উদ্‌ভ্রান্ত দুঃখে পিটার তার ভাইয়ের হাত চেপে ধ'রে ছিল, আর কিছুতে সে ভেবে পাচ্ছিল না, কেন এমন হোলো! শুধু যে তার ভাই আর বেঁচে নাই তা নয়। এই হেঁয়ালির অর্থ ভেবে তার কচি মন অধীর হ'য়ে উঠেছিল, যে-রাজ্যে ভয় নাই, অন্ধকার নাই, বরাবর এই কথা সে শুনে এসেছে, তার ভাই তো সেই রাজ্যে চ'লে গিয়েছে, কিন্তু তবু তার ভয়ের স্পন্দন কেন থামেনি।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

ইংলণ্ডে স্বাধীনতা

(প্যারিস, জুন ১৯৩৫-এর আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলনে ই, এম, ফর্স্‌টর-প্রদত্ত অভিভাষণের অনুবাদ)

এই পরিষৎ যখন বক্তৃতা দেবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে আমাকে গৌরবান্বিত করলেন এবং তার একটি বিষয় নির্ব্বাচন করতে বললেন, তখন উত্তরে আমি জানিয়েছিলাম যে আমার বিষয় হবে "মতপ্রকাশের স্বাধীনতা" অথবা "সংস্কৃতির ঐতিহ্য"—পরিষদের যেটা মনঃপূত, তবে উভয় প্রসঙ্গে আমি একই বক্তৃতা করব ব'লে স্থির করেছি। ইংরেজ ছাড়া আর কারও মুখে এই কথাটি ব্যঙ্গোক্তির মতো শোনাত। কিন্তু আমাদের দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বাধীনতা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে দু'টোর একত্র আলোচনা সেখানে কষ্টকল্পনা নয়। স্বাধীনতার স্তোত্রপাঠে ইংলণ্ড বহু শতাব্দী ধ'রে অভ্যস্ত। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কিম্বা আত্মত্যাগের স্তুতিও কম হয় নি, কিন্তু স্বাধীনতার মহিমা-কীর্ত্তনেই সব চেয়ে বেশি লোকের কণ্ঠ সর্ব্বদা মেতেছে। আজ যদি আমাদের সাহিত্যিকবৃন্দ সেই চিরাগত ঐতিহ্যের ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, যদি আজকের সমাজ এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা সেই সব কথা বলতে ভরসা পাই, মিল্‌টন শেলী ও ডিকেন্‌স্‌ তাঁদের যুগে যা বলতে পেরেছিলেন, তা হলে ভাবব যে অন্তত এদিক থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন নয়।

আমি জানি আমাদের এই স্বাধীনতা কত সংকীর্ণ, কত ত্রুটিতে কত কলঙ্কে পরিপূর্ণ। এর পরিব্যাপ্তি একটি জাতির মধ্যে এবং সে-জাতির একটি শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ। এ-স্বাধীনতা ইংরেজের জন্য, তার সাম্রাজ্যভুক্ত অশ্বেতাঙ্গদের জন্য নয়। কোনো সাধারণ ইংরেজকে যদি বলা হয় তার স্বাধীনতার উত্তরাধিকারে ভারতবর্ষ ও কেনিয়া-বাসীদেরও শরীক করতে, তাহলে টরি হলে সে উত্তর দেবে "কস্মিন কালেও না", এবং লিবরেল হলে বলবে "তারা আগে যোগ্য হোক, তখন ভেবে দেখব"। গত বৎসর জেনেরল স্মাট্‌স্‌ সেণ্ট এণ্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সভায় একটি জমকালো বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে-বক্তৃতায় তিনি যা বললেন তার

প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু একটি কথা তিনি বলেন নি। তিনি কোথাও ঘুণাক্ষরেও ইঙ্গিত করেন নি, মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তাও করেন নি, যে যে-স্বাধীনতার বন্দনা তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে নির্ঘোষিত হল তা দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় জাতিদেরও প্রাপ্য। এই একটি ত্রুটি তাঁর সমস্ত প্রশস্তিকে প্রহসন ক'রে দিল।

তার পরে শ্রেণীর কথা। ইংলণ্ডে স্বাধীনতা তারাই ভোগ করে যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে। যার ছু'বেলা অন্নের সংস্থান নেই স্বাধীনতায় তার পেট ভরে না। আমাদের লেখকগোষ্ঠীর কাছে আত্মপ্রকাশের স্বর্গাধিকার যতই অমূল্য হোক, সরকারী মুষ্টিভিক্ষার উপর যার দিনগুজ্‌রান, এসব নিয়ে মাথা ঘামানো তার পোষায় না। সে জানে যে স্বাধীনতা হল বড়লোকের ব্যসন; যারা নিশ্চিন্তে খেয়ে দেয়ে তোয়াজ ক'রে বেড়ায়, আইন অমান্য করার বাবুগিরি তাদেরই শোভা পায়। আমার নিঃস্বপ্রায় বন্ধু এবং একেবারে নিঃস্ব আত্মীয় কয়েকজন আছেন। এ-সম্মেলনের উপর তাঁদের অনাস্থা অবজ্ঞায় গিয়ে ঠেকেছে। স্বাধীনতায় যে আমার মতো বিশ্বাস করে অথচ চোখ কান বুজে থাকা যার অভ্যাস নয়, এই তিক্ত বিদ্রূপের ভাব সে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। নিরন্ন ও নিরাশ্রয় যারা তারা স্বাধীনতার জন্য উদগ্রীব নয়, সংস্কৃতির ঐতিহ্য নিয়েও বিচলিত নয়। একথা স্বীকার করতে না চাওয়া নিছক ভণ্ডামি।

আমাদের জাতিগত ও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা সম্বন্ধে আমি সত্য গোপন করি নি, কারণ তা সত্ত্বেও আমি স্বাধীনতার আদর্শে নিষ্ঠাবান, এবং আমার বিশ্বাস যে তার যে-বিশিষ্ট রূপটি ইংলণ্ডে পরিস্ফুট হয়েছে তার সার্থকতা আজো ঘুচে যায় নি—ইংলণ্ডের জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য। আমার রাষ্ট্রনীতি যে ফাশিস্ত্‌ নয় তা আপনারা অনুমান ক'রে থাকবেন; ফাশিস্‌ম্‌-এর কর্ম্ম ও কাম্য ছুই-ই অসৎ। আমি সাম্যবাদীও নই। হতে পারতাম, বয়স কম আর সাহস বেশি থাকলে, কারণ সাম্যবাদে আমি এখনো আশার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাই। তার কর্ম্মপদ্ধতি যে সব ক্ষেত্রে আমার মনঃপূত তা নয়, তবে উদ্দেশ্য তার শুভ বলেই জানি। আমার যুগ এবং আমার শিক্ষা আমাকে যা গড়েছে আমি তাই—অর্থাৎ একজন বুর্জ্জোয়া, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের খুঁটিটাকে যে চোখ বুজে আঁকড়ে রয়েছে যদিও সে জানে যে ঐ খুঁটির কাঠে ঘুণ ধরেছে। এ-অসম্মানের লজ্জাটাও আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমাদের অতীত যুগকে আমি শ্রদ্ধা করি; সে-যুগের মৌরুসে আমরা যে-স্বাধীনতা

পেয়েছি তার সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধনকে একান্ত আবশ্যক জ্ঞান করি। তাই আজ আমি এখানে এসেছি আপনাদের কাছে জানবার জন্য অন্য সব দেশে কোন্ পথে এ-চেষ্টা চলেছে, কোন্ দুঃখের মধ্যে দিয়ে। আমাদের দেশেও আজ দুর্দ্দিন। তবু আমাদের কর্ত্তাদের যে মুখে অন্তত স্বাধীনতার ভড়ংটুকু বজায় রাখতে হচ্ছে সেটা মস্ত সুবিধে। শেক্সপীয়রের ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক, কবিগুরু ভণ্ডামির মাহাত্ম্য বুঝতেন। হ্যাম্‌লেট তার বিপথগামিনী মাতাকে যে-সম্ভাষণ করেছিল, আমরা পার্ল্যামেন্টের আদি জননীকে সেই সম্ভাষণে অভিহিত করতে পারি :

> Good night ; but go not to mine uncle's bed ;
> Assume a virtue, if you have it not.
> That monster, custom, who all sense doth eat,
> Of habits devil, is angel yet in this,
> That to the use of actions fair and good
> He likewise gives a frock or livery,
> That aptly is put on.

ব্রিট্যানিয়া দেবী আজ কুলত্যাগিনী হতে চাইলে একটু বিব্রত হবেন। এত কাল তিনি পতিভক্তির বহ্বাড়ম্বর ক'রে এসেছেন ব'লে কলঙ্কের কথা চেপে রাখতে অধিকতর বেগ পেতে হবে। তাই তো আমাদের কাছে রাষ্ট্রব্যবস্থার বহিরাবরণ, ন্যায়বিচারের বাহ্যরূপ এত গুরুত্বপূর্ণ, তাদের উপর কড়া নজর রাখা এত আবশ্যক। "Mine uncle's bed" পার্ল্যামেন্ট-গৃহের বেঞ্চিগুলির অত্যন্ত কাছাকাছি, এবং সতী সাধ্বীদের মন ভাঙ্গানোর পক্ষে তার প্রলোভন দুর্নিবার—সে-"uncle" স্যর অস্‌ওয়াল্‌ড্ মস্‌লে হলেও। অবশ্য এটাও কম কথা নয় যে ইংলণ্ডে আজো ডিক্টেটরগিরিকে অভদ্র ভাবা হয়, ইহুদিদের মেরে ফেলাকে বদ্‌রুচি বলা হয়, এবং বেসরকারী সৈন্যদের যাত্রার সঙ মনে করা হয়।

যুদ্ধের সম্ভাবনা বাদ দিলে ফাশিস্‌ম্‌কে ভয় করবার কারণ তেমন নেই, আর যুদ্ধ একবার বাধলে যে কোন অঘটন ঘটবে না তা যুদ্ধের দেবতাই জানেন। আমাদের শত্রুরা আসবে অন্য পথ দিয়ে, শান্ত শিষ্ট ভাল মানুষটি সেজে—আমি তাদের নাম দিয়েছি ফেবিয়ো-ফাশিস্ট্। তারা ডিক্টেটরি করে চুপে চুপে, নিয়মতান্ত্রিকতার আড়ালে আবডালে ; হয় তো বা ছোট্ট একটি আইন পাশ করে

(সিডীশন আইনের মতো); আপিসের বড় কর্ত্তাদের জবরদস্তিকে ধামা চাপা দিয়ে বেমালুম চালিয়ে দেয় ; বলে সরকারী বিধিব্যবস্থা গোপন না থাকলে দেশের আর রক্ষা নেই ; আর তাদের নিজস্ব "সংবাদ"গুলি প্রতি সন্ধ্যায় বেতারে এমন মিষ্টি ক'রে এমন স্নেহার্দ্র কণ্ঠে জানায় যে প্রতিপক্ষ চুপ করে যায়, পোষ মেনে যায়। এই ফেবিয়ো-ফাশিস্‌মকে আমি সব চেয়ে ডরাই, কারণ ইংলণ্ডে স্বাধীনতা-হরণের এই হচ্ছে সনাতন প্রথা। এই প্রথা ছিল রাজা প্রথম চার্ল্‌স্‌-এর—তার মতো খাঁটি ভদ্রলোক কজনই বা দেখা যায়। এই প্রথা আমাদের অধুনাতন সুশিক্ষিত সুভদ্র রাজপুরুষদের। ফেবিয়ো-ফাশিস্‌ম্ আমাদের চিরপরিচিত শত্রু, বহু শতাব্দীর উপর তার নির্য্যাতনের ছাপ :

> He shall mark our goings, question whence we came,
>
> Set his guards about us, as in Freedom's name.
>
> He shall peep and mutter, and the night shall bring,
>
> Watchers 'neath our window, lest we mock the king.

"As in Freedom's name"—কিপ্‌লিং চমৎকার লিখেছেন। তবে এই স্তবকটা তুলে দেবার জন্য তিনি আমাকে ধন্যবাদ জানাবেন না নিশ্চয়ই।

[এর পরে কয়েকটি প্যারা ধরে সিডীশন আইন ও তিনটি পুস্তক বাজেয়াপ্তির বিবরণ আছে। এ সমস্ত আমাদের দেশের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, দৈনিক কাগজগুলির সম্পাদকী-রচনার প্রধান উপকরণ। তর্জ্জমা থেকে বাদ দেওয়া অসঙ্গত হবে না আশা করি।]

তথ্যের খুঁটিনাটি থেকে ফিরে আসা যাক একটি সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টার উদ্বোধন প্রসঙ্গে—আমার যতদূর মনে হয় তাই আমাদের সম্মেলনের মূল প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আপনাদের সামনে পেশ করবার মতো আমার কিছু নেই। আমি কী চাই সেটুকু অবশ্য আমি জানি, এবং তাই সংক্ষেপে ব্যক্ত করব। আমি চাই সাহিত্য-সৃষ্টিতে ও সাহিত্যবিচারে পূর্ণতর স্বাধীনতা। বিশেষত ইংলণ্ডে লেখকদের সৃজনীশক্তি ব্যাহত হচ্ছে যৌন প্রসঙ্গে তাঁরা স্বচ্ছন্দে লিখতে পারছেন না ব'লে ; আমি চাই একথার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি যে ঐ প্রসঙ্গটির গভীর বিশ্লেষণ ও লঘু বিবরণ দুই-ই আবশ্যক। এর দ্বিতীয় দিকটা বক্তৃতামঞ্চে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে ব'লে আমি বিশেষ ক'রে সে কথা পাড়লাম। সমালোচনার দিক দিয়ে আমি চাই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সব কিছুর ভালমন্দ-বিচারের নির্ব্বিঘ্ন অধিকার। ইংলণ্ডে

আমাদের বরাৎ ভালো, আমরা এখনো সেটা থেকে বঞ্চিত হই নি, যদিচ বাইরে কোনো কোনো দেশে তার অন্তর্দ্ধান ঘটেছে। কিন্তু এই অধিকারকে সার্থক করতে হলে শ্রোতারও দরকার, কাজেকাজেই আমি চাই মতপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরেক রকম মতপ্রচারেরও পরিপূর্ণ সুযোগ। এদিক দিয়ে ইংলণ্ডেও অন্য দেশের মতো বিঘ্নের সৃষ্টি হয়েছে, প্রধানত বেতারের উপর সরকারী দখল পাকা হবার পর থেকে। সর্ব্বোপরি আমি চাই আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

এতে আমার কর্ত্তব্য কী? আমি চেষ্টা করব নিজের দেশে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ সুযোগটুকু গ্রহণ করতে, এবং যা কতিপয় ধনী ও শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ তাকে সর্ব্বশ্রেণী ও জাতির অধিগম্য করতে। আর চেষ্টা করব ইংরেজ লেখকদের সঙ্গে অন্যান্য য়ুরোপীয় লেখকদের সংযোগ নিবিড়তর করতে। আমরা এত দূরে দূরে থাকি, চারিদিকে কী ঘটছে না ঘটছে তার খবর এত কম রাখি।

আমার বক্তব্য শেষ করবার পূর্ব্বে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমি যা বলেছি তা আমারি মত, ইংরেজ প্রতিনিধিদের সমষ্টিগত মতামত নয়। দেশের পরিস্থিতি আমি যেমন ভাবে বিবৃত করেছি তাতে বোধ হয় ওঁদের আপত্তি হবে না, তবে আমার সেকেলে দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের মনের মতো নাও হতে পারে। তাঁরা হয় তো ভাবছেন, স্বাধীনতা ও ঐতিহ্য সম্বন্ধে কথা বলা কথার অপব্যয় মাত্র যতদিন সমাজের আর্থিক ব্যবস্থার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তাঁরা বলতে পারেন যে আরেকবার যুদ্ধ বাধলে মিঃ অলডস্ হক্স্‌লি কিম্বা আমার মতো ব্যক্তিবাদী ও উদারপন্থী লেখকদের পাত্তাড়ি গুটোতে হবে। এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং আগামী যুদ্ধও আসন্নপ্রায়। আমার বিশ্বাস যে জাতির পর জাতি যদি রণসম্ভারে কেবলই ভাণ্ডার ভরতে থাকে তা হলে তাদের কামানবন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তেমনই অনিবার্য্য যেমন অনিবার্য্য নিরন্তর খাদ্যরত জন্তুর পক্ষে মলত্যাগ। অবস্থা যখন এইরূপ তখন আমার এবং আমার সমানুভব ব্যক্তিদের কাজ হচ্ছে ইতিমধ্যের কাজ। আমাদের মর্‌চে-পড়া যন্ত্রপাতি দিয়ে টুকিটাকি এটা ওটা ক'রে যেতে হবে যতদিন না সভ্যতার ইমারত শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়ছে। ভেঙ্গে যখন পড়বে, কিছুই আর কোনো কাজে লাগবে না, তার পরে, যদি "তার পরে" বলতে কিছু থাকে, সভ্যতার নব-অভিযানে যারা এসে যোগ দেবে, তারা নতুন শিক্ষা নতুন মন্ত্র নিয়ে আসবে।

যুদ্ধের দুর্ভাবনা নিজের মৃত্যুর দুর্ভাবনার চেয়েও আমাকে বেশি বিব্রত করে যদিও ও দু'টো কদর্য্য ব্যাপারে আমার একই কর্ত্তব্য। দৈনন্দিনের কাজকর্মে আমাকে এমন ভাব ধারণ করতে হবে যেন পরমায়ু অক্ষয় আর সভ্যতা অনন্ত দুটি উক্তিই মিথ্যা—আমিও বেঁচে থাকব না, আমাদের এই বিপুল পৃথিবীটাও টিঁকে থাকবে না,—দুটোই সত্য ব'লে ধ'রে নিতে হবে যদি আমরা খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা বন্ধ করতে না চাই, আর যদি মনের অন্ধকার কক্ষে দুটি একটি মুক্ত বাতায়নের প্রয়োজন বোধ করি। বক্তৃতা করা যদিও আমার পেশা নয়, তবু এই ক'টি কথা বলবার জন্য প্যারিসে আসবার ইচ্ছা সম্বরণ করতে পারি নি। বর্ত্তমান সঙ্কটের প্রতিবিধান সম্বন্ধে মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্য্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি ভয়শূন্য ও সংবেদনশীল হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্ত্তব্য সে পালন করেছে; আসন্ন দুর্য্যোগে মানবজাতিকে দলবদ্ধ করতে সে সহায়তা করেছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে-নির্ভীক চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বলিষ্ঠ করবে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

আমার এই নূতন জেলা কুলাবার মতনই উত্তর কোকনের অন্তর্গত। পূর্ব্ব-দিকে সহ্যাদ্রির থল ঘাট হতে আরম্ভ করে পশ্চিমে আরব সাগর অবধি বিস্তৃত। সমুদ্রকূলে বান্দরা, আন্ধেরী, সান্তাক্রুজ, জুহু ইত্যাদি কত সুন্দর সুন্দর জনপদ গড়ে উঠছিল। জুহুকে তখনও পাড়া গাঁ বলা চলত। তবে, বেলাভূমি খুব বিস্তীর্ণ ও সুন্দর বলে বোম্বাই থেকে সাহেবসুবো মানুষ সেখানে খুব সমুদ্রস্নান করতে আসতেন। এই স্থানটীর নাম পাঠক নিশ্চয়ই শুনেছেন। মহাত্মাজী ফাটক থেকে বেরিয়ে স্বাস্থ্যের জন্য কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন। ক্ষুদ্র জুহু সেই কয়েক সপ্তাহ ভারতের একটী পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছিল! হিমালয় হতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল প্রদেশের জননেতারা মহাত্মা দর্শনের জন্য রোজ দলে দলে আসা যাওয়া করছিলেন। মহাত্মার আবাসের সাজ সরঞ্জাম ছিল নিতান্ত সাদাসিধে রকমের। আগন্তুকমণ্ডলীর সবাই বসতেন ঘরের মেজের উপর মহাত্মাজীকে ঘিরে। একদিন এই রকম সবাই বসে রয়েছেন। পণ্ডিতজী রয়েছেন, দেশবন্ধু রয়েছেন, রাজগোপালাচারী রয়েছেন, আরও ছোট বড় অনেক নেতাও রয়েছেন। সবাই খদ্দর পরিহিত। এমন সময় ইংরেজী পোষাক পরে গট গট করে এসে দাঁড়ালেন দরজাতে জিনা সাহেব। কংগ্রেসের সঙ্গে এই মুসলমান নেতার বিচ্ছেদ হয়ে গেছল অনেক দিন আগেই। তাই তাঁর বিজয়ী বীরের মত মেদিনী কাঁপিয়ে হঠাৎ এসে পড়াতে সকলেই আশ্চর্য্য হলেন। হয় ত কারও কারও একটু সঙ্কোচ বোধ হয়েও থাকবে। গান্ধীজী ঈষৎ হেসে বললেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের কাজ শেষ হল বলে।" তার পর সবাইকে অন্য কামরায় সরে যেতে বলে দুচার মিনিট বাদে জিনা সাহেবকে ডাকলেন। সাহেব বোধ হয় একটু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কেন না, রূঢ়ভাবে উত্তর দিলেন, "মিষ্টার গান্ধী, আপনি বোধ হয় আশা করেন না যে এই পোষাক পরে আমি মেজের উপর আসনপীঁড়ি হয়ে বসব।" মিষ্টার গান্ধীর মুখে সেই অমায়িক হাসি। চেঁচিয়ে বললেন, "মহাদেব ভাই, জিনা সাহেবকে

স্নানের ঘর থেকে একটা জল চৌকী বার করে দাও ত!" এর পরে আর জিনা-গান্ধী বৈঠক তেমন জমল না।

গল্পটী আমি সম্প্রতি শুনেছি মাত্র। শুনে কত পুরানো কথাই মনে হয়েছিল! ১৯০৫-৬ সালে আমার ঠাণার বাঙ্গলাতে, কি বোম্বাইয়ে জিনার বাসাতে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসে দেশ উদ্ধারের জল্পনা কল্পনা—১৯১৬-১৭ সালে হোম-রুল সঙ্ঘের কাজ নিয়ে আলোচনা ও জিনার জ্বলন্ত উৎসাহ—তার পর ১৯২০ সালে নাগপুর কংগ্রেসের আগে তাঁর গর্ব্ব, "আমি আমার সঙ্ঘের লোকজন সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, চিত্তও কলকাতা থেকে তার ছেলেদিকে নিয়ে আসছে। এবার দেখবে, মহাত্মা ও মৌলানার দলকে পিষে মারব।" পিষে মারবার ব্যবস্থাটা যে গুলিয়ে গেল তা সবাই জানেন। জিনা কিছুদিন মান করে একান্তে বসে থেকে শেষ মোসলেম লীগ-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন। কিন্তু যাই করে থাকুন, আমার এই বন্ধুটী যে দেশকে যথার্থ ভালবাসেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। আসল কথা, জিনা দারুণ অভিমানী। আত্মসম্মানে এতটুকু ঘা বরদাস্ত করতে পারেন না। তাঁর মত পুরানো কংগ্রেস-কর্ম্মীকে ঠেলে ফেলে দিয়ে মহাত্মাজী যে মহম্মদ আলিকে আপন করে নিলেন, এটা তিনি সইতে পারলেন না।

আমার ঠাণা প্রবাসের সময় মহম্মদ আলির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। সে সময়ে তিনি ঘোর Pan-Islamic ভাবাপন্ন ছিলেন। ক্রমশঃ সেই ভাবের সঙ্গে ধীরে ধীরে কি করে এসে মিশল দেশ-প্রেম, সেটা বর্ণনা করার এ স্থান নয়। তবে ১৯০৬ সালের একদিনের কথা মনে পড়ে। আমি বোম্বাইয়ে তাজমহল হোটেলে রয়েছি। বিকেল বেলা মহম্মদ ঝড়ের মত এসে উপস্থিত হলেন। ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "দেখ হে, আমি ভেবে দেখলাম। ভারতবর্ষে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা আমরা মুসলমানেরাই একা করতে পারি। কিন্তু তোমাদের সাহায্য না পেলে রাজ্য রাখতে পারব না। আমাদের মধ্যে একটা বোঝা-পড়া সত্যিই দরকার।" কাফেরের সঙ্গে বোঝা-পড়া দরকার,—এটা এর আগে তাঁর মুখে কখন শুনি নেই।

উত্তর কোকনের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে নানা অবান্তর কথা এসে পড়ল। মোট কথা, এই বিচিত্র প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে আমার আর বিশেষ কোন সম্বন্ধ রহিল না, কেন না এখানে এসে আমার মফঃস্বলে সফর বন্ধ হয়ে গেল। আমার একঘেয়ে দিনগুলি কাটত সদরে, সারা দুপুর সাক্ষীর জবানবন্দী লিখে।

ঠাণা নগরটীকে একেবারে শ্রীহীন বললেও অন্যায় হয় না। খাড়ি ও জলার মাঝে এক ঘিঞ্জী ছোট্ট শহর। ব্যবসা বাণিজ্য বা দোকান পাট বিশেষ কিছু নেই, রাস্তা ঘাট কদর্য্য, আব-হাওয়া অস্বাস্থ্যকর। শহরের অধিকাংশ লোক, ভদ্র বা ইতর, প্রতিদিন রোজগার ধান্দার জন্য বোম্বাই যান। দুপুর বেলা শহর একেবারে নিঝুম। তবে, আমাদের আমলামণ্ডলী এখানে সংখ্যায় নিতান্ত অল্প ছিল না। তাই একটী ক্লাব আমাদের ছিল। কিন্তু বিচিত্র রকমের ক্লাব। আদালতের হাতার মধ্যে মুনসেফ কাছারীর লাগা এক প্রকাণ্ড উঁচু চালা ছিল। দিনের বেলায় আদালতের সাক্ষীরা সেইখানে বিশ্রাম করত। সন্ধ্যার পর মেজেতে নারকেল ছোবড়ার দরী বিছিয়ে, মাথার উপর দুই কীটসন বাতি জ্বেলে, সেই চালাটাকে আমাদের বেডমিণ্টন কোর্ট করে নেওয়া হত। সমুখে ছিল খানিকটা কাঁকরপেটা খোলা জমী। সেইখানে টেনিসের মৌশুমে আমরা টেনিস খেলতাম। নিকটস্থ ডাকবাঙ্গলার খানসামা এসে পানীয় সরবরাহ করত। কাছারীর একখানা লম্বা সরু টেবিল বের করে তার উপর রঙ্গ-বেরঙ্গের বোতল সাজিয়ে Bar তৈরী করে বসত। ক্লাবে তাস-পাশা বড় একটা খেলা হত না। কদাচ কখন জনা চারেক উৎসাহী লোক চালার মধ্যে এক কোণে ছোট তেপাই লাগিয়ে ব্রিজ খেলতে বসতেন। কিন্তু এই সব ভাঙ্গা-ছেঁড়া সাজ সরঞ্জাম সত্বেও সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কেটে যেত। মাঝে মাঝে ওই চালার মধ্যেই চা-পার্টী, নাচ-গান, বড় বড় ডিনার বা সপারের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা হত। এই রকম কোন একটা বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত হলে প্রত্যেকেই আমরা নিজের নিজের বাড়ী থেকে বাসন-কোসন, আসবাব-পত্র পাঠিয়ে দিতাম। কিছুরই অভাব ঘটত না। বোম্বাই মহানগরী কাছে। কাজেই বড় রকমের একটা জলসা হলে শহুরে লোকেরও অল্প-বিস্তর জমায়েৎ হত। তাদের কাছে আপন ক্লাবের মান-সম্ভ্রম বজায় রাখবার জন্য সবাই আমরা প্রাণপণে খাটতাম। ক্রিকেটের মৌসুমে ক্রিকেটও খুব চলত। মাসে অন্ততঃ একটা করে বড় ম্যাচ খেলা হত। তবে আমাদের ক্লাবে আর কজনই বা লোক, তাই শহরের খেলোয়াড় সব ডেকেডুকে এগার জন খাড়া করা যেত। অপর পক্ষে বোম্বাই থেকে বড় বড় প্রেসিডেন্সী খেলোয়াড়ও আসতেন। তবে, সব সময় যে আমরাই খেলায় হারতাম, তাও নয়। আমি ঠাণায় যাবার কিছুদিন পরেই আমরা কয়েকজনে মিলে ক্রীড়াভুবন নামে এক বড় দেশী ক্লাব খাড়া করলাম। সেটা জেলা ক্লাবের চেয়ে অনেক বড়।

এই ক্লাব সম্বন্ধে পরে আরও অনেক কথা বলব। আমার ইংরেজ বন্ধুরা ক্লাবটীর নাম দিয়েছিলেন Dutt's Club। তবে তাঁদের এই নূতন ক্লাব সম্বন্ধে কোন গাত্রদাহ ছিল না। বরং অনেকেই সেখানে শনি রবিবারে খেলতে যেতেন।

আমার বড় সাহেবের নাম ত আগেই করেছি। তিনি বয়সে প্রবীণ ছিলেন। ধরণ-ধারণ ছিল কতকটা সেকেলে, কিন্তু ক্লাবের বা সামাজিক কাজ কর্ম্মে তাঁর উৎসাহের এতটুকু অভাব ছিল না। আমার নিজের সঙ্গে ত তাঁর সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অন্য রকমের হয়ে গেছল। অর্দ্ধেক দিন জজ গৃহিণীর কাছে রান্না ঘরে পীঁড়িতে বসে ভাত খেতাম। খাবার সময় পাটের কাপড় পরে আদুড় গায়ে জজ সাহেবকে দেখাত যেন বুড়ো ঠাকুরদাদাটী। খেতে খেতে উচ্চৈঃস্বরে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াতেন ও মরাঠীতে ছড়া কাটতেন। কিন্তু এই টিপনীস সাহেবই যখন আবার কলার টাই এঁটে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে যেতেন তখন ছেলে-ছোকরা ইংরেজ কেউ ঝট করে তাঁর কাছে ঘেঁসত না। আদালতেও তাই। তাঁর গুরুগম্ভীর চেহারা দেখে কেউ এতটুকু বেয়াদবী করতে সাহস পেত না। সকলে তাঁকে ভালবাসত বটে, তবে ভয়-ও করত যথেষ্ট। কিন্তু বাড়ীতে সম্পূর্ণ অন্য রকম। সেখানে এমন অম্লান বদনে ছোট বড় আত্মীয়-স্বজনের উপদ্রব অনাচার সহ্য করে যেতেন যে পারিবারিক শৃঙ্খলা বলে একটা পদার্থের চিহ্নমাত্র দেখা যেত না। আমি ত অল্পদিনেই এক রকম টিপনীস-পরিবারের সামিল হয়ে গেছলাম। আর, সেই সূত্রে কর্ত্তার কাছে যা খুসী আবদার করতাম আর তিনিও সব আবদার সয়ে যেতেন। ফলে আমার জজিয়তী কাজ শেখাটা খুব মন্থর গতিতেই চলছিল। কর্ত্তার নাম ছিল রঘুনাথ রাও। কখন কালেভদ্রে তিনি বকলে ধমকালে আমি তাঁকে ঠাট্টা করে বলতাম, "মশাই, এ ত আপনার রাম-রাজ্য, এখানে আবার কড়া-কড়ি কিসের!" তিনি হেসে চুপ করে যেতেন।

আমাদের ডাক্তার সাহেব ছিলেন আর একজন প্রবীণ লোক, কর্ণেল M, জাতে পারসী। ভদ্রলোক বড় চমৎকার মানুষ ছিলেন, তবে তাঁর অতি বড় শত্রুও তাঁকে নিরীহ বা অমায়িক বলতে পারত না। কর্ণেল সাহেবের সাজ-গোজ, ধরণ-ধারণ ছিল একেবারে বুড়ো জঙ্গী অফিসারের মত। তাঁর সঙ্গে কথা কইতে কইতে বেশীক্ষণ কারও মনে থাকত না যে তিনি নেটিব সাহেব। কর্ণেলের একটা পুরানো

গল্প বলার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারছি না। গল্পটা তাঁর নিজের কাছেই শুনেছিলাম, তাঁর ভাষাতেই বলি।

কয়েক বছর আগের কথা। আমি তখন ফৌজে ডাক্তার ছিলাম, পদগৌরবে মেজার। একটা ছোটখাটো লড়াইয়ের পরে আমরা মধ্যভারতে মহু কান্টনমেন্টে বিশ্রাম করছিলাম। আমাদের কারও ঘরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। সবাই একসঙ্গে দুবেলা পলটনের Mess-এ খেতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় খানার টেবিলে এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটল। দোষ আমারই। কর্ণেল সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। ইন্দোরে নিমন্ত্রণ রাখতে গেছলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমি ছিলাম বরিষ্ঠ অফিসার। আমাদের এক তরুণ সেনানী, Lt. X, ডিনার শেষ হওয়ার আগেই কেমন বেসামাল হয়ে উঠল। Mess-এ কদাচ কখন একটু আধটু বেসামাল হওয়াটা কিছু এমন অসাধারণ ব্যাপার নয়। তবু আমি "Order, Order" বলে চেঁচিয়ে নিজের কর্ত্তব্য পালন করলাম। খাওয়া শেষ হলে যখন সবাই চুরুট সিগারেট ধরাচ্ছি, X টলতে টলতে একেবারে আমার সম্মুখে এসে চীৎকার করতে লাগল, "হ্যালো! পেস্তনজী, জমশেদজী, মাণেকজী, নওরোজী, তুমি আজ Mess-এর অধ্যক্ষ হয়েছ না কি?" আমি খুব ধীরে ধীরে বললাম, "X! নিজের কেদারাতে বস গিয়ে।" সে আরও উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "Mess-এর তুমি কি জান, পেস্তনজী, নওরোজী, মাণেকজী! বাজারে Stores-এর দোকান দেখ গিয়ে।" আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "মিষ্টার X, যাও, তোমার কামরাতে চলে যাও। কাল কর্ণেল ফিরে আসা পর্য্যন্ত সেইখানে আটক থাক।" আর একজন সেনানীকে হুকুম দিলাম, "কাপ্তান Y, আপনি মিষ্টার X এর সঙ্গে যান। ওঁকে নজরবন্দি করে রাখবেন।" সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু হুকুম যখন বেরিয়ে গেছে, না মেনে উপায় কি! X ধীরে ধীরে মাথা হেঁট করে চলে গেল, সঙ্গে কাপ্তান Y। একটু পরে আমরাও আপন আপন আবাসে চলে গেলাম। আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছল। রেজিমেন্টে আমিই ছিলাম একমাত্র ভারতীয় অফিসার। কিন্তু এর আগে কোন দিন কারও সঙ্গে এতটুকু মনান্তর বা কথা কাটাকাটি হয় নেই। আজ কেন আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না! রাত প্রায় একটার সময় কার ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বারান্দায় বেরিয়ে দেখি, আমাদের কর্ণেল

সাহেব। আমাকে দেখেই বললেন, "এইমাত্র ইন্দোর হতে এলাম। আবার এখনই ফিরে যাব। Adjutant-এর মুখে আজকের ব্যাপার শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।" আমি উত্তর দিলাম, "আমারই দোষ, কর্ণেল। আমি বয়স্থ অফিসার, আমার সামলে যাওয়া উচিত ছিল।" কর্ণেল আমার হাত ধরে ধীরে ধীরে বললেন, "সে কথা ত ঠিক নয়, ডাক্তার! দোষ ঐ বাঁদর ছেলেটার। কিন্তু কাল সকাল-বেলা কাওয়াজের পর ব্যাপারটা সিপাহীদের মধ্যে জানাজানি হয়ে যাবে। তারা কি বলবে?" আমি একটুও ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলাম, "তুমি ওকে এক্ষণই ছেড়ে দিয়ে যাও, কর্ণেল। আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।" কর্ণেল ঘাড় নাড়লেন, "তা হয় না, ডাক্তার। তোমার হুকুমের উপর কি আমি কথা কইতে পারি! তুমি যা ভাল বোঝ, কোরো। আমি আবার ইন্দোর ফিরে চললাম।" ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ চলে গেলেন। আমি X-এর বাঙ্গলাতে গেলাম। দেখি, সে ও কাপ্তান নীরবে বসে রয়েছে। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে সেলামী দিলে। আমি X-এর কাছে গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে আস্তে আস্তে বললাম, "X, আমি বয়োবৃদ্ধ। আমারই মাথা ঠাণ্ডা রাখা উচিত ছিল। সেটা পারি নেই বলে অত্যন্ত লজ্জিত। তুমি কিছু মনে কোরো না। কাপ্তান Y, তুমি এখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়। এখানে থাকার আর কোন দরকার নেই।" X মিনিটখানেক দুহাতে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর ভারী গলায় বললে, "স্যার, আমার অপরাধ অমার্জ্জনীয়—" আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। "Well, good-bye, my boy! কাল প্যারেডে দেখা হবে", বলে পলায়ন দিলাম।

গল্পটী ভারী সুন্দর। মনে হয় যেন রচা কথা। কিন্তু বন্ধুবর M ত কখন মিথ্যা কথা বলতেন না! Discipline কি চমৎকার জিনিস! আর কি চমৎকার লোক ছিলেন আমাদের ডাক্তার M সাহেব!

জেলার কলেকটার ছিলেন Orr নামক একজন প্রবীণ সিবিলিয়ান। তিনি রীতিমত বড় সাহেব ছিলেন। আমাদের ঠাণা ক্লাবের ক্ষুদ্র সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ও তাঁর সহধর্ম্মিণী বেশীর ভাগ সময় কাটাতেন বোম্বাইয়ে। যে কদিন বা আমাদের মাঝে কাটাতেন, তাও এমন বিকট চাল দিতেন যে আমরা ছেলে ছোকরার দল দূরে দূরেই থাকতাম।

তবে যেখানে বুনো ওল থাকে, সেখানে বাঘা তেঁতুলও পাওয়া যায়।

ঠাণাতে আমাদের Orr দম্পতির বাঘা তেঁতুল ছিলেন পুলিশের Cox সাহেব ও তাঁর লেডী। এই Cox জাতে বিলেতী বেরোনেট ছিলেন। অন্ততঃ তখন পর্য্যন্ত তাঁর baronetcy-র দাবী রাজ দরবারে অগ্রাহ্য হয় নেই। সাহেবের চালচলন Sir পদবীর উপযোগী ছিল বটে, তবে লেডী সাহেবা একটু অন্য রকমের ছিলেন। কথাবার্ত্তা খুব ঝাঁঝাল ছিল। আমার মনে পড়ছে, একদিন খানার পর আমাদের বৈঠকখানা ঘরে বসেই আমার স্ত্রীকে জনান্তিকে বলছিলেন, "ওরা কে, জান ত? মাদ্রাজে Orr কোম্পানী বলে এক জহুরীর দোকান আছে, তাদেরই কে হয়। দোকানদার, অথচ কি রকম চাল দেয়, দেখ না!" জনান্তিকে হলেও আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছিলাম। Cox গম্ভীর গলায় বললেন, "ও সব কথা শুনবেন না, Mrs. D। আজকালকার দিনে বংশ-গৌরবের কদর আর কে করে!" Cox লোকটী ছিলেন সাহিত্যিক। একবার এই বাতিকের জন্য একটু বিপাকেও পড়েছিলেন। সেকালে East and West বলে এক পত্রিকা বেরোত বোম্বাই হতে, মাসিক কি ত্রৈমাসিক তা এখন ভুলে গেছি। পত্রিকাখানাকে লোকে একটু উচ্চ শ্রেণীর বলেই মনে করত। সাহিত্যিক খ্যাতি লাভ করার উচ্চাশা যাঁদের ছিল, তাঁরা এতে প্রবন্ধাদি লিখতেন। একবার আমাদের Cox সাহেব "ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবশেষ" বলে একটা লেখা প্রকাশ করেছিলেন এই পত্রিকায়। লেখাটার মধ্যে এই ভাবের কথা ছিল যে লেখক স্বয়ং সিন্ধু প্রদেশে ব্রাহ্মণাবাদের ধ্বংসাবশেষ খুঁড়ে অমুক অমুক জিনিস পেয়েছিলেন। বোম্বাই সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক, এন্থোভেন সাহেব, এই প্রবন্ধ পড়ে কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠালেন, "কার হুকুমে আপনি ব্রাহ্মণাবাদে খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন?" Cox নিতান্ত বিনীতভাবে জানালেন যে তিনি কোথাও কোন দিন একটা সাবলের কোপ পর্য্যন্ত মারেন নাই, লেখাটা গল্প মাত্র, সত্য ঘটনা নয়। সরকারের রোষ হতে সে যাত্রা সাহেব রক্ষা পেয়ে গেলেন। কিন্তু দুটোর ভেতর খুব বেশী তফাৎ আছে কি? অনেক ইতিহাসই ত কাহিনী!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

স্পেইনের ছবি

স্পেইন্ দেশটা রহস্য আর রোমান্স দিয়ে ঘেরা। জাহাজ চলে ভূমধ্যসাগর দিয়ে, থামে ফরাসী মার্সেইতে, থামে ব্রিটিস্ জিব্রলটারে—স্পেইন্ যেন হারিয়ে গেছে। ইউরোপে থেকেও যেন এ দেশটা ইয়োরোপ-ছাড়া! ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে চলি—পীরেনিজ পর্ব্বত মাথা উঁচিয়ে নিষেধ জানায়। তা'র গোপন-নিভৃত অসংখ্য স্মৃতি-কাহিনীর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে দেশটা অনেকের কাছেই নিশীথ রাত্রের তারার মত সুদূর। ওয়েড্‌মোর সাহেব বলেছেন,—

"No great civilised land has, until lately, been so little visited as Spain....Spain leads nowhere, and so is cut off....It must be visited because of its galleries—it must be beheld because of its people. *Immeasurable is the light thrown by the one upon the other.*"

অনেকটা আমাদের দেশের মত—যদিও আমরা কাউকে অপরাধ দিতে পারিনে; কেননা,—আমরা নিজেরাই আমাদের দেশকে জানিনে। এমন কি জানতে চেষ্টাও করিনে।

স্পেইন্—বহু কথা আছে তা'র। মুর রাজত্ব, সিড্, ডন্ কুইকসোট্, ডন্ জুয়ান্, আল্‌হাম্‌রা, এস্‌কুরিয়াল্, টলেডো, গ্রানাডা, সেভাইল্, ইস্‌লাম সাম্রাজ্য, আরমাডা, এ্যামেরিকা বিজয়—সব মিলিয়ে একটা বিরাট ইতিহাস! এ দেশের ছবির কথা জানতে হ'লে, এ দেশের ছবি বুঝতে হ'লে—এ দেশের ইতিহাসও জানতে-বুঝতে হ'বে। কারণ, স্পেইনের ছবি জগতের চিত্রালোচনার একটি অমর অধ্যায় রচনা করেছে এবং সে-জন্যই তা' সে-দেশের ইতিহাস ও চরিত্র থেকে উৎসৃত। নেদারল্যাণ্ড ও নেপল্‌সে স্প্যানিশ্ প্রভুত্ব, ডাচ্ রিপাব্লিক, ফরাসী বিদ্রোহ, নেপোলিয়ন্—ইয়োরোপের রাজনীতিক ইতিহাসের এ সব বড়-বড় তথ্য স্প্যানিশ্ চিত্র-কথারও অঙ্গীভূত। এ'র প্রত্যেকটি স্প্যানিশ্ ছবির উপর যুগে-যুগে প্রভাব-সম্পাত করেছে। আরও মনে রাখতে হ'বে, কাউন্টার রিফর্মেশন—ইন্‌কুইজিশন্ ও লয়লার জেস্যুইট্ আন্দোলন।

(২)

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইটালীর চিত্রসাধনা থেমে পড়ে। রোম, বোলোনা, ফ্লোরেন্স, ভেনিস্ প্রভৃতি ইটালীর বড় বড় চিত্র-কেন্দ্রে তখন স্রষ্টার ভীড় আর নেই। কতকগুলি কুশিক্ষিত লোক শুধু রাফেল আর এঞ্জেলোর প্রেত দেখে তা'দের পিছন-পিছন ছুটাছুটি করছে—ইটালীতে চল্‌ছে শুধু নির্বীর্য্য অনুকরণ আর রাফেল্-কীর্ত্তন। ইটালীর জয়গান থেমে গেছে। কিন্তু তা'র সুর প্রতি-ধ্বনিত হচ্ছে সমগ্র ইয়োরোপে, সমস্ত দেশেই চলেছে রোমক অনুকরণে চিত্রাঙ্কন। ইটালীয় ছাঁদের অসংখ্য ছবি সে-কালে প্রত্যেক দেশের মত স্পেইনেও অঙ্কিত হয়েছিল। কিন্তু কে তা'র খোঁজ রাখে? তা'র মূল্য আছে শুধুই বিশেষজ্ঞের কাছে—যা'রা রিসার্চ করে খেতাব পেতে চায়। সে চিত্র-সমষ্টি স্পেইনের সত্যি-কার সম্পদ নয়, গুরুভার বোঝা। তা'তে স্পেইনের অন্তরের পরিচয় নেই, স্বকীয়তা নেই,—এক কথায়, নেই কোনো উদাত্ত সত্যভাষণ বা পৌরুষ। শুধু ভাষার দাবীতে ইটালীয় সুর, ইটালীয় ঠাটের গান স্প্যানিশ্ হয়ে ওঠে না—কারণ, স্পেইন্ সেখানে হারিয়ে গেছে ইটালীর তলায়।

আমরা শ্রদ্ধা করি সেই স্পেইন্‌কে, যখন সে নিজেকে পেয়েছে; নিজের কথা নিজের ভাষায় সুস্পষ্ট, সুদৃঢ় ও সুস্থ উচ্চারণে বল্‌ছে; যখন এল্ গ্রেকো, ভেলাজ-কুয়েজ্, ম্যরিল্লো, গয়া, জুলোয়াগার ছবি আঁকছে। এ সব যুগের ছবিই সত্যিকার স্প্যানিশ্ ছবি। এর আগেকার (বা পরের) ছবির ইতিহাস অবান্তর না-হলেও অগৌরবের। স্পেইনের আঙুর ক্ষেত, উজ্জ্বল দিনের প্রখর আলো, নীল আকাশ, ভূমধ্যসাগরের ঋতুসম্পদের প্রাচুর্য্যে স্পেইনের সত্যিকার চিত্রকরের দল যে সত্যটি নিজেদের রক্তের ভিতর অনুভব করেছিলেন—শুধু সে-টুকুই পৃথিবীর ছবির বাজারে স্পেইনের দান—যা' চিরদিনের জন্য অক্ষয়, অজয়।

এই স্বাধীন স্বাভিব্যক্তির গৌরবময় ইতিবৃত্তে নেপলসের কথা উঠবে। পূর্ব্বেই বলেছি যে স্পেইনে চিত্রোন্মেষণার যুগারম্ভে নেদারল্যাণ্ড ও নেপলস্ স্পেইনের শাসনাধীনে ছিল।

ইটালীয় চিত্রযুগের শেষভাগে নেপলসে একটি বিশিষ্ট চিত্রকর-সংঘ গড়ে উঠেছিল। আর নেদারল্যাণ্ড থেকে ভাল ভাল চিত্রকর হামেসাই আমদানী হ'ত। এমন-ও ইতিহাস আছে যে অনেক সময় নেদারল্যাণ্ডের চিত্রকর এদেশে রাজ-

চিত্রকরের সম্মান পর্য্যন্ত পেয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ্যান্টনি মোরের উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়োরোপে চিত্রসাধনার ইতিহাসে, নেদারল্যাণ্ডের নায়কত্ব একটি সম্মানের আসন অধিকার করে আছে। ইটালীর উপরে না-হলেও, এ-বিষয়ে তা'র পাশেই নেদারল্যাণ্ডের স্থান এবং নেদারল্যাণ্ডের ছবির আলোচনায় সে-কথা বিশদ-ভাবে আলোচিত হ'বে।

মাইকেল এমেরেগী নামক একজন স্বাধীনচিত্ত ও প্রতিভাবান চিত্রকর নেপলসে একটি প্রভাবশালী চিত্রকর-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। এমেরেগীকে কারাভাজ্জিও নামেই সবাই জানে। কারাভাজ্জিও (১৫৬৯-১৬০৯) বর্ত্তমান কালের বাস্তববাদের (naturalism or realism in painting) প্রবর্ত্তক। বিশ্বপ্রকৃতির পরিবীক্ষণ, বিশেষ করে নিজ জগতের ও দেশের সুন্দর-কুৎসিতের দৃষ্টি-বিচারের উপর অসামান্য জোর দিয়ে স্পেইনের শিল্পসাধনাকে গৃহমুখী করতে তিনি যথেষ্ট সহায়তা করেন। কারাভাজ্জিও যে চিত্রণ-পদ্ধতির সাহায্যে তাঁ'র চিত্রে রসসৃষ্টি করেছিলেন—তা'কে সাধারণতঃ টেনিব্রোসি বলা হয়ে থাকে। ছবিতে দরকারমত আলোক-সম্পাতের জন্য তিনি কালো রঙের সাহায্যে বর্ণ-বিরোধ সংঘটিত করতেন। এই কালো রঙের জন্যই উপরি-উক্ত আখ্যা। করেজ্জিও ভিন্ন সে-যুগে আলো-আঁধারের নিপুণ সংস্থান করতে কারাভাজ্জিও-র আর জুড়ী ছিল না। কারাভাজ্জিও দেখিয়েছেন যে সামান্য কয়েকটি বর্ণের সাহায্যে—শুধু আলো-আঁধারের উপযুক্ত সংমিশ্রণে উচ্চ শ্রেণীর চিত্রসৃজন সম্ভব। জুরবারণের (১৫৯৮-১৬৬১) "এ্যাপোথিওসিস্ অব্ সেণ্ট টমাস্ একুইনাস্" টেনিব্রোসি কলারীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারাভাজ্জিও বিদ্রোহের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। তাঁ'র ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবে বিদ্রোহ সফল হ'ল। ভাবের ঘরে ফাঁকির রোধ—নেপলস্ চিত্র-সংঘের আমরণ সাধনা হ'ল।

এই সবল-সুস্থ মনোভাবই চিত্র বা অন্য যে-কোনো রকম কলা-সৃষ্টির সব চাইতে বড় কথা। এর অভাবে সত্যিকার অভিব্যক্তি থাকতে পারে না। পরের দ্বারে ভিক্ষা ক'রে দান করা চলে না। ধার করা মেকীর স্তূপ জলের দরে বিকিয়ে যায়। তা নিয়ে রসিক চিত্ত তৃপ্ত বা উদ্বুদ্ধ হতে পারে না কখনও।

কারাভ্যাজ্জিও-র পর রাইবেরা (১৫৮৮-১৬৫৬) প্রবলতর নির্ঘোষে স্পেইনের বুকে এ সত্যটি সম্যকভাবে জাগ্রত করেন। রাইবেরার জীবনে স্রষ্টার চাইতে বড়

উদ্‌গাতা প্রবর্ত্তক। স্পেইনের আপনকার চিত্রগুরু ও শিক্ষক হিসাবে রাইবেরার স্থান অত্যুচ্চ। লণ্ডনে রাইবেরার "মৃত যীশু" বলে প্রসিদ্ধ একটি ছবি আছে। রুবেন্স বা এঞ্জেলো বা তার পূর্ব্বতন প্রতিভাস্পৃষ্ট অনুরূপ ছবির সঙ্গে রাইবেরার "মৃত যীশু"র তুলনা করা প্রত্যেক চিত্রামোদীর কর্ত্তব্য। তা থেকেই এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হ'বে যে প্রত্যেক দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য আছে এবং আর্টের ক্ষেত্রে সেগুলি অপাংক্তেয় নয়। বরঞ্চ সে-গুলির ছাপ আদরণীয় এবং অত্যাবশ্যক।

রাইবেরার পূর্ব্বে (ও সমসময়ে) স্পেইনে এল্ গ্রেকো নামক একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন। এল্ গ্রেকোর প্রকৃত নাম ছিল—ডমেনিকো থিওটকপিওলো (১৫৪৫-১৬১৪)। এঁর জন্মস্থান ক্রীট্ দ্বীপ এবং টিসিয়ানের নিকট তাঁর চিত্রশিক্ষা হয়েছিল। ছাত্র জীবনেই তিনি যশ লাভ করেছিলেন এবং শিক্ষাকাল শেষ হলে, তিনি প্রতিষ্ঠা ও জীবিকার জন্য স্পেইনে আসেন। (গ্রেকোর গুরু টিসিয়ান্ ছিলেন সম্রাটের বন্ধু। টিসিয়ান্ বহুদিন স্পেইনে ছিলেন এবং তাঁর আঁকা ছবি —স্পেইনের ছবির একটি ছোটখাট অধ্যায়।) গ্রেকোর কথায় প্রত্যেকেরই বট্টিচেল্লির কথা মনে হয়।

এল্ গ্রেকো টলেডোতে ষ্টুডিও খোলেন। এবং তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই টলেডো একটি চিত্র-কেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়। ভেনিসে গ্রেকোর অভিনবত্ব বা বা ব্যক্তিত্ব প্রকট হতে পারেনি। টীন্‌টরেট এবং টিসিয়ানের বিরাট ছায়ায় গ্রেকো মুক্ত আলোর স্পর্শলাভে বঞ্চিত ছিলেন।

The character of Toledo, emphatic, rugged unyielding, attractive, but attractive savagely, entered into El Greco's art, and through Toledo his own originality was disengaged. On Spanish soil, he developed a style curiously Spanish in character, Spanish in the depths as much as on the surface."*

থিওটোকোপিওলোর ব্যক্তিত্বের তাড়নায় তাঁর পরিণত কালের চিত্র হ'তে রোমক প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের মিঃ টমাসের ছবির মত নয়—সম্পূর্ণরূপে খাটি স্প্যানিশ্। তাঁর ছবিগুলিতে স্পেইনের একটি বিশেষত্ব অত্যন্ত সুস্পষ্ট—ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গোঁড়ামী। কিন্তু তাঁরই ছবি—"ক্রাইষ্ট ইন্ হিজ্

*"Painters and Painting" by Sir Fredrick Wedmore (Home University Library)

এগোনিজ্ ইন্ দি গার্ডেন"—পর্য্যন্ত "peculiarly Spanish in temper and treatment"। গ্রেকো-চিত্রিত যীশুর মুখ লম্বা এবং ধারালো—যেন একজন স্প্যানিশ্ জমিদার! "ব্যরিয়েল্ অব দি কাউণ্ট ওরগানজা" চিত্রে গ্রেকো বহু টলেডান্ নাগরিককে এঁকেছেন। টলেডোর এই প্রিয় লোকটির মৃত্যুতে টলেডোর দুঃখকে তিনি তুচ্ছ করেন নি। ওরগান্জাকে স্বর্গে নেওয়ার জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে গেছে, দেবদূতেরা এসেছে, সমস্ত আকাশ-বাতাস এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত কিন্তু তারই নীচে অশ্রুমুখ টলেডো—অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই "ব্যরিয়েল্।"

রাইবেরার প্রচার এবং গ্রেকোর অসামান্য সাফল্যে জাতীয় অভিব্যক্তির ফল্গুধারা উচ্ছল হয়ে উঠল। স্পেইনের শিল্প-প্রতিভা অনুকরণ-মুক্ত হয়ে স্বাধীন আকাঙ্ক্ষায় দৃপ্ত হয়ে উঠল। ভ্যালেনসিয়া, সেভাইল, করডোবা, ক্যাষ্টাইল, প্রাডোতে চিত্র-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অভূতপূর্ব্ব উৎসাহে স্পেইন্ আত্মাবিষ্কার করে নিঃশেষে প্রকাশ করতে পারল আপনার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা ও আনন্দ-বেদনার কথা। সে সার্থক সৃষ্টির পথে যাত্রা করল। এই বিজয়যাত্রার পথে সৃষ্ট হল রাইবাল্টা* কুয়েজ, ম্যরিল্লো এবং আরও অনেকে।

(৩)

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ স্পেইনের একটি স্মরণীয় বছর। শুধু স্পেইনেরই নয়—সারা জগতের। এই বছরে ডন্ ডিয়াগো ডি সিল্ভা ই ভেলাজকুয়েজের (১৫৯৯-১৬৬০) জন্ম হয়। "ভেলাজকুয়েজ" তাঁর মাতৃকুলের নাম। কিন্তু এ্যনডুলেসিয়ার প্রথানুসারে তিনি "ভেলাজকুয়েজ" নামই গ্রহণ করেন। কুয়েজ যে শুধু স্পেইনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর—তাই নয়। বিশ্বের পাঁচ জন শ্রেষ্ঠ চিত্রকরের অন্যতম তিনি। কেউ-কেউ বলেন যে শুধু কুয়েজকে জানলেই সমগ্র স্পেইনের চিত্রকাহিনী, বিশেষ করে তার অন্তরের সব বড় সত্যটি, জানা হয়ে গেল। এরূপ বিশ্বাসীদের নিকট স্পেইনের ছবির কথার জন্য ষ্টিভেনসন্-কৃত কুয়েজের জীবন ও আর্টের ইতিহাসই যথেষ্ট।

---

* রাইবাল্টাকে (১৫৫৮ (?)—১৬২৮) নিয়ে অনেকে রাইবেরার সঙ্গে একটু "Comedy of Errors" করে ফেলেন। রাইবাল্টা ভ্যালেন্সিয়ার চিত্রগুরু এবং কিছুদিন রাইবেরাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে তিনি হেরেরার সংস্পর্শে এসে মৃত্যুর পূর্ব্বে জাতীয় জাগরণের সহায়তা করেন।

কুয়েজের পিতা ছিলেন পর্ত্তুগীজ। কুয়েজের জন্মনগরী সেভাইলে হেরেরার নিকট তাঁর প্রথম চিত্রাভ্যাস আরম্ভ হয়। ছোটকাল হতেই স্বভাবতঃ তাঁর প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তাঁর ছোটবেলাকার ছবিগুলি অতিশয় বিস্ময়কর—এতটা যে অন্যান্য শ্রেষ্ঠ প্রতিভার বাল্য-সৃষ্টি তার কাছে অকিঞ্চিকর বলে মনে হতে পারে। কুয়েজ খুব বেশী দিন হেরেরার নিকট থাকেতে পারলেন না। হেরেরা অতিশয় বদমেজাজী মানুষ ছিলেন।

হেরেরার পর কুয়েজ প্যাচেকো নামক অন্য একজন প্রবীণ চিত্রকর ও সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচকের সাকৃরেদ হন। প্যাচেকো গণ্যমান্য লোক ছিলেন এবং তাঁর কন্যার সহিত কুয়েজের বিবাহের পরে তিনি প্রিয় শিষ্য ও জামাতার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রমে সম্মানের আসন গড়ে তোলেন। পচিশ বছর বয়সে কুয়েজ রাজচিত্রকর নিযুক্ত হলেন। রাজা ছিলেন চতুর্থ ফিলিপ—মাত্র আঠার বছর বয়সী। ফিলিপ রসগ্রাহী ছিলেন। কুয়েজের উন্নত চরিত্র, পরিশীলন এবং তাঁর শিল্পী ও কবি-প্রতিভা উভয়ের মধ্যে স্থায়ী ও মধুর আকর্ষণের সৃষ্টি করল।

কুয়েজ ফিলিপের নানা বয়স, সাজসজ্জা ও অবস্থার অনেক প্রতিকৃতি এঁকেছেন : ২৬।২৭টি এখনও বহু অত্যাচার সহ্য করে বর্ত্তমান আছে। এ ছবিগুলি আঁকবার তারিখ অনুসারে পরপর লক্ষ্য করে দেখলে কুয়েজের ক্রমবিকাশের ধারাটি সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। কুয়েজকে বুঝবার বহু পথ বহু লোকে প্রস্তাব করেছে। কিন্তু এর চাইতে সদুপায় আর আছে বলে মনে হয় না।

কুয়েজের জীবনে খুব বেশী বৈচিত্র্য নেই। প্রতিভার মাঝে দুইটি বিভাগ আছে বলে মনে হয়। প্রথম শ্রেণীতে—রাফেল, রুবেন্স, কুয়েজ প্রভৃতি—যাঁদের জীবনে যশ, মান, সুখ, শান্তি সবই আছে। অন্য শ্রেণীতে মাইকেল এঞ্জেলো, ফ্রান্স হালস্, ভ্যান্ ডাইক, গয়া প্রভৃতি। এঁদের জীবনে শান্তি নেই, স্থৈর্য্য নেই —কেবল বিরোধ আর শক্তি পরীক্ষা। প্রতিভার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এটা চোখে পড়ে।

কুয়েজের নাতিদীর্ঘ জীবনে বিরোধ বা শক্তি পরীক্ষার প্রয়োজন সামান্যই ঘটেছে। রাজদ্বারে সম্মান, গৃহে শান্তি, দেশ বিদেশে যশ, মধুর বন্ধুত্ব—সবই তিনি পেয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনি ইটালীতে যেতেন; নিকোলাস্ পুশিন, রাইবেরা, রুবেনস্ প্রভৃতি বিখ্যাত চিত্রকরের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন—সবাই তাঁকে প্রশংসা করে গেছেন মুগ্ধ ভক্তিতে।

জগতের চিত্রসাধনায় কুয়েজের সব চাইতে বড় দান ইম্‌প্রেশনিজম্‌। কুয়েজের ইম্‌প্রেশনিজম্‌ হতেই আধুনিক ম্যাস ইম্‌প্রেশনিজম্‌ প্রভৃতি উদ্ভূত। বস্তুতঃ উপায়ে বৈসাদৃশ্য থাকলেও উদ্দেশ্যের কোনো তারতম্য নেই। নানাভাবে তিনি ইম্‌প্রেশনিজম্‌ সৃষ্টি করতেন। বর্ণ-বিরোধ, সমাবেশের বিশেষত্ব, স্থানের পরিমাপ—এ-তিনটার সব কয়টি বা যে-কোনো একটি বা দুটির সাহায্যে তিনি সুনিপুণ সংস্থানের গুণে ইম্‌প্রেশনিজমের সৃষ্টি করতে পারতেন। এমন দৃষ্টান্ত আছে যে উপযুক্ত ফলের (i. e. impressionism in essence) জন্য তিনি কোনো কোনো ছবিতে একটার পর একটা ক্যানভাস্‌ জুড়ে গেছেন। শুধু space-এর সাহায্যে এমন একান্ত ভাবে ইম্‌প্রেশনিজমের সৃষ্টি বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। স্পেইনের চিত্র সাধনায় ইম্‌প্রেশনিজমের একটি ধারা কারাভাজ্জিও থেকে গয়া পর্য্যন্ত সুস্পষ্টভাবে চলে আসছে। এবং এজন্যই প্যাবলো পিকাসোর জন্ম একমাত্র স্পেইনেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সে-কথা একটু পরে আসছে।

চল্লিশ বছর বয়সে কুয়েজ রঙের বিশেষত্ব সৃষ্টি করেন। সমস্ত যুগ এবং দেশের বড় চিত্রকর মাত্রেই একটি বিশিষ্ট ঢং সৃষ্টি করে থাকেন। "ভেনাস্‌ এবং কিউপিড্‌" ও "দি মেড্‌স্‌ অব অনার"—ছবি দুটির অরিজিন্যাল যারা দেখেন নি—তাঁরা কুয়েজের রঙের বিশেষত্বটুকু সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। লিখে বুঝাতে গেলে কতকগুলি ইংরেজি শব্দ ভিন্ন গতি নেই। শুধু একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক যে কুয়েজ বর্ণ-শক্তি জিনিসটাকে এত আয়ত্ত করেছিলেন যে তাঁর পরিপ্রেক্ষিতের শ্রেষ্ঠত্ব এবং অত্যদ্ভুত aerial effect তা থেকেই সম্ভব হয়েছে। বড় শিল্পীর এখানেই পরিচয়—দু'-তিনটি জানা রং মিশে তার হাতে একটা অপূর্ব্ব অজানা রং সৃষ্টি হয় এবং তারই জন্য সম্ভব হয় একটি অনবদ্য দ্যোতনা যা কোনো "technical excellence" থেকে সম্ভাব্য নয়।

কুয়েজের প্রসঙ্গ আমরা তাঁ'র কয়েকটি ছবির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করে শেষ করছি।

(ক) "সেণ্ট জন্‌ ইন্‌ দি উইল্‌ডারনেস্‌"।—প্রথম দিককার ছবি, কুড়ি বছর বয়সে আঁকা। ছবিটি প্রকাণ্ড বড়। এ ছবিতে বর্ণ-বিন্যাসের পারিপাট্য অসাধারণ। সাধু জন-এর গায়ের রং এক অদ্ভুত স্বর্ণাভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পিছনকার চিত্র-ভূমিতে একখণ্ড জলভারাক্রান্ত কালো মেঘ আলোকিত হয়ে,

সমস্ত ছবিতে একটি "mystic glory" ফুটে উঠেছে। বনের প্রশান্তি যেন এ-আলোকে আরো পরিপূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সাধু জন-এর চেহারায় দেবোপম ললিত রূপ-লাবণ্য নেই।

(খ) "দি মেডস্ অব্ অনার"।— ভেলাজকুয়েজের শ্রেষ্ঠ চিত্রাবলীর অন্যতম। ছবিটির বিশেষত্ব— তৃতীয় আয়তন (depth)। পৃথিবীর আর কোনো চিত্রে (ক্যামেরা আজও এ স্থলে অসহায়), আজ এই fourth dimension-এর দিনেও, এত চমৎকার তৃতীয় আয়তন দেখানো হয় নি। আপনারা এ ছবিটির টেক্‌নিকের সঙ্গে ডা' ভিঞ্চির "শেষ ভোজ" এবং প্যাচার-কৃত "সাধু উলফ্‌গ্যাংগ একটি রোগীকে নিরোগ করছেন" ছবিটির তৃতীয় আয়তনের তুলনা করবেন।

(গ) "সারেণ্ডার অব্ ব্রেডা"

পৃথিবীর অল্প-সংখ্যক বিখ্যাত চিত্রের অন্যতম। ছবির বিষয়ঃ বিখ্যাত স্প্যানিশ্ বীর ও রাজনীতিজ্ঞ স্পিনোলা কর্ত্তৃক ব্রেডা জয়। স্পিনোলার বাঁ হাতে টুপী, ডান হাত বিজিত সেনাপতি জুষ্টিনের কাঁধের উপর। জুষ্টিন স্পিনোলাকে নগর-দ্বারের চাবিটি দিয়ে দিচ্ছেন। স্প্যানিশ্ চিত্রকর জুষ্টিনের মুখে যে গরিমা ও স্বদেশপ্রীতি অঙ্কিত করেছেন--তা অপূর্ব্ব ঔদার্য্যের পরিচায়ক। স্পিনোলার অশ্ব উচ্ছল আনন্দে ছুটতে চাইছে, ডান দিকে স্প্যানিশ্ সেনানী বর্শা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এত জীবন্ত ঐতিহাসিক চিত্র আর নেই। আর ডান দিকের প্রত্যেকটি বর্শাদণ্ড ইম্‌প্রেশনিজমের এক-একটি উচ্চ গৌরবস্তম্ভ।

(ঘ) "রোকেবী ভেনাস"

কুয়েজের একটি অসাধারণ সৃষ্টি। পেগান্ বিষয় নিয়ে কুয়েজের যুগ, বিশেষ করে কুয়েজ, খুব কমই এঁকেছেন। উপরন্তু ভেনাসের মূর্ত্তি এ-ছবিতে বসনাবৃত নয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৪৫,০০০ হাজার পাউণ্ড-ষ্টার্লিং মূল্যে ইংল্যাণ্ড এ ছবিটি কিনেছে।

কুয়েজের প্রতিভার বিস্তারের ইঙ্গিত করবার জন্য তাঁর "টোপার্স" এবং "ঈসপ্" চিত্রদ্বয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। "টোপার্স" তাঁর মধ্যবয়সের শ্রেষ্ঠ ছবি। রিনেসাঁর যুগে যে পেগানিজম্ সাভোনারোলা এবং ইন্‌কুইজিশন কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েছিল, "ভেনাস্" এবং "টোপার্সে"র মারফৎ কুয়েজ তাকে পুন-প্রার্থনা করেছেন। কুয়েজের শেষ পরিণতির শ্রেষ্ঠ প্রতীক-চিত্র হচ্ছে "ঈসপ"।

কুয়েজের ছবি দেখে বলা হয়েছে যে, "We can well forget the Inquisition"। কারণ, তাঁর জীবনের সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির প্রাচুর্য্য তাঁর ছবির জগতে দুঃখের প্রবেশ রোধ করেছে। সেখানে তিনি সৃষ্টি করেছেন এক আনন্দ-লোক।

বিশ্ব কুয়েজের বন্দনা করছে। অথচ তাঁর সৃষ্টি ইটালীয় নয়, ফরাসী নয়, ইংরেজী নয়, বিশেষ করে স্প্যানিশ্। স্পেইনের রাজা, রাজপরিবার, স্পেইনের "মেডস্ অব্ অনার", স্পেইনের যুদ্ধ-বিগ্রহ, গৌরব-অগৌরবের কাহিনী, স্পেইনের "ব্রেডা জয়"—কিন্তু এরই মাঝে স্রষ্টা সার্ব্বভৌমিকতার প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং শুধু তা'তেই করতে পেরেছেন। এটাই স্বাভাবিক এবং একমাত্র সত্য। স্বর্গ থেকে অমৃত আমদানী করে মর্ত্ত্যের লোক অমর হ'তে পারে না। যদি অমরত্ব সম্ভবপর হয়েই থাকে, তবে তা' নিশ্চয় এখানকারই কিছু আস্বাদন ও হজম করে।

ক্রমশঃ

শ্রীঅপরূপ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

ঘর-ছাড়া

তখন একটা রাত ; উঠেছে সে তড়বড়ি
কাঁচা ঘুম ভেঙে। শিয়রে দিয়েছে ঘড়ি
যাত্রার সঙ্কেত নির্ম্মম ধ্বনিতে।
অঘ্রাণের শীতে
এ বাসার মেয়াদের শেষে
যেতে হবে আত্মীয়পরশহীন দেশে,
ক্ষমাহীন কর্ম্মের এসেছে ডাক।
পড়ে থাক্
এবারের মতো
ত্যাগযোগ্য গৃহসজ্জা যত।
জরাগ্রস্ত তক্তপোস কালি-মাখা সতরঞ্চ পাতা ;
আরাম কেদারা ভাঙা-হাতা,
পাশের শোবার ঘরে
হেলে-পড়া টিপায়ের পরে
পুরানো আয়না দাগ-ধরা ;
পোকা-কাটা হিসাবের খাতা-ভরা
কাঠের সিন্দুক এক ধারে ;
দেয়ালে ঠেসান-দেওয়া সারে সারে
বহু বৎসরের পাঁজি ;
কুলুঙ্গিতে অনাদৃত পূজার ফুলের জীর্ণ সাজি।
প্রদীপের স্তিমিত শিখায়
দেখা যায়
ছায়াতে জড়িত তারা
স্তম্ভিত রয়েছে অর্থহারা।

গাড়ি এলো দ্বারে, দিলো সাড়া
প্রবল পরুষ রবে। নিদ্রায় গম্ভীর পাড়া
রহে উদাসীন।
প্রহরীশালায় দূরে বাজে সাড়ে তিন।
শূন্যপানে চক্ষু মেলি'
দীর্ঘশ্বাস ফেলি'
দূরযাত্রী নাম নিলো দেবতার,
তালা দিয়ে রুধিলো দুয়ার ;
টেনে নিয়ে অনিচ্ছুক দেহটিরে
দাঁড়ালো বাহিরে।
ঊর্দ্ধে কালো আকাশের ফাঁকা
ঝাঁট দিয়ে চলে গেলো বাদুড়ের পাখা ;
যেন সে, নির্ম্মম
অনিশ্চিত পানে ধাওয়া অদৃষ্টের প্রেতচ্ছায়া সম।
বৃদ্ধবট মন্দিরের ধারে,
অন্ধকার অজগর গিলিয়াছে তারে।
সদ্য মাটি-কাটা পুকুরের
পাড়ি-ধারে বাসা বাঁধা মজুরের
খেজুরের পাতা-ছাওয়া, ক্ষীণ আলো করে মিটমিট।
পাশে ভেঙে পড়া পাঁজা, তলায় ছড়ানো তার ইট।
রজনীর মসীলিপ্তি মাঝে
লুপ্ত-রেখা সংসারের ছবি,—ধান কাটা কাজে
সারা বেলা চাষীর ব্যস্ততা ;
গলা-ধরাধরি কথা
মেয়েদের ; ছুটি-পাওয়া
ছেলেদের ধেয়ে যাওয়া
হৈ হৈ রবে ; হাট বারে ভোর বেলা
বস্তা-বহা গোরুটাকে তাড়া দিয়ে ঠেলা ;

আঁকড়িয়া মহিষের গলা
ওপারে মাঠের পানে রাখাল ছেলের ভেসে চলা।
নিত্য-জানা প্রাণলীলা না উঠিতে ফুটে
যাত্রী লয়ে অন্ধকারে গাড়ি যায় ছুটে।
যেতে যেতে পথ পাশে
পানা পুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহু দিন-রজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন।
আঁকা বাঁকা গলি
রেলের ষ্টেশন পথে গেছে চলি;
দুই পাশে বাসা সারি সারি।
নরনারী
যে যাহার ঘরে
রহিল আরাম শয্যা 'পরে।
নিবিড় আঁধার-ঢালা আম বাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া স্তব্ধতাকে
শুকতারা দিল দেখা।
পথিক চলিল একা
অচেতন অসংখ্যের মাঝে।
সাথে সাথে জনশূন্য পথ দিয়ে বাজে
রথের চাকার শব্দ হৃদয়বিহীন ব্যস্ত সুরে
দূর হতে দূর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুস্তকপরিচয়

ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)।

সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত (বিশ্বভারতী)।

গত আট ন' বছর ধ'রে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে রবীন্দ্রনাথের যে সমস্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছিল, সেগুলো পুস্তকাকারে গ্রথিত না হওয়া আমাদের পক্ষে ছিল একটা প্রকাণ্ড অভিযোগের বিষয়। সাহিত্যিক বাজারের বর্ত্তমান অবস্থায় গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের বইই আশানুরূপ চলে না—তাই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধও এতদিন অপ্রকাশিত থেকেছে। এ কথা দেশের পক্ষে আদৌ প্রশংসার নয় নিঃসন্দেহ, কিন্তু এ সত্যি কথা। সুতরাং 'সাহিত্যের পথে' এবং 'ছন্দ' প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হ'য়েছেন।

সাহিত্যের পথের 'সাহিত্য ধর্ম্ম' এবং 'সাহিত্যের নবত্ব' প্রবন্ধ দুটি নিয়ে আমাদের দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হৈ চৈ হ'য়েছিল। প্রথম প্রবন্ধটি বিচিত্রায় প্রকাশিত হবার পরই আন্দোলন-আলোড়নের সুরু হয়—তারই ফলে দ্বিতীয় প্রবন্ধের জন্ম। এই দুই প্রবন্ধ এবং সাহিত্যের পথের 'বাস্তবতা', 'সাহিত্য-বিচার', 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধ মূলতঃ আধুনিকতার প্রতিকূলে। এই পাঁচটি প্রবন্ধের বক্তব্য থেকে নির্য্যাস বের ক'রলে, তথাকথিত আধুনিকতা সম্পর্কে কবির একটি সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায়—এবং তা আধুনিকতার সমর্থনে নয়, প্রতিকূলে।

কবি মোটামুটি যা বলেন তা হ'চ্ছে এই যে, যা প্রত্যক্ষ, যা স্থূল, যার উদ্ভব প্রয়োজনে, নয় ত উত্তেজনায়, যার প্রসার ইন্দ্রিয়-সীমায় আবদ্ধ—এমন জিনিষ সাহিত্য নয়। এমন জিনিষ নিয়ে যখন সাহিত্য গ'ড়তে যাওয়া হয়, তখন স্বভাবধর্ম্মেই তা একটা কৃত্রিম জিনিষ হ'য়ে দাঁড়ায়। তার বহিরঙ্গের জৌলুস সাম্প্রতিকের মনোহরণ করে বটে, কিন্তু চিরন্তন মানব-মনের সঙ্গে তার মেলবন্ধন হবার সম্ভাবনা কম। কাজেই বাস্তবঘেঁষা এই আধুনিকতা সাহিত্যকে কোনো ক্রমে জলাচরণীয় রাখলেও, তার আভিজাত্য নষ্টই করছে। এই সঙ্গে কবি একথাও বলেন যে সত্যিকার সাহিত্যের পক্ষে 'বিগত কল্যের' প্রশ্নও যেমন নিরর্থক, 'আজকে'র প্রশ্নও তেমনি অর্থহীন। আজও যা সাহিত্য হ'চ্ছে, তা কেবলমাত্র এনামেল্ করা ফ্যাশানের জোরে নয়—তার অন্তর্সম্পদেরই জোরে। যা এই রসাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, তা হট্টগোল ক'রে যতই বাজার মাৎ করুক, আসলে তা হচ্ছে খেলো জিনিষ!

বলা বাহুল্য একথা প্রতিবাদসাপেক্ষ—কিন্তু একথা ব'ল্‌ছেন এমন কেউ যাঁর প্রতিবাদে লেখনী ধরার মতো শক্তিমান জগতে সুলভ নয়, পক্ষান্তরে সমস্ত জগৎই যাঁকে আধুনিক কালের

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কাজেই এক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবাদ-স্পৃহা স্বভাবতঃই নিরস্ত।

তবু যে কথাটা এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে মনে আসে, তা সসঙ্কোচে ব'লতেও ইচ্ছে হয়। একথাও ঠিকই যে সাহিত্য শুধু বর্ত্তমানের জন্যে নয়—আজকের যে সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাধা-বিঘ্ন কাল তা নাও থাকৃতে পারে। সুতরাং কেবলমাত্র আজকের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে সাহিত্য গ'ড়লে সেটা প্রয়োজন-সাধনের হাজারটা বাস্তব উপকরণের মতোই একদিন বাসী হ'য়ে যাবেই। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ গভীরতর, সুদূরতর হওয়া দরকার। কিন্তু একথাও ত ঠিক যে মানুষের মন একটি বিশেষ বিন্দুতে যুগ যুগ ধ'রে আবদ্ধ থাকে না—তার পরিবর্ত্তন হবেই এবং ভেতরকার এই পরিবর্ত্তন তার বাইরের ফ্যাশান্‌কে বদ্‌লে দেবে, নয় ত বাইরের বহুবিধ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া তার ভেতরকে আলোড়িত ক'রবে। এ না হ'লে গুহা-বাসের অন্ধকার থেকে মানুষের মুক্তিই ছিল না কোনো দিন। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ-বিপর্য্যয়কে অস্বীকার করা হয়ত সঙ্গত হয় না—কারণ যেটাকে বিপর্য্যয় বলা হ'চ্ছে সেটা যে কেবলমাত্র ফ্যাশানের খাতিরেই জন্মেছে তা ত নয়—তার ঐতিহ্য ঘটনাক্রমে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে, তার পক্ষে এই বিপর্য্যয়ই হ'য়েছে অনিবার্য্য। তাছাড়া এটা বিপর্য্যয়ই বা কেন?

• প্রকাশ্য রাজপথে যে কেবলমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে চীৎকার করে সে হয়ত উপহাসাস্পদ কিন্তু দস্যুহস্তে হৃত-সর্ব্বস্ব হ'য়ে যে চীৎকার করে, তার কি চীৎকারের সঙ্গত অধিকার নেই? হয়ত নিস্তব্ধতা তার পক্ষে শোভনতর নাগরিকতার পরিচায়ক হ'ত—কিন্তু মানুষের হৃদয়-ধর্ম্মের তা ঘোরতর পরিপন্থী। তথাকথিত আধুনিকতা এই হৃদয়-ধর্ম্মের অকুণ্ঠ অনুগমনকে বড় ক'রে দেখছে এবং এখানেই তার ভূতপূর্ব্বের সঙ্গে বিরোধ। এ-বিরোধের মীমাংসা হয়ত কোনো দিন হবে—কিন্তু সেদিন আমরা কোথায় থাক্‌বো?

আধুনিকতার অজুহাতে অনেক মেকী জিনিষও মাথা তুলেছে সন্দেহ নেই এবং তাদের পরমায়ুও যে সীমাবদ্ধ সে কথাও নিশ্চিত। কিন্তু তারই সঙ্গে এমন জিনিষও হয়তো আস্‌ছে, যার স্থিতি সন্দেহের অতীতও হ'তে পারে।

একথা বলার সাহস হয় না। তবু যে যুগে আমরা বেঁচে আছি, তার ঐতিহ্যকে নস্যাৎ ক'রতেও আমাদের কষ্ট হয়। আমাদের ক্রিয়া-কর্ম্মে, চিন্তা-চেষ্টায়, দর্শনে-বিজ্ঞানে আজ পূর্ব্ব-তনের সঙ্গে একটা স্পষ্ট বিরোধ হ'য়ে গেছে। একপারে তাঁরা, আরএক পারে আমরা—মধ্যে মহাসমর, যা শুধু জগতের ভৌগলিক সংস্থানকেই পরিবর্ত্তিত করে নি, নৈতিক ও তার আনুষঙ্গিক সামাজিক এবং সাহিত্যিক সংস্থানকেও উল্টে পাল্টে দিয়েছে। এর পর অতি-প্রাকৃতের দিকে, সুন্দরের দিকে মানুষের সমগ্র দৃষ্টি থাকাই কঠিন। কিন্তু তাই ব'লেই এটা হেয় নাও হ'তে পারে।

অবশ্য মানুষের মনে সুন্দরের ক্ষুধা, অতি-প্রাকৃতের ক্ষুধা থাকেই—আজকের লক্ষ

বিক্ষোভের মধ্যেও তা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে মানুষ অন্যবিধ ক্ষুধাগুলোকেও সম্মান ক'র্‌ছে··· সমান মাত্রায় ক'র্‌ছে, নূতন ব'লে হয়ত একটু বেশী করেই ক'র্‌ছে। এ সুন্দরের ধারাবাহিকতা থেকে অসুন্দরের সাময়িকতায় ইচ্ছে ক'রে লাফিয়ে পড়া নয়—এ একটা নূতন দৃষ্টি—হয়ত রস-দৃষ্টিই। কবিও এ কথা স্বীকার ক'রেছেন, কিন্তু কুণ্ঠিত ভাবে।

বস্তুতঃ যন্ত্র-বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসার যেমন মানুষকে বহুবিধ প্রাকৃতিক বাধার উপর দিয়েছে অক্ষুণ্ণ আধিপত্য, তেমনই মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান এবং দর্শনের নবতন দৃষ্টি তার জীবনাদর্শকেও আমূল ঢেলে সাজিয়েছে। এই ভেতর-বাইরের যুগপৎ পরিবর্ত্তনের মাঝখানে থেকে তার সাহিত্যিক আদর্শ অপরিবর্ত্তিত থাক্‌তে পারে নি—তা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু এর ফলে সাহিত্যের প্রাণ-সম্পদ বৃহত্তর পরিণতির মুখেই আস্‌ছে কিনা, কে জানে? কারণ, যতদূর দেখা যায়, তাতে একে ষোলো আনা সাময়িক আখ্যা দেওয়ার উপায় নেই। কুঙ্কুম, কাজল, দুকূল-বসন এবং মঞ্জীরের স্থানে রুজ্, পাউডার, ব্লাউজ, হাইহিলের পত্তনের মতো এটা নিতান্তই বাইরের বদল নয়—এর মূল মানুষের অন্তরের গভীরতর স্তরে বিসর্পিত। তবু কবির কাছে আমরা অনুযোগ ক'র্‌তে পারি মাত্র—অনধিকারী লেখনীর অসংযত কালিমা উদ্‌গার এ-বিতর্কের প্রয়াস নয়। সে ধৃষ্টতা আর যারই থাক, বর্ত্তমান লেখকের নেই।

সাহিত্যের পথের অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলো যেমন 'সত্য ও তথ্য' 'সৃষ্টি', 'সাহিত্যতত্ত্ব' কবির কাব্যাদর্শের স্বকৃত ভাষ্যস্বরূপ। রচনার মনোহারিত্বে, প্রকাশের বৈশিষ্ট্যে এগুলির উৎকর্ষ 'প্রাচীন সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্যে'র চেয়ে কম নয়। কিন্তু এ প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন হয় নি—তার কারণ, এদের বক্তব্য সাহিত্যের পাঠকের সুপরিচিত। বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের এগুলি হ'চ্ছে ইতিবাচক ব্যাখ্যা এবং পূর্ব্বে যে প্রবন্ধগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা ক'রেছি, তা হ'চ্ছে নেতিবাচক ব্যাখ্যা। এ দুই-ই রবীন্দ্রনাথকে—তাঁর সমগ্র সাহিত্যকে—বুঝ্‌বার পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

দ্বিতীয় বই 'ছন্দে' বিভিন্ন সময়ের লেখা ছন্দ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি গ্রথিত হ'য়েছে। তার মধ্যে 'সঙ্গীতের মুক্তি' প্রবন্ধটি সবুজপত্রে বেরিয়েছিল—এবং রবীন্দ্রনাথের বহু-আলোচিত রচনাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম। প্রবন্ধটির রচনা-পারিপাট্য বিশেষ ক'রে লক্ষ্য ক'র্‌বার বিষয়—কিন্তু এর আলোচ্য বিষয় নিয়ে অব্যবসায়ীর কোনো কথা না বলাই ভালো। অবশিষ্ট ছন্দসম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ—কিন্তু নীরস তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই সেগুলো লেখা নয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে সাধারণতঃ যে-ছন্দোবিচার স্থান পেয়ে থাকে, তা গণিতের এলাকায় এসে পড়ে। তাতে পর্য্যায় নির্ণয়ের কতকগুলো বাঁধা ফরমিউলা খাড়া ক'রে সেই অনুপাতে গোণাগুন্তি হিসাবে ছন্দের প্রকৃতি বিচার হ'য়ে থাকে। সে জিনিষ তাই থাকে ছাত্রদের দপ্তরভুক্ত—বিদ্যালয়ের বাইরে তা অবিমিশ্র করুণারই উদ্রেক্ ক'রে থাকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছন্দ-বিচারও যে সাহিত্যই হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? পণ্ডিত

মশায়রা হয়ত ব'ল্‌বেন—এ হ'ল না, কিন্তু আমরা ব'ল্‌বো—এই হ'ল ; এর আগে কিছুই হয় নি। বস্তুতঃ বাংলা ছন্দের জাতি ও গোত্র বিচারের অধিকার, বাংলা সাহিত্যের সর্ব্ব-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির চেয়ে কারুরই বেশী নয়। অবশ্য ইতিপূর্ব্বে যাঁরা বহুবিধ কেতাবী বিতর্কের সূত্রপাত ক'রেছিলেন, তাঁরা কাজের কাজই ক'রেছিলেন—কিন্তু সমস্ত বিতর্কের পরও, একটা কথা থেকে যায়—তা হ'চ্ছে এই যে, ছন্দের বিচার কানে, চোখেও নয়, আঙুলেও নয়। এই কান কবির চেয়ে কারুরই বেশী সজাগ নয়—সুতরাং বাংলা ছন্দের বিচারে তাঁকেই আমরা authority ধ'র্‌বো, অধ্যাপক মশায়দের নয়।

'ছন্দের অর্থ', 'ছন্দের মাত্রা', 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'—এই তিনটি প্রবন্ধে কবি বাংলা ছন্দকে মূলতঃ ক' পর্য্যায়ে ভাগ করা যায়, তাই নিয়ে আলোচনা ক'রেছেন। বলা বাহুল্য বাংলা ছন্দ-বিচারে পয়ার, ত্রিপদী, অমিত্রাক্ষরের হিসাব রাঢ়ী-বারেন্দ্র বিচারের মতো—ব্রাহ্মণ-কায়স্থ বিচার একটু সূক্ষ্ম · সেটা অক্ষরমূলক, কি মাত্রামূলক, কি স্বরমূলক···তাই হ'চ্ছে বিশেষজ্ঞের বিচার। এ বিচারে কবি যে কোনো নূতন কথা ব'লেছেন তা নয়—তবে যে সমস্ত কথা আজ তাঁর লেখা প'ড়েই পুরানো মনে হ'চ্ছে, তাঁর পূর্ব্বে কেউ তা আমাদের ধরিয়ে দেয় নি। 'ছন্দের হসন্ত হলন্তে'র দু' এক জায়গা সম্বন্ধে বর্ত্তমান লেখকের নিজের কিছু বক্তব্য ছিল—কিন্তু মাসিকপত্রের নিরূপিত গণ্ডী বোধ হয় এর মধ্যেই ছাড়িয়ে গেছি।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

World Population—by A. M. Carr-Saunders (Oxford).

Population Movements—by Robert R. Kuczynski (Oxford).

The Struggle for Population—by D. V. Glass (Oxford).

Population Theories and their application with special reference to Japan—by E. F. Penrose (Ford Research Institute, Standford University, California).

Migrant Asia—by Radhakamal Mukherjee (The International Institute of Population, Rome).

গত কয়েক বৎসরে পৃথিবীর জনসাধারণের ভেতর, এমন কি ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও লোকতত্ত্ব জানবার স্পৃহা ছড়িয়ে পড়েছে। বিস্তর বই, প্রবন্ধ, রিপোর্ট বেরিয়েছে। নানা সভাসমিতি স্থাপিত হয়েছে, আলোচনার শেষ নেই। তত্ত্বের দিক থেকে optimum অর্থাৎ শ্রেয়-সংখ্যার ধারণা প্রতিষ্ঠান ও হিসেবের দিক থেকে নতুন অঙ্কের পত্তন এই কয়েক বৎসরের আলোচনারই দান। সকলে ভাবছেন কি করা উচিত। কেউ বলছেন, পৃথিবীতে লোক-সংখ্যা বেড়েই চলেছে, জন্মশাসন, এমনকি জন্মরোধ ভিন্ন উপায় নেই। অন্যদল

বলছেন, তার প্রয়োজন ত' নেই-ই, বরঞ্চ তাতে নানা প্রকার ক্ষতি হবে, তার বদলে হয় কুটীর-শিল্প না হয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, নেহাৎ না হয় যে-দেশে অপেক্ষাকৃত লোকের ভিড় কম সেই দেশে অবাধে বসবাস করবার বাধা তুলে দেওয়াই ভাল, এবং এ-দুটি পন্থা গ্রহণ করলেই লোক-সমস্যার নিরাকরণ হবে। কিন্তু শিল্পের উন্নতি কিংবা ভিন্ন দেশের আইনের বাধা তুলে দেওয়ার চেয়ে, কিংবা নতুন দেশ জয়ের পর বসবাসের উপযোগী করার চেয়ে জন্মশাসন আজ-কালকার বাজারে বেশী সস্তা ও সোজা। তাই, অন্ততঃ, ভারতবর্ষ, জাভা, চীন, মলয় ভিন্ন অন্য সব দেশেই, অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, নরওয়ে, সুইডেন, এমনকি জাপানেও জন-সাধারণে কম বেশী জন্মশাসনের নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। ইয়ুজেনিষ্ট, ধার্ম্মিক ও শাসক সম্প্রদায় আজ তাই ভীত ও সন্ত্রস্ত। জীবতাত্ত্বিক, ক্যাথলিক, হিন্দু, মুসলমান, ফ্যাশিষ্ট, নাৎসী সকলেই আজ জাতীয় আত্মহত্যার বিপক্ষে, কেউ বা ধর্ম্মের জন্য, কেউ বা দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য। অন্যদিকে উন্নতিশীল মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর গোষ্ঠী নিতান্ত ছোট হয়ে আসছে, না বুঝে তাঁরা নতুন-কিছু করতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ভাবের বশে মানুষ অনেক কাজই করে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ও মানুষ, তাঁরাও ভাবমুক্ত নন সকলেই জানেন, কিন্তু এই লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে যত কুসংস্কার বিদ্যমান অমন অন্য কোনো বিষয়ে আছে বলে আমার জানা নেই। অথচ লোক-সংখ্যার হার-বৃদ্ধিটা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন-মরণের ব্যাপার; তাই তার বৈজ্ঞানিক বিচার একান্ত কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত পাঁচখানি বই এ কুসংস্কার ও ভাববিলাসের অভাব এবং ন্যায়সঙ্গত আলোচনা লক্ষ্য করেছি এবং সেই জন্য গোটাকয়েক সিদ্ধান্ত পরিচয়ের পাঠকবর্গের কাছে উপস্থিত করছি।

গোড়াতেই বইগুলির মোটামুটি একটা বিবরণ দিই। প্রথম বইয়ের বাইশটি অধ্যায়ে লোক-সংখ্যার ইতিহাস, এবং বিশেষ করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম ও মৃত্যুহারের বিবরণ, বর্ত্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ অত্যন্ত সহজভাবে আলোচিত হয়েছে। কুসিন্‌স্কি প্রধানতঃ সংখ্যা-তাত্ত্বিক। তিনি অনেক খুঁজে ও অনেক ঘেঁটে মৃত্যুহার ও জন্মহারের প্রকৃত সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন, বিশেষতঃ দুটি হারের হ্রাসের তাৎপর্য্যটুকু। গ্লাস্-এর কাজ অন্য ধরণের। তিনি দেখাচ্ছেন ছোট গোষ্ঠীকে কি ভাবে জার্ম্মানী, ইটালী ও ফ্রান্সে বড় গোষ্ঠীতে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে ও তার ফলে বিশেষ কিছুই হচ্ছেনা। পেনরোজের বই-এর প্রথমাংশে আছে লোকতত্ত্বের মতামত আলোচনা, বিশেষতঃ শ্রেয়-সংখ্যার, এবং শেষাংশে জাপানের লোক-বৃদ্ধি সম্পর্কে মাথা-পিছে সবচেয়ে বেশী গড়পড়তা আয়ের দ্বারা শ্রেয়-সংখ্যা নির্দ্ধারণের চেষ্টার ত্রুটি দেখানো। লোকের মঙ্গলই তাঁর শ্রেয়সংখ্যার কষ্টিপাথর, কেবল আয়-বৃদ্ধি নয়। রাধাকমল বাবুর উদ্দেশ্য এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অর্থাৎ ভারতবর্ষ, চীন, মলয় দ্বীপপুঞ্জে লোকাধিক্য দেখানো এবং পৃথিবীর কাছে জোরে বলা যে যতক্ষণ না অপেক্ষাকৃত কম ঘন দেশে, যেমন অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, আমেরিকায় 'কালা আদমী'দের প্রবেশাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে ততদিন পৃথিবীর কোনো মঙ্গল নেই।

এ-টুকু পরিচয়পত্র মাত্র। সমালোচনার জন্য আমি বইগুলির বক্তব্যগুলিকে অন্যভাবে সাজাচ্ছি। সভ্যজাতির মধ্যে লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির দিক থেকে বেশ একটি ভাগ চোখে পড়ে। একধারে আয়র্লণ্ড, চীন, ভারতবর্ষ, মলয় দ্বীপপুঞ্জ এবং অন্যধারে বাকী সব। অবশ্য সব দেশেই প্রায় জনসংখ্যা কিছু না কিছু বাড়ছে, রাশিয়ায় ভয়ানক বেশী, ফ্রান্সে খুব কম এবং ভারতে ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩১ পর্য্যন্ত বছর পিছু শতকরা, ১·০১৫, যে-হার জাপানের চেয়ে অল্প ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তুলনায় অর্দ্ধেকেরও কম। পার্থক্য তবু আছে, এবং সেই পার্থক্যই মারাত্মক। কুসিনস্কির পূর্ব্বে এই পার্থক্যের গুরুত্ব কারুর চোখে ধরা পড়েনি। আয়র্লণ্ড, ভারতবর্ষ, চীন, জাভায় লোক সংখ্যা বাড়ছে প্রাধানতঃ মৃত্যুহার হ্রাসের জন্য, জন্মহারের কম-বেশীতে এ-সব দেশে এখনও কিছু আসছে যাচ্ছে না। বাকি সব দেশে নানা কারণে স্বাস্থ্যোন্নতির কৃপায় মৃত্যুহার এক রকম প্রায় অচল এবং জন্মহার যে-ভাবে কমছে তার ফলে লোক-সংখ্যা এমনকি পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ভীষণভাবে কমতে বাধ্য। বিশেষতঃ পশ্চিম য়ুরোপেরই বিপদ আসন্ন, অথচ সে দেশের লোকেরা আজও বিপদ সম্বন্ধে অচেতন; কারণ মৃত্যুহারের চেয়ে জন্মহারের আধিক্য এখনও সঙ্কটকে আচ্ছন্ন রেখেছে। চীন, ভারত ও মলয়-দ্বীপপুঞ্জের ভবিষ্যৎ বিপরীত দিকে। এখানকার বিপদ এই যে সামাজিক সংস্কার সাধনের সঙ্গে সঙ্গেই লোক সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাবে। আগে থেকেই এখানে লোক পিছু চাষের জমির আয়তন কম ছিল, চাষবাসের উন্নতিও ইতিমধ্যে হয় নি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পেরও অবস্থা তদ্রূপ। গত কয় বৎসরে দেখা গিয়েছে যে, চাষের জমির ওপর লোকের নির্ভরশীলতা বেড়েই যাচ্ছে। অর্থাৎ অতিরিক্ত লোক সংখ্যার ওপর আরো বাড়লে এ-সব অঞ্চলে জন্ম-শাসন ছাড়া উপায় নেই। আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

পশ্চিম য়ুরোপে যে ১৮৭৬ সালের পর দ্রুতভাবে জন্মহার কমছে তার প্রধান কারণ ইচ্ছাকৃত জন্মশাসন। তার ফল বেশী খারাপ হ'ত না কারণ মৃত্যুহার আরো কমেছিল, যদি না জন্মহার-হ্রাসের দ্বারা specific fertilityর হ্রাস হত। কথাটির অর্থ এই :- বিবাহ-বন্ধনের মধ্যে ও বাইরে যত শিশু একটি বিশেষ বয়সের মেয়েদের কোলে জন্মলাভ করে, সেই শিশু-সংখ্যার সাথে সেই বয়সের সমাজে যত বিবাহিত ও অবিবাহিত মেয়ে আছে তার অনুপাত। মেয়েদের একটি বিশেষ বয়স—এইটাই প্রধান কথা। আদমসুমারিতে সাধারণতঃ পঞ্চ বার্ষিক কিংবা দশমবার্ষিক ভাবে বয়সের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। এই থেকে বৎসরানুসারে হিসেব সম্ভব। এখন কুসিনস্কি দেখাচ্ছেন যে যে-সব কারণে মোটামুটি (crude) জন্মহার বাড়ে কমে, যেমন বিবাহ-সংখ্যা, বিবাহের বয়স ইত্যাদি তার একটাও পশ্চিম য়ুরোপে specific fertility কমবার জন্য দায়ী নয়। দায়ী হল জন্মশাসনের জন্য net reproduction rate-এর কমতি। ছবি এঁকে এই হার বোঝানো যায়। তার বদলে আমি গোটা কয়েক সংখ্যা সাজাচ্ছি। বোঝাবার জন্য সংখ্যা কাল্পনিক ও সমস্যাকে সোজা করা হল।

বয়সের শ্রেণী।	প্রত্যেক পঞ্চবার্ষিক বয়স্কের হাজার মেয়ে পিছু মেয়েদের শিশু-কন্যার জন্ম-সংখ্যা।	প্রত্যেক হাজার জন্মানো মেয়ের মধ্যে যে কয়টি বেঁচেছে।	জীবিত যে কয়টি মেয়ের দ্বারা আজকার মেয়েদের সংখ্যা পরিপূর্ণ হচ্ছে।
১৫-১৯	১০০	৮০০	৮০
২০-২৪	৪০০	৭৫০	৩০০
২৫-২৯	২০০	৭০০	১৪০
৩০-৩৪	১৫০	৬৫০	৯৭.৫
৩৫-৩৯	১০০	৬০০	৬০
৪০-৪৪	৫০	৫৫০	২৭৫
সাধারণতঃ মেয়েদের উর্ব্বরতা এর পর থাকে না। শেষ বয়সে কমতেই থাকে।	১০০০		৭০৫

এখানে হাজার মেয়ে ৭০৫ মেয়ের দ্বারা পরিপূর্ণ হচ্ছে। এটা হল gross reproduction rate। এটা কেবল সাধারণ উর্ব্বরতার দিক থেকে। কিন্তু হাজার মেয়েদের মধ্যে মা হ'বার পূর্ব্বেও অনেকে মরে। অতএব সমগ্র লোকসংখ্যার সঙ্গে পরিপূরণের অনুপাত যদি বার করতে হয় তবে মৃত্যুহারকেও ধরতে হবে। কাল্পনিক দৃষ্টান্তে আমরা দেখলাম যে এক হাজার মা ৭০৫ স্ত্রী সমাজকে দিলেন, অতএব এই হিসাবে net reproduction rate হল '৭০৫। এই হার একের কম হলে বুঝব যে জন্মসংখ্য মৃত্যুসংখ্যার চেয়ে বেশী হলেও সমাজের সংখ্যা পূরণ হচ্ছে না। সমগ্র পশ্চিম য়ুরোপের এই সংখ্যা একের কম। একক হলে জোর বলা যায় যে লোক-সংখ্যা আপাততঃ স্থায়ী আছে ও অল্পদিন থাকবে। কিন্তু তার কম হলে, প্রথমে ধরা না পড়লেও শীঘ্রই দেশের লোক-সংখ্যা ভীষণ ভাবে কমবে, কারণ আজ যদি এই হার কম হয় তবে পনেরো বছর পর থেকেই ১৫ থেকে ৪৫ বছরের মেয়েদের সংখ্যা সমগ্র লোক-সংখ্যার অনুপাতে কমতে বাধ্য। তখন সন্তানের হার আরো সুড় সুড় করে নামবে। অতএব অন্ততঃপক্ষে গোষ্ঠী পিছু চারটি সন্তান হওয়া চাই, নচেৎ একশ বছরে পশ্চিম-য়ুরোপের লোক-সংখ্যা অর্দ্ধেকেরও বেশী কমে যাবে।

ভারতবর্ষ, চীন, মলয় সম্পর্কে এই অঙ্ক থেকে কিছুই বলা যায় না, কারণ এ-সব দেশে মেয়েদের সন্তানবতী হবার বয়স লেখানো হয় না। বছর পনেরো ধরে তাঁরা প্রায় কুড়ি-একুশ থাকেন, তারপর হঠাৎ ত্রিশ, তারপর হঠাৎ পঞ্চাশ-ষাট, তারপর আশি-নব্বই! মার্ক টোয়েনের ব্যাঙের মতন ভারত-ললনার বয়স অগ্রসর হয়।

য়ুরোপের সব রাষ্ট্রই এখন নানা কারণে বৃহৎ গোষ্ঠীর পক্ষপাতী। গ্লাসের কৃতিত্ব ভিন্ন-দেশের উপায়-বিচারে। ছেলে পুলে বাড়লে মজুরদের পারিশ্রমিক বাড়ানো, বিবাহের জন্য টাকা

ধার দেওয়া, ট্যাক্স কমানো, নবদম্পতির বাড়িভাড়া গাড়িভাড়া কমানো, গ্রামে জমি দেওয়া থেকে অবিবাহিতের উপর ট্যাক্স বসানো কিছুই বাদ পড়েনি। তা ছাড়া হিটলার, মুসোলিনির উৎসাহ ত' আছেই। কিন্তু তার ফলে, গ্লাস দেখাচ্ছেন, ফ্রান্স, ইটালি ও বেলজিয়মে জন্মহারের পতন আটকানো যায় নি। ১৯৩৪ সালে জার্ম্মানিতে অবশ্য পূর্ব্বের দুতিন বছরের চেয়ে শিশু-সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু সে বৃদ্ধি প্রায় নিরর্থক—কারণ, গর্ভপাত-নিবারণের আইন রুজু হওয়ার ও অগ্রিম ধার দেওয়ার ফলে মাত্র প্রথম সন্তান বিবাহের প্রথম বৎসরের মধ্যেই জন্মাচ্ছে, পরে সেই হার বজায় থাকবে কিনা কেউ বলতে পারে না। জার্ম্মানিতে লোক-সংখ্যা পরে বজায় রাখতে এবং বাড়াতে হলে গোষ্ঠী পিছু চারটি থেকে পাঁচটি শিশু জন্মানো দরকার। তা ছাড়া, জার্ম্মানিতে আজ অস্ত্র শস্ত্র ব্যবসার উন্নতির জন্য পূর্ব্বের আর্থিক দৈন্য কিছু কমেছে, সেই জন্যই হয়ত বিবাহের সংখ্যা বেড়েছে। অতএব রাষ্ট্রপদ্ধতির গুণাগুণ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত মন্তব্য করা চলে না।

কি করা উচিত? এইখানে কুসিন্‌স্‌কির সঙ্গে কার-সণ্ডার্স ও গ্লাসের পার্থক্য। ১৯৩৫ সালে কুসিন্‌স্‌কি বলেছিলেন যে দেশের অর্থ বড়লোকদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সেইজন্য সমাজের অর্থ যথাযথভাবে বিভক্ত নয়, তাই যতক্ষণ না সেই অর্থের ওপর জনসাধারণের অধিকার সুবিস্তৃত হয় ততদিন এই সমস্যার পূরণ হবে না। কার-সণ্ডার্স অবশ্য ইংরেজ, তাই অতিশয় সাবধানী ব্যক্তি। তিনি চান প্রোপাগ্যাণ্ডা, আদমসুমারির বিশুদ্ধ হিসেব, আর গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, যাকে social services বলে সেই দিকে। বিপ্লব তিনি চান, তবে মনের। একস্থানে তিনি বলেছেন পশ্চিম য়ুরোপে আর্থিক অবস্থার সঙ্গে জন্মহারের হ্রাসের সম্বন্ধ মোটেই সদর্থক নয়। সেদিনকার স্পেকটেটারে তরুণ অর্থনৈতিক মিঃ হ্যারড্ লিখেছেন যে আজ বড় বড় কথা বলে লাভ নেই, মাতৃত্বের বয়স যেন প্রথমেই রেজেষ্ট্রি করা হয়। আমার বিশ্বাস মানসিক পরিবর্ত্তন আর্থিক পরিবর্ত্তনের ওপর আজকাল অন্ততঃ নির্ভর করে।

রাধাকমল বাবুর বইখানির মূল্য অন্য দিক থেকে বুঝতে হবে। তিনি একটি বিশেষ কোনো দেশ ধরেন নি, একটি ভৌগলিক পরিবেশ (region) ধরেছেন। স্থানটি হল এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ। এ-অঞ্চলের লোক সংখ্যা ও খাদ্য-সংস্থানের গোটাকয়েক মূলসূত্র আছে, (এ-কথা কার-সণ্ডার্সও স্বীকার করেন)। ৫০ লক্ষ বর্গমাইলে, অর্থাৎ পৃথিবীর শতকরা চার অংশে ৯০০০ লক্ষ অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোক বসবাস করে। এই সব লোকেদের basal metabolism য়ুরোপীয়ান ও আমেরিকানের অপেক্ষা শতকরা ১০।১৫ ভাগ কম বলে, এবং তাদের নীচু ভিজে জমিতে চাষবাসের অভিজ্ঞতা থাকার দরুণ তারা উপযোগী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করবার যোগ্য। তারা করছেও বটে, যেখানে সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু 'সাদা আদমী'রা সুবিধা দিচ্ছে না। এ-সব দেশে ভিড় জমেছে, জন্মহার খুব বেশী, মৃত্যুহারও বেশী, লোক-সংখ্যা বেড়েই চলেছে, চাষ-বাস ছাড়া লোকেদের খাবারসংস্থান নেই, কাঁচামালের যোগান দেওয়াই

তাদের ব্যবসা, এবং তাদের জীবনযাত্রা নিতান্ত নিচুস্তরের। য়ুরোপীয়ানদের ৩৪% য়ুরোপের বাইরে, এ-অঞ্চলের মাত্র ২০%। বর্গমাইল পিছু এ-অঞ্চলের লোক-সংখ্যা ১৮০, জাপানের ৪৪১, চীনদেশে ১৯৩, ভারতে ১৯৫, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ায় ২·২, নিউজিলাণ্ডে ১৪, ক্যানাডায় ২৯, যুক্তপ্রদেশে ৩৭·২,। এ-দেশের মাথাপিছু চাষ জমির আয়তন গড়পড়তা এক একরের কাছে। সেই ছোট্ট জমি থেকে অন্যদেশের তুলনায় বেশী লোকের অন্ন-সংস্থান হলেও ব্যাপারটা সংখ্যাতিরেকেরই চিহ্ন। তাই রাধাকমল বাবু লোক-সংখ্যার, কাঁচামাল ও খাদ্য-সংস্থানের সুব্যবস্থার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্ল্যানিং প্রস্তাব করছেন। এশিয়াবাসীর প্রতি অবিচারের তীব্র প্রতিবাদ হিসেবেও বইখানির সার্থকতা অত্যন্ত বেশী।

সমালোচনা দীর্ঘ হলো, তবু বইগুলির সমস্যার প্রতি সুবিচার করতে পারলাম না। ভারতবর্ষের শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি লোকতত্ত্বের প্রতি আজ আকৃষ্ট হচ্ছে। এটি নিতান্ত সুখের কথা। লোকসংখ্যার বৃদ্ধিকে আমি দেশের সর্ব্বপ্রথম সমস্যা বলি না, কিন্তু একটি প্রধান সমস্যা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই। সে যাই হোক, ভারতবর্ষের সমস্যা নিজস্ব, আর্থিক উন্নতির জন্য অতিশীঘ্র উপায় না আবিষ্কৃত হওয়া পর্য্যন্ত জন্মশাসনই এখনকার বিধান। এডিংটন জীনস্ পড়ে হিন্দু দর্শনের সমর্থন করার মতন কেউ যেন কার-সণ্ডার্স, কুসিন্‌স্কি গ্ল্যাস পড়ে হিন্দুসমাজের অবাধবৃদ্ধি কামনা না করেন। বিদেশী সমস্যার পরিচয় দেবার এই মস্ত বিপদ এ-দেশে। পণ্ডিতবর্গকে এই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লোকতত্ত্বের আলোচনায় আহ্বান করাই আমার সমালোচনার উদ্দেশ্য।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

Look, Stranger !—by W. H. Auden (Faber & Faber)
Ascent of F6—by Christopher Isherwood & W. H. Auden (Faber & Faber)
More Poems—by A. E, Housman (Jonathan Cape)

সমরোত্তর ইংরেজী কবিতায় ১৯২৮-২৯এর পরে একটি পরিবর্ত্তন এসেছে। মহাযুদ্ধ এবং এলিয়ট, অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং অডেন প্রমুখ কবি, মোটামুটি এই ভাবে অতি-আধুনিক ইংরেজী কবিতাকে দেখতে পারি। এলিয়টের হতাশায় আর কঠিন অবিশ্বাসে, তাঁর শবযাত্রার গানে একপুরুষের জীবনদর্শন সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, আজ পর্য্যন্ত তিনি ইংরেজী সাহিত্যে আমাদের শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি। কিন্তু এই জীবনদর্শন যে পুরুষানুক্রমে চলতে পারে না, অডেন ইত্যাদির কবিতা তারই প্রমাণ এবং যে পরিবর্ত্তন আজকাল সাহিত্যে লক্ষিত হচ্ছে তার পিছনে বিশেষভাবে রয়েছে অর্থনৈতিক সঙ্কটের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া।

আধুনিক কবিতায় বিশ্বাসের প্রশ্ন উঠলে এলিয়টের শেষের দিকের পরিণতির কথা অনেকেই উল্লেখ করবেন। অধুনা তিনি ব্যক্তিগত পরিত্রাণে বিশ্বাস করেন বটে, কিন্তু 'ফাঁপা মানুষের' ভবিষ্যতে কোনো আস্থা তাঁর নেই। এইখানে এলিয়টের সঙ্গে অডেন প্রমুখ কবিদের মতান্তর সুস্পষ্ট। যুদ্ধের পরে যে-ফাঁপা সম্প্রদায়ের ছবি এলিয়ট এঁকেছিলেন, তার পর্য্যায়ে জনসাধারণ পড়ে না, কারণ, ফাঁপা হাওয়াটা surplus value-রই লক্ষণ এবং সেটা পাবার সুযোগ অধিকাংশ লোকেরই ঘটে না। মানুষের ভবিষ্যতে এলিয়টের অবিশ্বাস এবং অডেনের কম্যুনিষ্ট জীবনদর্শনে মূলগত পার্থক্য আছে। সেই জন্য Ascent of F6-এর যেখানে যেখানে Sweeny Agonistes-এর ধ্বনি প্রতিধ্বনি আছে সেখানেও অডেন ও ইসারউডের তীক্ষ্ণ সহানুভূতির পরিচয় পাই।

১৯২৯-এর অর্থনৈতিক সঙ্কট জীবনে ও সাহিত্যে যে আলোড়ন এনেছে, Look, Stranger !-এ তা সুস্পষ্ট। অবিশ্বাসের নিশ্চিন্ত খোলসে চিরদিন বসবাস করা যায় না, বাইরের পৃথিবী বিপুল ও প্রবল। সামাজিক জীবনে সংঘাতের, অনাচারের বিশিষ্ট উপলব্ধি অডেনের লেখায় আছে এবং ইংরেজী সাহিত্যে এই বেদনাবোধ ও সহানুভূতির প্রয়োজন ছিল। আমাদের অনেককেই Waste Land-এর ট্র্যাজিক গভীরতা বিশেষভাবে আলোড়িত করে, কিন্তু সাধারণ জীবনে শ্রেণী-সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, প্রাচুর্য্যের মধ্যে দৈন্য, ইত্যাদির ট্র্যাজেডি চোখে পড়ে না।

Concealing fiom their wretchedness
Our metaphysical distress,

কবিতায় metaphysical distressটাই আমাদের মুগ্ধ করে, তার বাইরে যাওয়াটা হাস্যজনক বলে মনে হয়। Look Stranger-এ এর ব্যতিক্রম দেখি।

আধুনিক কোনো কবিকে ভালো লাগা না লাগা শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর করে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গীর উপরে। অডেনের জীবনদর্শনে আস্থা যাঁদের নেই, তাঁদের কাছে Look Strange এর কয়েকটি কবিতা (যেমন Brothers, who when the sirens roar) খেলো বলে হয়ত ঠেকবে, সমরোত্তর হাইব্রাউ অবিশ্বাসে অভ্যস্ত অনেকের কাছেই অডেনের বেদনাবোধ এবং ঋজু আর স্পষ্ট সুর ভালো লাগবে না, কারণ মানুষে বিশ্বাস না করাটাই ছিল বিগত যুগের ধর্ম্ম ও ফ্যাশন।

Look, Stranger-এর বহু কবিতাই তত্ত্বমুখী, আর অডেনের তত্ত্ব নিয়েই যত বাদ প্রতিবাদ। এ ছাড়াও অবশ্য অনেক লেখা এ বইতে আছে যার মধ্যে সাংসারিক সচেতনতা থাকলেও তত্ত্বের ভাগটা কম, যেমন, Casino শীর্ষক কবিতাটি। আর খুঁজলে দু' একখানি 'বিশুদ্ধ' কবিতাও উপরোক্ত বইতে পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ নাম-কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি—

Look, stranger, at this island now
The leaping light for your delight discovers,
Stand still here
And silent be,
That through the channels of the ear
May wander like a river
The swaying sound of the sea

ইত্যাদি।

Ascent of F6 অডেন ও ইসারউডের দ্বিতীয় নাটক। বর্ত্তমান সভ্যতার আবহাওয়ায় সামাজিক কিম্বা ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা অসম্ভব। Dog Beneath the Skin-এ এই সমস্যার সামাজিক দিকটার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হয়েছিল, ফলে ঘটনার সংঘাতে চরিত্রের বিকাশ উপরোক্ত নাটকে ঘটে নি। Ascent of F6-এ লেখকদ্বয় প্রধানতঃ ব্যক্তিগত দিকটাই দেখিয়েছেন এবং তার ফলে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে। বাইরের সংঘাতটা এখানে পটভূমিকা মাত্র। Ransom-এর ইতিহাসই Ascent of F6-এর আসল কথা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাটকে আরো একটি ধারা চলেছে যেটা বর্ত্তমান সভ্যতার অর্থহীনতা বরাবর আমাদের চোখের সামনে রাখে। Mr ও Mrs-এর ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এঁরা হচ্ছেন পেটি বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এবং এঁদের কথোপকথনে, এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে বণিকসভ্যতার ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে—

A slick and unctuous time
Has sold us another shop-soiled day

* * *

Give us something to live for, we have waited too long

T. E. Lawrence-এর সঙ্গে Ransomএর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। F6 আরোহণের ভালোমন্দ এবং ভবিষ্যৎ ফলাফল সম্বন্ধে র‍্যানসন সচেতন ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির অস্ত্র হবার আগ্রহ তাঁর ছিল না ; র‍্যানসমের এই সচেতনতা শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে হানা দেয়, মৃত্যুকালীন মানসিক বিকারেও এর থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন নি—It was not virtue or knowledge, it was Power। কিন্তু ঘটনার চক্রে মায়ের প্ররোচনায় F6 আরোহণের ভার তাঁকে নিতে হয়। মাতাপুত্র দৃশ্যটি স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু দুর্ব্বল ও হাস্যজনক ; মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে এই ব্যাপারটি হয়ত নিখুঁত, কিন্তু নাটকের মেরুদণ্ড হিসাবে অল্পবিস্তর তুচ্ছ। F6 আরোহণের অধিকাংশ দৃশ্যেই বলিষ্ঠতা এবং শক্তির পরিচয় পাই। এই সব দৃশ্যে সাধারণ কথাবার্ত্তার অন্তরে গভীর একটি সুর বাজতে থাকে। র‍্যানসমের মৃত্যুকালীন দৃশ্যটি সাইকো-এ্যানালিসিসের

আধুনিকতম একটি থিসিস হলেও বিসদৃশ হয় নি। এর শেষের দিকের কোরাসগুলিতে Paid on Both Sides-এর প্রতিধ্বনি আছে।

র‍্যানসমের মৃত্যুর ফলাফল কি যে হবে তার পরিচয় শেষ দৃশ্যে পাই, যখন নোয়েল কাওয়ার্ডের পৃথিবীতে আবার ফিরে আসি।

Ascent of F6 পড়ার পরে স্বভাবতই Dog Beneath the Skinএর কথা মনে হয়। আঙ্গিকের এবং গভীরতার দিক দিয়ে প্রথমোক্ত নাটকটি যে শ্রেষ্ঠতর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। Dog Beneath the Skin-এর গল্পাংশ কয়েকদিনের মধ্যেই মন থেকে মুছে যায়; কিন্তু এর কোরাসগুলিতে অডেন ও ইসারউডের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি, সহজ ভাষা এবং স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গী অনেকদিন মনে থাকে।

More Poems হাউসম্যানের তৃতীয় কবিতার বই। এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখার প্রয়োজন নেই, কারণ এর অধিকাংশ কবিতাই যে সাধারণ, তা লেখকও বোধহয় জানতেন। বইটির পাতায় পাতায় হাউসম্যান-সুলভ বিষণ্ণতা আছে; কিন্তু পাতা কয়েক পড়ে যাওয়ার পরে এই সুর এক ঘেয়ে ও ক্লান্তিকর ঠেকে। মনে হয়, হাউসম্যানের দুঃখবাদে কোনো বিশিষ্টতা নেই, তা নেহাৎই ভাসা ভাসা এবং ব্যক্তিগত। কয়েকটি কবিতায় লেখক আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট কোনো ছবি আনতে পেরেছেন, সেই জন্য ভালো লাগে।—হাউসম্যানের ব্যক্তিগত বিষণ্ণতার সঙ্গে তুলনা করুন

Only a flicker
Over the strained time-ridden faces
Distracted from distraction by distraction

এখানে অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে বিংশ শতাব্দীর ছন্দ আছে। More Poems আমার ভালো না লাগার কারণ এই যে হাউসম্যানের দুঃখবাদ অত্যন্ত রোমান্টিক; তিনি তাঁর বেদনাবোধকে কোনো বিশিষ্ট সংহত রূপ দিতে পারেন নি।

সমর সেন

Eyeless in Gaza—by Aldous Huxley (Chatto and Windus).

মার্ক র‍্যাম্পিয়নের পরে অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই দীর্ঘ রোমন্থন এবং অবশেষে লরেন্সের পরে গুরুগবেষণান্তে গান্ধীজি-মার্কা ডিক শেপার্ড এবং গাজায় চক্ষুহীন অবস্থা। চক্ষুহীন না হোক্, চশমা সেই মোটা পাথরেরই। সেই অতিস্মার্ট বুদ্ধিমান নরনারীর নীরস শৃঙ্গার, সেই পাণ্ডিত্যাভিমান, সেই মানুষ সম্বন্ধে অমানুষিক বিরাগ। নীতিবাগীশ বার্দ্ধক্যে সেকালে এই রকম শরীরবিদ্বেষী হয়ে' শরীরসম্পর্কীয় উল্টানো কৌতূহলবিলাসী হতেন, একালের

সৌখীন বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্নের সুর অবশ্যই অন্য কিন্তু মানসিক অবস্থা একই। নাকি, রক্তস্বল্পতায় কাতর, যকৃৎদুষ্ট বুদ্ধিজীবীর এই প্রতিশোধ? তাই কি নায়ক বীভিস্ একটা পণ্ডিত হৃদয়হীন রতিবিহারী মাত্র? তাই সে সমাজতত্ত্বের ফাঁকে ফাঁকে মেয়রি, গ্ল্যাডিস্ প্রভৃতির শেষে মেয়রিরই কন্যা হেলেনের শরীরচর্চ্চায় সহায় হয়? বলতে ইচ্ছা হয়, কি দরকার বাপু এই স্ফূর্ত্তিবাজ আবহাওয়ায় যাবার? কেউ ত আর মাথার দোহাই দেয় নি। গভীরভাবে শরীর-সর্ব্বস্বতা লরেন্স্ করেছেন, হাল্কা চরিত্রহীন ভাবে এপিউলেয়াস্, পেট্রোনিয়াস্ আরবিটার্। এমন নয় যে হাক্স্লি ছাড়া এই লজ্জাকর অপিচ সুস্থ রসলোকে নিয়ে যাবার কেউ লোক নেই।

আপত্তিটা আমার নীতি বা রুচির দিকেই নয়। উপন্যাস হিসাবেই বইটা জমে নি এই কারণে, আপত্তিটা তাই। নীতিবাগীশ মহৎ সংস্কারকবৎ উত্তেজনাতেও ভালো উপন্যাস লিখতে পারেন, লিখতে জানলে ও পারলে। অপর পক্ষে বোকাচ্চো-ও অতি উপাদেয় গল্প লিখেছেন। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি তাঁর গল্প বা উপন্যাসের মানুষ সম্বন্ধে কোনো প্রবল ভাবই না রেখে শুধু বিরক্ত ক্লান্ত বোধ করেন, ত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপে তাঁকে যতোই গভীর, তাঁর ব্যঙ্গভঙ্গিম কথা যতোই স্মার্ট লাগুক, তাঁর লেখা ওৎরায় না নিছক সাহিত্য হিসাবে। সমাজতত্ত্ব হিসাবেও ওৎরায় কিনা সন্দেহ। কারণ, জন ষ্ট্রেচি যাই বলুন, ডে লুইস বলেন, হাক্সলির চরিত্রেরা যে রকম বিদগ্ধ, বুদ্ধিমান ইত্যাদি সেরকম মানুষ সমাজে নেই। এবং ডে লুইস্ কবি, কমিউনিষ্ট এবং ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখক।

আর অতিরিক্ত বুদ্ধি বিদ্যা এবং শৃঙ্গারপ্রীতির কারণে অনুতাপের ফলে ঈশ্বরপ্রীতিতে নবকলেবর ধারণ বরং বোঝা যায় কিন্তু যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদে কোথায় সেই চিরাচরিত ঐতিহ্যের ভাবজ ব্যঞ্জনা? ফলে উপন্যাসের ধারায় যে সাগর-স্রোত লেখকের অভিপ্রেত, সে স্রোতমুখর ঘূর্ণীতে আমাদের হাসিই পেত, যদি না যুদ্ধ সমস্যায় আমাদের মন কাতর থাক্‌ত। অবশ্য ধর্ম্মের আভাসও আছে। ইয়েটস্ ব্রাউনের চেয়েও মজার ব্যাপার এই নায়কের জুতার ফিতা বাঁধবার সময়ে যোগাভ্যাস, ইভ্যান্‌স্‌ওয়েন্টস্-এর সাহায্যে। আর মেক্সিকোয় গিয়ে 'উদ্যানে যন্ত্রণা'-বোধ!

ব্রুসেল্‌সে শান্তি সভায় যখন স্পেনের লা পাসিওনেরা সভাগৃহে ঢোকেন, তখন সাম্যবাদী কর্ম্মী এবং বাগ্মী এই সুন্দরীকে দেখে সাম্যবাদীরা বারণ সত্ত্বেও স্পেনের জয়নাদে মুখর হয়ে' পড়ে এবং সভাপতির ধমক খায়। সে-বারণ ও সে-ধমক আসে শেপার্ড ও হাক্স্লি প্রমুখ মহাশান্তিবাদীর জন্যেই। তারপর উক্ত সেবিকা স্পেনে নিহত হন এবং হাক্স্লির প্রবন্ধাবলী 'অলিভ ট্রী' প্রকাশিত হয়। শান্তিবাদী নাকি যে যুদ্ধ বস্তুত চল্‌ছে, সে যুদ্ধকেও যুদ্ধ বল্‌বে না।

শান্তিসমস্যায় হাক্স্লির সম্বন্ধে আপত্তি হচ্ছে তাঁর এই গোঁয়ার ভাবেই। এবং সে

আপত্তি করতে গেলে স্পেণ্ডরের মতো সাম্যবাদী না হলেও চল্‌বে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি নিরাকরণ সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিকরা যা বলেন, তা মেনে নিতেই হয়। গ্লোভরের এই বিষয়ে বইটির সার হাক্‌স্‌লি নিজেই ব্রডকাষ্টে বলেন। কিন্তু, তাঁর বইয়ের মধ্যে সেই দূরদৃষ্টির ছায়াপাত নেই।

এ ছাড়া দু তিনটি তারিখ এবং তথ্যে ভুলও এ বইয়ে আছে। এবং যেহেতু হাক্‌স্‌লি বেন্‌স্‌ সিক্‌স্‌ পেনি সিরিজ বা হোম্‌ ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী থেকে রসদ যোগাড় করেন না বলেই অন্তত আমার বিশ্বাস, তাই এতে একটু আশ্চর্য্য হয়েছি।

বিষ্ণু দে

Memoirs of a Fox-hunting Man
Memoirs of an Infantry Officer
Sherston's Progress
—By Siegfried Sasoon, (Faber & Faber)

গ্রন্থ তিনটির মধ্য দিয়ে যে জীবন-কাহিনীটি প্রবাহিত হয়েছে তার কতখানি অংশ অভিজ্ঞতালব্ধ আর কতখানি কল্পনায় রঞ্জিত জানবার জন্য কৌতূহল জাগে। বিচার করে দেখলে অবশ্য এ ঔৎসুক্য অনর্থক বলে প্রতীয়মান হবে যেহেতু গ্রন্থকার কাল্পনিক নাম গ্রহণ করে প্রকারান্তরে জানিয়েছেন যে ড্রাইসারের 'ডন্‌'-জাতীয় নিছক নির্ব্বিকল্প আত্মউদ্‌ঘাটন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু প্রচ্ছদপটে আভাস দেওয়া হয়েছে যে স্মৃতিলিপিটি সেসুনের নিজের, সুতরাং পাঠকের মনে প্রশ্ন ওঠে—'হলেই বা তুমি কবি—পঁচিশ বছর পূর্ব্বে কোন এক বিশেষ প্রভাতে একটি কালো পাখী ঝোপ ছেড়ে উড়ে গিছলো কেমন করে তা স্মরণ রাখলে? এমনি ত রোজই কত কি উড়েছে তারপরে।'

কথিত হয়েছে শাস টন দিন-পঞ্জিকা রাখতেন। শৈশব কালের সদা-সজাগ কৌতূহল তাঁর ছোট্ট দিক্‌চক্রবালটির মধ্যে কি কি বার্ত্তা বহন করে আনতো হয়তো লিপিবদ্ধ হয়েছিল—কিন্তু প্রথম টাট্টুঘোড়া চড়ার মত এক একটি বিশেষ দিনকে ঘিরে যে ছোটখাট, তুচ্ছ অথচ অর্থপূর্ণ ঘটনার বর্ণনা পাই তাতে বালকসুলভ চপলতার পরিবর্ত্তে শিল্পীর সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সাহিত্য-বিচারে ঘটনা-বিশেষের অন্তরালের সত্য-মিথ্যার লুকোচুরি ধর্ত্তব্য নয়। গ্রন্থির বন্ধন সুচারু হলেই হলো। কিন্তু গোড়াতেই ঐ কথা উল্লেখ করলাম কারণ আমার মনে হয়েছে, পাঠকের এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার মূলে আছে অভিমান। এবং অন্তরের এই আবেগটি নিবিড় ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক।

বর্ণনার সৌকুমার্য্যে, সে রূপকথার গল্পমুগ্ধ বালকের মত কখন অন্যমনস্কে বক্তার কোল

ঘেঁসে আসে—তারপর প্রত্যেক কথাটি নির্ব্বিবাদে হজম করে যখন শেষ পৃষ্ঠা অতিক্রম করতে উদ্যত হয় তখন তার চমক ভাঙ্গে—তাইতো আর একটু হলে ঠকিয়েছিল—কতই যেন সত্যি।

এই উক্তিটি প্রথম পুস্তকখানির সম্বন্ধে প্রযোজ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির কথা পরে বলবো। গ্রন্থখানির নামটি ভ্রমাত্মক। মৃগয়ার অংশটি অদ্ভুত ভাবে আমোদপ্রদ হলেও একখানি সর্ব্বাঙ্গীণ জীবন-চিত্রের অঙ্গীভূত। অবশ্য ইচ্ছাকৃত অবদমিত অংশগুলিকে বাহুল্য জ্ঞানে অগ্রাহ্য করে সর্ব্বাঙ্গীণ আখ্যা দিচ্ছি।

ধনী পিতৃস্বসার ঐকান্তিক যত্নে প্রতিপালিত বালকটি যে-রূপ অবলীলাক্রমে নিষ্কর্ম্মা কর্ত্তব্যকুণ্ঠ যুবকে পরিণত হয়েছে তার সুসংবদ্ধ সংক্ষিপ্তসার পর্য্যন্ত দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু পড়বার সময় অণুমাত্রও অবকাশ পাওয়া যায় না।

গ্রন্থকারের লিপিপদ্ধতি মৌলিক। স্নেহময়ী অভিভাবিকা, বৃদ্ধ গৃহ শিক্ষক, সহিস ডিক্সন্, অশ্বারোহণে ভ্রমণ, প্রথম পার্টি, মিলডেন্, ক্রীকেট ম্যাচ, জনৈক বধির স্পষ্টবক্তা বৃদ্ধা, মিষ্টার পেনেট, অন্তঃপুরের পরিচারিকা, হোমার, রাজপথ সংস্কারক 'জোই', ঘোড়-দৌড়, মৃগয়া, বন্ধু ষ্টীফেন, যন্ত্রবাদক ক্রাইস্লার, আভিজাত্য গর্ব্বী প্যাকৃলষ্টোন সমাজ, সমর-সজ্জা ইত্যাদি এক একটি ছোট বড় চিত্রকল্প বিষয় অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন বয়সের মানসিক পরিবর্ত্তন-ধারা বর্ণনা করে গেছেন। এবং সেই সঙ্গে বাহুল্যবর্জ্জিত স্বচ্ছভাষায় পাঠকের ঘনান্ধকার স্মৃতি-অঙ্গনে শৈশব কালের ঝরা পাতার মধ্যে প্রাণের সাড়া পড়ে যায়।

শুনতে অতিশয়োক্তির মত লাগতে পারে। বোধ করি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন। নিজের কথা বলি। আমিও ছিলাম নিঃসঙ্গ লাজুক বালক। এমনি ধারা আকাশকুসুম রচনা করেছি। অপরিচিত সভাস্থলে সঙ্কুচিত হয়ে প্রগল্‌ভতার ভয়ে মনোভাব প্রকাশ করিনি, কিম্বা বেফাঁস উক্তির জন্যে পরে তীব্র অনুশোচনায় ধরণীকে দ্বিধা হতে অনুরোধ করেছি। স্নান ঘরের দর্পণে ভয়ে ভয়ে ক্ষুদ্র মুখখানিকে বিস্ফারিত চোখে দেখা—সে তো আমারই স্মৃতি কথা ; কিন্তু কোন অতলে তলিয়ে ছিল। দৈবাৎ জীবনের পড়ন্ত সময় একটি অজ্ঞাত অপরিচিত বিদেশীর অভিজ্ঞতার ঐক্যসূত্রে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো সব কিছু।

অভিজ্ঞতার বৈষম্যেও কিছু এসে যায় না। প্রথম অশ্বারোহণের নিবিড় ভয় ও আনন্দের বর্ণনা যখন আমার অশ্বশূন্য বাল্যকালকে সঞ্জীবিত করে তুলতে পেরেছে, আশা করা যায়, আনন্দের সংক্রামকতা সকলকেই স্পর্শ করবে।

পূর্ব্বেই বলেছি ভাষার সঞ্চারণ পেলব। লেখনী চলেছে দ্রুততালে, মিকিমাউসের সঙ্গীত গোলকের মত স্পর্শমাত্র করে—কখন শৈশব ও যৌবনের বেদনাতুর সন্ধিস্থল অতিক্রম করে মহাসমরের প্রাঙ্গণে এসে থামে লক্ষ্য হয় না ; কিন্তু একটি পাঠক জানে তার নিজের সমগ্র বিগত জীবন মানসপটের বিলুপ্তপ্রায় দাগগুলির ওপর নূতন রেখা টেনে গেলো কলিকাতা নগরীর দু'টি ক্লেদ ও মালিন্য সংযুক্ত সন্ধ্যার অবসরে।

অশ্বারোহণে শৃগাল বা হরিণ শিকার ও তৎসম্পর্কীয় ক্রিয়া-কলাপের মধ্য হতে রস সংগ্রহ করা এদেশবাসীর পক্ষে দুরূহ। অন্ততঃ শকট বোঝাই ভীতি-বিহ্বল মৃগকুলকে একটি অচেনা গহনে ছেড়ে দিয়ে শিকারী কুকুর নিয়ে তাড়া করে বেড়াতে কী আনন্দ থাকতে পারে তা আমার মত উৎকট ক্রীড়া-ভক্তেরও ধারণায় প্রবেশ করেনি। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে এক একটি স্খলিত বাক্য, কটাক্ষ ও ইঙ্গিত; প্রকৃতির অসহযোগিতায় নিষ্ফল অনুযোগ, সাফল্যের আনন্দ, অহমিকা ইত্যাদি অন্তর্লীন বিশ্বমানবের প্রকৃতিকে প্রকটিত করেছে।

পুষ্প-প্রদর্শনী দিবসের ক্রীকেট ম্যাচটির বর্ণনা মানসচক্ষে যে সৌন্দর্য্য উদ্ঘাটন করেছে সমৃদ্ধিশালী ইংরাজি সাহিত্যে তার তুলনা হয়ত আছে কিন্তু আমি জানি না। নিরালা গ্রামটি বাৎসরিক উৎসবে মেতে উঠেছে। নবীন যুবক প্রথম আসরে নেমেছে। উত্তেজনা, আশঙ্কা ও পুলক একত্রিত হয়ে গ্রীষ্মের প্রভাতটিকে দীর্ঘায়িত করে এনেছে। রক্তের ঢেউ বেপমান। চিত্ত তুক্ তাকের সাহায্য গ্রহণের জন্য ব্যগ্র। তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে সামাজিক জীবনের একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সজীব চিত্র—ছত্রে ছত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে আনন্দের শান্ত দীপ্তি। নাতিদীর্ঘ স্থূলকায় স্কীপার ডড্, এক চক্ষু উইকেট্‌কিপার নোক্স, খঞ্জ ও যৎকিঞ্চিত প্রতারক আম্পায়ার সাটলার, অপ্রিয় পাদ্রী প্রবর ইয়ালভেন, রক্তগোলকের তির্য্যকগতির প্রতিক্রিয়ায় সলজ্জ নাসিকাকণ্ডুয়নকারী গ্রাউণ্ডসম্যান, তৃণের ওপর ব্যাট-ধর্ষক ক্রাম্প, বিশ্রাম-অবসরের বাক্যালাপ, সব কিছুই চোখের ওপর ভেসে থাকে।

শার্স্টনের উচ্চ শিক্ষার ওপর বিতৃষ্ণা এলো কেমন করে গ্রন্থকার বলেন নি। দেখা যায় পেনেট্ নামক জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী সলিসিটার অভিভাবকের অনুজ্ঞা অগ্রাহ্য করে সে য়ুনি-ভার্সিটি ছেড়ে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন বেকার ভাবে গ্রামের পথে ঘাটে কাল ক্ষেপণ করছে। মৃগয়ার নেশা কিছু দিনের জন্যে ছেড়ে যেতে সেই অবসরে প্রকৃতির নিভৃত ছন্দ হৃদয়ঙ্গম হয়েছে বলে মনে হয়—কারণ এর পরে আর অবসর আসে নি।

মিলডেনের প্রভাব তাকে অচিরেই প্যাক্‌লষ্টোনের সম্ভ্রান্ত সামাজিক আবর্ত্তে ফেলে গ্রাস করে ফেললো। এবং সারমেয়-কুলের বংশ-তালিকা প্রস্তুতের অতিরিক্ত কোনো লেখনী বা মস্তিষ্ক চালনার সময় বা স্পৃহা রইলো না।

প্যাক্‌লষ্টোন সমাজের পর্য্যালোচনা সূক্ষ্ম হওয়ার প্রয়োজন ছিল। অভিজাত বংশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদের নিন্দা করা কঠিন নয়—হয়ত, প্রশংসা করবারও কিছু নেই, কিন্তু তাঁরা যে ভাল মন্দে গড়া সজীব মানুষ আজকালকার শ্রেণীবিদ্বেষের দিনে স্মরণে থাকে না। শার্স্টনের সানুরাগ বর্ণনায় এক একটি চরিত্র শতদলের মত প্রস্ফুটিত হয়েছে। অনধিকার চর্চ্চায় শেষ অবধি বিড়ম্বনাই অপেক্ষা করে। তিনি নিজেও সঙ্গতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু যেমন রায় সাহেবের উপরে রায় বাহাদুর তারও উপরে নাইট্‌হুড্ শার্স্টনও এমনিই স্তর-বৈষম্যের মধ্যে পড়েছিলেন। শীতের শেষে মৃগয়ার নেশা একটু ছুটতে দেখলেন কর্জ্জের অঙ্ক আতঙ্কজনক

আকার গ্রহণ করে বসেছে এবং সেই সঙ্গে মে-ফেয়ারের স্বপ্ন, বার্কলী, গ্রোভনর, পোর্টম্যান স্কোয়ার ইত্যাদি স্থানের হর্ম্ম্যমালার মধ্যে নির্ব্বিবাদে প্রবেশাধিকারের সম্ভাবনায় আনন্দ তরল হয়ে আসছে। অবশেষে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার সময় মনকে প্রবোধ দিলেন হয়ত যতটা ভাবছি ততটা চমৎকার নয়—এ্যাস্‌কট, লর্ডস, কয়েকটি নাচ, থিয়েটার, নিরস ডিনার পার্টি আর দু' একবার অপেরায় সময় যাপন ছাড়া এদের কিই বা আছে।

শীর্ষস্থানীয় সামাজিক আবেষ্টনীর আভ্যন্তরীণ রিক্ততা বোধগম্য হয়েছিল আরও পরে।

সহিস ডিক্‌সনের সহিত প্রভুর সম্বন্ধ গ্রন্থখানির মধ্যে প্রকৃষ্টতম সম্পদ। আমাদের দেশে পিতা পিতামহদের আমলের পুরাতন ভৃত্যদের নামের সঙ্গে দা' কিম্বা কা' যুক্ত ক'রে অভিহিত করতে দেখা যায়; অনেকে সংসারের সঙ্গে প্রায় একীভূত হয়ে পড়ে এবং আন্তরিক প্রীতি ও সম্ভ্রম সব সময় অপ্রকাশিত থাকে না। ইংরাজ সমাজে মনিব ভৃত্যের মধ্যে আন্তরিক আকর্ষণ যতই প্রবল হোক না কেন বাহ্যিক ব্যবহার আড়ষ্ট ও কায়দাদুরস্ত হতে বাধ্য। শ্রেণী-বৈষম্য ওদেশের লোকেদের ধাতস্থ হয়ে গেছে। এমন কি যুদ্ধের বিপ্লবেও তিলমাত্র বদলায় নি। সৌহার্দ্দ্যের এই প্রকাশ-অক্ষমতা বহু বিচিত্র ও কৌতুকপ্রদ ভাবে প্রকটিত হয়েছে শার্সটন-জীবনের প্রতি ক্ষেপে। কবে প্রথম 'মাষ্টার' 'সারে'তে পরিণত হলো। ক্রীকেট মাঠে একাধারে ভৃত্য ও সহক্রীড়ক; মৃগয়ার দলে শিক্ষক ও ভৃত্য; দৈনন্দিন সাহচর্য্যের মধ্যে—চতুর ডিক্‌সন একটি মধ্য পন্থা বেছে নিয়ে তারই ভেতর অতি সন্তর্পণ পদবিক্ষেপে চলেছিল।

গ্রন্থকার নায়ককে পারিপার্শ্বিক জগতের মহৎ, তুচ্ছ যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নিমজ্জিত রাখতে পেরেছেন বলে আদ্যান্ত বইটি সমানভাবে সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

শ্রুতিকটু হয়েছে মাত্র দুই স্থানে—পিতৃস্বসার অঙ্গুরীয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ গ্রহণে আর জনৈক ভোজন-বিলাসী সেনানায়কের শোচনীয় মৃত্যুর বর্ণনায়।

শেষ পরিচ্ছেদটিকে দ্বিতীয় গ্রন্থখানির সঙ্গে একত্রিত করে সমালোচনা করা উচিত।

দেখতে পাই মহাসমরের আগমনে শারর্সটনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত গতিবিধি সহসা স্তম্ভিত হয়ে ধাবিত হয়েছে প্রবল ঝটিকার অনুবর্ত্তী হয়ে। মরণ বাঁচনের আলোড়নে চলনের স্বাভাবিক লাবণ্যময় দোলন ঊর্দ্ধশ্বাস ধাবনে পরিণত হয়ে মানসচক্ষে নূতন পরিপ্রেক্ষিত এনে দিয়েছে। এবং সে পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে বিধৃত বৈশিষ্ট্যময় ঘটনাগুলি ব্যক্ত হলো অনাদরে, বিশৃঙ্খল ভাবে।

গত বিশ বছর ধরে য়ুরোপীয় সমর-সাহিত্যের উৎকর্ষ বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছে বিচিত্রভাবে। শাসর্টনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকবে কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব, তিনি কবি এবং রচনা যুদ্ধ নিরাকরণের মত সাধু উদ্দেশ্য-প্রসূত না হওয়ায় তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। দুরন্ত বালক যেমন একান্ত নিবিষ্ট চিত্তে বাত্যাঘাতে বৃন্তচ্যুত ফল

সংগ্রহ করে তেমনি করে তিনি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলি গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। ঝড়ের কারণ, গতি কিম্বা বিভীষিকা, তাঁর লিপিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করেনি।

দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হওয়াতে উত্তেজনা প্রশমিত হয়েছে ভাবলে ভুল করা হবে। কারণ প্রত্যেকটি ঘটনা সদ্য-আহরিত ফলের মত তাজা এবং গন্ধযুক্ত। অকিঞ্চিতকর টেঁপারি বা বৈঁচি অভিজাত-বংশীয় আম কাঁটাল হতে কিঞ্চিৎ মাত্রও অনাদৃত হয়নি। সংগ্রহের বৈচিত্র্য আমাকে মুগ্ধ করেছে।

একটি শান্ত রাত্রির কথা ধরা যাক্। ফ্রান্সের পঙ্কিল দুর্গন্ধ খাদের মধ্যে ল্যাম্-এর গদ্য সাহিত্য পড়ছেন শার্ণকায় মোমবাতির বেপমান স্বর্ণালোকে ; মনের আর এক অংশ সদ্যহত বন্ধুদের জন্য শোকাচ্ছন্ন ; আশে পাশের সুপ্ত অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ দুঃস্বপ্নের তাড়নায় অস্ফুট ধ্বনিতে আরও এক অংশকে অস্থির করছে। তিমিরাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলের বক্ষ চিরে রক্ত হাউই রেখে টেনে গেলো।

ঠিক তারই পরদিন ভোরে হয়ত আক্রমণের নেশায় পেয়ে বসেছে। অন্ধ উন্মাদনায় ধাওয়া করেছেন শত্রুদলের পরিখা—এমন সময় পথপার্শ্বে পতিত একটি হত দেহ অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে মানব-প্রকৃতিকে জাগ্রত করে তুললো। দেহটি তুলে দেখলেন জার্ম্মান বালক। যত্ন সহকারে কোটের হাতায় চোখ মুখ কর্দ্দম-মুক্ত করে এগিয়ে গেলেন। ফেরবার পথে নজরে পড়লো কে সেই বালকটির ওপর স্থূল পদচিহ্ন রেখে চলে গেছে এবং তার পাশেই শিলাখণ্ডের নিচে একটি ছোট্ট ফুল দৈবাৎ আত্মরক্ষা করে বাতাসে দোদুল্যমান।

সম্মুখসমরের উত্তেজনায় প্রপীড়িত স্নায়ুমণ্ডলীকে বিশ্রাম দেবার ব্যবস্থায় গ্রামের প্রান্তে আর্ম্মি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সেখানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হচ্ছে মানুষ-দেহের মধ্যে বেওনেট্ চালনার শিক্ষা। সেই স্কুলেরই বাতায়ন-পথে শান্ত প্রকৃতির অপরূপ মাধুর্য্য। পাকঘরের গন্ধ ও কাঁটা চামচের ধ্বনি। স্বাস্থ্য ও যৌবনের আনন্দ। সহকর্ম্মীদের দুর্ব্বলতায় সহানুভূতি ও কৌতুক। পদক-প্রাপ্তির মানসিক প্রতিক্রিয়া। ছোট ছোট ছুটির অবকাশ। সূর্য্যাস্তের সুবর্ণদিগন্তে কৃষ্ণাভ বৃক্ষরাজি ও উড্ডীন ধূলিচক্র। ধর্ম্মযাজকদের যুক্তি-বৈষম্য। উৎক্ষিপ্ত বৃক্ষ-শিকড়ের মত মৃত্তিকা গ্রথিত মানব দেহ হতে উত্তোলিত হস্তযুগল যেন আকাশস্থ বিধাতার দ্বারে অভিযোগ জ্ঞাপন করছে।

এমনি ছন্নছাড়া ভাসমান খণ্ডচিত্র যত। স্বল্পপরিসর পরিধির মধ্যে এতাদৃশ বহুবিধ উত্তেজনার সমাবেশ পাঠকের চিত্ত ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে ব'লে প্রথম পুস্তকখানির তুলনায় দ্বিতীয়টিকে নিকৃষ্টতর মনে হয় কিন্তু একে পৃথক ভাবে বিচার করা অনুচিত। একটি বিরাট সুরের আলাপ, উত্থান পতনের মধ্যে প্রবাহ যেখানে দ্রুত ও জ্বালাময় সেখানটির খণ্ডভাবে বিচার চলে না।

গুরুতর রূপে আঘাত পেয়ে শাসর্টন যখন অধিককালের জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন কোরলেন,

তাঁর অবসর-প্রাপ্ত মন নিমিষের মধ্যে তিক্ততায় ভরে উঠলো। জার্ম্মান-বিদ্বেষের মিথ্যা বাক্য-বন্যায় পরিপুষ্ট দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দন তাঁর কাছে নিষ্ঠুর পরিহাস বলে প্রতীয়মান হলো। দেশ উজাড় হয়ে বালক ও যুবকদল যুদ্ধানলে উৎসৃষ্ট হচ্ছে কিসের জন্য? আত্মরক্ষার জন্য না কর্ণধারদের আত্মশ্লাঘার চরিতার্থে? থামাবে কে?

দেশভক্ত শোকাকুল নরনারী 'আমি এক ছেলে দিয়েছি' 'আমি দুই ছেলে'—ইত্যাদি আত্মপ্রতারণার বাক্য আওড়াতে আওড়াতে পুরোহিত-কুলের মারফৎ ভগবানের আশীর্ব্বাদ সংগ্রহ করে বেড়াচ্ছে—প্রশ্ন তোলবার সাহস নেই।

অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নিজের সামরিক পদক নদীর জলে নিক্ষেপ করে তিনি কর্তৃপক্ষদের কাছে স্বয়ং এ প্রশ্ন তুললেন।

সামরিক আইন অনুযায়ী এ অপরাধের দণ্ড ছিল মৃত্যু কিন্তু তিনি অব্যাহতি পেলেন; তাঁকে পাঠানো হলো যুদ্ধের উত্তেজনায় বিকৃত-মস্তিষ্কদের আরোগ্য-ভবনে।

সম্প্রতি প্রকাশিত তৃতীয় গ্রন্থখানির প্রথম পরিচ্ছেদটির নামকরণ হয়েছে 'রিভার্স।" বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক রিভার্স-এর নাম অনেকের পরিচিত থাকতে পারে—তিনি ছিলেন হাসপাতাল-টার অধ্যক্ষ।

রিভার্স-এর স্মৃতি তাঁর স্বনামে প্রকাশ করা সম্ভব হলো কারণ তিনি আজ বহুকাল পরলোকগত কিন্তু সেসুন শার্সটনকে দিয়ে বলিয়েছেন যে তিনি জীবিত থাকলে তাঁকে ছদ্মনামে অভিহিত করা সম্ভব হতো না—তাঁর প্রতি গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা এত নিবিড়। এ প্রাচ্য জাতীয় ভক্তির কথা কিন্তু এই মহানুভব ব্যক্তিটির কাছে তিনি যথার্থই দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং আজও, বিশ বছর পরে, মৃত্যুর ব্যবধান অগ্রাহ্য করে গুরুর বাণী শিক্ষার ধারা নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে।

দেড়শত রোগীর ভার-প্রাপ্ত চিকিৎসক মাত্র তিন সপ্তাহ কালের মধ্যে একটি লাজুক স্বল্পভাষী সঙ্কুণ্ঠ ইংরাজ যুবকের মনে কেমন করে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করলেন বিস্ময় লাগে—সন্দেহ জাগে হয়ত পরবর্ত্তী কালের ছায়াপাত হয়েছে। কিন্তু এরপর যে শার্সটনের মানসিক জগতে একটি প্রবল পরিবর্ত্তন এসেছিল ঘটনার মধ্যে দিয়ে তা পরিষ্কার বোঝা যায়।

গল্প খেলা আর উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সত্ত্বেও তিনি বুঝলেন যে ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত জীবনকে প্রফুল্লভাবে গ্রহণ করে অন্তরের বিদ্রোহকে জাগরিত রাখাই শ্রেয়। তিনি তখন পুনর্ব্বার সম্মুখ সমরে ফিরে গেলেন। সে সময়কার দিন-পঞ্জিকার মধ্যে দেখতে পাই যৌবন-সুলভ চপলতার পরিবর্ত্তে গাম্ভীর্য্য এসেছে। উত্তেজনার স্থানে শান্ত নির্লিপ্ততা এসেছে। সমস্যা-বোধের প্রখরতা অনিবার্য্য অন্যায়ের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সুন্দরের সন্ধান মিলেছে।

মিশর, জেরুসালেম হয়ে ফ্রান্সে ফিরে যাবার পূর্ব্বে তাঁর সৈন্যবাহিনী আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হয়েছিল কিছুকালের জন্য। সে সময়ের কতকগুলি মৃগয়ার বর্ণনাতে যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয়েছে

ইংরাজি সাহিত্যের মত বিচিত্র কোষাগারেও বিরল বলে মনে হয়। অন্ততঃ "পানাসক্ত মিষ্টার" ভদ্রলোকটি অতুলনীয় হয়ে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আয়র্লণ্ড পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি-চিত্রগুলি দিন-পঞ্জিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশ হয়েছে বলে অন্তর্দ্বন্দ্বের আভাস প্রকট হয়ে উঠে পাঠকের চিত্তে ঈষৎ ক্লান্তি আনে—বিশেষ করে যে সকল স্থানে শার্সটন অন্তর্নিরীক্ষণের চেষ্টা করেছেন; কিন্তু বিচার ক'রে দেখলে মনে হয় উপায়ান্তর ছিল না। সে সকল দিনের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া চলে না—প্রত্যেকটি কথা অর্থপূর্ণ, তুচ্ছাদপিতুচ্ছ মানসিক প্রতিক্রিয়াও ইঙ্গিতপূর্ণ।

আসল কথা পাঠক চায় শৈশবকালের মত উন্মুক্ত আবহাওয়া—মনে হয় 'এবার ত রাক্ষসদের সঙ্গে লড়াই শেষ হলো—চল না ফিরিয়ে নিয়ে।'

জীবনের পথে প্রত্যাবর্ত্তনের নিয়ম নেই—তবু শার্সটন বিদীর্ণ-মস্তিষ্ক অবস্থায় মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাকালে যে ক্ষণিক জাগরণের বর্ণনা দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

Reporter in Spain—by Frank Pitcairn, with introduction by Ralph Bates (Lawrence & Wishart, 2/6.)

Spain in Revolt—by Harry Gannes and Theodore Repard. (Gollancz, 5/.)

Spanish Front—by Carlos Prieto (Nelson, 2/6.)

Behind the Spanish Barricades—by John Langdon-Davies (Secker & Warburg, 12/6)

The Nazi Conspiracy in Spain—by the Editor of the Brown Book of the Hitler Terror (Gollancz, 5/.)

স্পেনে যে সংগ্রাম এখন চলেছে, তার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন আর নেই। যারা স্বেচ্ছায় অন্ধ, তারা বাদে সবাই আজ বুঝেছে যে, এ সংগ্রামে একদিকে আছে গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি, আর অন্যদিকে ফ্যাশিজম্ ও প্রগতিদ্রোহ। সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল স্পেনের জাতীয় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ফ্যাশিষ্ট্‌দের অস্ত্রধারণে; সংগ্রাম এখন চলেছে স্পেনের গণসাধারণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্যাসিষ্ট্ শক্তির বর্ব্বর অভিযান রূপে। ১৯৩৩ সালে জার্ম্মানীতে হিটলারের একাধিপত্য পৃথিবীর শান্তিকে ব্যাহত করে যুদ্ধভয় ও যুদ্ধায়োজনকে সংক্রামক করেছে। সে ঘটনার মতই স্পেনের বর্ত্তমান সংগ্রাম বিশেষ গুরুতর; স্পেনের গণসাধারণের বিজয়ের ওপর গণতন্ত্র, সমাজপ্রগতি ও শান্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সম্প্রতি এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে আবেদন প্রকাশ করেছেন, তা দেখে আশা হয় যে আমাদের দেশেও যথাযথ চেষ্টা হবে যাতে ফ্যাশিষ্ট্ শত্রুরা রক্তের বন্যায় স্পেনের জনশক্তিকে হত্যা না করতে পারে।

স্পেন সম্বন্ধে সম্প্রতি এত বই বেরিয়েছে যে একটা ছোটখাট লাইব্রেরী শুধু তাই দিয়ে প্রায় ভরানো চলে। তাদের মধ্যে বাছাই করে কতকগুলো বইয়ের নাম ওপরে দেওয়া গেছে। প্রথম আর চতুর্থ বইয়ের লেখক দুজনই হচ্ছেন সাংবাদিক ; প্রথম বইয়ের নামকরণেই সে ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্তু তার লেখক শুধু সাংবাদিক নন, খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে এমন সব ব্যাপার তিনি জানতে পারেন যার দরুণ ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য মনে করে তিনি পঞ্চম রেজিমেন্টের ষ্টীল পলটনে যোগ দেন। যুদ্ধের দুঃখকষ্ট, তিক্ততা উত্তেজনা, বিপদের সঙ্গে সাক্ষাৎপরিচয়, সহযোদ্ধাদের প্রতি, স্পেনের জনসাধারণের প্রতি নিবিড় সহানুভূতি—তাঁর লেখায় উদ্দীপনা এনে দিয়েছে। প্রথম বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বেট্‌স্ ; তিনি স্পেনে বহুকাল বাস করেছেন। পায়ে হেঁটে প্রায় সারা দেশ ঘুরেছেন, সমাজের সকল শ্রেণীতেই মেলামেশা করেছেন, বার্সিলোনা আর আন্দালুসিয়ায় বিপ্লব-আন্দোলন সম্বন্ধে "Lean Men" আর "The Olive Field" বলে দুটি বহুপ্রসংশিত উপন্যাস লিখেছেন। স্পেনের জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধে জানতে হলে সেণ্ডার আর বেট্‌সের বই না পড়লে চলে না ; তাই বেট্‌সের সাক্ষ্যের দাম খুব বেশী।

ল্যাংডন্-ডেভিস্ সাম্যবাদী নন্, এমন কি কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতকেও যে তিনি সমর্থন করেন তা বলা শক্ত ; স্পেনের গণতন্ত্রবিরোধীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁর বন্ধু ; স্পেনদেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি আমাদের দিয়েছেন সেখানকার রাস্তাঘাটে রোজকে-রোজ কি ঘটছে তার বর্ণনা, যাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে তাদের কথা, আর একটা খুব দরকারী ব্যাপার সম্বন্ধে খবর, তা হচ্ছে স্পেনের চার্চ্চের অবস্থা, ধর্ম্মযাজকদের মনোভাব। দেশে ফিরে তিনি ফ্যাসিজম্-বিরোধী সভায় সভায় বক্তৃতা দিচ্ছেন, স্পেনের রাষ্ট্রশক্তি যাতে বিজয়ী হয় তার চেষ্টা করছেন—এ হচ্ছে স্পেনে সম্প্রতি তিনি যে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন তার ফল। আমরাও তাঁর বই থেকে বুঝব যে বর্ত্তমান অবস্থায় স্পেনের সমস্যা সম্বন্ধে হৃদয়বান্ মাত্রেই মনস্থির করেছেন। পক্ষপাতদুষ্ট বলে বইখানিকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হবে বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞানতার, সংস্কৃতি-বিরোধের পরিচায়ক। ল্যাংডন্-ডেভিসের বইয়ের অবশ্য একটা দোষ রয়েছে, আর তা হচ্ছে দুর্ম্মূল্যতা।

দ্বিতীয় বইখানি লিখেছেন দুজন অ্যামেরিকান কম্যুনিষ্ট। তাঁরা যেন একটু তাড়াহুড়ো করে লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছিলেন, তাই ঐতিহাসিক পরিচ্ছেদগুলো তেমন পরিষ্কার হয়নি, আর বোধহয় তাঁরা স্পেন দেশটার সঙ্গে খুব ভালভাবে পরিচিত নন্ বলে লেখায় একটু শুকনো ভাব আছে। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট্ বিদ্রোহের মূলগত কারণ আর তার অব্যবহিত পূর্ব্বে ও পরের ঘটনাদি সম্বন্ধে একখানা বইয়ে এত খবর আর কোথাও মিল্‌বে না। স্পেনের চাষীদের কথা, সেখানকার প্রায় আজগুবি সামরিক ব্যবস্থা (প্রায় ৮০০ সেনাপতি, প্রতি ছয় জন সৈনিকের জন্য একজন অফিসার ইত্যাদি !), সে দেশের চার্চ্চ, শ্রমিক আন্দোলন, প্রাদেশিকতা প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব দরকারী খবর এ বই থেকে পাওয়া যাবে।

তৃতীয় বইটির লেখক ইংরেজ (নাম সত্ত্বেও); কম কথায় স্পেনের ইতিহাস চমৎকার গুছিয়ে বলেছেন। তবে ইনি ঘটনাই বর্ণনা করে গেছেন, তাদের কারণ সম্বন্ধে বেশী মাথা ঘামান্ নি। মোটামুটি তাঁর বৃত্তান্ত থেকে বোঝা যায় যে স্পেনের বর্ত্তমান গণতান্ত্রিক সরকার আর তার নেতা আজানার পক্ষেই তাঁর সহানুভূতি। লিবারল্‌রা যে নিশ্চয়ই স্পেনের গণতন্ত্রকে ফ্যাসিষ্ট্‌দের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চাইবেন, এ বই হচ্ছে তার প্রমাণ। আমাদের তালিকা থেকে অল্প পরিসরে, সহজ ভাষায় লেখা একটা বই বাছতে হলে এটাই সুপারিশ করতে হয়। অবশেষে যে বইয়ের নাম করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। বহুদিন থেকেই যে বাইরের ফ্যাশিষ্ট্ শক্তিরা এই দারুণ তাণ্ডবের মতলব করেছিল, তার নানা প্রমাণ এতে পাওয়া যাবে; ডিটেক্‌টিভ নভেলের মত এ বই পড়ায় কোন কষ্ট হবে না।

গত বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে স্পেনে যে নির্ব্বাচন হয়েছিল, তার পরিচালন ভার ছিল গণতন্ত্রবিরোধী দক্ষিণমার্গীদের হাতে; সুতরাং গণতান্ত্রিকরা যে অসদুপায়ে নির্ব্বাচিত হয়েছিল তা বলা চলে না। 'পপুলার ফ্রন্টের' নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা যত ভোট পেয়েছিল, তার চেয়ে অবশ্য অন্য সব দলের সম্মিলিত ভোট সংখ্যা কিছু বেশী হয়েছিল, কিন্তু পরিষদে সভ্যসংখ্যা 'পপুলার ফ্রন্টেরই' বেশী হয়। ল্যাংডন-ডেভিস্ এই আলোচনা ব্যপদেশে বলেছেন যে ইংলণ্ডে কোন-বারই লেবর দল মন্ত্রিসভাগঠনের সময় নির্ব্বাচনে অন্য সকল দলের ভোট সংখ্যার চেয়ে বেশী ভোট পায়নি, আর তা সত্ত্বেও সেদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ করার কথা ওঠেনি। এ-যুক্তিতে কিন্তু একটু খুঁৎ আছে। পাউণ্ডের দাম নিয়ে ১৯৩১ সালে বিলাতে যে সঙ্কটের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, তা একরকম বিদ্রোহেরই নামান্তর। লেবর দল যদি ওদেশে সাম্যবাদী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা যথার্থই করত, তাহলে পুঁজিদারের দল ছেড়ে কথা কইত না; আইরিশ ব্যাপারে কার্সন আর এফ, ই, স্মিথ আইনধুরন্ধর হয়েও যে মনোভাব জোর গলায় প্রচার করেছিলেন, তা থেকে মনে হয় যে ইংরেজদের তথাকথিত নিয়মানুগতা আর বিপ্লবে অনাসক্তি তাদের একটা সনাতন গুণ নয়, স্থানকালপাত্র বিশেষে সকলেই (শুধু ইংরেজ নয়) নিয়মানুগ হতে পারে।

স্পেন সম্বন্ধে কিন্তু আরও মনে রাখতে হবে যে ফ্যাশিষ্ট্ বিদ্রোহ আরম্ভ হবার পর যে সব দল সরকারের পক্ষে যোগ দিয়েছে, তাদের ভোট সংখ্যা গুণলে 'পপুলার ফ্রন্টে' মতাধিক্য একেবারে অবিসম্বাদী। একথা মনে রাখলে আমরা ঠিক বুঝব যে নিয়মানুগভাবে, সুনিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক উপায়ে স্পেনে প্রগতিশীল দল দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। যাঁরা মার্ক্‌সের মতবাদকে মেজে ঘষে "ভদ্রস্থ" করে নিতে চান্, তাঁদের মতে ঐভাবে শাসনভার গ্রহণ করলেই সমাজরূপ পরিবর্ত্তন করা হবে, কোন এক অদূর পুণ্যাহে ধনিকবাদ বিনা বিপ্লবে নিঃশেষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। স্পেনের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যে তাঁদের মত ধোপসই হল না, হল বরং মার্ক্‌সের মত, কারণ তিনি বলেছিলেন যে জনসাধারণের দাসত্বকে স্থায়ী করার জন্য অর্থবানরা সদলবলে, সদম্ভে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবেন। স্পেনে আমরা দেখছি সেই বিদ্রোহ।

সভ্য মানুষের সাধারণ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যে নির্ভয় আত্মোৎসর্গ আজ চলেছে, তার মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনা প্রথম বইটীতে বিশেষ রকম পাওয়া যাবে। বন্দুকের অভাবে লাঠি বা পাটা নিয়ে কুচ্ কাওয়াজ; ছুরি আর গজাল নিয়ে ফ্রাঙ্কোর মেশিনগানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া; কামান আর বোমার অত্যাচারপীড়িত হলেও তা তুচ্ছ করে প্রাণপণ উদ্যম—এ সব ঘটনার মধ্য দিয়ে স্পেনের জাগ্রত গণতন্ত্রের আত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যাবে। লেখক ইংরাজ: তাই বহুবার বহুলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছে যে কবে ইংলণ্ড আর ফ্রান্সের তথাকথিত "নিরপেক্ষতা" শেষ হবে, কবে তারা সত্যিই জার্ম্মানী, ইটালী আর পর্টুগালকে ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য করতে বারণ করবে। তাঁর চোখের সামনে এক চাষীর ঘরের ছেলে—যে ছিল সদা প্রফুল্ল, যে গান গেয়ে আর নেচে পল্টনের সবাইকে স্ফূর্ত্তি দিত,—ডুক্‌রে কেঁদে উঠেছিল এই বলে, "আমি যে আমার দেশের জন্য লড়তে চাই, আর তোমরা বার বার আমাকে এই নকল খেলাঘরের বন্দুক এগিয়ে দিচ্ছ!"

স্পেনের চার্চ্চ সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার যে ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে কেউ কেউ দেবচরিত্র হলেও মোটের উপর তাদের সঙ্গে অত্যাচারী ধনিক আর দেশছাড়া জমিদারদের সম্পর্ক একেবারে অচ্ছেদ্য। স্পেনের বর্ত্তমান বৈদেশিক সচিব একটা বক্তৃতায় বলেছেন যে সেখানে লর্ড রবার্ট সেসিল একটা শান্তি মহাসভার (Peace Congress) আয়োজন করতে গিয়ে একটীমাত্র ধর্ম্মযাজকেরও সাহায্য পান্ নি; অথচ ওরূপ ব্যাপারে ইংলণ্ড বা অন্য অনেক দেশে বহু ধর্ম্মযাজক সাগ্রহে যোগ দিয়ে থাকেন। স্পেনের চার্চ্চ যে কি রকম কুসংস্কারদুষ্ট, তার একটা হাস্যকর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ল্যাংডন-ডেভিসের বইয়ে উদ্ধৃত 'New Catechism' থেকে:—

Qustion: What sin is committed by those who vote Liberal?

Answer: Usually, mortal sin.

স্পেনের জাতীয় সরকারের পক্ষে যারা লড়ছে, তারা যে অতিমানব এ কথা কেউ বলে না; তারা অনেক অপকর্ম্ম করে থাকতে পারে। কিন্তু অপর পক্ষ যে তাদের নানা অকথ্য উপায়ে প্রকোপিত করেছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

"গরীব চাষীদের জমি দিয়ে দরকার নেই; আর পঁচিশ বছর বাদে বড় বড় সম্পত্তি আপনা আপনিই ভেঙে আস্‌বে, তখন মধ্যবিত্ত চাষীসম্প্রদায় গড়ে উঠবে"—একথা বলেছে ফ্রাঙ্কো এক সাংবাদিকের প্রশ্নোত্তরে (Quoted in 'Spain in Revolt'. p. 164.)। অর্থাৎ আরও পঁচিশ বছর স্পেনের চাষীরা এখন যেমন দুর্দ্দশায় আছে তেমনি থাক্! অর্থাৎ সাত হাত লম্বা সাত হাত চওড়া ঘরে তিনটী বিবাহিত দম্পতী বাস করতে থাকুক, (স্পেনে যে এ ব্যাপার আজগুবি নয় তার সাক্ষ্য দিচ্ছেন ল্যাংডন্-ডেভিস্, ৩৯ পৃষ্ঠায়)! অর্থাৎ পঁচিশ বছরের কমে মধ্যবিত্তদের প্রাধান্য স্থাপন করা যাবে না, আর যতদিন না যায় ততদিন রিক্তবিত্তদের দমন চলুক! ফ্রাঙ্কোর স্পর্দ্ধার উত্তর দিচ্ছে স্পেনের গণসাধারণ; তারা জয়ী হোক্!

ইংরেজের একটা ছেলে ভুলানো ছড়া আছে "Rain, rain, go to Spain !" আমাদের দেশে আমরা সূর্য্যদেবের কৃপা এত প্রচুর পেয়ে থাকি যে মেঘের ঘনিমা আর বৃষ্টির উদ্দাম প্রতাপ দেখার জন্য আমরা ব্যাকুল হই, আমাদের ছেলেমেয়েরা বলে, "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।" ইংলণ্ডে তারা নীল আকাশ দেখে নেচে ওঠে, রোদের প্রত্যেক কণাটিকে ভালোবাসতে চায়, তাই বৃষ্টি দেখলে তাকে তখনই জবাব দিয়ে পাঠাতে চায় স্পেনে, যেখানকার আকাশ সাধারণত আলোতেই ভরে থাকে, যেখানে বৃষ্টি প্রায় প্রতিদিনের সঙ্গী নয়। কিন্তু ইংরেজদের একটা বৃষ্টি-তাড়ানো ছড়া যে স্পেনের বহু লক্ষ নরনারীর দৈনন্দিন প্রার্থনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার অর্থ ভালরকম এখনও আমরা বুঝি নি। সূর্য্যের আলোক ভালোবাসে তারা, কিন্তু দুঃসময় এমনই এসেছে যে তারা ভোরে উঠে সূর্য্যের মুখ দেখলে অভিশাপই দেবে; চারদিক যখন আলোয় ঝলমল করে উঠছে, তখন তাদের শুধু মনে হবে যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আকাশ থেকে মৃত্যুবাণ পড়তে থাকবে, জমি শুকিয়ে যাওয়ার দরুণ ফ্যাসিষ্টদের বোমাগুলো ফাটবে ভাল, কাউকে মারবে, কাউকে বিকলাঙ্গ করবে, কাউকে বুদ্ধিভ্রষ্ট করবে, যন্ত্রণার অন্নসত্র খুলে দেবে। তাই আলো যারা ভালো বাসে, তারা আলো দেখে শিউরে উঠছে; সভ্যতার আলো নিভাবার চেষ্টা করছে ফ্যাশিষ্ট বর্ব্বরেরা, তাই যেন আজ সূর্য্যের আলোকে এই অপমান সইতে হচ্ছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ২০।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৪৪

পরিচয়

হিন্দু ও বৌদ্ধ

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের জনধর্ম্মের আলোচনা করিতে বসিলে প্রথমেই চোখে পড়ে পঞ্চনদ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ মুসলমানপ্রধান এবং বাংলাদেশ বাদ ভারতের অপর সকল প্রদেশ হিন্দুপ্রধান। পঞ্চনদ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ কেন মুসলমানপ্রধান হইল তাহার কারণ সুস্পষ্ট ঃ—এই দুইটি প্রদেশ ঠিক তোপের মুখে অবস্থিত, প্রায় এক সহস্র বৎসর ধরিয়া মুসলমান বিজেতাগণ এই প্রত্যন্ত প্রদেশ দুইটি কতবার যে আক্রমণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বিজেতাদের প্রভাবে এই প্রত্যন্ত প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীরাও ক্রমশঃ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল এবং এইরূপে পঞ্চনদ কালে মুসলমানপ্রধান হইয়া উঠিল। কিন্তু বাংলাদেশ মুসলমানপ্রধান হইল কিরূপে? অবশ্য বাংলার এই বৈচিত্র্য অল্প দিনের; কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও বাংলাদেশ মুসলমানপ্রধান ছিল না। কিন্তু তথাপি বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যানুপাত নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। কারণ এদেশে মুসলমান আধিপত্য কোন দিনই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মুসলমান আধিপত্য সর্ব্বাপেক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল যুক্তপ্রদেশে। দিল্লী ও আগ্রা ছিল মুসলমান সম্রাট্‌দের রাজধানী। অথচ এই যুক্তপ্রদেশ মুসলমানপ্রধান নহে।

আমার মনে হয় বাংলার জনধর্ম্মের এই বৈচিত্র্যের কারণ এদেশে দ্বিসহস্র বৎসরব্যাপী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব। যজ্ঞসর্ব্বস্ব বৈদিক ধর্ম্মের প্রতিবাদ রূপে এই বাংলা দেশেই বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। অগণ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম কালে সমগ্র ভারত অধিকার করিল এবং আপনাকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া নবজাগরিত হিন্দুধর্ম্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া শেষে এই বাংলাদেশেই তাহার

লয়প্রাপ্তি। অপর সকল প্রদেশে বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্ম্মে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেও বাংলার বৌদ্ধগণ আপনাদের আংশিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াসী ছিল। ইহাতেই ঘটিল বিপত্তি। তাহারা যখন শেষে হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিতে চাহিল তখন হিন্দু তাহার নবদর্পে মুখ ফিরাইয়া লইল। বৌদ্ধগণ তখন অভিমানে বিজেতার পরধর্ম্ম গ্রহণ করিল। ইহাই আমার মতে বাংলাদেশে মুসলমান প্রাধান্যের কারণ। ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দিবার সাধ্য আমার নাই। দেওয়া যায় বলিয়াও মনে করি না, কারণ একমাত্র সহজিয়া সম্প্রদায়ের ইতিহাসই আমাদের নিকট সুস্পষ্ট।

কিন্তু ভারতের অপরাপর অংশেও তো বৌদ্ধধর্ম্ম যথেষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সব অংশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল কিরূপে? ইহার উত্তরে বলিব হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটির অপরটিতে বিলীন হওয়ার পথে বিশেষ অন্তরায় কিছুই ছিল না, কারণ অতীত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে এদুটি একই ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিভিন্ন দিক মাত্র। ইহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভারতের সকল ধর্ম্মমতের বিশেষত্ব এই যে বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদের সামাজিক চতুঃসীমা নির্দ্দেশ করাই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই ইহাদের সার্থকতা। কাজেই বাধ্য হইয়া কিছু অনধিকার চর্চ্চা করিতে হইবে ঃ—হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনেরও কিছু আলোচনা করিব।

বৌদ্ধ শাস্ত্র বা দর্শনের কথা উঠিলেই আমাদের মনে আসে Pali Text Societyর দ্বারা Roman অক্ষরে ছাপা কতকগুলি গ্রন্থ। বুদ্ধদেব যে পালি ভাষাতে ধর্ম্মাদেশ করিয়া যান নাই একথা বুঝিতে ছাত্রদের অনেক দিন লাগে। বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করিবার পথে এই পালি পিটকই প্রধান বিঘ্ন। আদি বৌদ্ধধর্ম্ম কিরূপ ছিল তাহা নিঃসংশয়ে জানিবার কোন উপায় এখন নাই; কিন্তু পালি পিটকোক্ত ধর্ম্মই যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদি রূপ নহে সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। পালি পিটককে যে এতদিন ধরিয়া এত সম্ভ্রম দেখান হইয়াছে তাহার একটি প্রধান কারণ পালি ভাষা। পালি ভাষার রূপ অবশ্যই যে কোন প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা প্রাচীনতর; কাজেই এই ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির কাল খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে—ইহাই প্রায় সকলেই ধরিয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু এই যুক্তির কোন ভিত্তিই নাই। এই যুক্তি স্বীকার করিলে স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে বিংশ শতাব্দীতেও সংস্কৃত ভাষায় যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইতেছে সে-

গুলি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত সপ্তশতী অপেক্ষা প্রাচীন! কারণ বিংশ শতাব্দীর লিখিত সংস্কৃত ভাষার কাঠামো নিশ্চয়ই মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃতের তুলনায় অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইবে। বস্তুতঃ দুইটি ভাষার তুলনা করিতে হইলে পূর্ব্বে নিশ্চিত রূপে জানা দরকার যে সে দুইটিই জীবিত ও কথিত ছিল, নতুবা তুলনার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু পালি যে কোন দিন কোথাও একটি কথিত জীবিত ভাষা ছিল তাহার প্রমাণ নাই।

পালি পিটককে আদি বুদ্ধবচন মনে করিবার দ্বিতীয় কারণ সিংহল দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থ মহাবংস ও দ্বীপবংসে উল্লিখিত বট্টগামণি-সঙ্গীতি। ইহার মধ্যে বলা হইয়াছে যে বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের ৪৪৩ বৎসর পরে সিংহলের রাজা বট্টগামণির সময় সমস্ত বুদ্ধবচন সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। যদি ধরিয়াও লওয়া যায় যে বট্টগামণি-সঙ্গীতিতে বুদ্ধবচন যে আকারে সংগৃহীত হইয়াছিল সেই আকারেই Pali Text Society কর্তৃক বর্ত্তমান যুগে প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইলেও ইহাকে আদি বুদ্ধবচন বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না, কারণ ৪৪৩ বৎসরের মধ্যে বুদ্ধবচন নিশ্চয়ই ভাবে ও ভাষায় নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাহার উপর বট্টগামণির সময়ে যে বাস্তবিকই বুদ্ধবচন লঙ্কাদ্বীপে সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল সে বিষয়েও কিছু স্থিরতা নাই, কারণ সম্প্রতি অধ্যাপক Lesny Archiv Orientalniতে দেখাইয়াছেন যে মহাবংসের যে অংশে বট্টগামণির রাজত্বকালে বুদ্ধবচন সংগৃহীত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে সে অংশটি প্রক্ষিপ্ত। কাজেই বট্টগামণির দোহাই দিয়া আর পালি পিটকের প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করা চলিবে না।

বাস্তবিক বুদ্ধঘোষের পূর্ব্বে পালি পিটকের কি রূপ ছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই। বুদ্ধঘোষের সমন্তপাসাদিকা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল; তদ্ভিন্ন বুদ্ধঘোষেরও কাল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কিছু জানিবার উপায় নাই। বুদ্ধঘোষের অট্‌ঠকথা (ভাষ্য) গুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার সময়ে পালি পিটক বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু অট্‌ঠকথার ইতিহাসও বিচিত্র। বুদ্ধঘোষ সিংহলান্তর্গত অনুরাধপুরের মহাবিহারে যে সকল অট্‌ঠকথা পাইয়াছিলেন সেগুলি ছিল সিংহলী ভাষায় রচিত। ভারতে সাধারণ্যে প্রচার করিবার জন্য বুদ্ধঘোষ এইগুলি পালি ভাষায় রূপান্তরিত করেন।

এই অট্‌ঠকথাই কিন্তু আমাদের নিকট পালি পিটকের প্রাচীনত্বের একমাত্র প্রমাণ।

বৌদ্ধশাস্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য সংবাদ প্রথম পাওয়া যায় অশোকের শিলালিপিতে। এখন প্রশ্ন অশোকের উল্লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালি পিটক অভিন্ন কি না। আমার বিশ্বাস অশোক যে-বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাহা হীনযানী পালি পিটক হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। পালি পিটকোক্ত হীনযানী বৌদ্ধমতের প্রধান কথা নির্ব্বাণ। অশোক তাঁহার শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্ম্মের এত কথা বলিলেন অথচ এই নির্ব্বাণ কথাটি পর্য্যন্ত কোথাও উল্লেখ করিলেন না ইহা হইতে প্রতীতি জন্মে যে অশোক হীনযানী ছিলেন না। উপরন্তু অশোকের জনহিতব্রতও লক্ষ্য করিবার বিষয়। আত্ম পর সর্ব্বভূতে সুখ ও দুঃখের প্রতি সমান ঔদাসীন্য যে হীনযানী বৌদ্ধমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য সেই মতের সহিত অশোকের "ধম্মে"র পার্থক্য এতদূর যে তাহা প্রায় বৈপরীত্যে গিয়া দাঁড়ায়। অশোকের জনহিতব্রত কিন্তু মহাযানমতসম্মত। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে যে বৌদ্ধমত ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা হীনযান অপেক্ষা মহাযান রূপেই পরিগণিত হওয়া উচিত। তৃতীয়তঃ, অশোক কল্‌সী শিলালিপিতে "গজতমে"র উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে অশোক এই কথাটি দ্বারা বুদ্ধদেবকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মায়াদেবীর স্বপ্নে শ্বেতহস্তী রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে পালি পিটকের কোথাও শ্বেতহস্তীরূপে বুদ্ধদেবের মাতৃগর্ভে প্রবেশের কথা পাওয়া যায় না। এতদ্দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে অশোক মহাযানী বৌদ্ধমতের সহিতই পরিচিত ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে যে অশোক অসীম আগ্রহ দেখাইয়া গিয়াছেন তদ্দ্বারাও এই কথাই প্রমাণিত হয়। সাধারণতঃ ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে যে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে নাগার্জ্জুনের দ্বারাই মহাযান মত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু একথা সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক। নাগার্জ্জুন মহাযান মতকে একটি বিশেষ রূপ দিয়াছিলেন মাত্র। আদিম বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যেই ইহা অঙ্কুর রূপে বিদ্যমান ছিল।

বৌদ্ধধর্ম্মের উদ্ভব হঠাৎ হয় নাই। বৈদিক যুগের অবসানে যখন সারা ভারতবর্ষ নানা দার্শনিক মতবাদে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত, সেই সময়ে সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি মতবাদের সহিত বৌদ্ধ মতবাদের উদ্ভব। কিন্তু এই সব

মতবাদ গ্রন্থাকারে বা সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের অভ্যুদয়ের প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে। পরস্পরের সহিত তুলনা না করিলে এই সকল মতবাদের কোনটিরই ইতিহাস উদ্ধার করা সম্ভব নয়; এবং যে পরিমাণে এই ইতিহাস উদ্ধার করা যায় তাহা হইতে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে এই সকল বিভিন্ন মতবাদ সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া একই সমাজ ও ধর্ম্মসমবায়ের মধ্যে কখনও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে, কখনও পরস্পরের সহায়করূপে, ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু দার্শনিক মতবাদের বিচারে তাই বৌদ্ধমতবাদের বিচারও অবশ্যম্ভাবী; একটিকে অবহেলা করিলে অপরটি বুঝিতে পারা সম্ভব নয়। হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদের পরস্পর তুলনা কিন্তু সহজ নহে, কারণ ইহাদের প্রত্যেকটি অতি প্রাচীন কালেই বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল বিভিন্ন শাখার তুলনা করিয়া তবে হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের আদি রূপের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়।

সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে জাগতিক সকল বস্তুর ক্ষণবিধ্বংসিতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা লক্ষ্য করাতেই মানুষের মনে প্রথম দার্শনিক চিন্তাধারার উন্মেষ হইয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ আদি গ্রীক্ দার্শনিকদের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সর্ব্বপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক Thalesই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে নিয়ত পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও বস্তুর অনন্যত্ব কিরূপে অক্ষুণ্ণ থাকে ইহাই দার্শনিকের প্রথম ও প্রধান সমস্যা। কিরূপে জলবাদের সাহায্যে তিনি এই সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত। অনুরূপ পন্থায় Anaximenes প্রচার করেন যে জগৎ বায়ুমাত্র, ইত্যাদি। এক বস্তুর সাহায্যে অপর বস্তুর বস্তুত্ব বিনির্ণয়ের এই প্রচেষ্টা কিন্তু বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। শেষে Heraclitus প্রচার করিলেন যে বস্তুর বস্তুত্ব বস্তুতে নহে ধর্ম্মে (principle) নিহিত, এবং এই ধর্ম্মই নিয়তপরিবর্ত্তনশীলতা ও ক্ষণবিধ্বংসিতা। Pythagoras-এর সংখ্যাবাদের সাহায্যে বস্তুর ধর্ম্মনিষ্ঠতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, এবং এইরূপে বস্তুর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া Socrates-Plato-Aristotle-এর হস্তে গ্রীক্ দর্শন ক্রমশঃ পরাবিদ্যায় উন্নীত হইল। গ্রীক্ দর্শনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস মোটামুটি এইরূপ। এবং এই ইতিহাস এতই সুস্পষ্ট যে Thales হইতে Aristotle পর্য্যন্ত এই সকল দার্শনিকের জীবিতকাল আমাদের অজ্ঞাত থাকিলেও ইহাঁদের মতবাদের তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এই দার্শনিকদের আপেক্ষিক কাল নির্ণয় করা

সম্ভব হইত। এখন ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলির ক্রমবিবর্ত্তনও যে গ্রীসের মত সহজ ও স্বাভাবিক পন্থায় ঘটিয়াছিল একথা স্বীকার করিয়া লইতে কোন বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকদের মতই মাত্র আমাদের জানা আছে, কাল জানা নাই। কাজেই এই মতবাদগুলিকে যেভাবে বিন্যাস করিলে ক্রম-বিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিস্ফুট হইয়া পড়ে তাহাই আমাদিগকে প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস উদ্ধারের ইহাই একমাত্র উপায়। বৌদ্ধমতকে উপেক্ষা করিলে কিন্তু বিবর্ত্তনানুযায়ী মতবাদগুলির ক্রম-বিন্যাস সম্ভব নয় ইহাই এখন দেখাইবার চেষ্টা করিব। এই সম্পর্কে বৌদ্ধমতেরও প্রধান প্রধান চিন্তাধারাগুলির আলোচনা করিতে হইবে।

বৈদিক যুগের অবসানে বহু বিভিন্ন অথচ পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দার্শনিক মতামত কিরূপে ভারতীয় সমাজকে বিক্ষোভিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার পরিচয় একদিকে উপনিষদগুলি হইতে এবং অপর দিকে পালি পিটকান্তর্গত সামঞ্ঞফলসূত্র হইতে বেশ উপলব্ধি করা যায়। এই সকল মতবাদের কয়েকটি বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতে পর্য্যন্ত পরিণত হইয়াছিল, কিন্তু অপর সকল মতবাদ কোন দিনই হিন্দু সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যায় নাই। এইগুলিই পরবর্ত্তী যুগের সাংখ্যযোগাদি মতবাদের সূচক। যে চিন্তাধারাটি সুসংবদ্ধ হইয়া পরবর্ত্তী যুগে সাংখ্য দর্শনে পরিণত হইয়াছে সেইটিই মনে হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, কারণ একদিকে ন্যায় বৈশেষিকাদি হিন্দু দার্শনিক মত এবং অপরদিকে বৌদ্ধ দর্শনেরও বিভিন্ন মতা-মত এই আদিম সাংখ্য মত হইতেই উদ্ভূত এরূপ কল্পনা আদৌ ক্লেশকর নহে। কিন্তু কল্পনা করা ক্লেশকর না হইলেই সাংখ্যের আদিমত্ব প্রমাণিত হয় না; পূর্ব্বে যে বিবর্ত্তনানুযায়ী মতবাদগুলির ক্রমবিন্যাসের কথা বলিয়াছি তদনুযায়ী আরও দেখাইতে হইবে যে সাংখ্যমত হইতে যাত্রারম্ভ করিলেই সমগ্র ভারতীয় চিন্তাধারা সুবোধ্য ও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অর্থাৎ দেখাইতে হইবে, যে পন্থায় সামান্য ক্রম-বিন্যাস আপনা হইতেই ক্রমবিকাশ ও বিবর্ত্তনের ইতিহাসে পরিণত হয় সেই পন্থার প্রথম সোপান সাংখ্য।

সাংখ্য দর্শনের সহিত বৌদ্ধমতের অতি নিকট সম্পর্ক লক্ষ্য করিয়া কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন বুদ্ধদেবের জন্মস্থান কপিলবস্তুই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কপিলের অধ্যুষিত নগর। কিন্তু কেবলমাত্র শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর

করিয়া কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আমাদের স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ঋষি কপিল সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শুধু ঋষি কপিল কেন, তাঁহার অনুবর্ত্তী আসুরি, পঞ্চশিখ ও সন্দনাচার্য্য সম্বন্ধেও আমরা কিছুই জানি না। চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে সাংখ্য প্রচারক বিন্ধ্যবাসী বৌদ্ধদিগকে তর্কযুদ্ধে জর্জ্জরিত করিয়াছিলেন। চৈনিক ইতিহাস অনুযায়ী বিন্ধ্যবাসীর কাল প্রথম শতক। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা চীন ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল, সপ্তম শতকে—শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বে—গৌড়পাদের জন্ম, এবং দ্বাদশ শতকে বাচস্পতিমিশ্র তাঁহারা সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী রচনা করিয়াছিলেন। সাংখ্য সম্বন্ধে ইহাই আমাদের মূলগ্রন্থ। কিন্তু এই সব ঐতিহাসিক তথ্য হইতে সাংখ্যদর্শনের উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই; তজ্জন্য আমাদিগকে অন্যান্য মতবাদের সহিত তুলনামূলক বিচারের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

সাংখ্যমতকে অতি প্রাচীন মনে করিবার প্রধান কারণ দুইটি। প্রথমতঃ, অন্যান্য মতের তুলনায় সাংখ্যগণ সহজ ও সরল পন্থাতেই কালাত্যয় সত্ত্বেও বস্তুর অনন্যত্ব সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয়তঃ একাধিক মূলতত্ত্ব সম্পর্কে আদি বৌদ্ধমতের সহিত সাংখ্যের সম্বন্ধ অন্ততঃ আমার মত অদার্শনিকের নিকট এত নিকট বলিয়া মনে হয় যেন এদুটি একই আদি চিন্তাপ্রণালীর দুইটি বিভিন্ন ধারা। আদি সাম্যাবস্থা হইতে বিচলিত হইয়া পুরুষও প্রকৃতির অনন্ত বিবর্ত্তনের পর অন্তে পুনরায় আদ্যাবস্থায় পুনরাবর্ত্তন—ইহাই সাংখ্যের মূল কথা। বৌদ্ধগণ আদি ও অন্তের সাম্যাবস্থা অপ্রমেয় বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন—ইহাই সাংখ্যমতের সহিত বৌদ্ধমতের প্রধান পার্থক্য। আদ্যন্তের সাম্যাবস্থা স্বীকার করার জন্যই সাংখ্যগণ বলিতে পারিয়াছিলেন "সর্ব্বং নিত্যম্," এবং ইহা অস্বীকার করাতেই বৌদ্ধদিগকে বলিতে হইয়াছিল "সর্ব্বমনিত্যম্"। সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয়েই ক্ষণিকবাদী এবং ইহাই উভয় মতের মূলতত্ত্ব।

এই ক্ষণিকবাদ ভারতীয় দর্শনের একটি গৌরবের বস্তু। গ্রীস্-এ অবশ্য Heraclitus-এর সময়েই ক্ষণিকবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; কিন্তু ভারতীয় দার্শনিকগণের হস্তে অতি প্রাচীন কালেই এই মত যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল আধুনিক যুগেও, বিজ্ঞানের সাহায্য সত্ত্বেও, ইউরোপীয় দার্শনিকগণ সে অবস্থায় পৌছিয়াছেন

কিনা সন্দেহ। সাংখ্য ও বৌদ্ধ উভয়ের ক্ষণিকবাদ যে সম্পূর্ণ অভিন্ন নহে তাহা বলাই বাহুল্য। সাংখ্যমতে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির বিবর্ত্তন, সুতরাং সে বিবর্ত্তন নিরবচ্ছিন্ন –সে বিবর্ত্তনের এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা পর্য্যন্ত একটি নিরন্তর সম্বন্ধ বর্ত্তমান। যে কোন বস্তু বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে যেরূপ পর মুহূর্ত্তে আর সেরূপ নহে—এবিষয়ে উভয়েই একমত ; কিন্তু সাংখ্য বলিবেন বিভিন্ন হইলেও এই দুই অবস্থা নিঃসম্বন্ধ নহে। এবং বৌদ্ধ বলিবেন এ দুই অবস্থার মধ্যে পরস্পর কোন সম্বন্ধই নাই, কারণ প্রথম মুহূর্ত্তে যাহা বর্ত্তমান ছিল দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা। সুতরাং Heraclitus-প্রোক্ত নদীর জলের রূপক দিয়া সাংখ্যের ক্ষণিকবাদ বুঝান যাইতে পারে,—যে আপাতদৃষ্টিতে প্রবহমান নদী দীর্ঘকাল ধরিয়া অনন্য রহিলেও তাহার গর্ভস্থ জল প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বৌদ্ধগণ তাঁহাদের ক্ষণিকবাদ বুঝাইবার জন্য ভিন্ন রূপকের আশ্রয় লইয়াছেনঃ— যদি একসারি প্রদীপের এক একটি প্রজ্বালিত করিয়া তন্মুহূর্ত্তেই পুনরায় নিবাইয়া দেওয়া হয় তবে মনে হইবে যে "একটি" দীপশিখা দীপশ্রেণীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতেছে। দীপরাজির অনন্তর পারম্পর্য্যের দ্বারাই এ ক্ষেত্রে অগ্নিশিখার নিরবচ্ছিন্ন অস্তিত্ব রূপ ভ্রম উৎপাদিত হইতেছে। সাধারণ যে কোন বস্তুর অস্তিত্বও এই একই ভ্রমপ্রসুত, কারণ প্রথম মুহূর্ত্তের বস্তু দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আর অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুর এই রূপান্তর কেবল "পরিবর্ত্তন" বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কারণ পরিবর্ত্তন কি? A যদি B-তে পরিণত হয় তাহাকে পরিবর্ত্তন বলা যায় না, কারণ তাহা একবস্তুর স্থলে অপর বস্তুর প্রতিষ্ঠা, —ইহা replacement, change নহে। আর A যদি $\frac{A}{x}+B$-এ পরিণত হয় তবে তাহাও আংশিক পরিবর্ত্তন মাত্র। ইহার কোনটির দ্বারাই বস্তুর পূর্ণ পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারা যায় না। অথচ পূর্ণ পরিবর্ত্তন যে ঘটিয়া থাকে তাহাও অস্বীকার করার উপায় নাই। সুতরাং ক্ষণবিধ্বংসিতার আশ্রয় লইতে হইবে। বাহ্যিক বস্তু সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়াদি সহযোগে প্রথম মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে অনুভূতি জন্মিল। বস্তুটি তন্মুহূর্ত্তেই লয় প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ অনুভূতি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কল্পনা দ্বিতীয় মুহূর্ত্ত হইতে বস্তুর অনস্তিত্ব সত্ত্বেও তৎসম্বন্ধে প্রতীতির সৃষ্টি করিবে। অনুভূতি অস্তিত্বজ্ঞানের উপাদান, কল্পনা তাহার কারক। বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঠিক এই কথাটিই বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান যুগে Bergson

ছায়াচিত্রের তুলনা করিয়াছেন ঃ—ছায়াচিত্রে যেমন দৃশ্যপটের উপর প্রতি মুহূর্তে নূতন চিত্র প্রতিফলিত হইলেও দীর্ঘকাল ধরিয়া একই চিত্র দেখান হইতেছে এইরূপ ভ্রম উৎপাদন করা সম্ভব, প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে বাস্তব জগতেও প্রতিনিয়ত তাহাই ঘটিতেছে। Bergson-র কথা উঠিতে আপনা হইতেই মনে আসে, ক্ষণ-বিধ্বংসিতা কোন বস্তুর ধর্ম্ম না হইয়া কালের ধর্ম্মও হইতে পারে। সেইজন্য Bergson যেমন কাল (time) হইতে পৃথক একটি সময়ের (duration) কল্পনা করিয়াছেন প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিকগণও তাহা করিয়াছিলেন। ঢেউ যেমন জল হইতে অভিন্ন হইয়াও পৃথক, সময় সেইরূপ অচঞ্চল কালগর্ভে "ক্ষণিক" হিল্লোল।

বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ "প্রতীত্যসমুৎপাদ," —প্রথমটি স্বীকার করিলে দ্বিতীয়টি স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ লইয়াই হিন্দু নৈয়ায়িকদিগের সহিত বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের প্রধান বিবাদ। হিন্দু নৈয়ায়িকগণ realist, তাঁহারা সর্ব্বত্র কার্য্যকারণসম্বন্ধে বিশ্বাসী। যদি দেখা যায় যে কাক আসিয়া তালের উপর বসাতে তালটি বৃক্ষচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িল তবে নৈয়ায়িক বলিবেন তাল পড়ার "কারণ" কাকের তাহার উপর আসিয়া বসা। বৌদ্ধ কিন্তু একথা স্বীকার করিবেন না; তিনি বলিবেন কাক বসা ও তাল পড়া এই দুইটি ঘটনার মধ্যে পারম্পর্য্য সম্পর্ক ভিন্ন আর কোন সম্বন্ধ আছে তাহা প্রমাণ করা যায় না। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের স্থলে কালগত পারম্পর্য্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার নামই প্রতীত্যসমুৎপাদ (dependent origination)। সামান্য অস্তিত্বও তাল পড়ার মতই একটি ঘটনা। অনন্তর দুই মুহূর্ত্ত ব্যাপী অস্তিত্ব ব্যতিরেকে অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; কিন্তু বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদীর পক্ষে দুই মুহূর্ত্ত ব্যাপী অস্তিত্ব স্বীকার করা সম্ভব নয়। ক্ষণিকবাদীর নিকট কার্য্য (কাক বসা) ও কারণ (তাল পড়া) সম্পূর্ণ discrete দুইটি ঘটনা, সুতরাং তাহাদের মধ্যে কোন "সম্বন্ধ" থাকা সম্ভব নয়। কাজেই "কাক বসিল বলিয়া তাল পড়িল" এ কথা বলা অযৌক্তিক। বড় জোর বলা যাইতে পারে "কাক বসিল এবং তাল পড়িল"। ইহাই প্রতীত্যসমুৎপাদ। নৈয়ায়িক বলিতে পারেন "তস্মাদেতদ্ভবতি"; কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদবাদী বৌদ্ধকে বলিতে হইবে "তস্মিন্ সতি ইদং স্যাৎ।"

বেদান্তের সহিত বৌদ্ধদর্শনের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে বিচার করা প্রয়োজন বৌদ্ধগণ "আত্মা (পালি "অত্তা") কথাটি কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন,—self অর্থে না soul অর্থে। বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক সময় অনাত্মবাদ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাই আদি বৌদ্ধ মত কিনা তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈত রহিয়াছে। অধ্যাপক Walleser বহু আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে পালি পিটকে "অত্তা" কথাটি যে কোথাও soul অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। অথচ ব্যক্তিত্ব বিশ্লেষণ করিতে গিয়া যে বুদ্ধদেব সর্ব্বত্র স্কন্ধসমষ্টির মাত্র উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহাও নহে, কোথাও কোথাও তিনি তদতিরিক্ত আরও কিছুর ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই বেদান্তের আত্মা কিনা তৎসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এখনও একমত নহেন। প্রথমাবস্থায় কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বেদান্তের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ বেদান্তের যাহা কিছু মূল তথ্য সমস্তই বৌদ্ধগণ নির্ম্মম ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়মের কোন চিহ্নই বৌদ্ধদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায় না। বহুর স্থলে একের প্রতিষ্ঠাই বৈদান্তিকের উদ্দেশ্য এবং একঁকে বহুধা বিচ্ছিন্ন করাতেই বৌদ্ধ দার্শনিকের চরম পরিতৃপ্তি। কিন্তু অধ্যাপক Shtcherbatsky দেখাইয়াছেন কিরূপে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত এই দুই মতবাদের মধ্যেও আংশিক ঐক্য সম্ভব হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে শূন্যবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বৌদ্ধমতে শূন্যতাই বহুর মধ্যে একের প্রতীক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে যাহা মিলনের প্রধান অন্তরায় ছিল পরে তাহাই হইয়া পড়িল সংযোগের সেতু। এই সেতু অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধ দর্শন বেদান্তের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এ প্রভাব শঙ্করাচার্য্য স্বীকার না করিলেও গৌড়পাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। শূন্যবাদ বৌদ্ধ তথা ভারতীয় দর্শনের অমূল্য সম্পদ। বর্ত্তমানে Europeএ যাহা relativity বলিয়া পরিচিত তাহাই শূন্যবাদ। যে কোন বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান অপর সকল বস্তু হইতে সেই বিশেষ বস্তুটির পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। "A thing is seen to be what it is only by contrast with what it is not" (Mill)। এখন প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান যদি অপরাপর বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তবে স্বীকার করিতেই হইবে যে কোন বস্তু সম্বন্ধেই 'প্রকৃত' জ্ঞান মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের যতদূর চিন্তার প্রসার তাহাতে সম্পূর্ণ শূন্যকেই বস্তুত্বের ভিত্তিরূপে স্বীকার

করিয়া লইতে হইবে—ইহাই মাধ্যমিকাচার্য্য নাগার্জ্জুনের মূল কথা। কিন্তু নাগার্জ্জুনের শূন্যবাদও তাঁহার পরবর্ত্তী যুগের বিরাট দার্শনিক, যোগাচার-বিজ্ঞানবাদ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা, অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর হস্তে নিষ্কৃতি পায় নাই। ইহাদের মতে বস্তু স্বভাবশূন্য হইলেও যাহা চিত্তমাত্র তাহা অ-পরতন্ত্র। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃষ্ট এই উভয়েরই অতিরিক্ত আছে একটি "বিশুদ্ধ" দৃষ্টি—পরমার্থ সত্য। ইহা তো প্রায় বেদান্তের ব্রহ্মবাদ!

ভারতীয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠযুগে ভারতীয় চিন্তাধারা কিরূপে প্রকাশ ও প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহার ইঙ্গিত মাত্র বর্ত্তমান প্রবন্ধে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে প্রতিপদে বৌদ্ধদর্শনের সহিত তুলনা করিলে তবে হিন্দুদর্শনের ক্রমবিকাশ সুস্পষ্ট হইবে। দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। তবে বিষয়টির প্রতি অনুরাগবশতঃ যদি "চাপলায় প্রণোদিত" হইয়া থাকি তবে আশা করি বিশেষজ্ঞগণ আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। কিন্তু চাপল্যের শাস্তিবিধানই বিশেষজ্ঞদের প্রধান বা একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাদিগকেও ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাস জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিতে হইবে, এবং প্রকাশের যে প্রণালী আছে সেই প্রণালীতে প্রকাশ করিতে হইবে। ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাস যেন "Descriptive Catalogue of Philosophical Treatises in Sanskrit-এ পরিণত না হয়। Robin তাঁহার Pensee Grecque-এ একটি অনতিবৃহৎ গ্রন্থেই গ্রীক চিন্তাধারার একটি সুসংবদ্ধ ইতিহাস দিয়া গিয়াছেন। একাদশ খণ্ডে সমাপ্ত Kuno Fischer-এর বিরাট গ্রন্থ Geschichte der neueren Philosophie হইতে আমরা আধুনিক Europe-এর চিন্তাপ্রণালীর একটি বিশদ বিবরণ পাই। এই প্রণালীতে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস কবে লেখা হইবে?

শ্রীবটকৃষ্ণ ঘোষ

আবর্ত্ত

৯

খগেন বাবু পরের দিন সন্ধ্যায় রমলা দেবীর বাড়ি এলেন। সকালে মাসীমার সঙ্গে যা কথোপকথন হয় তাইতে বুঝেছিলেন যে তাঁর মন 'মেম-সাহেবে'র সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে। সন্দেহের রূপ সুস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার অস্তিত্বকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাঁর পালিত-পুত্রের স্নেহের মাত্রাহ্রাসে তিনি নিরাগ্রহ, কিন্তু দিক্‌পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে উদাসীন নন। অভ্যস্ত আসক্তি তাঁর হৃদয়ের চারপাশে এক দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর রচনা করেছে। সকলেরই প্রাচীর থাকে, তার পাদদেশে পরিখা, শেওলাভরা মজা নদী বিষাক্ত বাষ্প উদ্‌গীরণ করে, কিন্তু অচলায়তনের অধিবাসীর অসহ্য নয়। মাসীমার চারপাশে জলই নেই। রমলা দেবীর হৃদয় স্রোতস্বিনীর অন্তরে দ্বীপের মত। তাঁর অনুভূতিকে খগেন বাবু সত্য বলে স্বীকার করেন। তাঁকে গ্রহণ করার অর্থই হল মাসীমার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ। তবু, মাসীমার ওপর রাগ হয় না।

আজ রমলা দেবীর ঘরে টেবিল-ল্যাম্প, ঘনসবুজ কাচের আবরণ, তার ওপর ঘেরাটোপ, কোণে মুক্তার দুল ঝোলে। শেড্ বাঁকান, আলো পড়েছে রমাদেবীর মুখে ও গলায়। মুখের একটি পাশ দেখা যায়, অন্য গালে হাত রাখা, সোনার দু'গাছি প্লেন চুড়ি চিক্ চিক্ করে। গলার হার ঝিকঝিকে, শীতল স্বস্তিকা দোলায় নিদ্রিত, মা অন্যমনস্ক, তবু নিদ্রিত শিশুকে ধীরে ধীরে দোলা দেন। শঙ্খশুভ্র সাড়ি, ট্যানাগ্রার মূর্ত্তির মতন সর্ব্বাঙ্গে মোলায়েম ভাঁজ পড়ে, উরুর গঠন ফোটে, খালি ছোট্ট পা, শশকের মতন শঙ্কিত।

শেড্ বাঁকাবার পর আলো পড়ল খগেন বাবুর মুখে। রমলা দেবী উঠে ঘেরাটোপ তুলে নিলেন।

খগেন বাবু বল্লেন, 'সুজন আসে নি। তাকে আনলাম না।'

'শেড্‌টা থাকবে?'

'দরকার নেই। কাচটাও তুলে রাখুন। দাঁড়ান, গরম বোধ হয়, আমি তুলে দিচ্ছি।' কিন্তু রমলা দেবী নিজেই তুলে রাখলেন।

'আজ আপনি কেমন?'

'আমি ! আপনি কেমন ? কালকের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা করুন। একটু চা করে দিই ? থাকগে, খাবেন না। বসুন, আজ গল্প করুন। একটা গল্প শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'কিসের গল্প ? ভূতের, সাপের, ডাকাতের, না দেশ-বিদেশের ?'

'না, মানুষের।'

'মানুষের গল্প বলতেই এসেছি। মানুষের গল্প হয় তিন প্রকারের—প্রেমের, মৃত্যুর, এবং সাধনার, অর্থাৎ জীবনের। কোনটা ?'

'মৃত্যু চাই না, সাধনাও নয়, অত ভাবতেও পারি না।'

'শুনুন। একটি মেয়ে, একটা ছেলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাৎ আছে, জীবন বিফল হল। গল্প শেষ।'

'অন্য রকমও হয়।'

'আপনি নতুন সাহিত্য পড়েন বুঝি ?'

'আচ্ছা আমি আরেকটি গল্প বলছি। একটি ছেলে, আর একটা মেয়ে। মেয়েরা চালাক হয় কিনা, তাই প্রথম থেকেই জানত যে ওকে না হলে চলবে না। ছেলেরা বোকা, তাই গোড়ায় জানত না, পরে যখন টের পেলে যে তারও না হলে চলবে না, তখন, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।'

'কিন্তু ফিরে ত' এল ! তারপর ?'

'তারপর ছেলেটি যা করবে তাই মেয়েটার ভাগ্যে আছে।'

খগেন বাবুর চিবুকের মাংসপেশী মুখে সঞ্চারিত হয়। রমলা দেবীর মুখে হাসি ছল্‌কে উঠতে চায়, ডান হাতের তালুর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। রেখা অস্পষ্ট, তাই ডান হাত আলোর তলায় টেবিলের ওপর চিৎ করে রাখেন, রেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, বড় ষ্টেশনের রেল-লাইনের মতন কাটাকুটি, বেসামাল হলেই দুর্ঘটনা ঘটবে, আঙ্গুলের ডগা একটু ফোলা।

খানিকক্ষণ কৃত্রিম মনোযোগের সঙ্গে দেখবার পর চোখ না তুলে রমলা দেবী জিজ্ঞাসা করলেন. 'আপনি হাত দেখতে জানেন ?'

'না।'

'তবে কী সাধু ! নিশ্চয় জানেন, দেখবেন না তাই বলুন ! চেষ্টা করুন, পারবেন।'

খগেন বাবু রমলা দেবীর হাত নিজের হাতের ওপর তুললেন।

'এখনও রেখা ফোটে নি।'

'মুখে ফুটেছে, বিজন বলেছে। হাত দেখুন, পুরানো রেখা দেখেই বলুন না?'

'জীবনে নানা প্রকার, না, তা ত' দেখছি না···মাত্র একবার আঘাত পেয়েছেন।'

'মাত্র একবার!'

'তাই দেখছি।'

'কপালে সুখ আছে?'

'রেখা ফোটেনি। বুদ্ধিটা ভাল, হৃদয়বৃত্তিও উন্নত, স্বাবলম্বী।'

'না গো না, ঠাকুর···'। রমলা দেবী হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

'আচ্ছা আমি দেখি।' রমলা দেবী খগেনবাবুর হাত পরীক্ষা করতে লাগলেন। 'অতীত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সবই বলতে পারি। একে একে বলছি··· অতীতে আদুরে ছেলে, ভবিষ্যতে অন্যের···'

'অন্যের? কার?'

'কার আবার? যেন জানেন না!'

'বর্ত্তমানে?'

'ভবিষ্যৎ সুরু আজ থেকে। এই বর্ত্তমান।'

'ভুল হল। বর্ত্তমানে স্বাধীন, ভবিষ্যতে সকলের।'

হাতটা জোরে সরিয়ে রমলা দেবী খগেন বাবুর চোখে চোখ রেখে বল্লেন, 'বর্ত্তমান আমার অধিকারে। আচ্ছা সে-সব কথা থাক্। গল্প বলুন—ভাল লাগবে কি না জানি না। আচ্ছা থাক্···আমি বলছি। ভাল লাগবে না? তার চেয়ে দুজনে চুপ করে বসে থাকি, কেমন?'

অনেকক্ষণ দুজনে বসে থাকেন, খগেনবাবু গালে হাত দিয়ে, চোখ নামিয়ে, রমলা দেবী কোলের ওপর দুটি হাত জুড়ে, খগেন বাবুর মুখে চোখ রেখে। চোখের পলক পড়েই না···মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়, খগেন বাবুই চোখ নামিয়ে নেন। একাগ্রতায় রমলা দেবীর চোখের জল শুকিয়ে যায়। খগেন বাবুর চিত্ত অস্থির হয়, মুখে দ্বন্দ্বের সামান্য নিদর্শন ভেসে ওঠে, চিত্তের গোপনস্তর থেকে শক্তি আহরণ করতে চেষ্টা করেন, শক্তি আসে না বেরিয়ে, হতাশায় ব্যথিত হন। তার লক্ষণ দেখে

রমলা দেবীর একগ্রতা বাড়ে। চিবুক সুদৃঢ় হয়। যেমন বলদেবের তনুত্যাগের সময় জঠর থেকে ফণী নির্গত হয়েছিল, তেমনই রমলা দেবীর অন্তরের বাসনা চোখের জ্যোতির আকারে বিচ্ছুরিত হয়। অন্তরালের যুদ্ধে দেহ অবান্তর। খগেন বাবুর হাত ভারি ঠেকে, লতিয়ে পড়ে। দেহকে মনের সাথে যুক্ত করতে যান, প্রয়াসে কপালে বলী পড়ে।

রমলা দেবী ধীরে উঠে পিছন থেকে খগেন বাবুর কপালে হাত দিলেন। বলী তিনটি অদৃশ্য হল। রমলা দেবীর করতলে উষ্ণশ্বাস লাগে, 'চোখের পাতা অত শক্ত কেন? যেন তীর!'

'গন্ধ মাখা হয়েছে বুঝি?'

রমলা দেবী টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতরের শিশি বার করে খুলে ভুরুতে মাখিয়ে দিলেন...'এইবার আশ্রম থেকে নির্ব্বাসন! বিলাসী শিষ্যের স্থান নেই আশ্রমে। তখন কোথায় থাকা হবে?'

'সেই কথাই বলতে এসেছি। যে-ভিক্ষা চেয়েছিলাম তা মঞ্জুর হবে না?'

'না। আর আমি নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেব না, কিছুতে দেব না। সে হয় না।'

'শুনুন আমার কথা।'

'শুনব না, কান আমার ভোঁ ভোঁ করে। অন্য দিকটা বুঝি দেখতে নেই একেবারে!'

'অন্য দিকের কথাই বলব।'

'বলুন, শুনব, কিন্তু মানব না।'

'মানিলে ভাল হবে। আমার, আপনার...'

'ভাল আর ভাল,! কিছুতে ভাল কারুর হয় না অমন অন্ধ হলে। মনকে ফাঁকি দিয়ে উপকার! মন চাইছে এক, আর বলছে অন্য। একে সত্য আচরণ বলে না। মিথ্যার ওপর আসন পাতা যায় না, সে-আসনে পূজা হয় না, যতই মন বিক্ষিপ্ত হয় ততই ভাবতে হয় ওপরে উঠছি। ও-সব মনের জুচ্চুরি, ছেলেখেলা। সোজা কথা এই, আমি কাউকে শঠ হতে দেব না। তাতেই সকলের কল্যাণ হবে। কি এতদিন করলেন যার শেষ এখনও হল না? এমন কি ব্রত যার উদযাপনে

এতদিন লাগে ? এত নিজের পানে চাইবেন না—চাইবেন না। একলা সাধনা হয় না। পরকে অত ঘৃণা করতে নেই।'

'আমিও তাই ভাবি। সেইটাই আমার পরীক্ষা, ভিক্ষা, যাই বলুন। আমার অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে, মতামতে নয়, ভেতরে। ভেবেছিলাম, আপনার সামনে তার হিসেব-নিকেষ করব। অঙ্কের হিসেব নয়, তালিকা প্রস্তুত নয়, যেমন নীলামের সময় উকীল ও পেয়াদারা করে। খতেন-পড়েনও নয়। কি করতে চেয়েছিলাম তাও জানিনা। হয়ত, কেবল কথা কইতেই এসেছিলাম, মন উজাড় করে। এতদিন মনে মনে যা ভেবেছি তার প্রকাশ করার তাগিদ থাকবে না ? ঘরের দোর-জানালা বন্ধ ছিল, বাবু গিয়েছিলেন প্রবাসে, আসবাব-পত্রে আলো হাওয়া লাগে নি।'

'মুকুন্দ ঘর-দোর পরিষ্কার রেখেছে।'

'যথাসাধ্য করেছে। আপনি ঠিকই ধরেছেন, একলা সাধনা হয় না। তাই, আমি চাই শক্তি আহরণ করতে সর্ব্বসাধারণের ভাণ্ডার থেকে, তাদের জীবনীশক্তি থেকে ! এ-সব কি বলছি ! আপনার ভাল লাগবে না জানি, এতদিন পরে দেখা হল, কেমন আছেন, কেমন ছিলেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না, আপনিও পারলেন না, অথচ কত যত্নই না আপনি করেছেন ! স্বাভাবিক ভদ্র আচরণে কি হবে এখন ? পারছি না কি করব ! যার যা স্বভাব, সেই অনুসারেই ব্যবহার করা ভাল। কেমন ?'

'আমিও পারিনি।'

'আপনি ঠিক বুঝেছেন। পরের দিকে তাকাই নি। আমি এতদিন সকলকে অবহেলা করেছি, ঘৃণা করেছি, এক প্রকার আততায়ীর মত ব্যবহার করেছি। ভয় ছিল পাছে তারা আমার দুর্ব্বলতা জানতে পেরে আমাকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যায় তাদের স্তরে। তারা ছিল ইতর অস্পৃশ্য। শুচিবাইয়ে পাগল হলাম। জনমতের বিপরীত মত পোষণ, সার্ব্বজনীন ব্যবহারের বিপক্ষাচরণকেই ভাবতাম ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ। তারা বোঝেনা সাহিত্য, গান, চিত্রকলা, বিজ্ঞান, তাদের চিত্ত নেই, ভদ্রতা নেই, এই ছিল আমার ধারণা। বেশ ছিলাম বলতে পারি না। আমার স্বাবলম্বন নিরালম্বতার নামান্তর হল। একদিন বুঝলাম, সাবিত্রীর আত্মহত্যাই আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে আমি একজন

আত্মম্ভরি মানুষ ছাড়া অসাধারণ পুরুষ নই। আমার অহংজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার সাধনায় বাধা দিলে।'

'যা হবার তা হয়ে গেছে। নিজের স্বভাবকে ছাড়িয়ে ওঠা যায় না, উচিত নয়।'

'না, তা নয়। প্রকৃতিকে অতটা প্রাধান্য দিতে পারি না। এতদিনকার কাজ বরবাদ হয়ে যাবে যে! সে হয় না।···স্বভাবকে ছাড়ানো যায় না—এ-জ্ঞান যদি আসে তবে পরে আসুক। প্রথম থেকেই গ্রহণ করলে আর্ট, বিজ্ঞান, সমাজ সব বাতিল পড়ে। কোনটা স্বভাব তাই বুঝিনা। যেটা রক্তমাংসে আবদ্ধ না যেটা সমবেত মানবের সামাজিক সৃষ্টি? সেও প্রায় দশ হাজার বছর হতে চলল। অবশ্য তাও আমি মানতে পারি না। সেখানেও দেখি, সব আকাশে ঝুলছে··· দেশের আর্ট গুহায় সেঁধোচ্ছে, গায়ক লুকোচ্ছেন ওস্তাদির আবডালে, সাহিত্য আত্ম-বিনাশ করছে ইচ্ছাপূরণে. আর বিজ্ঞান? বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগার এক-একটি মর্গ্, আপনি ত' দেখেছেন। সব অঙ্ক কষছে, পাছে লোকে বুঝে ফেলে, আর না হয় বড়লোকের দাসত্ব, ঝগড়াঝাঁটি। জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে মানুষ বাইরের ও অন্তরের প্রকৃতি করায়ত্ত করছে, এমন সময় সমাজের সঙ্গে তার যোগ গেল ছিঁড়ে। সাধারণের কেন ছবি, গান, সাহিত্য ভাল লাগবে, বলুন? কেমন করে স্বামী স্ত্রী সুখী হবে, বলুন? তাল রাখতে হবে সভ্যতার গতির সঙ্গে·· নচেৎ মৃত্যু সুনিশ্চিত। ···আপনার কি মনে হয়? তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে সেতার বাজান, কবিতা পড়েন। এঁরা ভদ্রলোক, এঁরাই স্বভাবের ওপর জুলুম করেন না। কিন্তু এঁদের গোপন সাধনা দেখলে হাসি পায়। ক্ষতিপূরণ যদি করতেই হয় তবে সাহস ভরে করাই ভাল।'

'আমাদের অত প্রয়োজন হয় না। সংসার চালাতে গেলে কিছু না জানলেও চলে। কেবল পরের মন যুগিয়ে চলার জন্য অত কিসের দরকার বলুন?'

'একার সংসারে দরকার নেই। আমি অন্য কথা ভাবছি। জীবন আমার নয়, আপনার নয়, কোনো মহারথীর নয়। জীবন সকলের···জীবন এই যুগের, যে-যুগ অতীতের কর্ত্তব্যজ্ঞানের উত্তরাধিকারী, বর্ত্তমানের সৃষ্টি-গরিমার সুযোগে সজ্ঞান ও মহীয়ান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সাহায্যকল্পে প্রতীক্ষারত। এতদিনে অনেক কষ্টে বুঝলাম, তাই সাবিত্রীকে বুঝিনি, আপনাকেও নয়।···আমি তাই চাই সমাজের

জীবনধারা বুঝতে। বই পড়ে হবে না। এটা আমার প্রয়োজন, নচেৎ আমি সম্পূর্ণ হব না। সম্পূর্ণ হবার প্রবৃত্তিটা দৈহিক প্রবৃত্তির মতনই জোরাল, দৈহিকই বোধ হয়। বিজনই ঠিক পথ নিলে। এই সুযোগই আমি চাইছি। জোর করে গ্রহণ করার শক্তি আমার নেই, তাই একরকম ভিক্ষাই করছি।'

রমলা দেবীর বুক কেঁপে ওঠে। একবার কোলকাতার বাড়িতে ঘরের মধ্যে একটি সুন্দর লতা টবে রেখেছিলেন, জলসিঞ্চনের ও যত্নের কোনো ত্রুটি হয়নি, সকালে বিকেলে আলো-হাওয়া সেবন করাতেন। একবার দমদমায় মাত্র কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যান···চিন্তামণি জল দিত—ফিরে এসে দেখেন, লতার একটি তন্তু জানলার পর্দ্দার ওপরকার ফাঁক দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছে। তখনই তাকে বিদায় করেন। উর্দ্ধে ওঠার কি অদ্ভুত দুর্নিবার প্রবৃত্তি! পুরুষের অধ্যাত্মস্পৃহাকে কি সত্যই বাঁধা যায় না? নিশ্চয়ই যায়···রবীন্দ্রনাথ ভুল লিখেছেন, তিনি পুরুষ, স্ত্রীশক্তির পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেছেন।

'আমি আপনাকে কি ভাবে সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি আমার চিঠি পড়েন নি? এই সব কথাই ছিল।'

'পড়েছি।'

'তবু প্রশ্ন করছেন?'

'এনে দেব।'

'না, না, আনতে হবে না।'

'লজ্জা করছে? আচ্ছা, আমি আনব না। যে সাহায্য আমার কাছে চাইছেন তা আমি দেব না, তাতে মিথ্যা প্রশ্রয় পাবে।'

'আমি মিথ্যা কথা লিখি নি। আপনার মতে সত্য তবে কি?'

'সত্য? সত্য, আমাকে চাওয়া। আমি জানি। আপনি জানেন না?'

'জানি কি জানি না তাও জানি না। তবে এককালে, কিছুদিন পূর্ব্বেও, সেইটাই হয়ে উঠেছিল সত্য। একটা আস্ত পাহাড় কেটে মন্দির তৈরী হচ্ছিল··· কিন্তু কাজ বন্ধ হল। সেদিন আর নেই। আজ কে সে মন্দির সম্পূর্ণ করবে? যারা জানত তারা হয়ত গত।'

'না, মরেনি, বেঁচে আছে, আমি জানি। আপনিই মেরে ফেলছিলেন।'

'তারা এখন অসভ্য বনবাসী। আমি সহুরে লোক, তাদের সঙ্গে আমার কোনো কারবার নেই। তার চেয়ে, না-চাওয়া, না-পাওয়াই ভাল। তৃষ্ণার সংস্কারই মায়া। এখন চাইলে অস্বাভাবিক হবে, পেলেও বিষাদ আসবে, আজ না হয় দুদিন পরে।'

রমলা দেবী খিল খিল করে হাসতে লাগলেন, 'আমাদেরও হার মানালেন হিসেবে,...এই বেলা কুলোর বড়ি, আচারের হাঁড়ি তুলে ফেলুন, বিষ্টি আসছে, টপ্ টপ্ করে পড়ছে যে, মাগো...' রমলা দেবী চেয়ার ছেড়ে ছুটে গেলেন দরজার দিকে, সর্ব্বাঙ্গ দুলে উঠল। ফিরে এসে খগেন বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সংযত হয়ে বল্লেন, 'পরীক্ষা আমি কখন দিই নি, তাই তার মর্ম্ম বুঝি না। অত তোড় জোড়, অত অপেক্ষা, অত ওজন, অমন ব্যবসাবুদ্ধি আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। পরীক্ষা না হয় হল, তার পর? হয় পাশ, না হয় ফেল। তার পর? পাশ করেও কাজ জোটে না। তখনকার বিষাদই ভয়ঙ্কর...তখন, শূন্য...কিছুই নেই স্বীকার করতেও পারা যাবে না। কি দরকার পরীক্ষার?

খগেন বাবু নীরবই রইলেন। রমলা দেবীর মুখ দিয়ে কথা ভেসে এল, 'তখন থাকে কি? কি থাকবে? গোটাকয়েক আক্ষেপের ঝুড়ি আর স্মৃতির সিঁদূর চুবড়ি। তখন আমি থাকব না... না, নাঃ, সে কিছুতেই হয় না।'

'সময় চাইছি।' রমাদেবীর উত্তর প্রেতলোকে ঘুরে বেড়ায়—কতদিন প্রতীক্ষা করব! এতদিন ছিল সাবিত্রী, পরে এল আধ্যাত্মিক সাধনার সুদীর্ঘ অধ্যায়, মমতাহীন, অন্তহীন আদর্শের একি অত্যাচার! পরজন্ম মানি না, আমি হিন্দু নই, স্ত্রী, সামান্য মেয়ে।

রমলা দেবীর মুখ থেকে একটি মাত্র বাক্য নিস্সৃত হয়...'আমাদের কাল নেই, সময় নেই।' খগেন বাবুর তরফের তারে ঝঙ্কার ওঠে, ঘরের কোণে ঘেরা-টোপের মধ্যে অবগুণ্ঠিতা বধূর মতন দিলরুবা ছিল, তারই তার ঝন্ ঝন্ করে উঠল, দ্যুলোকে বার্ত্তা ছড়াল...প্যারিসের রাস্তায় য়্যালান পো বন্ধুর সঙ্গে হাঁটেন, কথোপ-কথন থেমে যায় অনেকক্ষণের জন্য—পো' কথা সুরু করেন আবার, যেন কোনো কালে খেঁই হারায় নি, সময়ের স্রোত রুদ্ধ হয়নি...হারায় না কোনো সুতো, ছেঁড়ে না কোনো তার, কেবল নেমে যায়, ওস্তাদের একটি মোচড়ে আবার সেগুলি তরফের তার হয়ে ওঠে—তাই নীরবেই কথা খোলে...নীরবতার অন্তরে বিনিময়

সম্ভব, সামান্য ও বিশেষের বিনিময়, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দান-প্রতিদান, অগ্রসৃতি ও অবস্থিতির বোঝাপড়া···বাদী প্রতিবাদীর সম্পর্কে নয়, বন্ধুভাবে কাঁধে হাত রেখে এগিয়ে চলা···খগেনবাবু চান সামান্যে অনুবিষ্ট হতে, রমলা দেবী নিজেকে সাধারণ ভাবেন কিন্তু পার্থক্য আছে; জুড়ির একতার বাঁধা, অন্যটি মধ্যমে, তাই এখনও আঘাত শোনা যায়, মধ্যমের ব্যাকুলতায় খগেন বাবু ব্যথিত হন—তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন, 'আমি কিন্তু আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করি। আমি আপনাকে অন্যভাবে দেখেছি, আমি ত' বলেইছি!'

'মিনতি করছি, জোড় হাত করে। পায়ে পড়ব? তবে মন উঠবে? ভয় নেই, পা ছোঁব না। আমি যেমন তেমনই থাকতে চাই, তেমনই নিজেকে দেখাতে চাই। আমাকে কারুর টেনে তুলতে হবে না। অত্যন্ত সাধারণ মেয়েকে খোসামোদ করে উচ্ছন্ন দেবেন না। এত, এত সাধারণ যে কী বলব! আপনার মাসীমাকে জিজ্ঞাসা করবেন—তিনি জানেন, যেমন সাধারণ মেয়েরা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসে আমি ঠিক তেমনটি। সুজনকেও জিজ্ঞাসা করবেন. সে জেনেছে তার রমাদি কত সাধারণ। আগে ভাবত আমি বুঝি একটা কেও-কেটা, তাই ত' গাড়িতে অনেক উপদেশ দিলে···"তুমি" বলতে বারণ করলে, দূরে রাখতে উপদেশ দিলে এখন সে টের পেয়েছে। যারা ইচ্ছে করে চোখ বুজিয়ে রাখে তারাই টের পায় না, পাবেও না। তারা নিজেকে ঠকাচ্ছে, বলে দিলাম, বলে দিলাম···' রমলা দেবী অশান্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সানাইয়ে বেহাগ বাজে। সঙ্গীত কখনও না ভালবেসে থাকা যায়! এ যে 'প্রিয় বস্তু' নয়, সঙ্গীত যে প্রাণের ভাষা। এতদিনকার মৌনী সন্ন্যাসী মুখ আজ খুলেছে। প্রথমে বাজে সুর, অতি ধীরে, ধীরে, ক্রমে আকাশে বাতাসে ছড়াল, সরু তুলির নিষ্কম্প শায়িত রেখার ওপর আবার তুলি পড়ল যেন, রেখার রূপ ফুটে উঠল, চোখ কান ভরল, পিপাসা মিটল। কতক্ষণ নিশ্চলতা সহ্য হয়? নিম্নগতির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, নিখাদে নামল একটু কেঁপে, স্থায়ী শুদ্ধ নিখাদ·· চিরস্থায়ী নয়, তাই পঞ্চমে ডুব দিয়ে গান্ধারে ওঠে। তীব্র গান্ধার, আরোহীতে রেখাবের স্পর্শবর্জ্জিত, মধ্যমের আত্মীয়। আত্মীয়তা বজায় রেখে সুর আবার গান্ধারে ফিরল। আর পারা যায় না, গান্ধারে মন বসে না কান যেন পঞ্চমের শান্তি ভিক্ষা করে।

এখনও পঞ্চম এল না ? কোমল মধ্যমের আক্ষেপে, কড়ি মধ্যমের অনিশ্চিত আকুলতায় মন বিক্ষুব্ধ হয়, সুর ঘোরে কড়িমধ্যম ও মধ্যমের আবর্ত্তে। মন চায় পঞ্চমের শান্তি।···

পঞ্চম এল, কিন্তু রইল না।

বেহাগের অস্থায়ী কৈশোর, তার প্রসার নিখাদ-গান্ধারের আশ্রয়ে। সে আদি সুরে স্থিত হয় না, তার ঘর-বসতে মন ওঠে না, ছোটাছুটি তার নিখাদ, গান্ধার, মধ্যম ও পঞ্চমের চার পাশে, দুষ্টু ছেলের মতন লুকোচুরি খেলা, সুরের বুড়ি ছুঁয়ে পালানো, আবার দুই মধ্যমের সন্ধিক্ষণে ভয়, পাছে অজানা কেদারায় হারিয়ে যায়। পঞ্চমের সোয়াস্তি ক্ষণস্থায়ী ?

চড়া সপ্তকের সুরের জন্য ব্যগ্রতা আসে। সুর ওপরের নিখাদে উঠেছে··· আর ভয় নেই, সব স্বরকে টেনে তুলবে এই স্বর···।

যৌবন চলে ক্ষিপ্রগতিতে, রাগ এখন ঊর্দ্ধমুখী, বিষণ্ণ আত্মকেন্দ্র নয়, তার ভরসা বেশী, আশা অনেক। সুর ওপরের গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চমে লাগল, আবার ফিরল। আরোহী কি সেই পুরাতন ছকেরই পুনরাবৃত্তি ? বিবর্ত্তন কোথায় ?

খগেন বাবু অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে শোনেন কানের পাশে হাত রেখে, যেন তার উত্তরের ওপর জীবন নির্ভর করছে। সুর নামছে মুদারায়, পরম্পরা বজায় রইল, কিন্তু···

এবারকার স্বরের ওজন ভিন্ন, তাই সুরের প্রকৃতিতে গভীরতা এসেছে। যৌবনাবশেষের প্রত্যাগমন, কৈশোরের খেলার মাঠ থেকে বাড়ী ফেরা নয়। শিশুর হাসি ও পরমহংসদেবের হাসি সমগুণাত্মক হতে পারে না। এ-মিলন অন্য শ্রেণীর।

এ-সঙ্গীতে ওঠা নামার সঞ্চারণেই সুরের গভীরতা, পার্শিয়ান ছবিতে একটি কি দুটি অতিরিক্ত রেখাতেই যেমন অন্য প্লেনের ইঙ্গিত ! পরম্পরার মধ্যেই মীড়, গমক, মূর্চ্ছনা, আশ সব অলঙ্কার ভরতে হবে। ওদের দেশে হার্ম্মনি সম্ভব, তাদের বহুমুখী জীবন থেকে উদ্ভূত। ওরা চতুর্ম্মুখ, তাই সমাজে সৃষ্টি, গানেও সৃষ্টি। সর্ব্ব-সাধারণের জীবন ওদের কাছে অন্যভাবে সত্য। এদেশে পরম্পরার আরোহী-অবরোহী, বিস্তার, অলঙ্কার···। তবে ? তবে।

রমলা দেবী ঘরে এলেন। বেহাগের খেলা সাঙ্গ হল। খগেন বাবুর মনে শান্তি আসে, চিত্তশুদ্ধির পর। স্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, 'সুজন কি বলেছিল ?'

রমাদি একদৃষ্টে চেয়ে থেকে উত্তর দেন, 'সে বলেছিল, রমাদি, "তুমি" বোলো না। দূরে রেখো…'

অনেকক্ষণ পরে খগেন বাবু চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনার কী ইচ্ছে করে ?'

রমলা দেবী আনত নেত্রে উত্তর দেন, 'আমার ইচ্ছা ! ও-সব ইচ্ছা হয় না, তবে ..আপনি আমাকে "তুমি" বলুন। আমি, আপনার ইচ্ছামত, আপনিই বলব।'

'বেশ।'

'বলুন।'

'কি বলব ? বল। সুজন আমার চিঠি ও ডায়েরী পড়েছে ?'

'পড়েছে। তাকে লেখা আপনার চিঠিও পড়েছি।'

'কি ভাবে কে জানে !'

'আমার ভাই-এর মতনই ছিল।'

'ছিল !'

'এখন বয়স হচ্ছে। আর পারবে না।'

'বুঝলাম না।'

'দরকার নেই। অধ্যাত্মজগতের খবর নয়।'

'সুজন খুব ভাল ছেলে।'

'ভাল মন্দ নেই, কোথাও, কেউ। সাধারণ ছেলে। যে-সাধারণত্ব অন্যে গায়ের জোরে দাবী করে সেটা তার সহজাত, স্বাভাবিক।'

'তা অনেকটা ঠিক। জবরদস্তীর কাজ বোধ হয় নয়। আজকাল আমি আগের চেয়ে সহজ হয়েছি। এখন, আমার তাই মনে হচ্ছে। কি মনে হয়—তোমার ? সানাই-এ বেহাগ শুনছিলাম, আরোহীর তান নেওয়া সোজা, অবরোহীরই শক্ত। কিন্তু আরোহী-অবরোহী দুইএ মিলেই রাগ সৃষ্টি হয়। বেশ লাগছিল। তুমি কোথায় ছিলে ? থাকলে ভাল লাগত। শুনছিলে বুঝি ?…সহজ হই নি ?'

'প্রমাণ পাই নি।'

'প্রমাণ দেব ? সুরটা আমাকে হয়ত বিকল করেছে। প্রমাণ চাই তোমার ?' খগেন বাবু এগিয়ে এসে রমলা দেবীর মুখ নিজের দুটি করতলের মধ্যে রেখে

চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, পাতা বোজা, সমগ্র মুখে, দেহে নিঃশ্বাস রুদ্ধ ভাবে পরিব্যাপ্ত হয়েছে।

খগেন বাবু বল্লেন, 'কার পলক শক্ত দেখব?'

রমলা দেবীর কপালে ঘাম ফুটল, ঠোঁটে হাসির রেশ লাগল। খগেন বাবু দুটি আঙ্গুল দিয়ে চোখের পাতা খোলেন, রমা দেবীর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'খুব কাল ত! ভাবতাম ছিপির রঙের মত!'

রমা দেবী মুখ ছাড়িয়ে আঁচলে মুখ ঢাকতে চেষ্টা করেন।

নীচের দরজায় কে কড়া নাড়ল।

নিঃশ্বাস ফেলে রমলা দেবী বল্লেন, 'মহারাজিন। সময় দিতে রাজি। কিন্তু কাশী ছেড়ে যাওয়া হবে না। আমার কি কষ্ট হয় না! কেবল নিজের সুখই কি দেখতে হয়! যা হবার এইখানে বসেই হোক,—অন্য কোথাও যাওয়া হবে না আমি পরিষ্কার বলে দিলাম।'

'আচ্ছা, যাব না আপাততঃ।'

'বড্ড গান শুনতে ইচ্ছে করছে। আর বাজবে না সানাই? বাজুক না!'

'শুনতে চাও?'

'বড্ড চাই, এই সময়।'

'কার সঙ্গে? বল, "তোমার সঙ্গে।"'

'বেশ, সুজন মরুক্। তোমার সঙ্গে।'

'চল, ঘাটে যাই। এই কাপড়েই চল। খুব ভাল দেখাচ্ছে।'

'সত্যি? ছাই! ছাদে যাই এস। সেখান থেকে গঙ্গা দেখা যায়।'

'সত্যি ভাল দেখাচ্ছে। চল।'

তেতালার ছাদে গেলেন। ক্বচিৎ কোথাও নৌকার ছাউনির মধ্যে আলো জ্বলছে। খুব দূরে বাঁকের মুখে নদীতীরের একটি প্রাসাদের আলো তারার মতন ঝক্ ঝক্ করে, কখনও নীল, কখনও সাদা, কখনও লাল।

'মাণ্ডুর রাতের কথা মনে হয়। যেখানে রূপমতী বাজবাহাদুরের জন্য অপেক্ষা করতেন, গান গাইতেন, বীণা বাজাতেন, সেই হাওয়া মহলে দাঁড়িয়ে আমি মালোয়ার উপত্যকা দেখেছি এক অন্ধকার রাতে। রূপমতীর জন্য বাজ্ নদী

আনলেন হাজার ফুটেরও ওপরে। সেই নদীর ধারে একটি গ্রামে রূপমতী কিশোরী হন। আমি হলে ও-মহল তৈরী করতাম না।'

'কেন ?'

'পিত্রালয়ের স্মৃতি প্রেমের অন্তরায়।'

'সেই নদীর ধারেই না বাজ্‌বাহাদুর রূপমতীকে সখীদের সঙ্গে বীণা বাজাচ্ছেন প্রথমে দেখতে পান ? তারই খাতিরে নদীকে পাহাড়ে তোলা। সেই স্মৃতির মূল্য দিয়েছিলেন বলেই না লোকে বাজ্‌কে ভুলতে পারে নি !'

'কিন্তু বাজের একাধিক রূপ ছিল প্রমাণ হয়েছে। লোকটার আরেকটা নেশা ছিল, যুদ্ধ।'

'ও-সব মিথ্যা কথা। আজকের জন্য.. কেমন ?'

'আরেকবার দেখেছি·· '

'মনে রেখো না কোনো কথা, মনে রেখো না—স্মৃতির শাপ মহাশাপ··· বাঁচতে দেয় না। এস, বসে থাকি। বাজুক না সানাই একবার—বাজবে না ?'

অনেক রাতে ফিরে এসে খগেনবাবু দেখলেন টেবিলের ওপর কাগজে লেখা রয়েছে, 'এসেছিলাম দশটার সময়, কাল সকালে আসব। সুজন '

(ক্রমশঃ)

শ্রীধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

স্পেইনের ছবি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৪

কুয়েজের পরেই যাঁর কথা মনে হয়, তাঁ'র নাম বার্টোলেমিও এষ্টিবান ম্যরিল্লো। ১৬১৭ খৃঃ সেভাইলে তাঁ'র জন্ম হয় এবং ১৬৮২ খৃঃ একটা বেদী-চিত্র (alter-piece) আঁকবার সময় উঁচু মঞ্চ থেকে পড়ে মারা যান। চিত্রটি প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল।

সেভাইল্ স্পেইনের দক্ষিণতম অংশের প্রধান শহর। ডন্ পেড্রোর মৃত্যুর পর ক্যাষ্টাইল্ রাজবংশের কোর্ট এখান থেকে অন্যত্র চলে যায় এবং নগরটি নবাবিষ্কৃত এ্যামেরিকা হ'তে আনীত পণ্য ও সোনারূপার ব্যবসায়ের প্রধান বন্দরে রূপান্তরিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেভাইলে জুয়ান্ ন্যুমেজ এবং হিস্পালেস্ প্রভৃতি চিত্রকর বর্ত্তমান ছিলেন। যুগ-পরিবর্ত্তনের সময় ইটালীয় রিনেসাঁস্-এর সাড়া স্পেইনের মধ্যে সেভাইল্ নগরেই প্রথম অনুভূত হয়। এলেজো ফার্নাণ্ডেজ্ এ যুগের প্রতিনিধি। রিনেসাঁসের যুগে ভারগাস্, কাম্পোন্, রোয়েলাস্ প্রভৃতি সেভাইলের চিত্রকরগণ যশোলাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোয়েলাসের সঙ্গে সঙ্গে সেভাইলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রযুগ সুরু হয়। এলনসো ক্যামো, ম্যরিল্লো, ভল্‌ডেস্ লীল্ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ প্রতিভাসম্পন্ন চিত্রকরবৃন্দ জগতের চিত্রেতিহাসে সেভাইলকে অমর করে গেছেন। ক্যামোর "ভার্জিন এ্যাণ্ড চাইল্ড এ্যাট্ সেভাইল্ ক্যাথিড্রাল্" ছবিটির মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। ক্যামো অত্যন্ত কোমল স্পর্শের চিত্রস্রষ্টা। পরবর্ত্তী কালের ফরাসী চিত্রকর গ্রুজের সাথে ক্যামোর তুলনা চলে। জুরবারনের আলো-আঁধার সংস্থানের নৈপুণ্য অসাধারণ। প্রথম শ্রেণীর চিত্রশিল্পীর অনেকগুলি গুণ আছে তাঁ'র। লীল্‌কেও খুব বড় স্থানই দেওয়া হয়।*

কুয়েজের পিতার মত ম্যরিল্লোর পিতা শিক্ষিত বা বিত্তশালী ছিলেন না।

* The Painters of the School of Seville : N. Sentenach (Duckworth)

তা'ও যা' ছিল, ম্যরিল্লোর এগারো বছর বয়সে তিনি মারা যান। কি কষ্টে যে ম্যরিল্লো যশের শিখরে উঠেছিলেন—তা' বলবার নয়। ছোটবেলা কষ্টেলো নামক একজন চিত্রকর তা'র শিক্ষক ছিলেন।

ম্যরিল্লোতে পাই—একটি শান্ত সমাহিত ভাব; উগ্রতা বা ভাবাবেগের প্রাবল্য নেই। ম্যরিল্লোর রঙের মাধুর্য্য প্রত্যেক চিত্ররসিকের আদরের বস্তু। স্প্যানিশ ছবিতে সাধারণতঃ কালো ও ধূসর রঙের প্রাধান্য লক্ষিত হয়—"cold tones are pronounced।" কিন্তু ম্যরিল্লোতে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। আধুনিক সরোল্লাতে যে দীপ্ত রঙের ছড়াছড়ি পাই—ঠিক তেমন না-হলেও ম্যরিল্লোতে রঙের একঘেয়ে দৈন্য নেই।

ম্যরিল্লোর মৃত্যুর পর একশ' বছর তাঁ'র বিশেষ সমাদর হয় নি। তারপরে একটি যুগ এলো যখন সবাই বলতে সুরু করল, "We have discovered the greatest painter of Spain. His name is Bartolome Esteban Murillo।" কিন্তু আজ আবার একটি যুগ এসেছে যখন চিত্র-সমালোচক ম্যরিল্লোকে রাইবেরা, গ্রেকো বা গয়ার চাইতে ছোটদরের চিত্রকর বলে নির্দ্দেশ করেন। এতটা ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরে যে ম্যরিল্লোর সুদিন আসছে, তা'তে সন্দেহ নেই। এ রকম ভাগ্যবিবর্ত্তন র‍্যাফেলের বেলাতে পর্য্যন্ত ঘটেছে!

ম্যরিল্লোর ছবি বাঙ্গালীর প্রাণে খুব লাগে। এটা নানাস্থানে লক্ষ্য করেছি। ম্যরিল্লোর ছবির উচ্ছ্বাসময় ভাবপ্রবণতাই এর কারণ। এবং এ জন্যই ম্যরিল্লোকে প্রথম শ্রেণীর চিত্রকরের সম্মান দিতে অনেকে কুণ্ঠিত।

ম্যরিল্লোর দু' রকমের ছবিরই সমালোচনা করব মাত্র। ধর্ম্ম চিত্র ও সাধারণ চিত্র। স্প্যানিশ্ চিত্রকরদের বিশেষত্বই এখানে। From the sublime to the "ridiculous" যেন এদের প্রত্যেকের বেলাতে একটি অতি সাধারণ নিয়মের মত। স্পেইনের পথঘাটের অন্ধ, খঞ্জ, দুঃখীদের ষ্টুডিওতে এনে এঁরা তা'দের চিত্র এঁকেছেন অত্যন্ত সাদর মনোযোগে। এবং ম্যরিল্লোর অঙ্কিত "মেলন্-ইটারস্" ও "বয় উইথ এ ক্লাব ফুট্"—"ইমাকুলেট কন্‌সেপশন্", "সেন্ট জন্ এ্যাণ্ড দি ল্যাম্ব", "মোজেস্ ষ্ট্রাইকিং দি রক্" প্রভৃতির মতই বিশ্ববিখ্যাত।

সমস্ত ছবিতেই ম্যরিল্লোর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখবেদনার ছায়াপাত হয়েছে। কুয়েজের মত চরিত্রচিত্রণে (portraiture) তিনি ওস্তাদ ছিলেন না। কারণ

স্বভাবতঃই তিনি উদাসী ছিলেন। গভীর ও সূক্ষ্ম অনুভব ব্যতিরেকে কেউ চরিত্র-চিত্রে সফল হতে পারে না। ম্যরিল্লো তা'ই পারেন নি। ম্যরিল্লোর ধর্ম্মচিত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব হচ্ছে একটু ঘুমঘুম বিষাদের আবহাওয়া। মনে হয়, স্রোত আগেও চলেছে, পরেও চলবে, শুধু ম্যরিল্লোর ছবিতে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ রয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ম্যরিল্লোর কৌতুকপ্রিয়তা ও "grip"-এর পরিচয় আছে। কিন্তু তা'রও পিছনে নিহিত আছে বেদনা। এ হাসি যেন শুধু অশ্রু গোপন করবার জন্যই। কর্টেরিল্ ম্যরিল্লোর ছবিগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন—(i) Cold, (ii) Warm, (iii) Misty।

ম্যরিল্লোর সঙ্গে সঙ্গে স্পেইনের চিত্রাকাশের গৌরবসূর্য্য পশ্চিমে নেমে পড়ল। দেখতে-দেখতে অনুচিকীর্ষুর দলে (mannerists) দেশ ছেয়ে গেল। ম্যরিল্লোর শেষ বয়সের অঙ্কনে ফ্লেমিশ্ প্রভাব দৃষ্ট হচ্ছিল। তা'র মৃত্যুর পরে ফ্লেমিশ্ ও ইটালীয়—এ' দু' নৌকায় পা দিয়ে স্পেইনের স্বকীয়তা ধ্বংস হ'ল। ঘনিয়ে এল অন্ধকার দুর্দ্দিন।

ম্যরিল্লোর পর গয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য খাঁটি চিত্রকর ছিল না। কিন্তু কর্টেরিল্ স্যর এড্‌মণ্ড হেডের মতে মত দিয়ে কোয়েল্লো (১৬৩০-১৬৯৩) নামক একজন চিত্রকরকে নির্দ্দেশ করে বলেছেন,—

"Coello's death was the death of Spanish art, for we now come to a period of rather more than a century, between the advent of the Bourbons and the War of Liberation (the Peninsular War) during which foreign influences extinguished almost every spark of native genius."

প্রায় একশ' বছর পরে আবার স্পেইন্ দেশে আর্টের পুনর্জীবন লাভ হয়। ল্যাজারাসের উত্থানের মত। কিন্তু এই পুনর্জাগরণের যজ্ঞে গয়া ছিলেন সম্পূর্ণ একা।

ফ্রান্‌সিস্‌কো জোস্ ডি গয়া ইলুসিয়েন্টিস্ (১৭৪৬-১৮২৮) সারাগোসাতে চিত্রশিক্ষা করেছিলেন। আজীবন তাঁ'কে যত ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও দুঃখ-বিপদের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে হ'য়েছে, তত এক ফ্রান্স হালস্ আর মাইকেল এঞ্জেলো

ছাড়া আর কা'কেও করতে হয় নি। এক কথায়, গয়ার ছিল "stormy life"। স্বভাবতঃই গয়া cynic হয়ে ওঠেন এবং হয়ে ওঠেন, "the greatest satirist in paints that ever lived !" উদ্ধত, আমোদপ্রিয়, সবল এবং সুন্দর, স্বাধীনচেতা, চঞ্চল, ধর্ম্মদ্রোহী গয়া জীবনটাকে একটা সিগারেটের মত ফুঁকে গেছেন। গীর্জাতন্ত্র এবং রাজমণ্ডলীর উপর তিনি হাড়েহাড়ে চটা ছিলেন। ভল্‌টেয়ার তাঁর উইট্ দিয়ে ফরাসী গীর্জার বিরুদ্ধে যা' করেছিলেন, গয়া তাঁ'র তুলির প্রতি আঁচড়ে স্প্যানিশ গীর্জার ততোধিক রক্তপাত করেছিলেন। কিন্তু যে প্রবল দেশপ্রেম তাঁ'কে সারা জীবন অনুপ্রাণিত উদ্‌বুদ্ধ করেছে—তা'রও তুলনা মিলবে না। পেনিন্‌সুলার ওয়ারের অসভ্য বীভৎসতায় শিউরে উঠলেন তিনি। নেপোলিয়ানের হাতে স্পেইনের অশেষ লাঞ্ছনা তাঁ'র বুকে যে গভীর বেদনা-ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল—তা' তাঁ'র মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জ্বালাময় ছিল। ছবির পর ছবি এঁকে নেপোলিয়ানের কলঙ্ক এবং স্পেইনের দুর্গতিকে চিরস্থায়ী করে গেছেন তিনি। হেরোডোটাসের সাধ্য ছিল না এমন ইতিহাস লিখবার।

চতুর্থ চার্লস রাজা হওয়ার পর গয়া রাজচিত্রকরের পদে স্থায়ী হ'ন। কিন্তু তিনি রাজ-রাণী এবং রাজসভার স্বরূপ নির্ভীক ভাবে এঁকেছেন। রাজাকে তিনি দেখিয়েছেন—"a regular moloch" ; আর রাণীকে, "courtezan" ; রাজ-পরিবারকে এঁকেছেন ঠিক যেন "a grocer's family group !" সত্যকে এমন নির্ভীকভাবেই গয়া প্রকাশ করতে পারতেন।

স্প্যানিশ্ গীর্জা ভূত-প্রেত আর জ্যাক্ এ্যাসের ভয়ে পাগল, অকর্ম্মণ্য রাজ-শাসন, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা নেই—গয়ার সমস্ত সত্তা তিক্ত ক্ষুব্ধতায় ভরে উঠল। এ সমস্ত অনাসৃষ্টির মূলে ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গীর্জা—অন্ততঃ গয়া তা'ই মনে করতেন। এই প্রাণহীন প্রাচীন তন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য গয়া বিদ্রোহ করলেন—আমন্ত্রণ করলেন নেপলিয়নকে। কিন্তু বুরবন্ রেষ্টোরেশনের পরে আবার যখন ফারডিনাণ্ড স্পেইনের রাজপদে অভিষিক্ত হ'লেন, তখন গয়ার স্বাধীনতা ও লিবারেলিজমের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল।

—এত গুণ গয়ার ছিল। কিন্তু তাঁ'র চরিত্র যদি উন্নত হ'ত—তবে তাঁ'র দুঃখ-তপ্ত জীবনের মূল্য, "would have been perfectly equal, if not more than, the greatest of the great Florentines—Michaelangelo !" গয়ার

নিকট "নীতি" কথাটির কোন মূল্যবান অর্থ ছিল না। স্প্যানিশ্ ব্যারন্ এবং ভদ্র-লোকরা, বিশেষ করে যা'দের সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যা ছিল, গয়াকে রীতিমত ভয় করতেন। "Maja Draped" এবং "Maja Nude" ছবি দু'টি এ্যালভার ডাচেস্ থেকে মডেল নিয়ে আঁকা। ডিউক মহোদয়কে "Draped" ছবিটি দিয়ে, তিনি "Nude" চিত্রটি নিজের জন্য রেখেছিলেন। গয়ার চরিত্রের নৈতিক দৌর্ব্বল্য তাঁ'র অনেক সদ্গুণ নষ্ট করেছিল কিন্তু তাঁ'র "immorality"ও ছিল অত্যন্ত জোরালো।

গয়ার ছবির রকমারি (variety) দেখলে অবাক হ'তে হয়। তিনি হত্যা-কারী লম্পট হ'তে প্রতিভাবান শিল্পী ও স্বদেশ-প্রেমিক এবং বুল্-ফাইটার দলের ছোক্রা থেকে রাজ-চিত্রকর পর্য্যন্ত সমস্ত রকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁ'র চিত্রের ভিতর দিয়ে এই বহুমুখী অভিজ্ঞতাকে রূপ দিয়েছেন তিনি।

শেষ জীবনে গয়া বর্ডোতে নির্ব্বাসিত অবস্থায় মারা যান। বৃদ্ধ বয়সের একটি এন্‌গ্রেভিং—Lux ex Tenebrio—খুব উল্লেখযোগ্য। আমি ছবিটির অরিজিন্যাল্ দেখিনি। অরপেনস্ সাহেব লিখেছেন :—

In it he shows us a shaft of light falling on a dark spot of earth (Spain ?) and scaring away from it owls, ravens—and priests !

এখানে গয়ার সত্যিকার পরিচয় আছে। ছবিটি চিহ্নাত্মক চিত্রের অগ্রদূত বলে গণ্য হ'তে পারে। গয়াই বাস্তবিক পক্ষে,—

"The first of the moderns—one who knew what he was and what he wanted and had the courage to utter forth his emotions" এবং নিঃসন্দেহে, "To the Tenebrosi, to Velasquez and to Goya—the debt of modern art is prodigious." *

গয়ার পর আবার স্পেইনের শিল্পজীবন আঁধারে ঢেকে গেল। কিছুদিন আর কোন শব্দসাড়া নেই। ফরাসী বিপ্লবের আগে থেকে পেনিন্সুলার যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত স্পেইনে রাজনৈতিক গোলযোগ, যুদ্ধ, লোকক্ষয় ও অন্যান্য নানা রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ে দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। এ আঘাত সাম্‌লে উঠতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগল। কিন্তু সে-দিন থেকে স্পেইনের যে দুরবস্থা ও রাজনৈতিক অবমাননার সূত্রপাত হয়েছে, আজও তা'র অবসান ঘটেনি।

---

* ম্যাক্‌ফল

কিন্তু আর্ট কখনও মরতে পারে না। সে ঘুমায়—অনেকবার ঘুমিয়েছে, ইতিহাস তার সাক্ষী। তাই এই হতাশার অন্ধকারেই পিকাসো, কাস্, সরোল্লা, জুলোয়াগার প্রভৃতির চতুর্দ্দিকে দীপ্তিগোলক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পূর্ব্বাচলে অরুণ দীপ্তি দেখা যাচ্ছে। রোজালিসের পর থেকেই নব যুগের সুরু। এর পরে এসেছেন প্র্যাডিলা, (১৮৪৮—জন্ম বছর) ও ফর্টুনী (১৮৪১-১৮৭৪)।

সরোল্লাকে এক হিসেবে ইম্প্রেশনিষ্ট বলা চলে। কিন্তু কোন কলানীতি বা থিওরি দিয়ে তিনি শিল্পীর আনন্দ-সৃজন ব্যাহত করেন নি। স্পেইনের আলো-বাতাস, রূপ-ঐশ্বর্য্য তিনি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় উপভোগ করতে চান। তাঁ'র আনন্দের ভাগী হচ্ছে সারা জগৎ। এত বর্ণ-মহিমা, অফুরন্ত আনন্দের তিনি সন্ধান পেয়েছেন যে তাঁ'র ছবি দেখে সেগান্তিনির সৃষ্টির কথা মনে পড়ে চম্‌কে উঠতে হয়।

জুলোয়াগার হচ্ছেন কঠোর পুরুষ। তাঁ'র প্রতিটি চিত্ররেখায় অত্যদ্ভুত শক্তির পরিচয় আছে।

কিন্তু আধুনিকদের মধ্যে সর্ব্বাধিক আলোচনার উদ্রেক করেছেন প্যাব্‌লো পিকাসো (১৮৮১—)—একজন স্প্যানিশ্ চিত্রকর। পিকাসো কিউবিজমের স্রষ্টাদের অন্যতম।† কিউবিজম্ ইম্প্রেশনিজমেরই একটি বিভাগ। ফিউচারিজম্ হচ্ছে ইম্প্রেশনিজমের একটি চূড়ান্ত সৃষ্টি-রীতি, যা' আজ আর্টের জগতে বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু কিউবিজমে স্থায়ীত্বের বীজ আছে। এই নিত্য-নূতনের যুগেও দেখতে পাই যে কিউবিজম স্থায়ী হয়েছে।

কিউবিজম্ স্পেইন্ থেকে (পিকাসোর মার্ফত) উদ্ভূত হয়েছে। এবং এ'কথা সাহস করে বলা যেতে পারে যে এক স্পেইন্ থেকেই এর উৎপত্তি সম্ভব ছিল। এবং জাতি-প্রতিভার ঐতিহ্য-মুখে সৃষ্ট বলেই হয়ত কিউবিজম্ আজও টিঁকে আছে। প্রথমতঃ, ইম্প্রেশনিজম্ জিনিসটি অনুচ্চারিত ভাবে প্রথম থেকেই স্পেইনের চিত্রকলাতে চলে আসছিল। দ্বিতীয়তঃ, কিউবিজমের মূল নীতি একটি রহস্যময় মরমী অনুভূতি থেকে জন্ম নিয়েছে—যা' স্পেইনের ধর্ম্ম ও দর্শনে নিহিত ছিল।

ইম্প্রেশনিজম্, বিশেষ করে ফিউচারিজম্, চলমান বিশ্বের চির-পরিবর্ত্তন

† ব্র্যাক্ এবং সেজান পিকাসোর সহকর্ম্মী ছিলেন।

ছবির পটে মূর্ত্ত করতে চায়। চলচ্চিত্রের নিকট ফিউচারিজস্‌ম্ ঋণী। কিন্তু কিউবিজম্ প্রত্যেক বস্তু বা ঘটনার মূলীভূত আন্তর সত্যের ও শক্তির প্রকাশ করতে চায়। এজন্য বস্তু বা ঘটনার বহিরঙ্গ-রূপ তা'র নিকট তুচ্ছ। তাই দরকার মত শিল্পী নিজ কল্পনার থেকে নূতন আকৃতি চিত্রিত করতে পারবে—যা'র অনুরূপ বাস্তবে নেই। কিন্তু এ-সব অদ্ভুত ও উদ্ভট আকৃতির ভিতর প্রাণ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা পিকাসো অনুভব করলেন। নইলে তা' মানুষের বুকে ভাবতন্ময় সুর জাগাবে কি করে? তাই তিনি চিত্রের রেখায় সঙ্গীতের অবতারণা করতে চাইলেন—বর্ণ-আবহের ও প্রতিসাম্য সংস্থানের সাহায্যে। বস্তুর অন্তর্নিহিত সত্য-স্বরূপের সন্ধানই যথেষ্ট নয়, তা'র গীতময়, প্রাণময় প্রকাশ চাই। যে-রূপ যুক্তি ও চিন্তাধারার উপর কিউবিজম্ প্রতিষ্ঠিত এবং তা'র দৃষ্টান্ত—সৃষ্টি হিসাবে পিকাসো, ব্রাক্ (ব্রাকের Still Life Studies দ্রষ্টব্য) সেজান, নেভিন্‌সন প্রভৃতির কাছ থেকে আমরা যা' পেয়েছি —তা' স্পেইনের ধর্ম্ম ও চিত্র-সাধনার নিকট একেবারেই অপরিচিত নয়। খুব একটা দ্রুত পরিণতি বলেই তা' অনেকের নিকট বিদ্রোহ বা আবিষ্কার বলে অনুভূত হয়ে থাকে। কিন্তু যাক্—ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরো আলোচনা করবার ইচ্ছা রইল।

আজকাল আন্‌গ্লাডা, সরোল্লা, জুলোয়াগাব, জুংগার, মেজ্, মগ্রেল, প্রভৃতি তরুণ ও আধুনিক চিত্রকরের দল স্পেইনে একটি সমৃদ্ধ সংঘ সৃষ্টি করছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন,—আমরা আবার চল্‌তে সুরু করলাম। আমাদের অতীত আমা-দেরই আছে। সেই অতীত আমাদের অন্তরে অদৃশ্য প্রভাবে অব্যর্থ লিখন লিখ্‌ছে। সম্মুখে ভবিষ্যৎ—অনন্ত রহস্যের সৌন্দর্য্যে আবৃত। সুখে-দুঃখে, আশা নিরাশায় আমরা চল্‌ব—সব কিছুকে অনুভব ও প্রকাশ করে। বহুদিনের অকর্ম্মণ্য মৌনিতা ও বিকৃত অনুকরণ ত্যাগ করে আমরা আবার চলতে সুরু করলাম।

এই চল্‌তে সুরু করাটাই প্রতি যুগসৃষ্টির গোড়ার কথা। আমরা এই তরুণ স্প্যানিশ্ চিত্রকর গোষ্ঠীকে অভিনন্দিত করি!

শ্রীঅপরূপ মুখোপাধ্যায়

পুরানো কথা

(পুনরাবৃত্তি)

গেল বারে আমাদের আমলা সমাজের মহারথীদের কথা একটু আধটু বলেছি। এঁরাই ছিলেন এই সমাজের মান-ইজ্জতের মহাজন। বাকী আমরা যে খুদে সাহেবের দলটী ছিলাম, আমাদের ইজ্জৎ-জ্ঞান বা ভব্যতার বালাই বড় একটা ছিল না। তবে আমাদিগকে নইলেও ত চলত না! কর্ত্তারা পয়সা-কড়ি যোগাতেন বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের, খেলা-ধূলোর, নিত্য নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করতাম আমরা। কখনও বা সন্ধ্যাবেলায় ব্যাডমিন্টনের চালাতে গ্রামোফোনের তালে নাচ, কখনও বা টেনিসের মাঠে বিরাট supper ভোজ, কখনও বা রঙ্গ বেরঙ্গের সাজ করে (fancy dress-এ) ডিনার ভোজন, কখনও বা বনে বাদাড়ে রকমারি চড়াইভাতি—এ সব কল্পনা আমাদের উর্ব্বর মাথাতেই গজাত। কদাচ কখন এই সব উদ্ভট ব্যাপারের অনুষ্ঠানে এক আধটু বাড়াবাড়ি হয়ে যেত। সে জন্য কর্ত্তাদের চোখ রাঙ্গানিও খেতে হত।

একটা মজার গল্প বলি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে পারসিক বলে এক উঁচু পাহাড় ছিল। সেই পাহাড়ের গোড়ায় সমুদ্রের খাড়ি। একদিন প্রস্তাব করা গেল যে রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সবাই সেই খাড়িতে নৌকা-বিহার করা যাবে। প্রচুর জলযোগেরও ব্যবস্থা সঙ্গে থাকবে। সকলেই, বিশেষতঃ মহিলারা, সাগ্রহে রাজী হলেন। যথাসময় দুই বড় নৌকাতে লোকলস্কর, রসদের ঝাঁকা, গ্রামোফোন ইত্যাদি নিয়ে ভেসে পড়া গেল। সুন্দর চাঁদনী রাত। মৃদু মন্দ বাতাস। চারিদিক নিঝুম। মনের আনন্দে ঘণ্টা দুই খুব ঘুরে ঘুরে বেড়ান গেল। হঠাৎ দূরে নজর পড়ল, জলের উপর ভাসছে এক ঝাঁক পাখী। একটু কুয়াসার মতন ছিল পাখী গুলো খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। আমাদের নৌকাখানা ধীরে ধীরে দাঁড় ঠেলে একটু কাছিয়ে গেল। হাঁসই বটে, কোন সন্দেহ নেই! যখন অন্তর প্রায় তিরিশ কদম, তখন আমাদের ছোকরার দলের দুই বীর বন্দুক তুলে দড়াম দড়াম করে গোটা চারেক টোটা ওড়ালেন। কতকগুলো হাঁস পালাল, গোটা দশেক মরে জলে পড়ে

রইল। আমরা খুব জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। কিন্তু দুর্দ্দৈব, কাছে গিয়ে দেখা গেল, একটাও বুনো হাঁস নয়, সব আশপাশের গ্রামের লোকের মোটা মোটা পোষা হাঁস! কলেকটর সাহেব অন্য নৌকাখানায় ছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে ভয়ানক বকাবকি করতে লাগলেন, "খুব sportsmen, শিকারী, তোমরা! অনর্থক কতকগুলো পোষা হাঁস গুলি করলে। ওগুলোকে ধরে ছুরি দিয়ে জবাই করলেই পারতে! রাত্রে নৌকাতে পিকনিক করতে এসেছ, বন্দুক কিজন্য এনেছিলে, ইত্যাদি।" উপসংহার, পরের দিন বড় সাহেব শিকারীদ্বয়ের ঘাড় ধরে কুড়িটী টাকা খেসারত দেওয়ালেন। এই রকম চুক ও এই রকম তার সাজা মাঝে মাঝে ঘটত বই কি!

তবে সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে আমরা যথাসম্ভব পদমর্য্যাদা বজায় রেখে চলতাম। আমাদের হৈ হৈ ধর্ম্মাবলম্বী তরুণ দলের খাস বৈঠক বসত রাত্রে, কারও না কারও বাড়ীতে। এটা মাসের মধ্যে বার দুয়ের বেশী ঘটে উঠত না। তবে সময়টা কাটত বড় আনন্দে। শাসন বাঁধন, ভয় ডর, কিছু ছিল না, কেউ কাজ কর্ম্মের কথা নিয়ে জাবর কাটত না, কেউ বিদ্যা জাহির করবার চেষ্টাও করত না। নিছক হাল্লা। প্রধানতঃ তাস খেলাই চলত, তবে হালকা রকমের গান বাজনাও হত মাঝে মাঝে। ভোর বেলায় দ্বিতীয় supper-এর পরে মজলিস ভাঙ্গত। কিন্তু এক আধ দিন এমনও ঘটত যে ভোরের আলোতে খানিকক্ষণ clay pigeon-এর উপর বন্দুক ছোঁড়াছুঁড়ি করে বাড়ী ফিরতাম। আমাদের এই বৈঠকের সবাই ছিলেন সাহেব, আমিই একমাত্র ভারতীয়। তখনকার দিনে আমি ইংরেজী কাপড়-চোপড় পরতাম না। নৈশ বৈঠকে অনেক সময়ে ধুতি পরেই যেতাম। সেজন্য কিন্তু কখন কোন অসুবিধা আমাকে ভোগ করতে হয় নেই। বরং আমি না গেলে ওদের আসর জমত না, জোর জবরদস্তী করে ধরে নিয়ে যেত। এর আগে এত ঘনিষ্ঠ ভাবে তরুণ ইংরেজ মণ্ডলীর সঙ্গে মিশি নেই। আর, আজ এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি যে এই ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করতে গিয়ে আমাকে কখন এতটুকু খাটো হতে হয় নেই। আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্য কখন বীরদর্পে আস্ফালনও করতে হয় নেই। এই ঠাণাতেই শেষাশেষি আমলা মহলের সঙ্গে আমার সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। সেই বিচ্ছেদ কিছুকাল অবধি রয়েও গেছল। কিন্তু তার কারণ ব্যক্তিগত নয়, আর সেজন্য আমি কোন ইংরেজী বন্ধুকে দোষী করতে পারি না। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্য্যন্ত ছিল সঙ্কট

সময়। তখন আমি ছাড়া আরও অনেকেরই বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিল। এ সব অপ্রিয় কথা, এর আলোচনাও আমার পক্ষে অশোভন। তবে এখানে শুধু এইটুকু বলব যে আমার ভুলের জন্য আর যেই দায়ী হোক, আমার ঠাণার তরুণ সহকর্ম্মীরা নয়।

আমাদের দলের অধিনায়ক ছিল পুলিসের ছোট কর্ত্তা P। এই P-র মত মুক্তহস্ত, উদার ও সরল মানুষ আমি আমলা মহলে খুব কম দেখেছি। তার দোষের মধ্যে এই ছিল যে অগ্রপশ্চাৎ ভেবে কখন কাজ করত না, কথার ওজনও রাখতে পারত না। তাই চাকরীতে শেষ পর্য্যন্ত তেমন উন্নতি করতে পারে নেই। তার অতিবড় শত্রুও বলতে পারত না যে সে মফস্বলে সফরে গিয়ে কোন দিন দাম না দিয়ে এক মুঠো ঘোড়ার দানা কারও নিয়েছে। বরং তার বকশীশ দেওয়ার ঘটা সর্ব্বজন-বিদিত ছিল। এখনও মনে পড়ে P-র পালোয়ানের মতন বিশাল দেহ, আর মুখে ছোট ছেলের মতন সরল মিষ্টি হাসি। বৈঠকখানার আড়ষ্ট আবহাওয়াতে লোকটীকে মোটে মানাত না; এক ধারে কেমন চুপ করে বসে থাকত। কিন্তু বনজঙ্গলে, খেলার মাঠে, বা আমাদের নৈশ বৈঠকে তার মুখ খুলে যেত, মনে হত যেন অন্য মানুষ। ঠাণা জেলাতে সে সময়ে ক্রমাগত চুরি ডাকাতি হত। ডাকাতের দল পেড়ে ফেলবার কাজে P সিদ্ধহস্ত ছিল। ডাকাতির খবর পেলে আর রক্ষা নেই। একেবারে ডালকুত্তার (Blood hound) মতন তেড়ে দৌড় দিত দস্যু দলের পেছনে। দিন রাত না খেয়ে, না ঘুমিয়ে, ডাকাতগুলোকে খেদিয়ে খেদিয়ে শেষ যে কটাকে পেত ধরে এনে সদরে হাজির করত। ধরে ত আনত, কিন্তু নিজের কাজ কি করে উপরওয়ালাদের নজরে আনতে হয় তার কিছুই বুঝত না। সাজিয়ে রিপোর্ট লেখা তার মোটে আসত না। ফলে, অনেক সময় P-র কাজের জন্য সাবাসী পেত অন্য লোক। ওর সে দিকে খেয়ালও ছিল না! আমরা কিছু বললে জবাব দিত, "আমি বেরনেটও নই, ইস্কুল মাষ্টারও নই, গল্প প্রবন্ধ রচনা করতে কখন শিখি নেই।" বেরনেট সাহেব "Adventures of John Carruthers, Policeman" বলে এক বই লিখে বেশ দু পয়সা রোজগার করে-ছিলেন, কিন্তু নিজে পারতপক্ষে কখন সরেজমীন তদন্ত করতে বেরোতেন না। তাই P তাঁকে দু চক্ষে দেখতে পারত না। তবে সে ভাবটা, বোধ হয়, উভয়তঃ ছিল। একবার ডাকাত ধরার উৎসাহের জন্য বন্ধু P-কে কি রকম বিপদে পড়তে হয়েছিল, শুনুন।

সদরে রিপোর্ট এল যে এক দূর পাড়াগাঁয়ে খুব জবর রকমের লুটতরাজ হয়ে গেছে, ডাকাতের দল অনেক টাকার মাল নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে। খবর পেয়েই বেরনেট নিত্যপ্রথা মত P-কে হুকুম করলেন, "এখনই নিজে বেরিয়ে যাও, P! দেরী কোরো না, অন্যের উপর বরাত দিও না। এ ডাকাতির কিনারা করাই চাই। আমি জরুরী কাজে ব্যস্ত, নইলে আমিই যেতাম।" Cox কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তা আমরা জানতাম না, তবে P পরের দিন একটা বড় রকমের শিকার picnic-এর ব্যবস্থা করেছিল বটে! যাক্, হুকুম পেয়ে বেচারা তৎক্ষণাৎ ঘোড়ায় বেড়িয়ে গেল। সঙ্গে মাত্র দুজন সওয়ার, চাকর-বাকর আসবাব-পত্র কিছুই নিলে না। চার দিনের দিন ফিরে এল। থল ঘাটের উপর কয়েকজন ডাকাতকে পাকড়াও করেছে, কিন্তু দলপতি দুজন পালিয়েছে। কয়েক দিন পরে শোনা গেল সেই ফেরারী আসামী দুটী শহরে উকীল দেশপাণ্ডে রাও সাহেবের বাড়ীতে লুকিয়ে রয়েছে। P তৎক্ষণাৎ সেপাই সান্ত্রী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। দেশপাণ্ডে বাড়ী ছিলেন না। খানাতল্লাসী সুরু হয়ে গেল। শেষ, উপর তলার এক কুঠরীতে ফেরারী ডাকাত দুজন ধরা পড়ল। P তাদিকে গেরেপ্তার করতে না করতে দেশপাণ্ডে বাড়ী ফিরে এলেন। তিনি সোজা সাহেবের সুমুখে গিয়ে বললেন, "এরা আমার মক্কেল। সলা পরামর্শের জন্য বাড়ীতে রেখেছি। আমিই যথাসময় এদিকে হাজির করব। এখন ছেড়ে দেন অনুগ্রহ করে।" উকীলের এই ধৃষ্টতাতে P রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠলেন, "আপনি আমাকে আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে লেকচার দিচ্ছেন না কি! আমি আপনাকেও গেরেপ্তার করতে পারি ফেরারী আসামীকে লুকিয়ে রাখার অপরাধে, তা জানেন!" দেশপাণ্ডে হেসে বললেন, "বেশ ত! গেরেপ্তার করুন না আমাকে! আদালতে পরে বোঝাপড়া হবে।" P এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ না করে উকীল বাবুকেও পাকড়াও করলে, আর হাত পা বেঁধে তাঁকে ও ডাকাত দুজনকে সদর রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে থানায় নিয়ে গেল। ব্যাপারটা বেশ গুরুতর হয়ে দাঁড়াল! কেন না, দেশপাণ্ডে সেই দিন সকালবেলাই সিটি মেজিষ্ট্রেটের কাছে এত্তেলা দিয়ে এসেছিলেন যে ডাকাতি অপরাধে অভিযুক্ত তাঁর দুজন মক্কেলকে তিনি বেলা তিনটার সময় হুজুরের এজলাসে হাজির করবেন। Cox সাহেব সব কথা শুনে তৎক্ষণাৎ দেশপাণ্ডেকে ছেড়ে দিলেন ও P-কে ডেকে খুব কড়কে দিলেন। ডাকাত দুজনকে পুলিস

আদালতে হাজির করলে। যথাকালে দায়রা মোকদ্দমা হয়ে তারা দলের লোকের সঙ্গে জেলখানায় প্রবেশ করলে। কিন্তু P বেচারার ভোগ এইখানেই শেষ হল না। দেশপাণ্ডে উকীল তার কাছ থেকে দশ হাজার খেসারৎ দাবী করে জেলা কোর্টে মোকদ্দমা রুজু করলেন। আমার জজ সাহেব ছিলেন বাদীর মাতুল, তাই তিনি মোকদ্দমা নিজে না নিয়ে আমার হাতে তুলে দিলেন। P আমাকে ঠাট্টা ছলে শাসাতে আরম্ভ করলে, "দেখ না, এডভোকেট জেনেরালকে নিয়ে আসছি, তোমাকে জব্দ করছি!" আমি কিন্তু জানতাম এডভোকেট জেনেরাল আসছেন না। Cox-এর কাছেই শুনেছিলাম যে বোম্বাই সরকার P-র উপর ভয়ানক বিরক্ত হয়েছেন, তাঁরা এ মোকদ্দমায় প্রতিবাদীকে কোন রকম সাহায্য করবেন না। আমি মনে মনে স্থির করলাম, P-কে যেমন করে হোক বাঁচাব। কি করা যায়? দেশপাণ্ডেকে জোর করে কিছু বলতে পারি না, সে আমার রাও সাহেবের ভাগনে। আবার P-র মেজাজ পাচ রকমে এমনই খারাপ হয়েছে যে তারও কোন সদুপদেশ শোনার সম্ভাবনা খুব কম। একদিন দেশপাণ্ডেকে ধীরে সুস্থে বললাম, "দেখুন, P বেচারা গরীব, ও দশ হাজার টাকা দেবে কোথা থেকে!" এতে হিতে বিপরীত হল। পরদিন কোর্টে বাদীর তরফে এক দরখাস্ত দাখিল হল, "আমরা শুনিয়াছি যে প্রতিবাদী নিঃস্ব, ঋণগ্রস্ত, দশ হাজার টাকা দেওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। অতএব এ ক্ষেত্রে বাদী নামমাত্র যৎকিঞ্চিৎ খেসারৎ পাইলেই সন্তুষ্ট হইবে।" P ত চটেই আগুন হল! ক্লাবে আমার কাছে চীৎকার করতে লাগল, "হতভাগা উকীল, আমাকে দেউলে বলেছে, অপমান করেছে, এইবার ওকে জব্দ করছি!" আরও কিছুদিন কেটে গেল। প্রতিবাদীর statement-ও দাখিল হল না, তার তরফে কেউ উকীলও উপস্থিত হলেন না। আবার দেশপাণ্ডেকে পাকড়াও করলাম, "দেখুন, এতদিন হয়ে গেল, আর এ পুরানো কথা নিয়ে গোলমাল করা কেন! আপনি ত বলেই দিয়েছেন যে সত্যি কিছু খেসারৎ চান না।" দেখলাম, ও ভদ্র-লোকেরও রাগ পড়ে গেছে। ধীরে ধীরে জবাব দিলেন, "আমি এখনই মোকদ্দমা তুলে নিতে রাজী আছি যদি সাহেব আমার কাছে মাপ চান।" সন্ধ্যাবেলা P-কে অনেক বোঝালাম, কিন্তু সে ক্রুটীস্বীকার করতে কিছুতেই রাজী হল না। তিন দিন বাদে তারিখ ফেললাম প্রতিবাদীর statement-এর জন্য। যথাসময় উভয় পক্ষ হাজির হলেন কোর্টে। P দাঁড়িয়ে বললে, "আমি লেখা statement আনি

নেই। আমার যা বক্তব্য মুখে বলতে প্রস্তুত আছি, হুজুর যদি লিখে নেন।” আমি দুজনকেই খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গেলাম। সেখানে বসে P-কে বললাম, “Mr. P, সেদিন আপনি যখন বাদীকে গেরেপ্তার করেন, তখন আপনি সব কথা জানতেন না। আপনার জানা ছিল না যে তিনি মেজিষ্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে তাঁর মক্কেলদিকে বাড়ীতে রেখেছিলেন!” P জবাব দিলেন, “অবশ্য জানতাম না। জানলে ওঁকে ধরব কেন!” “আচ্ছা, তা হলে না জেনে ওঁকে যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দিয়েছেন, সেজন্য আপনি, একজন বিশিষ্ট gentleman, নিশ্চয় দুঃখিত বোধ করছেন।” “হ্যাঁ, তা দুঃখিত হয়েছি বই কি! কিন্তু উনিও এই মোকদ্দমা করে আমাকে—” আমি থামিয়ে দিয়ে একটা কাগজে লিখলাম, “যখন আমি মিষ্টার দেশপাণ্ডেকে গেরেপ্তার করি, তখন আমি জানতাম না যে উনি মেজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি নিয়ে ডাকাত দুজনকে নিজের ঘরে রেখেছিলেন। না জেনে ওঁকে আমি যে কষ্ট দিয়েছি সেজন্য আমি দুঃখিত।” লিখে P-কে বললাম, “সই করিবেন?” সে ধীরে ধীরে সই করলে। আমি দেশপাণ্ডেকে বললাম, “প্রতিবাদীর এই statement-এর নকল আপনি নিতে পারেন। আর মোকদ্দমা চালাবার কোন প্রয়োজন আছে কি?” দেশপাণ্ডে উত্তর দিলেন, “আমি আজই মোকদ্দমা তুলে নেওয়ার জন্য দরখাস্ত দিচ্ছি, হুজুর। Mr P! আমি মুনসেফী চাকরীর প্রার্থী। সরকার থেকে আমার উপর হুকুম হয়েছিল যে আমি সেই গেরেপ্তারের ব্যাপারে নির্দ্দোষ এটা প্রমাণ করতে না পারলে আমার নাম উমেদারের তালিকা হতে কেটে দেওয়া হবে। আমার মোকদ্দমা না করে উপায় ছিল না, ক্ষমা করবেন।” বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন। P-ও হাত ধরে খুব নাড়া দিয়ে বললে, “Thanks ever so much, Mr. Deshpande—অশেষ ধন্যবাদ, দেশপাণ্ডে সাহেব।” উকীল বেরিয়ে যাবার পর আমাকে হেসে বললে, “আচ্ছা বাঙ্গালী বুদ্ধি, বাবা! ফাঁকী দিয়ে আমাকে মাপ চাইয়ে ছাড়লে!”

কিছুদিন পরে এই উপলক্ষে P-র বাড়ীতে আমাদের ছোকরা দলের এক বিরাট খানা হল। খানার নাম আমরা দিয়েছিলাম—Illegal gratification dinner!

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

মাথুর

মধুর ভজনের প্রগতি অনুসরণ করিতে আমরা গতবারে দুর্জ্জয় মানের দুর্যোগে পড়িয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে সে 'ভরা বাদর' কাটাইতে পারিয়াছি—দেখিয়াছি—'বরষিল মেঘদল, ধরিণী ভেল শীতল'—দেখিয়াছি শ্রীরাধার মানান্তে বৃন্দাবনে আবার মিলন-কৌমুদীর উদয় হইয়াছে। দেখিয়াছি—

দূরে গেল মানিনী মান
রাই-কোরে মগন ভেল কাণ

দেখিয়াছি—

নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস
দূরহি দূরে রহু নরোত্তমদাস

কিন্তু এত সুখ বিধাতার অসহ্য হইল—ক্রূর অক্রূর আসিয়া কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল—বৃন্দাবন বিরহের তপ্তশ্বাসে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। ইহাই বৈষ্ণবদিগের 'মাথুর'—বড়ই করুণ, অতিশয় মর্ম্মস্পর্শী!

তুহুঁ রহলি মধুপুর
ব্রজ কুল আকুল দু-কুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর

কৃষ্ণের সঙ্গে কংস-সভায় পিতা নন্দ ও শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখা-বৃন্দ গিয়াছিলেন—তাঁহারা জানিতেন না, কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ আর গোকুলে ফিরিবেন না। যখন শ্রীকৃষ্ণের মুখে শুনিলেন—'ব্রজের খেলা সাঙ্গ হ'ল, তাই এসেছি মথুরায়' তখন তাঁহাদের কি দশা ঘটিল? ইহাকেই বলে 'নন্দ-বিদায়'—বড়ই করুণার দৃশ্য! লোচনদাস 'দুর্লভসারে' এ দৃশ্য অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

বিরস বদন কৃষ্ণ ছল ছল আঁখি
নন্দ হেন পিতা আমি কেমনে উপেখি
শুন প্রাণ বলরাম দাদা মহাশয়
কেমনে বা জীব নন্দ যশোমতী মায়

কেমনে বা জীব মা রোহিণী আমার
শ্রীদাম সুদাম আদি সংহতি ছাওয়াল
সামলী ধবলী বলি না ডাকিব আর
যমুনা পুলিন বনে না খেলিব আর
কালিন্দী কদম্বতরু বৃন্দাবন বনে
গোপগোপীগণে আমি ছাড়িব কেমনে ?

শ্রীকৃষ্ণ বিদায়ের কথা নিজমুখে বলিতে পারিলেন না—বসুদেব তুতিয়া পাতিয়া নন্দকে বলিলেন—

তোমার ঘরে দুই ভাই ছিলা এতদিন
লালিলে পালিলে তুমি—আমি ভাগ্যহীন
কাতর হইয়া কহি—কহিতে ডরাই
দিন কত থাকুক এথা, যদি আজ্ঞা পাই।

*　　*　　*

এ বোল শুনিয়া নন্দ হরিলা চেতন
ছল ছল আঁখি কিছু না বলে বচন
স্তম্ভিত হইল অঙ্গ অনিমেষ আঁখি
পরাণ ছাড়িল যেন দেহ হেন দেখি।
চেতন পাইয়া 'রাম কৃষ্ণ' বলি ডাকে
ঘর যাব আইস বাছা চুম্ব দেহ মুখে

*　　*　　*

এ বোল বলিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইল
কৃষ্ণগত চিত্ত নন্দের সমাধি লাগিল
প্রেমায় বিহ্বল, কৃষ্ণ যেন আছে বুকে
কৃষ্ণে কোলে করি, নন্দ চুম্ব দিছে মুখে।
কথো দূর গিয়া পুনঃ সচকিত চিতে
চারি পাশে চায় কৃষ্ণ না পায় দেখিতে
না যাইব ঘরে, কেহ জালহ আগুনি
পুড়িয়া মরিব—যুক্তি এই ভাল মানি

কাঁদিতে কাঁদিতে সবে যায় ধীরে ধীরে
নিকট হইল দেখি গোকুল নগরে
কৃষ্ণ বলরাম আইলা উঠিল এ ধ্বনি
আনন্দে ধাইয়া আইল যশোদা রোহিণী
যশোদা দেখিয়া নন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া
শকট হইতে পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া।

তখন যশোমতীর কি দশা হইল ?

যশোদা দেখিয়া লোক, চমকিত চায়
কৃষ্ণ বলরাম দুই দেখিতে না পায়
নন্দেরে বলয়ে, কৃষ্ণ বলরাম কোথা ?
বজর পড়িল মোর বাসি (?) মোর মাথা
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে আউদড় চুলী
ভূমে গড়াগড়ি বুলে উন্মত্ত পাগলী
'আমারে ছাড়িয়া বাছা কেনে না থাকিবে
মা বলিয়া আর তুমি মোরে না ডাকিবে!
সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব
আজি হৈতে শূন্য হইল কালিন্দী কদম্ব
কুলের প্রদীপ মোর নয়নের তারা
এ দেহের আত্মা, তোমা বই নহি মোরা
কে মোর কাড়িয়া নিল আঁখির পুতলী
অন্ধকার দশ দিক্ শূন্য যে সকলি!'

শুধু নন্দ যশোদা কেন ?

বৃন্দাবনে তরুলতা
কিছু নাহি তার কথা
দাবাগ্নি পুড়িল যেন বনে
যত বৃন্দাবন বাসী
সবে হৈল নৈরাশী
সবে পুড়ে মনের আগুনে।
কৃষ্ণের বিরহে সবার চিত্ত উতরোল
সকল ইন্দ্রিয় ভেল কৃষ্ণগুণে ভোর

গিলিলেক সব দেহ বিরহ-বেয়াধি
আঁখে বুকে চিত্তে মুখে লাগিল সমাধি।

—এমনই তদ্‌গততা, এতই তন্ময়তা! পদকর্ত্তা এ ছবি অমর তুলিতে আঁকিয়াছেন—

যশোমতী নন্দ　　অন্ধ সম বৈঠল
সাহসে উঠহি না পার
সখাগণ ধেনু　　বেণু সব বিসরল
বিছুরিল নগর বাজার।

আর শ্রীরাধা? শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে তাঁর কি দশা—'মাথুর'-লীলা সম্পর্কে তাঁর কি বিক্রিয়া (reaction)?

বিরহিনী রাধা　　কি কহব মাধব
দশদিগ বিরহ হুতাস।
সহজে যমুনাজল　　অবহুঁ অধিক ভেল,
কহতহি গোবিন্দদাস।

ইহা পরের মুখের কথা— তাঁহার নিজের কথা শুনুন:—

অতি শীতল　　মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখী　　হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা॥
কোকিল কল,　　কুর্ব্বতি কিল,
অলি ঝঙ্কারে কুসুমে।
হরি লালসে　　প্রাণ তেজব
পাওব আন জনমে॥
সব সঙ্গিনী,　　ঘেরি বৈঠত
(বলে) গাও গাও হরিলীলা।
ঐছন বাণী,　　শুনি তৈখনে
বিরহিনী মোহ গেলা॥
ললিতা কোলে　　করি বৈঠত
বিশাখা ধরু লোটায়ে।

শশিশেখর দেখিয়া তাহা
যাওত জিউ ফাটিয়ে ॥

তিনি সখীদের সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করেন—

হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কি দিলে হইবে ভাল ? (জ্ঞানদাস)

সখী কি বলিবেন ? নিরুত্তর থাকেন—

নাহ দরশন সুখ বিধি কৈল বাদ।
অঙ্কুরে ভাঙ্গল বিনি অপরাধ ॥
সুখময়-সায়র মরুভূমি ভেল।
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥
আন ভাবিনু চিতে বিহি কৈল আন।
অবহু না নিকসই কঠিন পরাণ ॥
নখর খোয়াইনু ক্ষিতিতলে লিখি।
নয়ন আঁধুয়া ভেল পিয়া-পথ পেখি ॥
বিদ্যাপতি কহে বরজ কুমারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলিবে মুরারি ॥

আলংকারিকেরা বলেন—বিরহের দশ দশা—

চিন্তাত্র জাগরোদ্‌বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
বিলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দশা দশ ॥
—উজ্জ্বল নীলমণি।

'চিন্তা, উন্নিদ্রতা, উদ্‌বেগ, তনুতা, মলিনাঙ্গতা, বিলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু—বিরহের এই দশ দশা।' পাঠক লক্ষ্য করিবেন—প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ (external) এবং শেষ পাঁচটি অন্তরঙ্গ (internal)। বৈষ্ণব পরিভাষায় এই অন্তরঙ্গ দশা-পঞ্চকের নাম 'অধিরূঢ়' মহাভাব। এ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার 'উজ্জ্বল নীলমণি কিরণে' লিখিয়াছেন,—

'অধিরূঢ়' মহাভাবের মোদন ও মাদন এই দ্বিবিধ ভেদ! মোহনোয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং (অর্থাৎ বিরহের অবস্থায়) মাদনো ভবেৎ × × প্রায়শো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মাদনোহয়ং উদঞ্চতি। মাদনস্থ এব বৃত্তিভেদো দিব্যোন্মাদঃ—যত্র উদ্‌ঘূর্ণাচিত্র জল্পাদয়ো প্রেমময্য অবস্থাঃ সন্তি। × × এষ মাদনঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠঃ শ্রীরাধায়াম্ এব নান্যত্র।

বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা শ্রীরাধার বিরহের এই দশ দশা বর্ণনা করিয়া অনেকানেক সুন্দর মধুর পদ রচনা করিয়াছেন—এখানে তাহার দুই একটি মাত্র উদ্ধৃত করিব।

সখীরে! হামারি জীবত মরত কি বিধান
একি কিশোর যব　ছাড়ি গেল মাধব
ব্রজবধূ টুটল পরাণ
আগে না বুঝলি　রূপ দেখি মজলু
হৃদে বহিনু চরণ যুগল
যমুনা সলিলে সখি　অব তনু ডারব
আন সখি ভখিব গরল
কিবা কাননবল্লরী　গল বেড়ি বাধই
নবীন তমালে দিব ফাঁস
নহে—শ্যাম শ্যাম শ্যাম　শ্যাম নাম জপয়ি
ছার তনু করব বিনাশ!

…　　…　　…

মরিব মরিব সখি! নিশ্চয় মরিব
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব
তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে॥
মরণকালে কৃষ্ণ নাম লিখো মঝু অঙ্গে॥
ললিতা প্রাণের সখি মন্ত্র দিও কানে!
মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণ নাম শুনে॥
না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাইও জলে।
মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালের ডালে॥
সোইত তমাল তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়।
অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥
কবহুঁ সে পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে।
পরাণ পাওব আমি পিয়া দরশনে॥
পুনঃ যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব।
বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি॥

সখি ! যখন মরব—নিশ্চয়ই ত' মরব—

না পোড়াইও রাধা অঙ্গ না ভাসাও জলে
মরিলে তুলিয়া রেখ তমালের ডালে
-- তমালস্য স্কন্ধে সখি ! ললিতদোর্বল্লরিরিয়ং
যথা বৃন্দারণ্যে চিরম্ অবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ
—বিদগ্ধ মাধব

'মৃত্যুর পর আমার বাহুলতা তমাল তরুশাখায় এমনভাবে বন্ধন করিয়া রাখিও যেন এই দেহ চিরদিন বৃন্দারণ্যে অটলভাবে অধিষ্ঠিত থাকে।'

কেন ?

কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে--একদিন না একদিন আসিবেই আসিবে—এত প্রেম-আশা, প্রাণের পিয়াসা কখনই ভুলিতে পারিবে না—তাই বলি—

কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে
পরাণ পায়ব আমি পিয়া দরশনে !

কি fine touch ! কি কবিতা ও ভাবুকতা ! স্যাফো হইতে সুইনবার্ণ পর্য্যন্ত অনেকেই ত' প্রেমের গান গাহিয়াছেন—এমন সুর কাহারও কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইয়াছে কি ?

ক্রমে শ্রীরাধা নবমী দশায় উপনীত হইলেন—ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা—মুখের বুলি—

ক্ব নন্দকুল-চন্দ্রমা ক্ব শিখিচন্দ্রিকালংকৃতিঃ
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্ব সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি ! জীবরক্ষৌষধিঃ
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হাধিক্ বিধিম্ ॥

নিরন্তর বিরহের হাহুতাশ—

অমূল্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ! ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো ! করুণৈকসিন্ধো !
হা ! হন্ত, হা ! হন্ত কথং নয়ামি ॥ (কর্ণামৃত)
হে দেব। হে দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈকসিন্ধো !

হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
হা ! হা ! কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

ইহাকেই বৈষ্ণবেরা বলেন 'দিব্যোন্মাদ'—

ধনী ভেল মুরছিত হরিল গেয়ান
দশনে দশন লাগি মুদল নয়ান

সখীরা কৃষ্ণনাম শুনাইতে লাগিলেন—

শ্যাম নামে চেতন পাই চারিদিকে চায়
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়
তমালে দেখিয়া ধনী হইলা বিভোর
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া তমালে দিল কোর।

এই বিরহকে খৃষ্টীয় মিষ্টিকেরা 'Dark night of the soul' বলেন। সে অবস্থায় প্রেয়সীর মনে হয় প্রিয়তম তাহাকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন— 'the anguish of the lover who has suddenly lost the Beloved'। এইজন্য বিরহের নাম 'Divine Absence'—'the ecstasy of deprivation' —Teressa যাহাকে 'Pain of God' বলিয়াছেন। তখন ভক্তপ্রাণের মধ্যে একটা বিরাট্ রিক্ততা অনুভব করে—'a profound emptiness, a period of destitution'। সে অবস্থায় ক্রুশবিদ্ধ ক্রাইষ্টের কাতরোক্তির সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম হয়—'Father ! Father ! Why hast Thou forsaken me ?' বসন্ত-পূর্ণিমার স্নিগ্ধজ্যোতিঃ উপভোগের পর অমানিশার ঘনান্ধকারের অনুভূতির ন্যায় সঙ্গমের পর বিরহ !

Thou didst begin, oh my God, to withdraw Thyself from me ; and the pain of Thy absence was the more bitter to me, because Thy presence had been so sweet to me, Thy love so strong in me.—Madame Guyon.

ভক্ত মিলনের প্রথমোচ্ছ্বাসে মনে করে চিরদিন বুঝি ঐ ভাবেই যাইবে, কিন্তু সে মরীচিকার অচিরেই অবসান হয়।

The soul believes that this temporary (fleeting) union will prove a perdurable consciousness of the Divine. Blind fool ! The 'night of the Soul' is yet to come.—Underhill—p. 457.

(In সঙ্গম), when 'basking in the sunbeams of the uncreated Light' he forgets that he has not yet reached the 'Perfect Land'—is yet far removed from the true end of Being. So the Light withdraws itself and the 'Dark night of the Soul' sets in.—Ibid. p. 287.

মনোবিজ্ঞানের আলোকে দেখিলে সঙ্গমের পর বিরহ (the great swing-back into darkness) কেন যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বুঝা যায়। কারণ, 'affirmation has to be paid for by negation.' যোগোহি প্রভবাপ্যয়ৌ। অতএব সঙ্গমের pleasure-affirmation স্বতঃই বিলুপ্ত হয় এবং বিরহের pain-negation তাহার স্থান অধিকার করে! This 'Divine negation' the self must probe, combat and resolve.

বিরহের সময় মনে হয় বুঝি এ কালরাত্রির আর অবসান হইবে না—বুঝি নষ্টচন্দ্র আর হৃদয়াকাশে সমুদিত হইবে না।

'The greatest affliction of the sorrowful soul in this state', says St. John of the Cross, 'is the thought that God has abandoned it, of which it has no doubt,—is the sense of being without God.'

বিরহে ভক্ত ভগবান্‌কে অন্বেষণ করে কিন্তু তাঁহার পদচিহ্ন খুঁজিয়া পায় না—

—She seeks God and cannot find the least marks or footsteps of His presence.

God having shewn Himself has now deliberately withdrawn His presence, never perhaps to manifest Himself again. 'He acts', says Eckhart, 'as if there were a wall erected between Himself and us ?

তখন কি মনে হয়?

With Thee, a prison would be a rose garden, oh Thou, Ravisher of Hearts. With Thee hell would be paradise, oh Thou Cheerer of souls.'

—মৌলানা রুমি

রাধার প্রধানা সখী বৃন্দা দেখিলেন শ্রীরাধিকার বিরহের ঐরূপ দশম দশা উপস্থিত—মৃত্যু অতি নিকট। এই মৃত্যুই বিরহের চরম দশা। খৃষ্টান মিষ্টিকেরা ইহাকে "mystic death" বলেন। মাদাম্ গাইয়ন নিজের অবস্থা বর্ণন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন,—

The nearer the soul drew to the state of death, the more her desolations were long and weary, her weaknesses increased, and also her joys became shorter, but purer and more intimate, until the time in which she fell into total privation.

আরাধিকা সেন্ট টেরেসা এইরূপে আত্মবিরহের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন,—

The pain grows to such a degree of intensity that inspite of oneself one cries aloud. Moreover, the intense and painful concentration upon the Divine Absence, which takes place in this 'dark rapture', induces all the psycho-physical marks of ecstasy. Although this ecstasy last but a short time, the bones of the body seem to be disjoined by it. The pulse is as feeble as if one were at the point of death * * she is no longer the mistress of reason * * she burns with a consuming thirst and cannot drink at the well which she desires.

এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত নহে, চৈতন্যদেবের বিরহদশার বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা প্রতীত হয়।

প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যায়, শ্বাস নাহি আর।
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার॥
সঘনে পুলক যেন শিমূলের তরু।
কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ, কভু হয় সরু॥
প্রতি রোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম।
'জজ গগ মম পরি' গদ্‌গদ বচন॥
এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে।
ঐছে নড়ে দন্ত, যেন ভূমে খসি পড়ে॥

*   *   *

প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার।
তার উপর রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার॥
প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার।
কণ্ঠ ঘর্ঘর—নাহি বর্ণের উচ্চার॥
দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার।
সমুদ্রে মিলয়ে যেন গঙ্গাযমুনাধার॥

রাজকবি টেনিসন্ তাঁহার বিখ্যাত 'Lady of Shalott' কবিতায় বিরহিণীর দশম দশা—মৃত্যুর বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনা মনোহারিণী বটে কিন্তু রাধিকার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর।

Down she came and found a boat
Beneath a willow left afloat,
And round about the prow she wrote
'The Lady of Shalott,
And at the closing of the day
She loosed the chain, and down she lay,
The broad stream bore her far away,
The Lady of Shalott.
Heard a carol, mournful, holy,
Chanted loudly, chanted lowly,
Till her blood was frozen slowly,
And her eyes were darkened wholly.
Turned to towered Camelot
For ere she reached upon the tide
The first house by the water side,
Singing in her song she died,
The Lady of Shalott.

বিরহের উপযোগিতা কি ? কেন ভগবান্ ভক্তকে বিরহানলে দগ্ধ করেন ? বিরহের তাপে স্বর্ণের শ্যামিকা ক্ষালিত হইয়া বিশুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে বলিয়া। তত্ত্বদর্শী কবীর ঠিকই বলিয়াছেন—

বিরহ অগিন অন্দর জারে
তব পাওয়ে পদ পূরে।

'In the dark night of the Soul comes Krishna to Radha.—Vaswani

উদঘূর্ণা বিরহ চেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম
বিরহে কৃষ্ণ স্ফূর্তি, আপনাকে কৃষ্ণ জ্ঞান।—চরিতামৃত

খৃষ্টীয় মিষ্টিক্‌দেরও ঐ কথা—

'In the midst of a psychic storm (বিরহ), mercenary love is for ever

disestablished and the new state of pure love (অকৈতব প্রেম) is abruptly established in its place. With mystics the Dark Night is all directed towards the essenetial mystic act of utter self-surrender, that 'fiat voluntas tua' which marks the death of selfhood in the interests of a new and deeper life—a complete self-naughting, an utter acquiescense in the large and hidden purposes of the Divine Will.—Underhill's Mysticism.

এ সম্পর্কে আরাধিকা সেণ্ট ক্যাথেরিনের সাক্ষ্য উপেক্ষণীয় নহে।

'In order to raise the soul from imperfection' said the Voice of God to St. Catherine, 'I withdraw myself from her sentiment—which I do in order to humiliate her, and to cause her to seek Me in truth. * * Though she perceives that I have withdrawn myself, she awaits with lovely faith the coming of the Holy Spirit, that is, of Me, who am the Fire of Love.

—ভগবদ্-বিরহ এমনই চমৎকারী! এইজন্য 'সঙ্গম ভাল কি বিরহ ভাল?' ইহার উত্তরে কবি বলিয়াছেন—সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গম স্তস্যাঃ।

কিন্তু বিরহের হাহুতাশেই প্রেমলীলার পর্য্যবসান নয়—মাথুরের পরই পুনর্মিলন। আগামী বারে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

গোলাপবাগানে ছায়া

সমুদ্রের ধারে সুন্দর একখানি কটেজের জানালার পাশে বেঁটে খাটো একটি জোয়ান লোক খবরের কাগজ পড়ার ভান ক'রে যেন নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। বেলা প্রায় সাড়ে আটটা। বাইরে সকালের রোদে বড় গোলাপগুলো গাছে ঝুলছে—যেন ছোট ছোট আগুনের পাত্র। লোকটি একবার টেবিলের দিকে তাকালে, তারপর দেয়াল-ঘড়িটার দিকে, তারপরে নিজের বড় রূপোর ঘড়িটার 'পরে। মুখে অসহিষ্ণুতার ছায়া পড়লো। তারপরে, উঠে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলোর 'পরে দৃষ্টি গেলো, তীক্ষ্ণ অপ্রসন্ন দৃষ্টি পড়লো The Stag at Bay ছবিটার প্রতি বিশেষ ক'রে। পিয়ানোর ঢাকনা খুলতে গিয়ে দেখে চাবি-দেওয়া। ছোট একখানা আরশিতে নিজের মুখ দেখে ব্রাউন গোঁফে একটু তা দিলে, চোখে ফুটলো একটা সচকিত ভাব। দেখতে মন্দ নয় তাকে। আবার গোঁফে তা দিলে। শরীরটা একটু বেঁটে বটে, তা হলেও বেশ চটপটে, সাবলীল। আরশি থেকে যাবার সময় নিজের চেহারার তারিফের সঙ্গে তার চোখে একটু আত্মশ্লাঘাও দেখা দিলে।

মনের ভাব চেপে সে বাগানে গেলো। গায়ের জামাটা বেশ নতুন, চমৎকার কাটছাঁট, লোকটির আত্মপ্রসন্ন চেহারায় বেশ মানিয়েছে। লনের কাছে দেবদারু গাছটাকে একবার দেখলে, তারপর অন্য গাছেব কাছে গেলো। একটা বাঁকাচোরা আপেলগাছে লালচে রঙের ফলগুলোকেই বেশী সুবিধের মনে হোলো। চারদিকে তাকিয়ে বাড়ীর দিকে পিছন ক'রে একটা আপেল পেড়ে তাতে বেশ বাগিয়ে একবার দাঁত বসালে। আশ্চর্য্য, আপেলটা বেশ মিষ্টি। আর এক কামড় তবে। তারপরে বাগানের দিকে শোবার ঘরের জানালাগুলোর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে চমকে উঠলো একটি মেয়ের চেহারা দেখে। মেয়েটি তার স্ত্রী, অন্য কেউ নয়। সে দূরে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলো, বোধহয় একে দেখতে পায়নি।

দু' এক মুহূর্ত্ত সে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার স্ত্রী দেখতে বেশ ভাল, বোধহয় বয়সে তার চাইতে একটু বড়, ফ্যাকাশে তবে স্বাস্থ্যবতী, মুখে এক রকম কাতর ভাব। সোনালি চুলের রাশ কপালের ওপর ভাঁজ করা। লোকটির দিকে না তাকিয়ে সে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে। তার এ রকম উদাসীন

ভাব দেখে লোকটির অস্বস্তি বোধ হোলো। পপি ছিঁড়ে জানালার দিকে ছুঁড়লে। মেয়েটি চমকিয়ে উঠে' তার দিকে একবার অদ্ভুতভাবে হাসলে, আবার যেমন তাকিয়েছিলো তেমনি তাকালে। তারপর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে জানালা ছেড়ে চ'লে গেলো। লোকটি তার সঙ্গে দেখা করতে ভেতরে ঢুকলো।

—কতক্ষণ ধ'রে যে বসে আছি, লোকটি বল্‌লে।

—আমার জন্যে, না খাবারের জন্যে?—মেয়েটি হাল্কাস্বরে বললে,—আমরা ন'টা বলেছিলেম মনে নেই! আমার মনে হয়েছিলো তুমি হয়তো এতখানি রাস্তার পরে ঘুমোবে।

—তুমি ত জানই আমি বরাবর পাঁচটার সময় উঠি, ছ'টার পরে বাপু কোন-মতেই বিছানায় থাকা যায় না, আর এই রকম সকালে এতক্ষণ বিছানায় থাকার চাইতে খনির মধ্যে থাকা ঢের সহজ।

—বাবা! এখানেও তোমার খনির কথা মনে হয়!

মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঘুরে' ঘুরে' দেখতে লাগলো। কাঁচের ঢাকনার তলায় সব সৌখিন জিনিবপত্র। লোকটি তার দিকে তাকিয়ে রইলো, চোখের দৃষ্টিতে অস্বাচ্ছন্দ্য, জোর ক'রে খুসী হওয়ার ভাব। মেয়েটি কাঁধদুটি একবার নাড়লে।

—চলো, যতক্ষণ না মিসেস কোট্‌স্ খাবার আনছে ততক্ষণ বাগানে যাই, মেয়েটি লোকটির হাত ধরে বললে।

—তাড়াতাড়ি আনলে যে বাঁচি, লোকটি গোঁফে তা দিয়ে ব'লে উঠলো। মেয়েটি অল্প হেসে তার হাতে ভর দিয়ে চললো। লোকটি পাইপ ধরালে।

সিঁড়ি দিয়ে নামছে এমন সময় মিসেস কোট্‌স্ আগন্তুকদের বেশ ভাল ক'রে একবার দেখবার জন্যে তাড়াতাড়ি জানালায় গিয়ে দাঁড়ালো। বেশ ঋজু শরীর আর চমৎকার স্বভাব মিসেস কোট্‌সের। চীনে-নীল উজ্জ্বল চোখজোড়া তাদের দেখতে লাগলো, লোকটি তার স্ত্রীকে নিয়ে বেশ সহজভাবে চলাফেরা করছে।

—মাথায় ঠিক সমান। মেয়েটি নিশ্চয়ই তার চাইতে বেঁটে লোককে বিয়ে কোরতোনা, যদিও অবশ্য অন্য বিষয়ে মেয়েটির সঙ্গে তুলনাই হয় না, মিসেস কোট্‌স অল্প একটু ইয়র্কশার টানে আপন মনে বকে চলেছে। এমন সময় তার নাতনী ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ট্রেটা রাখলে, রেখে ঠাকুরমার কাছে গেলো।

—ঠাকুরমা, লোকটা আপেল ছিঁড়ে খাচ্ছিলো।

—তাই নাকি রে, দুষ্টু! তা ওর যদি ভাল লাগে থাক্না।

বাইরে লোকটি অধীর হয়ে চায়ের বাটির টুংটাং শুনছিলো। শেষকালে একটা বড় রকমের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দুজনে খেতে এলো। খানিক পরে লোকটি খাওয়া থামিয়ে বললে,

—এ জায়গাটা কি তুমি ব্রিডলিংটনের চাইতেও ভালো বলতে চাও?

—শতগুণে! তা ছাড়া এ জায়গাটায় আমার খুব ভাল লাগে, অচেনা একটা সমুদ্রতীরের জায়গা ব'লে মনে হয় না আমার।

—কতদিন এখানে ছিলে?

—দু' বছর।

লোকটি চিন্তিত ভাবে খেতে লাগলো।

—আমার কিন্তু মনে হয় এবার আর একটা নতুন জায়গায় যাওয়াই ভাল হোতো তোমার পক্ষে, লোকটি শেষে বললে।

মেয়েটি অত্যন্ত চুপ, তারপরে সুক্ষ্মভাবে কথা বাড়িয়ে দিলে—

—কেন, তোমার কি মনে হয় আমার এখানে ভাল লাগবে না?

খোলাহাসি হেসে রুটির ওপর মার্মালেড্ লাগাতে লাগাতে লোকটি বললে,

—তাই তো মনে হয়।

মেয়েটি এবারেও তার প্রতি মনোযোগ দিলে না।

—কিন্তু ফ্রাঙ্ক, এ নিয়ে যেন গাঁয়ে কিছু বোলো না, মেয়েটি আস্তাভাবে বললে, আমি কে, কি আমি এখানে থাকতেম—এ সব কথা। এখানে বিশেষ ক'রে কোন লোকের সঙ্গেই আমি দেখা করতে চাইনে। আর জানাজানি হোলে এখানে কিছুতেই সহজভাবে থাকতে পারবো না।

—তা হলে তুমি এলে কেন?

—'কেন?' তুমি কি বুঝতে পারবে না, কেন?

—যদি কারুর সঙ্গে আলাপই না করবে তাহলে কেন যে আসা তা বুঝি না।

আর কিছু কথা সে বললে না।

—মেয়েরা পুরুষদের থেকে তফাৎ, মেয়েটি বললে। কেন যে আসতে চাইলেম তা আমিই জানিনে—কিন্তু এসেও পড়লেম।

গায়ে-পড়া হয়ে মেয়েটি তাকে আর এক কাপ কাফি ঢেলে দিলে। তারপর কথার রেশ টেনে বললে,

—শুধু তুমি আমার সম্বন্ধে গাঁয়ে কিছু বোলোনা, মেয়েটি অস্থিরভাবে একটু হাসলো। আমি চাইনে আমার অতীত জীবন খুঁড়ে তোলা হয়। ব'লে, কাপড়ের ওপর রুটির টুকরোগুলি আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সরাতে লাগলো। কফি খেতে খেতে লোকটি তার দিকে তাকালে, তারপর গোঁফ চুষে, বাটিটা নামিয়ে অসহিষ্ণু স্বরে বলল,

—বাজি রাখতে পারি, তোমার অনেক কীর্ত্তিকলাপ আছে।

মেয়েটি একটু অপরাধীর দৃষ্টিতে টেবলক্লথের দিকে তাকালে। সে দৃষ্টিতে লোকটা যেন খুসী হোলো।

—আমি কে তা তুমি প্রকাশ ক'রে দেবে না, আমাকে ধরিয়ে দেবে না, কেমন ত? মেয়েটি আবদারের সুরে বললে।

—না, তোমায় ধরিয়ে দেবো না। লোকটি আশ্বাসের সুরে হেসে উঠলো। খুব খুসী।

মেয়েটি চুপ। দু'এক মিনিট পরে মাথা তুলে বললে,

—মিসেস কোট্‌সের সঙ্গে এখন আমার অনেক কাজকর্ম্ম সারতে বাকী, তুমি আজ একলাই বেড়িয়ে এসো—একটার সময় ডিনার খাব।

—সারা সকালটাই এমন কিছু তোমার গুছোতে লাগবে না!

—না, তা নয়, তবে আমায় কতগুলো চিঠি লিখতে হবে, আবার জামার সেই দাগটা তুলে ফেলতে হবে। আজ সকালে এই সব ছোটখাটো নানান কাজ। তুমি আজ একলাই বেড়িয়ে এসো।

লোকটি বুঝলে সে আজ অতিরিক্ত; মেয়েটি যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলো তখন সে টুপিটি নিয়ে মনে মনে বেশ রাগতভাবে পাহাড়ে ঘুরতে গেলো।

খানিক পরে মেয়েটিও বেরিয়ে এলো। টুপিতে গোলাপফুল লাগানো, সাদা জামার ওপরে লম্বা লেসের স্কার্ফ। ত্রস্তভাবে ছোট ছাতাটা খুললে, তার রঙ্গীন্ ছায়ায় মুখের অর্দ্ধেক ঢাকা পড়লো। জেলেদের পায়ে পায়ে ক্ষয়ে-যাওয়া পাথর বসানো সরু রাস্তা দিয়ে সে এগিয়ে চললো। আশপাশ যেন এড়িয়ে চলতে চায় এই রকম ভাবখানা, ছাতার আড়ালে যেন নিজেকে নিরাপদ বোধ করছে।

গির্জ্জা পেরিয়ে ছোট গলি দিয়ে রাস্তার ধারে একটা উঁচু পাঁচিলের তলায় এসে পড়লো। পাঁচিলের পাশে পাশে আস্তে আস্তে চলেছে। শেষে একটা খোলা দরজার সমুখে থামলে—আধোছায়া দেয়ালের গায়ে যেন আলোয় ঝকমকে একটা ছবি। দরজা পেরিয়ে ওদিকে যেন মায়াপুরী। নীল সাদা নুড়ি বাঁধানো আঙিনায় নানা আকারের ছায়া ; আরো দূরে জ্বলজ্বলে সবুজ লন, পাশে একটা bay-গাছের পাতা ঝলমল করছে। ত্রস্তভাবে মেয়েটি ঢুকে ছায়ায় ঢাকা একটি বাড়ীর দিকে তাকালে। পর্দ্দাবিহীন জানালাগুলো কালো প্রাণহীন ; রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। সংশয়ে আরো খানিকটা এগিয়ে গেলো, আরো এগিয়ে, বাগানের দিকে শরীর বাড়িয়ে দিয়ে, ব্যগ্র উৎসুকভাবে।

প্রায় বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁচেছে এমন সময় গাছের মধ্যে থেকে ভারীপায়ের শব্দ শুনলে। বাগানের মালী, হাতে একটা বেতের ঝুড়ি, তার মধ্যে খুব পাকা, ঘন রঙের বড়বড় ট্যাপারী ; আস্তে আস্তে এ'লো।

—আজকে বাগান খোলা নেই, মালী আস্তে আস্তে বললে। সুন্দরী মেয়েটি ফিরতে উদ্যত। মুহূর্ত্তের জন্যে মেয়েটি বিস্মিত চোখে তাকালে। বাগানে সাধারণের প্রবেশাধিকার হোলো কবে থেকে !

—কবে কবে খোলা থাকে ? মেয়েটি সপ্রতিভভাবে জিজ্ঞাসা করলে।

—পাদ্রীসাহেব কেবল শুক্রেবার আর মঙ্গলবার দর্শকের জন্যে খোলা রাখেন।

মেয়েটি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। সাধারণের জন্য পাদ্রীসাহেব বাগান খোলা রাখেন ! বড় অদ্ভুত কিন্তু।

—কিন্তু সবাই ত এখন গির্জ্জায়, এখানে ত এখন কেউ আসবে না, আসবে কি ? মেয়েটি মিষ্টি সুরে বললে।

লোকটা একটু নড়লে। চুবড়ীতে ট্যাপারি গড়াগড়ি দিতে লাগলো। বললে,

—পাদ্রীসাহেবের নতুন বাড়ী হয়েছে।

দুজনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। চলে যেতে বলতে মন উঠছিলোনা লোকটার। একটু মোহন হাসি হেসে মেয়েটি শেষে বললে,

—এ-ক-টিবার গোলাপগুলোকে দেখতে দেবে ? কথার সুরে অদ্ভুত আগ্রহ।

লোকটা স'রে দাঁড়ালো, বললে,

—বিশেষ দোষ নেই, তবে বেশীক্ষ-ণ—

মেয়েটি এগিয়ে গেলো, মালীটাকে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে ভুলে গেছে। মুখে উদ্বেগের ছাপ, গতিবিধিতে অত্যধিক আগ্রহ। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে লনের দিকে সব জানালাগুলোই অন্ধকার, পর্দ্দাবিহীন, কেমন একরকম পোড়োবাড়ীর ভাব। যেন বাড়ীটা ব্যবহার হয় তবে কেউ বাস করে না। মেয়েটির ওপরে একটি ছায়া খেলে গেলো। লন পেরিয়ে বাগানের দিকে চললো, মাথার ওপরে লালরঙের পাতার খিলান, রঙ্গীন গেট। দূরে খাড়ীর মধ্যে শান্ত নীল সমুদ্র, সকালের কুয়াশায় ঢাকা, আরো দূরে ডাঙ্গার পাহাড়টা আকাশের আর জলের নীলের মাঝামাঝি মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখ বেদনায় আনন্দে জ্ব'লে উঠলো। পায়ের তলায় বাগানের ফুলে ফুলে যেন জঙ্গল হ'য়ে রয়েছে, দূরে নীচুতে গাছের কালো কালো মাথা।

বাগানের দিকে গেলো, চারদিকে সূর্য্যের আলোয় রাশিরাশি ফুল ঝলমল করছে। কোথায় ছোট্ট একটি কোণে ঝাউগাছের তলায় একটি বসবার জায়গা আছে তা জানা ছিলো। তারপর আঙ্গিনা, তাতেও অজস্র ফুলের ঝিকিমিকি, ছুটো রাস্তা নেমে গেছে, বাগানের ছুধারে ছুটো। ছাতা বন্ধ ক'রে মেয়েটি চলতে সুরু করলে, আস্তে আস্তে, ফুলের মধ্যে দিয়ে। চারদিকে গোলাপের ঝোপ, বড় বড় গোলাপের পাড়, থাম থেকে ঝুলছে, ছুলছে, উপছিয়ে পড়ছে ঝোপঝাড় থেকে। খোলা মাঠের 'পরেও অসংখ্য ফুল। দূরে মাথা তুললেই সমুদ্র আর সেই অন্তরীপটা।

আস্তে, অতি ধীরে সে একটা পথ ধ'রে চললো, নিজেকে যেন অতীতে অপসারিত ক'রে নিয়ে। হঠাৎ কখনো বা এক আধটা গোলাপ ছুঁয়ে দেখছিলো, পাপড়িগুলো ভেলভেটের মতো নরম। তার স্পর্শ কেমন যেন অন্যমনস্ক, মা যেমন কচি ছেলের হাতে অজানিতে আদর করে। একটু ঝুঁকে ঘ্রাণ নিলে। তারপর আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে ঘুরতে লাগলো। কখনও আগুনের শিখার মতো গন্ধহীন কোন ফুলের পরে দৃষ্টি পড়ে, থমকে দাঁড়ায়, তাকিয়ে থাকে—যেন জিনিষটাকে বুঝতে পারছে না। আবার কখনও বা একরাশ গোলাপী পাপড়ির সম্মুখে পূর্ব্ব পরিচয়ের কমনীয়তা তাকে অভিভূত করে। সাদা গোলাপের কাছে গেল ঘুরতে ঘুরতে, সেগুলোর ভিতর দিকটা বরফের মতো সবুজ। বিষণ্ণ প্রজাপতির

মতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে গোলাপে ভর্ত্তি একটা ছোট উঠানে এসে পড়লো, জায়গাটা যেন হাসিখুসি জনতায় ভর্ত্তি, রোদে ঝিলমিল করছে। দেখে সঙ্কোচ লাগে, এত অজস্র পরিমাণ আনন্দ, যেন কথায় আর হাসিতে লুটিয়ে পড়ছে, মনে হয় এক অচেনা ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়া গেছে। মেয়েটি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো, আত্মস্থতার বাঁধ গেলো খুলে, উত্তেজনা কূলছাড়া হ'য়ে তার চৈতন্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো কোথায়। বাতাসে বিশুদ্ধ সুরভি।

তাড়াতাড়ি সে সাদা গোলাপগুলির মধ্যে একটি ছোট বসবার জায়গায় গিয়ে বসলো। তার ঘনলাল ছাতা বড় চোখে ঠেকতে লাগলো। মেয়েটি একেবারে নিস্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো অস্তিত্ব হারানোর অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে, যেন সে একটি গোলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়, আধফোটা একটা গোলাপের কুঁড়ি, ফোটার তপস্যায় তন্ময়। ছোট্ট মাছি একটা তার হাঁটুতে পড়লো, তার সাদা কাপড়ে, তাকিয়ে দেখলে, যেন একটা গোলাপের 'পরেই সেটা পড়েছে। নিজের মধ্যে আর নিজে নেই সে।

একটি ছায়ার সঙ্গে সঙ্গে একজনের চেহারা দৃষ্টিতে পড়ায় রূঢ়ভাবে তার চমক গেলো ভেঙ্গে। শ্লিপার পায়ে নিঃশব্দে একটি লোক এসেছে তার কাছে, গায়ে সুতি কোট। সকালের সে মায়া, সে স্বপ্ন চূর্ণীকৃত হোলো। পাছে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় এই ভয়। লোকটি এগিয়ে এলো, মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। তারপর, লোকটিকে দেখে, গায়ের সব শক্তি যেন কোথায় উবে গেলো, আসনে আবার হঠাৎ বসে পড়লো।

লোকটি অল্পবয়সী, সৈন্যে কাজকরা চেহারা, দোহারার চেয়ে সামান্য একটু বেশি। চকচকে কালো চুল পরিপাটি ব্রাশ করা, গোঁফে মোম দেওয়া। কিন্তু চলনে কেমন একটা ঢিলে ভাব। মেয়েটি চোখ তুললে, ঠোঁটদুটি রক্তশূন্য বিবর্ণ, লোকটির চোখে চোখ রাখলে। কালো, দৃষ্টিহীন চোখ দুটি, মানুষের চোখ নয়।

লোকটি এগিয়ে এসে মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে, যন্ত্রচালিতের মতো সেলাম ক'রে তার পাশের জায়গাটিতে বসলো। বেঞ্চিতে একটু উসখুস ক'রে নড়লো, পা জোড়া সরালে, তারপর ভদ্র মিলিটারী গলায় বললে,

—আপনার অসুবিধে ঘটাচ্ছিনা বোধহয় ?

মেয়েটি অসহায়, বোবা। লোকটির নিখুঁত কালো পোষাক, গায়ে সুতি

কোট। মেয়েটি নড়বার শক্তিও হারিয়েছে। কড়ে আঙ্গুলে আংটি পরানো লোকটির হাত—সে আংটি সে কত ভালো করেই না চেনে! দেখে তার মনে হোলো সে বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাবে। সমস্ত জগৎটাই উন্মত্ত প্রলাপের মতো মনে হোলো। নিশ্চেতনের মতো বসে রইলো মেয়েটি। সবল উরুর পরে ন্যস্ত হাত দুটি—যে দুটি হাত এককালে তার কাছে শুধু আবেগময় প্রেমেরই প্রতীক ছিলো—আজ তার মনে সে হাত দুটি আতঙ্কের সঞ্চার করলে।

—তামাক খেতে পারি কি? পকেটে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে লোকটি নিভৃতভাবে, যেন চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে।

মেয়েটি জবাব দিতে পারলে না, দেবার দরকারও ছিল না, কেন না লোকটি চলছে অন্য এক জগতের নিয়মে। মেয়েটির চোখে মিনতি, তাকে চিনেছে কি? তাকে চিনতে পারে কি? ব্যথায় বিবর্ণ হ'য়ে সে বসে রইলো, বসে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি!

—একটুও তামাক নেই, লোকটি চিন্তাজড়িত ভাবে বললে।

মেয়েটি তার কথা শুনতেই পেলেনা, কেবল তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে কি চিনতে পারলেই না একেবারে, তবে কি সব শেষ? উৎকণ্ঠায় যেন জমে গিয়ে সে বসে রইলো অসাড় হ'য়ে।

—আমি জন্ কট্‌ন্ খাই, ও তামাক অল্প ক'রে খরচ করতেই হয়, বড় দামী। জানেন, যদ্দিন এই মকদ্দমা চলছে ততদিন আমার অবস্থা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না।

—না, মেয়েটি বললে; বুক ঠাণ্ডা হিম, আত্মা যেন কঠিন হয়ে গিয়েছে।

লোকটি নড়লো, ঢিলে সেলাম করলে একটা, উঠলো, উঠে চললো। মেয়েটি বসে রইলো, শরীরের সব গতি স্তব্ধ। লোকটির আকৃতি তার চোখে ভাসতে লাগলো, সে আকৃতি, সে শরীর একদিন মনের সব আবেগ দিয়ে সে কী ভালোই না বাসতো; তার মাথার সেই সুঠাম গড়ন, শরীরটা এখন একটু ঢিলে হ'য়ে পড়েছে। কিন্তু এ তো সে নয়। দুর্ব্বোধ্য আতঙ্কে সমস্ত শরীর ভ'রে উঠলো।

হঠাৎ লোকটি ফিরে এলো, কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে।

—তামাক খাওয়াতে আপনার আপত্তি আছে কি? তামাক খেতে খেতে সব জিনিষ আমার চোখের সামনে বেশ স্পষ্ট হয়।

মেয়েটির পাশে আবার বসে পাইপে তামাক ভরতে লাগলো। তার সুন্দর

সুগঠিত আঙ্গুলগুলির দিকে মেয়েটি তাকিয়ে রইলো। বরাবরই আঙ্গুলগুলো সামান্য একটু কাঁপতো ; ভারী বিস্ময় লাগতো আগে, এমন সুস্থ চেহারা, অথচ আঙ্গুল কাঁপে। আজকে আঙ্গুলগুলি আবার ঠিক চলছিলো না, পাইপ থেকে তামাকপাতা এলোমেলো ঝুলছে।

—আইনের পঁ্যাচে জড়িয়ে পড়েছি আবার। ভারি বিদ্‌ঘুটে এই মকদ্দমার ব্যাপার। সলিসিটরকে আমার ঠিক কী দরকার কতবার বলেছি, কিন্তু কিছুতেই কাজ হয় না।

মেয়েটি ব'সে তার কথা শুনতে লাগলো। কিন্তু এ তো সে নয়। তবুও একদিন যে হাতে সে কতো চুমু খেয়েছে এ তো সেই হাত, এ সেই চকচকে মায়া-জড়ানো কালো চোখ যা সে ভালোবাসতো। কিন্তু তবুও এ তো সে নয়। ভয়ে স্তব্ধ নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো।

হাত থেকে তামাকের থলিটা খ'সে পড়লো, লোকটি মাটি হাতড়াতে লাগলো। তবুও সে বসে থাকবে, দেখবে একবারও চিনতে পারছে কিনা। কেন চ'লে যেতে পারছে না সে। মুহূর্ত্তের মধ্যে লোকটি উঠে দাঁড়ালো।

—আমাকে এখনিই যেতে হবে, পঁ্যাচাটা আবার আসবে। তারপরে, নিভৃত সুরে কথা টেনে বললে, তার নাম সত্যিই পঁ্যাচা নয়, তবে আমি তাকে ঐ বলেই ডাকি। যাই, দেখি এসেছে কিনা।

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। লোকটিও তার সমুখে দাঁড়ালো, মনে সংশয়ের জড়িমা। সুপুরুষ, সৈন্যে কাজ করা চেহারা, বদ্ধ উন্মাদ। মেয়েটির চোখ তাকে খুঁজলে, মরিয়া হয়ে তার চোখের মধ্যে খুঁজলে, যদি সে তাকে আবিষ্কার করতে পারে, যদিই কোন অভিজ্ঞান পায়, যদি লোকটি তাকে চিনতে পারে।

—চিনতে কি পারছো না? মেয়েটির নিঃসঙ্গ আতঙ্কিত আত্মা থেকে কথাগুলি ধ্বনিত হোলো। লোকটি হাবার মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলো, সে দৃষ্টি তাকে সইতে হোলো। সে দৃষ্টি তার 'পরে পড়লো, সম্পূর্ণ অর্থহীন বুদ্ধিহীন দৃষ্টি। লোকটি আরও কাছে সরে এলো।

—হ্যাঁ, আমি চিনতে পারছি, দৃঢ়, একাগ্র, উন্মাদ মুখ আরও কাছে সরিয়ে এনে লোকটি বললে। তার আতঙ্ক সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে, শক্ত সমর্থ উন্মাদটা তার বড় কাছে এসে পড়লো যে।

একজন লোক তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো, বললে,

—বাগান আজ সকালে খোলা নেই।

পাগলটা থমকে দাঁড়িয়ে তার দিকে চাইলে। মালীটা বেঞ্চির কাছে গিয়ে তামাকের থলিটা তুললে,

—মশায়, আপনার তামাক ফেলে যাচ্ছিলেন।

—আমি এই এঁকে লাঞ্চে থাকবার জন্যে অনুরোধ করছিলাম, আমার বন্ধু কিনা, লোকটি বিনীতভাবে বললে।

মেয়েটি ফিরেই দ্রুত হাঁটতে সুরু করলে। অন্ধের মতো, সেই রৌদ্রলাগা গোলাপের মধ্যে দিয়ে, বাগান পেরিয়ে, নুড়ি দিয়ে বাঁধানো উঠান পেরিয়ে, রাস্তা দিয়ে। দ্বিধাহীন, ক্ষিপ্রপদে অন্ধের মতো চলে গেলো, কোথায় তার খেয়াল নেই। যেমনি বাড়ীতে পা দিলে অমনি ওপরে উঠে, টুপিটা টেনে ফেলে বিছানায় বসলো। মনে হোলো যেন শরীরের কোন পর্দ্দা ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেছে, যেন চিন্তা বা অনুভূতির সামর্থ্য এতটুকু অবশিষ্ট নেই। জানালার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। একটা আইভিলতা সমুদ্রের হাওয়ায় অল্প দুলছে; সে হাওয়াতেও যেন রৌদ্রোদ্ভাসিত সমুদ্রের আমেজ। একেবারে নিশ্চলভাবে বসে রইলো, আত্মাশূন্য শরীর। কেবল মনে হোলো বোধ হয় অসুখ করেছে, বোধ হয় ছিন্ন অন্ত্র রক্তে ভেসে গেলো। নিশ্চল হয়ে বসে রইলো, একে বারে নিস্তব্ধ হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে নীচের তলায় তার স্বামীর পায়ের শব্দ শুনলে, কঠিন, ভারী শব্দ, তার কান সে শব্দর অনুসরণ করলে, অসহিষ্ণু পদশব্দ একবার মিলিয়ে গেলো, তার পর গলা শোনা গেলো, ফূর্ত্তিতে ভরা গলা, পায়ের শব্দ এগিয়ে এলো।

তার স্বামী ঘরে ঢুকলো, প্রফুল্লভাব আঁটসাঁট চেহারায় আত্মতৃপ্তি মাখানো। কাঠের পুতুলের মতো মেয়েটি একটু নড়লো। লোকটির একটু থতমত লাগলো।

—ব্যাপার কী? অসহিষ্ণু গলায় সে জিজ্ঞাসা করলে। শরীর কি তোমার ভালো নেই? কথাগুলো শূলের মতো লাগলো।

—না, বেশ আছি।

লোকটির চাউনি নির্ব্বোধের মতো, কুপিত।

—তোমার ব্যাপারখানা কী?

—কিছু না।

কয়েক পা এগিয়ে গেলো, নাছোড়বান্দার মতো দাঁড়িয়ে, জানালার বাইরে দৃষ্টি রেখে বললে,

—কারুর সঙ্গে কিছু হয়েছে নাকি ?

—না, এমন কেউ নয় যে নাকি আমাকে চেনে।

লোকটার হাতগুলো কাঁপতে লাগলো, ভয়ানক অপমানিত বোধ করলে, সে যেন সমুখে নেই এইরকম ভাব তার স্ত্রীর। না থাকতে পেরে শেষে বললে,

—নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

—না, কেন ? মেয়েটি নিরাসক্ত, লোকটি যেন কোন তুচ্ছ বিরক্তির কারণ, এ ছাড়া তার কোন অস্তিত্বই নেই যেন।

ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো লোকটা, গলার শিরাগুলি ফুলে উঠলো, বললে,

—সেই রকমই মনে হচ্ছে।

অর্থহীন রাগ যাতে না প্রকাশ হয় তার চেষ্টা করতে করতে সে নীচে নেমে গেলো। মেয়েটি বিছানার পরে চুপ করে বসে। অনুভূতির শক্তি যা অবশিষ্ট ছিলো তাতে কেবল তার স্বামীর প্রতি ঘৃণা আসে। তাকে বিরক্ত করবার তার স্বামীর কী অধিকার ! সময় বয়ে যাচ্ছে, ডিনার দেওয়া হয়েছে, গন্ধ ভেসে এলো, তার স্বামী বাগানে পাইপ খাচ্ছে—সে গন্ধও। তবুও নড়বার শক্তি সে খুঁজে পেলে না। টুং করে ঘণ্টা বাজলো। স্বামী ঘরে এলো ওপরে উঠবার শব্দ হচ্ছে। প্রত্যেক পদক্ষেপে মনের ভেতরটা যেন জমে উঠেছে, দরজা খুলে গেলো।

—খাবার দিয়েছে।

স্বামীর উপস্থিতি যেন অসহ্য হয়ে উঠেছে, তাকে যে বড় ঘাঁটাচ্ছে, শরীরে প্রাণ যে ফিরে আসছেনা, কাঠের মতো উঠে নীচে নেমে এলো। খাবার সময় না পারলে খেতে, না বলতে পারলে কথা, অন্যমনস্ক ছিন্ন আত্মশূন্য অবস্থায় বসে রইলো। তার স্বামী খেতে চেষ্টা করলে, ভাব দেখালে ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, শেষে রাগে নির্ব্বাক হ'য়ে রইলো। মেয়েটি ওপরে উঠে ঘরে চাবি দিলে। একা থাকা তার একান্ত প্রয়োজন। তার স্বামী পাইপ নিয়ে বাগানে বসলো। স্ত্রী তাকে অবজ্ঞা করে—এই রাগে তার বুকটা যেন কালো হয়ে উঠেছে। যদিও সে জানেনা তবুও কথাটা থেকে যায় যে সে তার স্ত্রীকে জয় করতে পারেনি, তার স্ত্রী তাকে ভালোবাসেনি। মেয়েটি দয়া করে তার স্ত্রী হয়েছে, এই হোলো তার কাল।

লোকটা কোন এক খনির ইলেকট্রিকের এঞ্জিনিয়ার, সামাজিক হিসেবে মেয়েটির অনেক নীচে। স্ত্রীকে সে সব সময়েই নিজের মতে চলতে দিয়েছে, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে মনে সহ্য করেছে আত্মাবমাননা। আজ যেন সব রাগ ঠেলে বেরুতে চায়।

উঠে ভেতরে গেলো। তৃতীয়বার মেয়েটি সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলে। হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে। ছিটকিনি তুলে দরজায় ধাক্কা দিলে লোকটা—দরজায় চাবি দেওয়া। আরো জোরে ধাক্কা দিলে। হৃৎপিণ্ডের কাজ একেবারে থেমে গিয়েছে।

—দরজা কি বন্ধ করে দিয়েছ? বাড়ীঅলীর কথা ভেবে গলা নামিয়ে লোকটা জিজ্ঞাসা করলে।

—হ্যাঁ, দাঁড়াও, একমিনিট।

মেয়েটি উঠে দরজা খুলে দিলে, ভয় করছিলো দরজা বুঝি বা ভেঙ্গে যাবে। স্বামীর প্রতি ঘৃণায় মন ভরে গিয়েছে, কেন তাকে একলা থাকতে দিচ্ছে না। লোকটি দাঁতে পাইপ চেপে ঘরে ঢুকলো, মেয়েটি আগেকার মতো খাটে উঠে বসলো। দরজা ভেজিয়ে তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে লোকটি দৃঢ়ভাবে প্রশ্ন করলে,

—ব্যাপারটা কী?

আর সহ্য হয় না।

—একটুখানি কী একলা থাকতেও পাবো না? স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মেয়েটি বললে।

মেয়েটির মুখে লোকটি তাকালে, পূর্ণদৃষ্টি অপমানের জ্বালায় ভরা; খানিক-ক্ষণ চুপ করে থাকার পর প্রত্যেক কথা যেন গুণে গুণে বললে,

—তোমার একটা কিছু ঘটেছে, না?

—হ্যাঁ, তা বলে তুমি কী আমাকে এ রকম নরক যন্ত্রণা দেবে নাকি?

—আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছি না, হয়েছে কী?

—তোমার শোনার দরকার? মেয়েটি ঘৃণায় মরিয়া হয়ে বলে উঠলো।

কট্ ক'রে একটা শব্দ হোলো, লোকটি চমকে উঠে হাত দিয়ে মুখ থেকে পড়ন্ত পাইপটা ধরে ফেললে, পরে কামড়ে-ভাঙ্গা পাইপের মুখটা জিভ দিয়ে বার করে ধরলে। পাইপটা নিবিয়ে ওয়েষ্টকোটের ছাই ঝেড়ে মাথাটা ফের উঁচু করলে—

—আমি জানতে চাই। মুখ পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে, বীভৎস ভঙ্গী।

কেউই অন্যের দিকে তাকালেনা। মেয়েটি বুঝলে লোকটা ক্ষেপে গিয়েছে। ঘৃণা করলেও মেয়েটি তাকে উপেক্ষা করবার শক্তি পেলে না। হঠাৎ মাথাটা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললে,

—জানবার কী অধিকার আছে তোমার?

লোকটা তার দিকে তাকালে, সে চোখের আহত দৃষ্টি তার মনে বিস্ময়ের ব্যথা জাগালে। কিন্তু মন চকিতে কঠিন হয়ে উঠলো। সে ত তাকে কখনও ভালোবাসেনি, এখনও ত বাসেনা।

হঠাৎ মাথাটা ঝাঁকানি দিয়ে উঠলো—যেন মুক্তি পেতে চায়, অব্যাহতি পেতেই হবে তাকে। স্বামীর হাত থেকে মুক্তি নয়, তরে নিজের মধ্যে কী একটার কবল থেকে, যেটা নাগপাশের মতো জড়িয়ে আছে, তাকে গিলছে। সব জিনিষে মর্ম্মান্তিক ঘৃণা তাকে নির্ম্মম করে তুললে। দরজায় ঠেসান দিয়ে স্বামী দাঁড়িয়ে, যেন যতদিন না সে লুপ্ত হয় ততদিন অনন্তকাল ধরে তার পথ জুড়ে দাঁড়াবে। স্বামীর দিকে তাকালে, শীতল শত্রুতা মাখানো দৃষ্টি।

—জানো তো আমি আগে এখানে থাকতেম, মেয়েটি কঠিন স্বরে আরম্ভ করলে, যেন তাকে নির্ম্মম আঘাত করতে চায়। লোকটা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়লে।

—তা, আমি Torril Hall-এ মিস্ বার্চ্চের সঙ্গিনী হয়ে ছিলেম; মিস্ বার্চ্চ আর এখানকার পাদ্রী দুজনের বন্ধুত্ব ছিলো- আর্চ্চি ছিলো পাদ্রীর ছেলে।

খানিকক্ষণ সব চুপ। কী ঘটতে যাচ্ছে লোকটির খেয়াল নেই, কেবল শুনছে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে। মেয়েটি বিছানায় পা মুড়ে বসে কাপড় হাত দিয়ে ভাঁজ করছে আর খুলছে। চোখে বিরাগ।

—সে ছিলো অফিসার—সাব লেফটানেন্ট—কর্ণেলের সঙ্গে ঝগড়া হয়, তাতে আর্ম্মি ছেড়ে চলে আসে। সে যাই হোক—। মেয়েটি পোষাকটা টানলে, স্বামী নিশ্চল দাঁড়িয়ে, শিরায় শিরায় মত্ততা জেগে উঠেছে।—সে যাই হোক সে আমাকে পাগলের মতো ভালবাসতো, আমিও।

—কতো বয়স ছিলো তার? স্বামী জিজ্ঞাসা করলে।

—কখন, যখন আমার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়, না, যখন চ'লে গেলো?

—যখন প্রথম আলাপ হোলো ?

—যখন প্রথম আলাপ হয় তখন তার বয়স ছাব্বিশ—এখন—একত্রিশ—প্রায় বত্রিশ—কারণ আমার ত উনত্রিশ, আমার চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়। মাথা তুলে মেয়েটি সমুখের দেয়ালে তাকালে।

—তারপর হোলো কী ?

মেয়েটি কঠিন হয়ে উঠলো, নিরুৎসুক ভাবে বললে,

—প্রায় একবছর আমরা বাগদত্ত হয়েই ছিলাম, যদিও কেউ জানতোনা—অন্তত, লোকে কানাকানি করতো; তবে খোলাখুলি ভাবে বলতো না—তারপর সে চলে গেলো।

—তাহলে তোমাকে ত্যাগ করলে ? পশুর মতো তার স্বামী বলে উঠলো, যেন আঘাত দিয়ে তাকে কাছে টানতে চায়। মেয়েটির বুক রাগে ধড়াস করে উঠলো, তারপর তাকে আরো রাগিয়ে দেবার জন্যে বললে,

— হ্যাঁ। লোকটা এক পায়ের থেকে অন্যপায়ে ভর দিলে, মুখ দিয়ে বেরুলো ক্রোধের অস্ফুট ধ্বনি, খানিকক্ষণের জন্যে সব চুপ।

—তারপর,—ব্যথায় মেয়েটির গলার স্বর শ্লেষের মতো শোনালো,—তারপর সে হঠাৎ আফ্রিকায় যুদ্ধ করতে গেলো, এবং সেদিন তোমার সঙ্গে দেখা বোধ হয় সেই দিনই মিস্ বার্চ্চের কাছে শুনলেম তার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে—আর, দুমাস পরে শুনলেম মারা গিয়েছে—

— আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার আগেই তাহলে ব্যাপারটা ঘটেছিলো ?

কোন উত্তর নেই। খানিকক্ষণ কেউই কথা বলেনা। লোকটি বুঝতে পারেনি। তার চোখজোড়া কুশ্রীভাবে কোঁচকানো।

—পুরানো অভিসারের জায়গা সব দেখতে বেরিয়েছিলে, না ? তাই বুঝি আজ সকালে একলা একলা যাবার ইচ্ছে হয়েছিলো।

তবুও কোন উত্তর নেই। দরজা ছেড়ে লোকটা জানালার কাছে গেলো, হাত পিছনে মুড়ে স্ত্রীর দিকে পিছন করে দাঁড়ালো। মেয়েটির মনে হলো লোকটার হাতদুটো বিশ্রী স্থূল, মজুরের হাত, ঘাড়টাও যেন বেজায় সরু।

শেষে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও, সে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে,

—কতদিন তাহলে তার সঙ্গে কারবার চালিয়েছিলে ?

—মানে ? কণ্ঠস্বর শীতল, উত্তেজনাশূন্য।

—মানে, এই কতদিন চালিয়েছিলে তার সঙ্গে ?

মেয়েটি মাথা তুলে মুখ ফিরিয়ে নিলে। উত্তর সে দেবে না। পরে বললে,

—'কারবার চালিয়েছিলে' কথাটায় কী ইঙ্গিত করছো জানিনে। মিস্ বার্চ্চের কাছে যাবার দুমাস বাদে আমাদের দেখা হয়—আর আমি প্রথম দিন থেকেই তাকে ভালোবেসেছি—

—সেও তোমাকে ভালোবাসতো মনে করো না কি ? তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বর।

—আমি জানি সে বাসতো।

—কেমন করে জানলে, তারপরে সে ত তোমাকে ত্যাগ করলে !

ঘৃণায় আর যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে কাটলো।

—তারপর, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছিলো ? লোকটা শেষকালে ভীত কাঠের মতো গলায় বললে।

—তোমার বাঁকাচোরা প্রশ্নে ঘৃণা হয়। রাগে পাগল হয়ে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠলো। আমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসতেম—আমরা দুজনে প্রেমিক ছিলেম, ছিলেম। তুমি যা খুসী ভাবতে পারো আমার তাতে কিছু আসে যায় না; কী কাজ তোমার এ খোঁজে ? তোমার সঙ্গে দেখা হবার ঢের আগেই আমরা ভালোবেসেছি।

—ভালোবেসেছি,---ভালোবেসেছি, রাগে সাদা হয়ে লোকটা বললে,—গোরার সঙ্গে ঢলাঢলি করে, রসরঙ্গ শেষ করে তারপরে আমাকে বিয়ে করতে এলে, কেমন ?

রাগে ঢোঁক গিলতে গিলতে মেয়েটি বসে রইলো। অনেকক্ষণ চুপচাপ।

—তাহলে, তাহলে রাস্তার শেষ অবধিই গেছলে ? কণ্ঠে এখনও অবিশ্বাসের রেশ।

—বলছি কী তোমাকে এতক্ষণ! মেয়েটি কথাগুলো চাবুকের মতো ছুঁড়লে।

লোকটা যেন কুঁকড়িয়ে গেলো, ফ্যাকাশে, নৈর্ব্যক্তিক চেহারা। লম্বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত স্তব্ধতা। লোকটা যেন কুঁকড়িয়ে ছোট হয়ে গেলো। তিক্ত শ্লেষের স্বরে শেষে বললে,

—বিয়ের আগে তুমি একবারও এসব কথা বলবার প্রয়োজন মনে করলে না।

—আমাকে ত কখনও জিজ্ঞাসা করোনি!

—কখনও ভাবিনি যে তার প্রয়োজন আছে।

—বেশ, তাহলে ভাবা উচিত ছিলো।

অভিব্যক্তিহীন, প্রায় ছেলেমানুষের মতো মুখ করে লোকটি দাঁড়িয়ে রইলো, মাথায় অজস্র চিন্তার তোলপাড়, ব্যথায় বুকটা মন্তের মতো।

হঠাৎ মেয়েটি বললে,

—আজও তাকে দেখলেম, মারা যায়নি, পাগল হয়ে গিয়েছে।

তার স্বামী চমকে তার দিকে তাকালে।

—পা-গ-ল, মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে গেলো।

—বদ্ধ উন্মাদ, মেয়েটি বললে। কথাটা উচ্চারণ করতে যেন তার সংজ্ঞা লোপ পেলে। স্তব্ধতা নামলো।

—তোমাকে চিনতে পারলে? তার স্বামী খুব আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

—না।

লোকটা স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজ জানতে পারলে দুজনের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ! মেয়েটি পা মুড়ে বসেই রইলো। লোকটা তার কাছে আসতে পারলে না। কাছাকাছি আসাও যেন কোন এক চুক্তিভঙ্গের মতো। এইরকম ভাবেই চলতে বাধ্য। মর্ম্মান্তিক আঘাতে দুজনেই আহত, দুজনেই নৈর্ব্যক্তিক, কেউ আর অন্যকে ঘৃণা করছে না। কিছুক্ষণ পরে লোকটি মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

অ. মি.

[D. H. Lawrence-এর The Shadow in the Rose Garden গল্পের অনুবাদ]

ভাষা ও ছন্দ

ভাষার জন্ম হয় খেলা হিসাবে, বাক্‌প্রণালীর চর্চ্চা হয় অবসর-সময়ে গানের মজলিসে। ওজন-করা অর্থে শীলমোহর করা ভাষায় আদিম মানুষ কথাবার্ত্তা বলত না, তাদের ভাষা ছিল অসংলগ্ন, বাঁধনহারা, অর্থের সংযম বা সঙ্কোচ তাতে ছিল না, ছিল সুরের মত্ততা। মায়েরা যেমন সোহাগ করে শিশুদের অর্থহীন কথার মালা গেঁথে, ঠিক তেমনি আদিম যুগের তরুণ তরুণীরা মুখোমুখী হোয়ে বসে প্রেমালাপ ক'রতো। প্রেমিকার অর্থহীন কথার কাকলিতে মুখরিত হোয়ে উঠতো প্রেমিকের মন। অর্থের বা তত্ত্বের ঝন্‌ঝনানিতে কান ঝালাপালা হোয়ে উঠতো না। সুরের সুরাপান কোরে মনপ্রাণ উঠতো মাতাল হোয়ে। সামান্য কোন বিষয় যত ভাষায় খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় অথবা জটিল ঘনীভূত কিছু যখন ভাষায় সঠিক নির্দ্দিষ্ট হয় সাধারণতঃ ভাষা তখন হোয়ে যায় বিবর্ণ, হাড়সার, ফ্যাকাসে। আদিম ভাষা বিদ্যুৎপ্রবাহে ইন্দ্রিয়স্থানে গিয়ে পৌঁছতো—তা ছিল আরও বেশী চিত্তাকর্ষক, বিশদ-বর্ণিত এবং চিত্রাত্মক (pictorial)। একটা সম্পূর্ণ ভাবকে খণ্ড খণ্ড কোরে তবে আমরা আধুনিক ভাষায় তাকে প্রকাশ করি, কিন্তু প্রাচীন অনবচ্ছিন্ন শব্দের মারফৎ পরিপূর্ণভাবে সেটা প্রতিফলিত হোতো অপরের মনে। আদিম ভাষা এবং কবিতার মধ্যে একটা যে সুন্দর আত্মীয়তা ছিল তা এখান থেকেই বেশ বোঝা যায়। আদিম মানুষ প্রত্যেকটি শব্দ (word) ব্যবহার ক'রতো রূপকভাবে। সভ্যতার ক্রম-বিকাশের সঙ্গে ভাষার যে বিবর্ত্তন ঘটেছে তাতে অনেক প্রাচীন শব্দালঙ্কারের সরসতা এবং সৌন্দর্য্য গেছে নষ্ট হোয়ে। ভাবের বিকাশ ক্রমেই সে-জন্যে যান্ত্রিক এবং নীরস হোয়ে উঠছে। কবিতার ভাষায় ভাব প্রকাশ ক'রতে আদিম মানুষ বাধ্য হোতো তার কারণ তাদের শব্দ-সম্ভার খুব বেশী ছিল না। সচরাচর তারা রূপকভাবে এবং উপমা দিয়ে কথা বলতো বেশী। গান ও গীতিকবিতার যখন জন্ম হ'য়েছিল তখন গদ্যের জন্ম হয় নি। Oehlenschlager তাই ব'লেছেন,—

> "Thus nature drove us ; warbling rose
> Man's voice in verse before he spoke in prose."

পদ-বিন্যাসে ও শব্দ-সঙ্কলনে আদিম ভাষা অত্যন্ত অসমঞ্জস এবং অনিয়মিত ছিল। তার মধ্যে ছিল শুধু বেপরোয়া খেয়াল এবং আজগুবী কল্পনা—নিছক আকারবৃদ্ধির বিলাসিতা। নিবিড় অরণ্যে প্রাচীন গাছপালার শিকড় যেমন মাটির সঙ্গে না হয় আশপাশের লতাঝোপের সঙ্গে জোট পাকিয়ে থাকে তেমনি প্রাচীন শব্দ সব পরস্পরকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাক্‌তো। Tarde ব'লেছেন,—"Rien n'entre mieux dans les esprits grossiers que les subtilites des langues"। সুইট্ (Sweet) তাঁর "New English Grammar"-এ লিখেছেন যে আদিম ভাষায় বৈয়াকরণিক এবং যৌক্তিক শ্রেণীবিভাগগুলির ভিতর সুন্দর সামঞ্জস্য ছিল। কিন্তু আদিম ভাষার ভিতর কোন যৌক্তিক সঙ্গতি (logical consistency) ছিল না, সরলতা বা সাবলীলতা ছিল না তাদের মধ্যে, ছিল কঠিন জটিলতা এবং ভীষণ স্থূলতা। Turgot ব'লেছেন,—Des hommes grossiers ne font rien de simple. Il faut des hommes perfectionnes pour y arriver"।

অফুরন্ত ভাব-সম্ভার ছিল না প্রাচীন ভাষার অধীনে। মানুষের অন্তরের রুদ্ধদ্বারে প্রথমে ভাব (thoughts) এসে করাঘাত করে নি মুক্তির জন্যে। কারাবন্দী সহজপ্রবৃত্তি (instincts) ও উপহৃতির দল তার বহুপূর্ব্বে অন্তরের লৌহগরাদ ভেঙে শৃঙ্খলমুক্ত হোয়ে বেরিয়ে আসবার জন্যে দাড়িয়েছিল সারবন্দী হোয়ে। তাদের মধ্যে বুভুক্ষাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বা সমজাতীয় কিছু, যার দ্বারা আত্মখ্যাপন করা এবং শুধু শরীরী অস্তিত্ব রক্ষা করা যেতে পারে। এই রূঢ় বাস্তবতার আঘাত লেগে উৎসারিত হোতো শুধু একমাত্রাত্মক (monosyllabic) অব্যয় শব্দ, যন্ত্রণার বীভৎস আর্ত্তনাদ এবং তৃপ্তির বা অতৃপ্তির গোঙানি। কিন্তু এগুলো ছিল অত্যন্ত অসংলগ্ন এবং ক্রমোৎকর্ষতার কোন সম্ভাবনা ছিল না এদের মধ্যে। এগুলো হ'চ্ছে ভাষার একান্ত অবিকার (immutable) অংশ, এবং হাজার বছর আগে এরা যা ছিল এখনও প্রায় ঠিক তাই আছে।

ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশের ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দের নানা রকম মতামত আছে। যুক্তিবাদীদের মধ্যে Madvig ও Whitney-র নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মতে ভাষা হ'চ্ছে ভাবের (thoughts) বাহন এবং ভাষার সৃষ্টি হ'য়েছিলো ভাবের আদানপ্রদানের জন্যে। ভাষার সাহায্যে আদিম মানুষ নিজ নিজ জীবনের

কঠিন প্রয়োজনীয় বিষয় পরস্পর পরস্পরকে জানাতে সক্ষম হোতো এবং ফলে উপকৃত হোতো। এঁদের মত সমর্থন ক'রতে হোলে সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কোরে নিতে হয় যে আদিম মানুষ ছিল আধুনিক গম্ভীর প্রকৃতি নগরবাসীর মত অত্যন্ত নীরস এবং সুপ্রণালীসঙ্গত। Madvig বলেন ভাষাসৃষ্টির মূলে নারীর কোন স্থান নেই।

এর বিরুদ্ধমতবাদী যাঁরা তাঁরা বলেন যে ভাষার বীজ জীবনের বাস্তবভূমিতে উপ্ত হয় নি। বিষাদময় কর্ম্মপ্রবণতাকে কেন্দ্র কোরে ভাষা গড়ে ওঠে নি, হাসি-তামাসা ও বালসুলভ প্রফুল্লতার মাঝখানে ভাষার জন্ম হোয়েছিল। যে-সব সুক্ষ্ম সহজপ্রবৃত্তি হাতছানি দিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে আসতো সঙ্গীতের আকস্মিক ঝঙ্কার, তাদের মধ্যে ভালবাসার আসন হ'চ্ছে সকলের উঁচুতে। আদিম কথাবার্ত্তার ভিতর শুনতে পাওয়া যায় বালকবালিকা, যুবকযুবতীর আনন্দের কোলাহল, যখন তারা প্রাণ খুলে গাইতো ও নাচতো প্রেমিকের একজোড়া চোখের প্রশংসাতুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ইয়েসপার্সন (Jespersen) বলেছেন,—

Language was born in the courting days of mankind; the first utterances of speech I fancy to myself like something between the nightly love-lyrics of puss upon the tiles and the melodious love songs of the nightingale. (Language, P.434.)

আদিম সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা একমাত্র ভালবাসাই ছিল না। যে-কোন প্রবল প্রবৃত্তি, বিশেষ কোরে কোন প্রীতিকর উত্তেজনা, গানের ভিতর মূর্ত্ত হোয়ে উঠতো। অসভ্য বুনোরা একটু উত্তেজিত হোলেই গান ক'রতো, যুদ্ধের সময়, অস্বাভাবিক কোন জন্তুজানোয়ার বা মানুষ সামনে পড়লে, ভূমিকম্পের সময়, উৎসবের সময়, এবং মুখে মুখেই তারা এ-সব গান রচনা ক'রতো। নদীর বুকে নৌকায় দাঁড় বাইবার সময় নীগ্রোরা হয় কোন প্রণয়কাহিনী না হয় কোন সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনা ক'রতো গান গাইতে গাইতে। পূর্ব্ব আফ্রিকার বাসিন্দারা কতকগুলো এলোমেলো অর্থহীন শব্দ একসঙ্গে সুর কোরে আবৃত্তি ক'রতো ক্লান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত। Karl Bucher তাঁর Arbeit und Rhythmus-এ লিখেছেন জগতের সমস্ত জাতীর দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যকলাপের একমাত্র সহায়ক হচ্ছে এই অর্থহীন ছন্দোবদ্ধ গান। অন্ধকার যুগে যেখানে মহাকাব্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, সেখানে গীতিকবিতার চিহ্ন সব সময়ই একটু আধটু পাওয়া যায়। Boas বলেছেন,—

Even where the slightest vestiges of epic poetry are missing, lyric poetry of one form or another is always present. It may consist of the musical use of meaningless syllables that sustain the song ; or it may consist largely of such syllables, with a few interspersed words suggesting certain ideas and certain feelings ; or it may rise to the expression of emotions connected with warlike deeds, with religious feeling, love, or even to the praise of the beauties of nature. (International Journ. Amer. Ling. 1. 8.)

গ্রীণল্যাণ্ডের এস্কিমোদের যাদুমন্ত্রের মধ্যে, W. Thalbitzer বলেন, এমন অনেক শব্দ উচ্চারিত হোতো যা কখনও বাইরে কথাবার্ত্তার মাঝখানে ব্যবহৃত হোতো না। মেয়রিস ও আফ্রিকার নিগ্রোদের ধর্ম্মসূত্রের মধ্যেও এই রকম পাওয়া যায়। ইয়েসপার্সন "The Oath of the Canting Crew" থেকে কয়েকটা লাইন তুলে দিয়েছেন,

No dimber, dambler, angler, dancer
Prig of cackler, prig of prancer ;
No swigman, swaddler, clapper-dudgeon,
Cadge-gloak, curtal, or curmudgeon ;
...............(Farmer's Musa Pedestris)

জগতের সমস্ত বর্ব্বর জাতীর বৈশিষ্ট হ'চ্ছে এই। মনের একটা চমৎকার আকস্মিক আবেশের স্বতঃপ্রকাশ হ'চ্ছে গান। "What is not worth saying can be sung," দার্শনিক গুরুভাবের চেয়ে কোন তুচ্ছ মনোভাব খুব সত্বর আত্মপ্রকাশ করে।

তা হোলে দেখা যাচ্ছে ভাবের অনুপ্রেরণায় মানুষ যখন কথা ব'লতে শেখে নি তার অনেক আগেই মানুষ অনুভূতির প্রেরণায় গান গাইতে পারতো। অবশ্য গান ব'লতে খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি আজকালকার আসরের উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত বোঝায় না। এই সব আদিম বাক্যকথন ছিল পাখীর মিষ্টি গলা-ছাড়া গানের মত, জন্তু জানোয়ারের হিংস্র গর্জ্জনের মত, শিশুর ক্রন্দন এবং অর্থহীন প্রলাপের মত তদাত্মক (exclamative), বিষয়জ্ঞাপক (communicative) বা আলাপনশীল ছিল না। প্রত্যেকের দুর্দ্দমনীয় বাসনার মণিকোঠা থেকে তারা উৎসারিত হোতো, সজাতীয়দের সঙ্গপ্রভাবের কোন বিবেচনা বা যুক্তি তাদের স্পর্শ ক'রতো না। ভাব বা অনুভূতি যে ভাষায় কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের

কোন ধারণাই ছিল না। তারা কল্পনাও ক'রতে পারতো না যে তাদের এই সরল স্বাভাবিক সঙ্গীত এমন কোন ভাষার আগমন-পথ সুগম ক'রছে যার সাহায্যে একদিন যে-কোন ভাবের মুকুল প্রস্ফুটিত হোয়ে উঠবে পাপড়ি মেলে। তারা ভাবতেও পারে নি যে তাদের আঁকা নরনারী এবং জন্তুজানোয়ারের জংলী ছবি থেকে একদিন এমন কোন শিল্পকলার সৃষ্টি সম্ভব হবে যার সহায়তায় হাজার হাজার দেশবিদেশের মানুষ অসংখ্য মূল্যবান ভাবের আদানপ্রদান ক'রতে সক্ষম হবে। আদিম চিত্রশিল্পের সঙ্গে লেখার যা সম্বন্ধ, আদিম সঙ্গীতের সঙ্গে কথাশিল্পের সম্বন্ধ তাই। আদিম চিত্রলেখায় প্রত্যেকটি চিহ্ন ছিল এক একটা সম্পূর্ণ বাক্যের (sentence) মত—কোন একটা অবস্থার বর্ণনা বা কোন ঘটনা পরিপূর্ণভাবে নির্দ্দিষ্ট হোতো তাতে। ক্রমে ক্রমে এর থেকে প্রত্যেকটি শব্দের ideographic writing আরম্ভ হয়। তারপর একে অনুসরণ কোরে syllabic methods এবং alphabetic writing প্রত্যেকটি বর্ণের (letter) বিশিষ্ট ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট করে। ভাষাসৃষ্টির গোড়ায় শব্দ ও অর্থের এই মিলন কেমন কোরে সম্ভব হোলো, যে-শব্দের শুধু ঝঙ্কার ভিন্ন কিছুই ছিল না, এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

'Bow-wow' অথবা 'Pooh-pooh'র মত অনুকার-শব্দের অনুষঙ্গ খুব সহজ এবং অপরোক্ষ। কিন্তু শুধু একে কেন্দ্র কোরে ভাষাসৃষ্টি সম্ভব হয় নি, পরোক্ষভাবে অনেক কথার অর্থ এখন আমরা কোরে নিয়েছি, যে-অর্থের ধার ঘেঁষেও একদিন হয়তো তারা যেতো না। আদিম যুগের সর্ব্বপ্রথম শব্দগুলো ছিল খুব ঘনীভূত ও সুনির্দ্দিষ্ট। তা হোলে বোঝা যাচ্ছে শব্দ ও অর্থের প্রথম সন্ধিযুগে একমাত্র সংজ্ঞাবাচক শব্দই ব্যবহৃত হোতো, বিশেষ কোরে নির্দ্দিষ্ট কোন ব্যক্তির নাম। এই সংজ্ঞাবাচক শব্দ থেকে ক্রমে ক্রমে সাধারণ শব্দের প্রচলন সুরু হয়। যে-শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নামরূপে ব্যবহৃত হোতো তাকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হোতো তার দোষগুণ এবং চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করার জন্যে। এই রকম দু'তিনটে সংজ্ঞাবাচক শব্দের সংমিশ্রণের ফলে সংগৃহীত শব্দের সৃষ্টি হয় এবং ক্রমে ক্রমে বাক্য রচনা সম্ভব হয়।

ভাবধারার উপর কবির যত বেশী দখল থাকে, সুর ও ছন্দের আভিজাত্য বজায় রেখে যত তিনি তাদের সুন্দরভাবে প্রকাশ ক'রতে পারেন, তত আমরা আনন্দ উপভোগ করি বেশী। সুরের সমাপাত (concurrence) থেকেও আমরা

প্রচুর আনন্দ পেয়ে থাকি। গদ্যরচনার সময় লেখক একটা সোজা পরিকল্পিত পথ ধ'রে চলেন, কিন্তু কবিতাকে যে ছন্দের ভিতর তিনি বাঁধতে চান, সেই ছন্দের ঘূর্ণাবর্ত্তে তাঁর মনে নূতন নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, যে-সমস্ত ভাব আসল বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র কোরে তাঁর মনে পূর্ব্বে উদিত হয় না। কূলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকের উপর ভীষণ দুর্য্যোগে দিকশূন্য হোয়ে নাবিক যেমন নূতন কোন বন্দরে নোঙর ফেলতে বাধ্য হয়, কবিও তেমনি তরঙ্গায়িত শব্দ-সমুদ্রে ছন্দ ঝঞ্চাবর্ত্তে দিক্‌ভ্রষ্ট হোয়ে তাঁর ভাবপোত নিয়ে নূতন এক অপরিচিত উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোধ করি Butler নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে এই কথাই বলতে চেয়েছেন,—

"Rhymes the rudder are of verses.
With which, like ships, they steer their courses."

প্রাচীন ইংরেজী কবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল অনুপ্রাস অলঙ্কার। Dr. Beattie ব'লেছেন—

"...some English poems are more distinguished by alliteration, than by any other poetical contrivance. In the works of Langland, even when no regard is had to rhyme, and but little to a rude sort of anapaestic measure, it seems to have been a rule, that three words, at least, of each line should begin with the same letter.

কিন্তু আধুনিক কাব্যের নিরাভরণতা এবং ভাষার নূতনত্ব সকলকে হকচকিয়ে দিয়েছে। মুক্তছন্দ নিয়ে যাঁরা দ্বন্দ্ব করেন তাঁরা বলেন—"to see deep enough is to see musically"—যেখানে দৃষ্টির সে গভীরতা নেই, সেখানে ছন্দের মধুর শিঞ্জন থাকতে পারে না। কবির অন্তরে যদি কোন রসবস্তুর সম্যক উপলব্ধি হয় তবে তার বাণী-সুষমা কিছুতেই ছন্দকে এড়িয়ে সুসম্পূর্ণ হোতে পারে না। এ কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু নির্ভুল মাত্রাবিন্যাসের স্বরসঙ্গতিই যে ছন্দ আর বাকি সব ছন্নছাড়া এ কথা আমি মেনে নিতে রাজি হবো না। রসিকসমাজ কাব্যের রস অন্তরের অন্তরালে অনুভব কোরে থাকেন, তাকে গণিতশাস্ত্রের ফরমুলাতে কষে বিচার করেন না, ছন্দও তেমনি উপলব্ধির জিনিষ, তাকে সঙ্কীর্ণ অক্ষরবৃত্তের মধ্যে বন্দী কোরে রাখলে তারও জীবনীশক্তি নষ্ট হয়।

কাব্যিক ভাষার সঙ্গে অশিষ্ট (slang) শব্দের সম্বন্ধ আছে। অনেকে অশিষ্টতা ও অশ্লীলতা (vulgarism) এক ভাবেন, কিন্তু দুটোর ভিতর অনেক

পার্থক্য আছে। অসভ্য নীচজাতীয় লোকের প্রকৃতিস্থ ভাষার একটা প্রধান অঙ্গ হ'চ্ছে অশ্লীলতা, কিন্তু অশিষ্ট শব্দগুলো সজ্ঞানে ব্যবহার করা হয় প্রকৃতিস্থ ভাষার পরিপন্থী হিসাবে। কেউ যখন 'those boys'-এর পরিবর্ত্তে 'them boys' বা 'knew'-এর পরিবর্ত্তে 'knowed' ব্যবহার করে, সেটা তখন তার ভাষার প্রকৃতিস্থ রূপ ব'লে ধ'রে নিতে হয়, কিন্তু কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাছে এগুলো অশ্লীল ব'লেই মনে হবে। ঠিক তেমনি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক জেনে শুনে অনেক শব্দকে বিকৃতভাবে ব্যবহার করে, যেমন 'wink' থেকে 'wunk', 'collide' থেকে 'collode', 'preach' থেকে 'praught' ('taught'-এর উপমান)—"We handshook and candlestuck, as somebody said, and went to bed" (H. James)। অশিষ্ট শব্দ প্রথমে পৃথগাত্মা (individual) থাকে, পরে অনুকরণের ফলে সেটা কোন একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের বা সমাজের ফ্যাশানে পরিণত হয়। প্রচলিত ভাষা থেকে অনেক শব্দ প্রথমে metaphorically অশিষ্ট শব্দের মত ব্যবহৃত হয়। যেমন মাঝে মাঝে আমরা দেখতে পাই 'head'কে ইংরেজীতে বলা হয় 'the upper story', 'upper loft', 'upper works' ইত্যাদি। প্রাচীন অশিষ্টে 'tongue'কে বলা হোত 'the red rag', তার থেকে 'the rag' হয়, পরে এই শব্দ থেকেই মনে হয় 'to rag'-এর উৎপত্তি হ'য়েছে (to scold, to rate)। অনেক সময় প্রচলিত শব্দটি ব্যবহার না কোরে বক্তা সদৃশ বা সংগৃহীত অপর একটা শব্দ ব্যবহার কোরে একই অর্থ ইঙ্গিত করে। যেমন 'I want to go to bed' না বোলে সে হয়তো ব'লবে, I am for Bedfordshire', ব'লবে 'send a peraon to Birching-lane' অর্থাৎ 'to whip him', 'he has been at Hammersmith' অর্থাৎ 'has been thrashed, beaten,' 'you are on the highway to Needham' অর্থাৎ 'on the highway to poverty.

দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্ত্তার ভাষা কবিতার বাহন হোতে পারে না। এই দিক থেকে slang-এর সঙ্গে poetry-র একটা আত্মীয়তা আছে। slang-এ সব সময় অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কোন শব্দ ব্যবহার করার দিকে দৃষ্টি থাকে, সেই জন্যে সেগুলো প্রায়ই 'eccentric' না হয় 'funny' বা 'would-be comic' হয়। কিন্তু কবিতার লক্ষ্য থাকে আরও ঊর্দ্ধে এবং এক অপরিবর্ত্তনশীল সৌন্দর্য্যের কামনা করে সে—ভাবের সৌন্দর্য্য এবং গঠনের সুষ্ঠুতা। ওড়নার আড়াল যেমন

বধূর মুখের সৌন্দর্য্য জোগায়, ভাষার অবগুণ্ঠন তেমনি কাব্যের মাধুর্য্য সৃষ্টি করে। যে-ভাষা সর্ব্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা ব্যবধান আছে তারই প্রভাবে কাব্যের রসসঞ্চার সম্ভব হয়। অনেকে বলেন আধুনিক কাব্যের ভাষা আর গদ্য এক জিনিষ। কিন্তু গদ্য আর আধুনিক কাব্যের ভাষা এক জিনিষ নয়, তার একটা বিশেষত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে যাতে কবির মন কাব্যের ভাষা ব'লে তাকে স্বীকার কোরে নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় "সে ভাষায় ও ভঙ্গীতে কোনো সাপ্তাহিক পত্রিকা লিখিত হলে তার গ্রাহক সংখ্যা কমবেই, বাড়বে না।" ছন্দের সাম্প্রতিক মুক্তির জন্যে অনেকে মনে করেন কবিতা লেখা সহজ হয়েছে। কিন্তু কবিতা লেখা এতে সহজ হয় নি। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কাব্যপাঠের ভূমিকায় বলেছেন, "অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হুহু ক'রে চলে, ছন্দই প্রবাহিত করে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্ব্বদা সতর্ক ক'রে রাখতে হয়।"

কাব্য স্বয়ম্ভু। প্রত্যেক যুগ পরিবর্ত্তনের যুগ এবং এই পরিবর্ত্তনের ঢেউ যেমন জীবনে এসে লাগে তেমনি লাগে সাহিত্যে এসে। কবি তাকেই বলা যেতে পারে যে নিজের জগতের উপযুক্ত 'idiom' আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। বিংশ শতাব্দীর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সপ্তদশ শতাব্দীর আধ্যাত্মবাদ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিবাদের পরিবর্ত্তে এখন অজ্ঞেয়তাবাদ (agnosticism) চিরন্তনতার (Eternity) ধারণা করে অসহিষ্ণুতা বা পরিতৃপ্তির সহিত নয়, বিস্ময় ও সন্দেহ সংমিশ্রিত মনোভাব নিয়ে। Tennyson-এর 'Crossing the Bar'-এর মঙ্গলবাণী এখন আমাদের কারও মনে প্রতিধ্বনিত হয় না। এখন আর সে wafer-এর যুগ নেই। রসশালায় বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার অন্ত নেই। পৃথিবী এখন আমাদের কাছে অনেক সীমাবদ্ধ। মানুষের উপর কোন অশরীরী দেবতার কাল্পনিক মস্তিষ্কের বিচারবুদ্ধিকে আর আমরা বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি নিজেকে, নিজের শক্তিকে, নিজের অস্তিত্বের বিরাট সত্যকে, নিজের সুপ্ত শক্তির পরিপূর্ণ বিকাশকে।

> Faun's flesh is not to us,
> Nor the saint's vision.

We have the Press for wafer ;
Franchise for circumcision.

All men in law are equals.
Free of Pisistratus,
We choose a knave or an eunuch
To rule over us.—(Ezra Pound)

জর্জ্জিয়ানদের সোনালি স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হোয়ে গেছে মহাযুদ্ধে 'machine gun' বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে এবং 'poison-gas'-এর ধূমল প্রতিকূল পরিবেষ্টনের মধ্যে তারা বেশ বুঝেছে শ্যাম্পেন-সিক্ত ইমারৎ ছাড়াও জগতে আর এক রকমের বাসস্থান থাকতে পারে যেখানে শ্যাম্পেনের সুস্নিগ্ধ সৌরভের পরিবর্ত্তে আছে পচামাংস, জরিষ্ণু ঘর্ম্মাক্ত চর্ম্ম এবং গলিত আবর্জ্জনা-স্তূপের বিকট দুর্গন্ধ। নাইটিংগেলের মধুর কাকলি-মুখরিত রম্যভূমির বাইরে যে বিশাল ক্ষেত্র আছে সেখানে শুনতে পাওয়া যায় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ, লক্ষ লক্ষ কদর্য্য কঙ্কালের কর্কশ-করুণ আর্ত্তনাদ এবং যন্ত্রের দানবীয় হুঙ্কার। ফলে জর্জ্জিয়ানদের শ্রুতিমধুর মঞ্জুল মদিরছন্দকে ছারখার কোরে দিয়ে, কৃত্রিম কয়েদী কাব্যকে বন্ধনমুক্ত কোরে তার বিপুল আবেগ আপনার ছন্দে আপনি মূর্ত্ত হোয়ে উঠেছে ঃ

The slough of unamiable liars,
bog of stupidities,
Malevolent stupidities, and stupidities,
The soil having pus, full of vermin,
Dead maggots begetting live maggots, slum owners,
Usurers squeezing crablice, panders to authority,
Pets-de-loup, sitting on piles of stone books,
Obscuring the texts with philology,
hiding them under their persons,
The air without refuge of silence,
the drift of lice, teething,
And above it the mouthing of orators,
the arse-belching of preachers.—(Ezra Pound)

সংস্কারমুক্ত হোয়ে যদি শুনি, তা হোলে বর্ত্তমান জগতের উদ্দাম গতির যে ছন্দ সেই ছন্দের ঝঙ্কার আমরা শুনতে পাবো এই কবিতার পংক্তিতে। ভাব ও ভাষার সুন্দর সমন্বয়ে এখানে একটা উৎকৃষ্ট কাব্য গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি শব্দ

তার দেহের সম্পূর্ণ ভার ও সৌন্দর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাষা এখানে ভাবের পোষাক নয়, ভাবের মূর্ত্তরূপ। Ezra Pound তাঁর "A. B. C. of Reading"-এ বলেছেন—

The changing of language is done in three ways : you receive the language as your race has left it, the words having meanings that have 'grown into the races skin' ; the Germans say 'wie in den schnabel gewachsen', as it grows in his beak. And the good writer chooses his words for their 'meaning', but that meaning is not a set cut-off thing like the move of a knight or pawn on a chess board. It comes up with roots, with associations, with how and where the word is familiarly used, where it has been used brilliantly or memorably......

Dante called words 'buttered' and 'shaggy' because of the different noises they make. Or 'pesca et hirsuto', combed and hairy.

রূপায়ণিক অনুভূতি হ'চ্ছে আমাদের আদিম অনুভূতি। খ্যাতনামা দার্শনিক ক্রোচে (Croce) বলেন উপলব্ধি ও অভিব্যক্তি একেবারে অভিন্ন। যা অভিব্যক্ত হয় না তা অনুভূতও হয় না। অনুভূতি অতীত কি বর্ত্তমান, বাস্তব কি অবাস্তব, সত্য কি মিথ্যা তার কোন বিচার নেই Croce বলেন,—

L'arte si regge unicamente sulla fantasia : la sola sua ricchezza sono li imagini. Non classifica gli oggetti, non li pronunzia reali o immaginari, non li qualifica, non li definisce : li sente e rappresenta.

কোন কবির বিষয়োপলব্ধি হোতে গেলেই অনুরূপ শব্দের ভিতর দিয়ে সেই উপলব্ধির জন্ম হোয়ে থাকে, কোন চিত্রকরের অনুভূতি হোতে গেলে বর্ণের বিচিত্র ভঙ্গিমার সন্নিবেশের মধ্যে সেই অনুভূতির সৃষ্টি হোয়ে থাকে, কোন সঙ্গীতবিদের অনুভূতি সম্পন্ন হয় সুর-তান-লয়ের ভিতরে। শব্দসৃষ্টি ছাড়া কবির অনুভূতির কোন স্বতন্ত্র সত্তা নেই। সে-যুগের কবিদের কাব্যের ভিতর ছিল বিশ্বের সমস্ত অণু-রাশিকে সমবেত করবার মত একটা প্রবল শক্তি। তাই মিলনের মধুর ছন্দের শিঞ্জন ছিল সে-যুগের কাব্যের শোভা। আধুনিক কবিরা অণুর রাজ্য ধ্বংস কোরে পরমাণুর রাজ্যে যেতে চান। তাঁদের কাব্যও তাই একটা বিস্ফোরক শক্তির সরল তেজে সমুদ্ভূত, আগ্নেয়গিরির মত প্রচণ্ড। অত্যাধুনিকের দল তাতেও সন্তুষ্ট নন। ইলেকট্রনের সুক্ষতম ধ্বনিকে তাঁরা অনুরণিত ক'রতে চান তাঁদের কাব্যে। তাঁদের এই দুরন্ত আবেগকে আপনার ছন্দ সন্ধান কোরে নিতে দেওয়াই প্রশস্ত। অন্য কোন বাঁধা ছন্দের দাসত্ব আজ সে মানতে চাইবে না।

আধুনিক গদ্যসাহিত্যকে যাঁরা নূতন কোরে ভেঙেচুরে গড়ছেন তাঁদের মধ্যে Mr. James Joyce ও Miss Gertrude Stein-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা এক নূতন শব্দকোষের সৃষ্টি করেছেন। ভাষার বিঘটন (disintegration) এবং একটা ভিন্ন ভিত্তির উপর তাদের পুনর্গঠন হ'চ্ছে এ-যুগের বৈশিষ্ট্য। জয়স্ তাঁর সমস্ত উপন্যাসে প্রাচীন তার্কিক ভাষার আগাগোড়া সংস্কার করেছেন। তাঁর অতিপার্থিব রচনার পর্য্যাসে তিনি ভাষাকে মণ্ডিত ক'রেছেন নূতন রূপলাবণ্যে। আধেয় উক্তির অনুপাতে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন আন্তরিক ছন্দের ঝঙ্কার আছে। একটি শব্দও তার প্রতিধ্বনির পরিসীমা ছাড়িয়ে যায় নি। সাগরাভিমুখী অসংখ্য নদীর কুলু কুলু তানে তারা মুখরিত হোয়ে ওঠে। মিস্ ষ্টাইন্ শব্দগুলোকে ছন্দোবদ্ধ দলে বিভক্ত কোরে একটা বেশ সুন্দর শব্দগণিতের সৃষ্টি করেন। জয়সের "Work in Progress" থেকে একটা অনুচ্ছেদ নীচে উদ্ধৃত হোলো :

Nuvoletta in her lightdress, spunn of sixteen shimmers was looking down on them, leaning over the bannistars and listening all she childishly could. She was alone. All her nubied companions were asleeping with the squirrels......she tried all the winsome wonsome ways her four winds had taught her. She tossed her sfumastelliacinous hair like la Princesse de la Petite Bretagne, and she rounded her mignons arms like Mrs. Cornowallis West and she smiled over herself like the beauty of the image of the post of the daughter of the queen of the Emperor of Irelande and she sighed after herself as were born to bride with Tristran Tristior Tristissimus......

Nuvolleta-র রূপ ও চরিত্রের দোষগুণ এখানে ফুটে উঠেছে শুধু তরঙ্গায়িত শব্দের ভিতর। জয়স্, প্রুস্ত্ বা ষ্টাইন্, এঁরা কোন প্লট মেনে চলেন না। আকস্মিকতার প্রাচুর্য্য এদের রচনার মাধুর্য্য জোগায়। পাখীর মত নৃত্যগীতমুখরা একটি মেয়ের চরিত্র মিস্ ষ্টাইন্ তাঁর "Susi Asado"র ভিতর ফুটিয়ে তুলেছেন শুধু ছন্দের ঝঙ্কারে। তার সরলতা, গৃহকর্ম্মে অখণ্ড নিষ্ঠা, তীব্র তরল কণ্ঠস্বর, সযত্ন অবহেলা ও অপরিচ্ছন্নতায় অগাধ আনন্দ—সব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন শব্দের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর।

Sweet sweet sweet sweet sweet tea.
Susie Asado.
Sweet sweet sweet sweet sweet tea.
Susie Asado.

Susie Asado which is a told tray sure.
A lean on the shoe this means slips slips hers.
When the ancient light grey is clean it is yellow,
　　it is a silver seller.
This is a please this is a please there are the saids
to jelly. These are the wets these say the
sets to leave a crown to Incy.
Incy is a short for incubus.
A pot.

ভেনাসের মত জীবন্ত পৃথিবী আজ নিরাভরণ দেহে কবির চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বহুদিনের সযত্ন রক্ষিত কীর্ত্তিস্তম্ভগুলোকে ধূলিসাৎ কোরে দিয়ে, সভ্যতার মেসিন্‌গান আজকে যে ধ্বংসলীলায় ব্রতী হ'য়েছে, তার প্রচণ্ড আঘাতকে অট্টহাস্যে উড়িয়ে দিয়ে শঙ্কিত হৃদয়ে অকপট কবি একা দাঁড়িয়ে আছে সৌন্দর্য্যের সিংহদ্বার কলমের কিরীচ নিয়ে আগলে। তার এই দুর্জ্জয় দুঃসাহস আমাদের কাছে দুঃস্বপ্ন বলেই মনে হবে। তার ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ, কর্কশ কণ্ঠের গান কামানের গর্জ্জনকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে। প্রতিবেশের বৈরিতাকে উপেক্ষা কোরে তার দুরন্ত আবেগ আজ মৈত্রীস্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জয়যাত্রায় বেরিয়েছে। সেই প্রশস্ত পথের মধ্যে তার এই অপরিচিত ছন্দের সাথে মিতালি। সে আজ লাঞ্ছিত প্রমিথীউস্‌। তাই তার ভাষার ভিতর কখন প্রতিধ্বনিত হয় যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবর্ষণের শব্দ আবার কখন শুনতে পাওয়া যায় মৌন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে, নিস্তব্ধ নিশীথের স্তিমিত নিঃশব্দতায় আদিম মানুষের অদম্য আবেগ ভরা অর্থহীন কথাবার্ত্তার ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি। জগতের সমস্ত শক্তি ষড়যন্ত্র কোরে আজ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে কবির বিরুদ্ধে, তাকে ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করবার সঙ্কল্প করেছে। সমালোচকদের মুখ থেকে স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যায়—"I, MILES, EXPEDI CRUCEM."। কিন্তু কালের যাত্রায় জমাট বাঁধা ভ্রান্তির কুয়াসা যখন কেটে যায় তখন তার জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে প্রতিভার চোখ ঝল্‌সানো দীপ্তি নিয়ে। কবিকে তখন আমরা স্বীকার করি আমাদের নমস্য ব'লে। তখন তার ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা, ভাবের জটিলতা, প্রকাশ-ভঙ্গির সর্পিলতা, অশ্রুতপূর্ব্ব ছন্দ আমাদের কাছে সহজ ও সুন্দর মনে হয়। এখন কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা অবিমৃষ্যকারিতার নামান্তর।

শ্রীবিনয় ঘোষ

চিলে কোঠা

চিলে কোঠা ভরে এলো ডিগ্‌রিয়ার ছায়ায়
পথের ধারে ঝিম্‌ধরা কুকুরের মতো শ্রান্ত ডিগ্‌রিয়ার ছায়ায়।
দাঁড়োয়ার চক্‌চকে রূপালী রূপ ম্লান হয়ে এলো,
মলিন হোলো খোয়াইয়ের রুক্ষ আমন্ত্রণ।

গুম্‌টিতে পশ্চিমের গাড়ীর প্যাসেঞ্জার নামলো,
বোঁচকা বুঁচকির জঞ্জাল সমেত
পাড়ি দিলো যম্‌না জোড়ের রাস্তায়,—
হোসেনি গাড়োয়ানের আড়গড়ার ধার দিয়ে,
ইউক্যালিপ্টাসের সুগন্ধি সঙ্কেতে পথ চিনে।

মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা থাম্‌লো,
থামলো নন্দন পাহাড়ের চূড়ায়
দপ্‌ করে জ্বলা আলেয়ার আলো।
কেবল রইলো জেগে
দুটি বুকের ওঠানামা,
বন্ধ কোঠায়,
ছাদের চিলে কোঠায়।

বাইরে নক্ষত্র খচিত আকাশের নৈমিত্তিক নিঃস্বন।
চাঁদের গান,
তারার গান,
মহুয়ার, আমের বোলের গান।
রোহিণীর রাস্তা ধরে হাটফিরতি পসারিণীর গান।
ফাগুন শেষের তপ্ত সন্ধ্যার গান।

বন্ধ কোঠায়
ছাদের চিলে কোঠায়
বাহুবন্ধে দেহলতার গান,
শিরায় শিরায় রক্তকণার গান,
ঠোঁটের কাঁপন, ঠোঁটের কাঁপন।

সাক্ষী রইলো ডিগ্‌রিয়া।

যুবনাশ্ব

শুকতারা

পৌষের সাঁঝে পূর্ণিমাচাঁদ আকাশে,
　পূর্ব্বপ্রান্তে, আনন কুয়াশা-ম্লান,
ভাবিছে ভাসিবে নীল নিঃসীমে একা সে,
　কার 'পরে তার বুকভরা অভিমান ?

পশ্চিমতীরে যে রহিত পথ চাহিয়া
　দিবসের শেষে শুভ্র শিখাটি জ্বালি',
তাহার বিহনে দিগ্‌-দিগন্ত ছাইয়া
　মরুভূমি যেন বিছায়ে রেখেছে বালি।

ফোটে একে একে 'দ্বন্দ্বী তারার পুঞ্জ,
　রজনীনাথের দৃষ্টি কাড়িতে চাহে,
দেখে না বিরহী তাদের সাজানো কুঞ্জ
　আনমনে তার সোনার তরীটি বাহে।

আধেক বছর শুক্লা রাতের সঙ্গিনী,
　আজি সে কোথায় বিথারিছে তার শয্যা ?
বৃথা বরবেশ না দেখিলে সেই রঙ্গিণী,
　সে-দয়িতা বিনা পূর্ণতা পায় লজ্জা।

প্রথম প্রহর ধীরে ধীরে হয় অতীত,
　সে-অনাগতার না মিলে কোনোই চিহ্ন,

ভাবে নিশাকর—"মনে ভাবে কি সে ব্যতীত
আমার মর্ম্ম চিরতরে রবে ক্লিন্ন ?

আজি সারা রাত কাটাবো বিলাস-ব্যসনে,
উজ্জ্বলতম তারাদের লবো সাথে,
সাজাবো তাদের স্বচ্ছ-কাষায় বসনে,
হীরকচূর্ণ ছড়াবো তাদের মাথে।"

সে বিলাস-লীলা চলে দু প্রহর ধরিয়া,
বিশ্বজগৎ সে শোভা হেরিয়া মূক,
ভুলিবার এত আয়োজন যারে স্মরিয়া,
পূর্ণিমাচাঁদ ভুলেছে কি তার মুখ ?

ক্লান্ত চন্দ্র ঢলে' পড়ে নিচু আকাশে,
তুঙ্গে থাকার বাসনা টুটেছে তার,
তারাদের সব মুখ হয়ে এল ফ্যাকাশে
ত্রস্তে পলায় বহি' লজ্জার ভার।

এমন সময় দেখা দিল পূব-গগনে
চন্দ্র যাহারে খুঁজিয়া ফিরেছে সারা,
ক্ষুব্ধ সে ভাবে,—"আসিল এ কোন্ লগনে
মোর প্রিয়তমা পলাতকা শুকতারা ?

তাহার আমার মাঝে দুস্তর ব্যবধি,
আমার আয়ু যে হইয়া এসেছে শেষ,
আমারে কি তবে ছেড়েছে সে নির-অবধি,
আমার ভাগ্যে লেখা ছিল এই শ্লেষ ?

দেখেছি যাহারে সন্ধ্যার অনুসারিণী,
রাত্রির ভালে আলোর টিপের মতো,

আজি সে হয়েছে প্রভাতের পুরঃ-চারিনী,
সেদিনের প্রেম আজি চিরাস্তগত ?

আমারে তেয়াগি' যাহারে ভজিছ, চপলে,
লভিবে না তুমি তার প্রসন্ন চোখ,
তার বহ্নির তেজে তুমি আমি অফলে
পুড়িব দুজনে,—নাহি মোর তাহে শোক।"

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়

কয়েকটি ক্লেরিহিউ
(Clerihew)

অনুবাদ

আলফ্রেদ দ্য মুসে
পুষিকে বলতেন পুসে।
টানটা একটু বিদেশী
সেটা এমন কি বেশী!

মৌলিক

সার জগদীশ বসু
উদ্‌ভিদ্‌কে বলছেন পশু।
নতুন কথা এমন কি
অবাক হওয়াই আশ্চয্যি।

…　　…　　…

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
এবার যাচ্ছেন পাকুড়।
চায়না কিম্বা পেরু না
সেইখানেই ত করুণা।

…　　…　　…

রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার
গান্ধারকে বলতেন কান্দারহার
'বলতেন' বলা সঠিক নয়
গবেষণায় আন্দাজ হয়।

…　　…　　…

শরৎচন্দ্র চাটুয্যে
মৌন আছেন মাধুর্য্যে।
সৃষ্টি এখন সবাক্ তাঁর
ষ্টেজ ও পর্দ্দা বেবাক তাঁর।

…　　…　　…

সার চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন
সম্প্রতি করেছেন উদ্‌ভাবন
একটা আস্ত বৈজ্ঞানিক গোষ্ঠ
রামনের এফেক্‌ট্ স্পষ্ট।

…　　…　　…

শ্রীমান সমরেশ সেন
পড়েছি যা লিখেছেন।
মনে হয় সমরেশ সেন
লিখেছেন যা পড়েছেন।

... ...

শিল্পী নন্দলাল বোস
গান্ধীরে করেছেন তোষ।
এ কথা বলা খুব শক্ত
তুজনের কে কার ভক্ত।

... ...

পণ্ডিত জবাহরলাল
নীলকে করবেন লাল।
কাঁদতে কাঁদতে ভাবে নীল
কান যে নিয়ে যায় চীল।

... ...

শ্রীমতী অনামিকা দে
কেমন সুন্দর নাচে সে।
সব ক'টি ভালো ভালো মে'
সকলের হয়ে গেছে বে'।

লীলাময় রায়

পুস্তকপরিচয়

ভারত ও মধ্য-এশিয়া—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক প্রণীত, প্রকাশক, ভারতী ভবন।

আমি সেদিন চন্দননগরের সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে আমাদের সাহিত্যে দর্শন বিজ্ঞান উপেক্ষিত বলে দুঃখ প্রকাশ করেছি। ইতিহাসের কথা যে উল্লেখ করিনি তার কারণ ইতিহাসও যে সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে সকলেই একমত। এই ঐতিহাসিক সাহিত্যে বঙ্গভাষা যে অত্যন্ত দরিদ্র সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শুনতে পাই বাঙ্গালীর রচিত দুচারখানি গ্রন্থ আছে যা বাস্তবিকই ইতিহাস। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এ সব গ্রন্থও ইংরাজী ভাষায় লিখিত। বাঙলায় লিখলে নাকি ইতিহাসের মর্য্যদা নষ্ট হয়। উপরন্তু বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তা উপেক্ষিত হয় কারণ তা ইতিহাস, সাহিত্য নয়। সে যাই হোক বাঙলা ভাষায় এখন নানা গ্রন্থ লেখা উচিত। যাতে করে শুধু আমাদের মত ইংরাজীনবীশদের নয়, সমাজেরও ঐতিহাসিক জ্ঞান বেড়ে যায়। আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষের পূর্ব্ব কথা শুনতে অনেকেই উৎসুক। কারণ পূর্ব্বকথাও কথা; ও অতি মনোজ্ঞ কথা। আমরা নিজের দেশ সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছি সেও ইংরাজী ভাষার মারফৎ। ইংরাজরা যে সব fact সংগ্রহ করেছেন—আর তার থেকে আমাদের অতীত সভ্যতা সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন—তাই হচ্ছে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের একমাত্র সম্বল। বলা বাহুল্য তাঁদের কথা শুনে আমাদের স্বজাতীয় আত্মমর্য্যদা বাড়ে না বরং ক্ষুণ্ন হয়।

ইতিহাস জাতীয় স্মৃতি রক্ষা করে। গীতার মতে "স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি"। আমরা যে আত্মবিস্মৃত জাতি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সম্ভবতঃ আমরা প্রনষ্টজাতি বলেই আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। ভারতবর্ষের সভ্যতার ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্মৃতিও লুপ্ত হয়েছে। আমাদের অবশ্য ভবিষ্যতে নানারূপ অভ্যুদয়ের আশা আছে। কিন্তু ভবিষ্যতের অংশাও স্মৃতিমূলক। আশাও একটা খেয়ালপ্রসূত নয়। এমন কি একালের মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন যে, বর্ত্তমানের জ্ঞানও অতীতের জ্ঞানের সঙ্গে জড়ানো। যাকে আমরা প্রত্যক্ষ বলি তাও অনেকটা স্মৃতি-বিজড়িত।

আমাদের ইতিহাসের বহু উপকরণ দেশে বিদেশে ছড়ানো রয়েছে। এবং বহু ইউরোপীয় পণ্ডিত বহুকষ্টে সে সব উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। জনৈক ফরাসী লেখক তারই সাহায্যে এশিয়াখণ্ডের একখানি চমৎকার ইতিহাস রচনা করেছেন। এ ইতিহাস অবশ্য অনেক অংশে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও আর্টের ইতিহাস।

তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বলেছেন "Il semble bien que le monde Bouddhique ait, a son heure, l' une de ces periodes privilegees. C 'etait au haut moyen age vers notre septieme siecle."

এই খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সময়েই ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও আর্টে অর্দ্ধেক এশিয়া গ্রাস করে—হিমালয়ের উত্তরে মধ্য এশিয়া ও দক্ষিণে জাভা, সুমাত্রা এবং ইন্দোচীন। সংস্কৃত ভাষা এই বিস্তৃত ভূভাগের লোকের মনের উপর প্রভুত্ব করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই উজ্জ্বল ও মনোহারী পৃষ্ঠা আমাদের কাছে অপরিচিত। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি সম্প্রতি মধ্যএশিয়ায় ভারতবর্ষের সভ্যতার প্রচার ও প্রভাবের ইতিহাস লিখেছেন—যে ইতিহাস আমাদের জানা ছিল না। ইউরোপের এ যুগের বলদর্পিত সভ্যতার মর্ম্মকথার সন্ধান আমরা আজ পেয়েছি। স্পেনে ইতালীয় সৈনিকদের বুকে লেখা আছে যে—"আমরা পোড়াতে এসেছি, আলো দিতে নয়"। ভারতবর্ষের সে কালের সভ্যতা কিন্তু কোনও বিদেশকে পোড়ায় নি, শুধু অপরকে আলো দিয়েছে। আলোক যেমন অন্ধকারের দেশে প্রবেশ ক'রে সে দেশকে উদ্ভাসিত করে ও অনুপ্রাণিত করে ভারতীয় সভ্যতাও সেই ভাবে হিমালয় লঙ্ঘন ক'রে ও সমুদ্র লঙ্ঘন ক'রে, নানাদেশে তার আলোক বিতরণ করেছিল। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী লেখক বলেছেন যে, ভারতবর্ষ অর্দ্ধ এশিয়াকে যা দিয়েছিল সে হচ্ছে bonte et beaute।

এ ইতিহাস প্রবোধচন্দ্র কেন লিখেছেন তা তাঁর কথাতেই বলছি। "মধ্য এশিয়ার এ ইতিবৃত্ত ভারতের ইতিহাসের একটি গরিমাময় অধ্যায় যা ভারতকে হয়ত পুনরায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য চিত্রকলা ভাস্কর্য্য প্রভৃতির যে ধারা লুপ্ত হয়ে গেছে, মধ্য এশিয়ার একান্তে সে সব ধারা পুনরুদ্ধার করা হয়ত আবার সম্ভবপর হবে"। এ আশা তিনি করেন কেন? এই কারণে যে:—"ভারতবর্ষের সঙ্গে এ সব জাতির যোগাযোগ হতেই তাদের মধ্যে নূতন প্রাণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছিল। যাদের ভাষার বাহন লিপি ছিল না ভারতবর্ষ হতে তারা লিপি পেল, যাদের সাহিত্য ছিল না, তারা সাহিত্য পেল, যাদের মন পূর্ব্বে কখনও ধর্ম্মের স্পর্শ পায় নি, তারা বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিজস্ব করে নিল, এবং সেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করে নিজেদের দেশকে শিক্ষা ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে সুশোভিত করে তুলল। এ কার্য্যে তারা প্রেরণা পেল ভারতীয় ভিক্ষু ও শিল্পী উভয়ের নিকট"। এ কথা শুনে কার হৃদয় না উল্লসিত হয়ে ওঠে। এ ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে কার না লোভ হয়।

"ভারত ও মধ্যএশিয়া" আসলে একখানি পুস্তিকা। শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র সেন 'বৃহৎ বঙ্গ' সম্বন্ধে যে বৃহত্তর পুস্তক লিখেছেন শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের ইতিবৃত্ত সে জাতীয় নয়। এক জাতীয় সাহিত্যিক আছেন যাঁরা তাঁদের লেখার ভিতর দেদার কথা পুরতে প্রস্তুত। আমি এ

জাতীয় লেখকদের পক্ষপাতী নই। ভারতচন্দ্র বলেছেন—"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"। আর একদল সাহিত্যিক তাঁদের লেখায় কোন কথা বাদ দিতে হবে, কোন অবান্তর বিষয় ছাঁটতে হবে তা জানেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র শেষোক্ত শ্রেণীর লেখক—অতএব তাঁর লেখা আমার বিশেষ মনোমত। তিনি যতদূর সংক্ষেপে ও সহজে বৃহত্তর ভারতবর্ষের কথা বলা সম্ভব তাই বলেছেন। ফলে এ পুস্তিকা যুগপৎ সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য। এই স্বল্পকায় পুস্তিকাখানি অস্থিসার নয়। হিমালয়ের ও-পারের দেশগুলির সভ্যতার তিনি পরিচয় দিয়েছেন—আর সে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ করে আমাদের মন আনন্দে ভরে ওঠে এবং তার বিবরণ রূপকথার মত শোনায়। কারণ এই লুপ্ত ইতিহাস ভারতবর্ষের সভ্যতারই ইতিহাস।

এ পুস্তিকাখানি অবলীলাক্রমে পড়া যায়। কিন্তু এ বই লিখতে লেখকের অগাধ পরিশ্রম করতে হয়েছে। যে সব ইউরোপীয় পণ্ডিত এই বালি-চাপা সভ্যতার ইতিহাস উদ্ধার করেছেন, তাঁদের রচিত দেদার বই তাঁকে পড়তে হয়েছে। তার পরিচয় এ পুস্তিকার পরিশিষ্টে পাবেন। উপরন্তু প্রবোধচন্দ্র চীনা ভাষায় সুশিক্ষিত; সুতরাং তিনি চৈনিক সাহিত্য থেকেই অনেক পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করেছেন। এ বইয়ে তিনি একটি বিঘৎ-প্রমাণ মধ্য এশিয়ার ম্যাপ দিয়েছেন। তদ্দৃষ্টে তিনি যে দেশ বিদেশের কথা বলছেন তার চাক্ষুষ পরিচয় সকলেই পাবেন।

আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক শাখার ছাত্রদের—এ পুস্তিকাখানি অবশ্যপাঠ্য। এ পুস্তিকাখানি অদ্বিতীয়। বঙ্গভাষায়, এমন কি ইংরাজী ভাষাতেও, এ বিষয়ে দ্বিতীয় বই নেই। আর এর মহাগুণ এই যে—এতে উল্লিখিত প্রতি fact scientific method-য়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

The Decline and Fall of the Romantic Ideal—by F. L. Lucas. (Cambridge University Press.)

Revaluation, Tradition and Development in English Poetry—by F. R. Leavis (Chatto and Windus.)

কবিতার পাঠক হওয়া শক্ত, এবং আরও শক্ত কাব্যবিচারক হওয়া। কবিতার বিশুদ্ধ পাঠক প্রায় দুর্লভ। আঠারো ভাষায় যাঁর দখল আছে, এবং পাণ্ডিত্যের থলিতে বহু ভাষার কাব্য সঞ্চয়ন আছে যাঁর, তিনি ভাল পাঠক না-ও হতে পারেন। অথচ একটা কবিতা ঠিক কেন ভাল লাগছে, এটা না বলতে পেরেও ভাল পাঠক হওয়া সম্ভব। কাব্যবিচারকদের

দায়িত্ব অবশ্য আরও কঠিন। এই সূত্রে এলিয়টের মহাবাক্য স্মরণীয়—একটা খারাপ কবিতা ভাল না লাগা এবং সত্যি ভাল কবিতা ভাল লাগা ঠিক একধরণের কাব্য-বোধ নয়।

এই বোধের তারতম্যের ওপর পাঠক ও সমালোচকদের শ্রেণী-বিভাগ। আমাদের কাব্যানুভূতির ক্ষেত্র বিস্তৃত করবার ভার সমালোচকদের ওপর। পাঠক ব্যক্তিগতভাবে কবি বা কাব্যের ওপর অবিচার করলে কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কুপাঠক নীরব থাকলেই তাঁর ওপর আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু বিচারকের মানদণ্ড হাতে নিলেই ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় অন্তরকম। তাই যখন দেখি লুকাস্ উঠলেন মানমন্দিরের চূড়ায় কাব্যলোকে রোমান্টিক্ আদর্শের পতন পর্য্যালোচনার উদ্দেশ্যে, তখন তাঁকে পর্য্যালোচনার করবার—নিশ্চয়ই ব্যক্তি হিসাবে নয়, সমালোচক হিসাবে—কর্ত্তব্যবোধ জেগে ওঠা স্বাভাবিক। লুকাসের এ আধুনিক কীর্ত্তিতে নূতনত্ব আছে সন্দেহ নেই। তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধি দেখে স্বীকার করতে হয় আমার বহু বই পড়া বাকি আছে এ জীবনে, এবং তা' আমার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা জানি না, হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় বইয়ের ওজনে কাব্য-বোধ ওজন করা যায় না।

লুকাসের নূতনত্ব, তিনি বহুযুগের বহু তর্ক ও নির্দ্দেশের পিছনে বলতে পেরেছেন যে—"the fundamental quality of Romanticism is not mere anti-Classicism, nor "medievalism", nor "aspiration", nor "wonder", nor any of the other things its various formulas suggest; but rather a liberation of the less conscious levels of the mind......মানে ফ্রয়েডীয় ত্রিপদী মনের একটা বিশেষ প্রকাশ এই Romanticism। এখন কাব্যবিচারে ফ্রয়েডীয় মনঃসংস্থানের কতখানি প্রবেশাধিকার প্রাপ্য সেটা বিচার্য্য। এ ক্ষেত্রে স্বয়ত লুকাসের আর একটা বচন উদ্ধৃত করতে বাধ্য হচ্ছি—"the differences between Classicism, Romanticism, and Realism turn out, I think, to be differences mainly of degree; depending on the strictness with which, if we may call them so, the reality-principle and super-ego control and censor such emanations from the unconscious mind. The classic, while ruthless toward some forms of unreality in the name of "good sense", elaborately cultivates others in the name of "good taste",—কিন্তু ওদিকে—"the Romantic escapes"।

পলাতক রোমান্টিকের উদ্দেশে কারাধ্যক্ষের এই কাতরোক্তি শুধু লুকাস্ নয় আরো অনেকের মুখে শোনা গেছে। উপরের উদ্ধৃতির ভেতর লুকাসের গলদ চাপা রয়েছে অনেকখানি। এবং এই দুর্ব্বলতা তাঁর সমস্ত তথ্যকে কলুষিত করেছে। আমরা আর্ট ও আর্টিষ্টের বিষয়ে আরো বিশদ ও উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা স্বয়ং ফ্রয়েড ও তাঁর নিষ্ঠাবান ছাত্রদের কাছ থেকে শুনতে অভ্যস্ত। ফ্রয়েডের হাতে ছিবলূহেল্ম্ য়েন্সেনের 'গ্রাদিভা', যে পরিণতি লাভ করেছে লুকাসের

হাতে 'La Princesse Lointaine' সে পরিণতি লাভ করে নি। লুকাসের দম্ভ এই অক্ষমতার উপর। তা ছাড়া যে ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যার ওপর লুকাসের তথ্য প্রতিষ্ঠিত সে ব্যাখ্যা ভুল।

আমরা বুঝি, Super-egoর শাসনের একটা সীমা আছে যার ওধারে কোনো কাব্যসৃষ্টিই সম্ভবপর নয়। আশা করি, লুকাস-বর্ণিত কবিরা Super-egoর এই সীমা লঙ্ঘন করেনি। আসলে Id-প্রেরিত কামনাগুলির মুখ চেনা Super-egoর পক্ষে খুব সহজ ব্যাপার নয় সব সময়। তাই কবির জাগ্রত মন কলম চালাচ্ছে কোন কামনার আতিথ্যে, এটা বলা সহজ নয়। এবং একথা জাতিনির্ব্বিশেষে সব কবিদের পক্ষেই খাটে, তাই—"the liberation of the less conscious levels of the mind"—বলতে বিশেষ কিছু বোঝায় না।

· সম্প্রতি এক বৃদ্ধ Sunday Times-এ লিখেছেন লুকাসের এ বইটা সম্বন্ধে যে, তরুণদের পক্ষে এ বইটা মোটেই উপাদেয় হবে না, কারণ এ বইতে লুকাস্ বলেছেন, আজকাল 'আধুনিক' বল্‌তে যা বোঝায় তা' আর কিছুই নয়, অন্তোন্মুখ রোমাণ্টিক আদর্শের জরাগ্রস্ত বীভৎস রূপ। অবশ্য তরুণরা বিরক্ত হয় যখন লুকাস্ আক্রমণ করেন কোলরীজ্‌কে এবং সেই সূত্রে রিচার্ডস্‌কে। এ ক্ষেত্রে টি, ই, হিউমের ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের সান্ত্বনা। তিনি লুকাসের মত পণ্ডিত না হয়েও সত্যদ্রষ্টা হতে পেরেছেন। তাঁর মতে—"we are in for classical revival, and that particular weapon of this new classical spirit when it works in verse will be fancy,···fancy will be superior to imagination···So banal have the terms Imagination and Fancy become that we imagine they must have always been in the language."—

লুকাসের বইটা তাই মোহ-মুদ্গর হল না। মোহমুদ্গরের সন্ধান পাই যখন হিউম্ বলেন—" For every kind of verse, there is a corresponding receptive attitude·· At the present time I should say that this receptive attitude has outlasted the thing from which it was formed. But while the romantic tradition has run dry, yet the critical attitude of mind, which demands romantic qualities from verse, still survives. So that if good classical verse were to be written to-morrow very few people would be able to stand it—" এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তবে, তথ্যের দিক ছাড়া, বইটা সুপাঠ্য। এবং বহু যুগের বহুমূল্য কাব্য-সংগ্রহ হিসেবেও বইটা পড়া যেতে পারে। এটা অবশ্য লুকাসের পাণ্ডিত্যেই সম্ভব হয়েছে।

বহু উৎকণ্ঠা নিয়ে লিভিসের বইটা শেষ করতে হল। এর অধিকাংশ নিবন্ধ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি এ বইয়ে সঙ্কলিত। লিভিসের বই পড়বার প্রধান অন্তরায় তাঁর অদ্ভুত ব্যাকরণ। তাঁর বহু বাক্য প্রায় দুর্বোধ্য। বইটার অন্তরে প্রবেশ করবার পথে বহু

কাঁটা-তারের বেড়া। তবে কৃচ্ছ্রসাধনে সবই সম্ভব। অবশ্য লিভিসের বই সম্বন্ধে এ আপত্তি না জানালেও পারতুম। কিন্তু তাঁর বিকৃত ব্যাকরণের ব্যূহ ভেদ করে যে সব সত্যে পৌঁছুই তার সঙ্গে আমরা একমত নই। ইতিপূর্ব্বে ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের মুষ্ট্যাঘাত পৌঁছেছে। সেটা তাঁর কম্যুনিষ্টিক অভিবাদন লিভিসের প্রতি। সে অভিবাদন, খানিকটা ধর্ম্মের গুণে, হয়ে উঠেছে প্রলাপ। সুতরাং অগ্রাহ্য।

প্রারম্ভেই লিভিস্ বলে রাখছেন তাঁর ঋণ তাঁদের কাছে যাঁরা ছাত্র হিসাবে তাঁর সঙ্গে গত দশ বছর থেকে সাহিত্য চর্চ্চা করে আস্ছেন। কিন্তু আমরা জানি তাঁর ঋণ ঠিক কোথায়। এলিয়টের প্রভাব তাঁর ওপর খুব গভীর। এত গভীর, যে বহু জায়গায় লিভিস্ এলিয়টের বচন হুবহু প্রয়োগ করেও স্বীকার করেন নি এলিয়টকে। রিচার্ডসের রসেও তিনি পরিপুষ্ট। এবং যেসব সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হয়েছেন সেগুলি তাঁর স্বোপার্জ্জিত কি না সন্দেহ। এলিয়ট প্রমুখ সমালোচকদের সঙ্গে লিভিসের তফাৎ এইখানে, এলিয়ট কবিতা বোঝেন, লিভিস বোঝেন না। তাই শেলীর Ode to the West Wind" এবং "When the Lamp is Shattered"-এর এ রকম অদ্ভুত ভুল ব্যাখ্যা সম্ভব তাঁর হাতে।

তার পর এটা বোঝা উচিত কবি ব্যক্তিগত ভাবে সম্পূর্ণ দায়ী নন তাঁর কাব্যের জন্যে। যে কারণে কবির কাব্য অনিবার্য্য হয়ে ওঠে, সে কারণ শুধু তাঁর নিজের মধ্যেই বা পারিপার্শ্বিক সাহিত্যিক প্রভাবের মধ্যেই নেই, কবির সংসারিক, সামাজিক প্রভাবও যথেষ্ট দায়ী। শেলীর উদ্দামতার জন্যে তাঁর বাড়ীর লোক দায়ী যথেষ্ট। শেলীর পিতৃদেব দুর্ভাগ্যক্রমে ছিলেন অশিক্ষিত বর্ব্বর। মিল্‌টনের কাব্যে শুধু লাটীন প্রভাব নয়, তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এটাও মানতে হয়। লিভিস্ তা মানেন নি। এবং তা মানেন নি বলেই, প্রমাণিত হয় লিভিসের শুদ্ধ সমালোচক হবার শিক্ষা ও যোগ্যতা নেই। যোগ্যতা আছে অন্যান্য সাহিত্যরথীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার। সে সম্পদ নিয়ে কাব্যবিচারক হতে যাওয়া বিড়ম্বনা। প্রশ্ন ওঠে: কবিতা পাঠ করতে গিয়ে বা লিখতে গিয়ে এমন একটা শিক্ষার (culture) প্রয়োজন আছে কি না, যে শিক্ষা প্রারব্ধ সংস্কার, সামাজিক, রাষ্ট্রিক বা সাহিত্যিক, সব কিছুকেই জোর করে ভুলতে বলে। এ প্রশ্নের সমাধান লিভিস্ করতে পারেন নি।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

European Civilisation, its Origin and Development— by various contributors under the direction of Edward Eyre. Vol. IV—The Reformation. (Oxford University Press)18s.

প্রায় তিন বৎসর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুদ্রণাগার থেকে ইয়োরোপীয় সভ্যতার এক বৃহদায়তন ইতিহাস প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ হয়েছিল। এডওয়ার্ড আয়ারের সম্পাদনায়

বিভিন্ন দেশীয় নানা লেখকের রচিত এই বিশাল গ্রন্থ সাত খণ্ডে সমাপ্ত হবে। কয়েক মাস হল এর চতুর্থ অংশটি ছাপা হয়েছে। বহু তর্কবিতর্কের আধার ষোড়শ শতাব্দীর রেফর্মেশন্ এই খণ্ডখানির বিষয়বস্তু বলে এর পৃথক সমালোচনা সম্ভবপর এবং সমীচীন।

আলোচ্য বইখানির দু'টি বৈশিষ্ট্য আমার চোখে পড়েছে। প্রচলিত সাধারণ ইতিহাসগুলি ষোলো শতকে ধর্ম্মবিপ্লবের যে যে অঙ্গ সম্বন্ধে উদাসীন এ পুস্তকে তাদের পূর্ণতর বিবৃতি পাওয়া যাবে—যেমন ক্যাথলিক্ প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরিক সংস্কারের সম্পূর্ণ কাহিনী এবং ধর্ম্মের নামে মানুষের উপর অত্যাচারের বিচিত্র বর্ণনা। দ্বিতীয়তঃ একথা বোধ হয় সত্য যে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ প্রায় সকল ঐতিহাসিকের মনে প্রটেষ্টাণ্ট্ প্রীতি এবং অনুভূতি প্রবল থাকার ফলে এ যুগের ইতিবৃত্তে ক্যাথলিক্ সমাজের প্রতি অবিচার হয়েছে; তাই ক্যাথলিক্দের চোখে রেফর্মেশন্ যে-রূপ গ্রহণ করে এ-গ্রন্থে তার পরিচয় কৌতূহলী পাঠকের চিত্তাকর্ষক হ'তে বাধ্য।

রেফর্মেশন্ সম্বন্ধে প্রটেষ্টাণ্ট মনোভাবের আভাস আমরা ক্যাল্ভিনের নিজের উক্তিতেই দেখতে পাই—জেনীভায় সংস্কারকদের জয়কে তিনি অন্ধকার থেকে জ্যোতির মধ্যে মুক্তিলাভ বলে' ঘোষণা করেছিলেন। এ-বিশ্বাস যে স্পর্দ্ধার কথা এবং এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জন মাত্র বহু লেখক ইতিপূর্ব্বে তা' প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তিগুলি সুসম্বদ্ধ ও সহজভাবে পাঠক সমাজে উপস্থিত করার প্রচেষ্টাই বোধহয় আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রটেষ্টাণ্ট মনের বদ্ধমূল ধারণা এই যে মধ্যযুগের অবসানে ক্যাথলিক্ সমাজের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল অতীব শোচনীয়। সিদ্ধান্তটির সম্বন্ধে কিন্তু সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। সমগ্র মণ্ডলীর তুলনায় অসচ্চরিত্র সন্ন্যাসী ও পুরোহিতের সংখ্যা তখন কতই বা ছিল, ওদিকে সংস্কারকদের মধ্যেও ত' বিশুদ্ধ নির্ম্মল লোকের বাহুল্য দেখা যায় নি। ধর্ম্মযাজকবৃন্দের পার্থিব আসক্তি যদি সে সময় চার্চ্চকে দুর্ব্বল করে' থাকে তবে ত' তার ফলে নিশ্চয় মানুষের চিন্তা ও ব্যবহারের স্বাধীনতা বাড়বার পথেই অগ্রসর হচ্ছিল। পুরোহিত-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অজ্ঞতার অভিযোগও হয়ত অন্যায়—কেননা আসলে সেকালের বিদ্যাচর্চ্চার ক্ষেত্র ও জ্ঞানের বিষয়ই অনেকাংশে ছিল আধুনিক মতে নিরর্থক। কুসংস্কার তখন দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখে থাকতে পারে কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কাছে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মমতও ত' অন্ধবিশ্বাসের প্রকারান্তর মাত্র। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ, তীর্থ যাত্রা, মূর্ত্তি পূজা, সেণ্টদের আরাধনা প্রভৃতি ক্যাথলিক্ প্রথা যে শুধু অমঙ্গলেরই আকর এ বিশ্বাসেরই বা যুক্তিসঙ্গত হেতু কোথায়?

ধর্ম্মমত হিসাবেও প্রটেষ্টাণ্ট বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব স্বতঃসিদ্ধ নয়। লুথার এবং ক্যাল্ভিনের মতে মানুষ স্বভাবতঃই পাপনিমগ্ন বলে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় ভগবানের দয়া; সুতরাং ভগবৎ কৃপায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন ও নির্ভর ভিন্ন নরক-যন্ত্রণার বিভীষিকা থেকে উদ্ধার পাবার অন্য কোন ভরসা থাকতে পারে না। সৎকার্য্যের ফলে পুণ্য সঞ্চয় সম্বন্ধে ক্যাথলিক্ সমাজে প্রচলিত ধারণাকে তাই প্রাথমিক প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়গুলি একেবারেই অস্বীকার করে। এ-

মতবাদের যুক্তিসঙ্গত পরিণাম যে ব্যক্তিবিশেষের দায়িত্ববোধের সম্পূর্ণ বিনাশ সে-আশঙ্কা পণ্ডিত-প্রবর ইর‍্যাস্‌মস্‌ নূতন আন্দোলনের প্রারম্ভেই স্পষ্ট ব্যক্ত করেছিলেন। অহৈতুক ঐশী করুণা মুক্তির একমাত্র সোপান হ'লে স্যাক্রামেণ্ট বা অবশ্যপালনীয় অনুষ্ঠানগুলির আর মাহাত্ম্য থাকে না অথচ প্রটেষ্টাণ্টেরা তখন সাতটি সংস্কারের মধ্যে অন্ততঃ দুটিকে বিসর্জ্জন দিতে পারে নি। এতে যুক্তির দিক থেকে নূতন ধর্ম্মের দুর্ব্বলতাই প্রতিপন্ন হয়েছিল।

অবশ্য প্রটেষ্টাণ্ট নেতারা তখন যুক্তির আশ্রয় নেন নি, তাঁদের প্রধান নির্ভর ছিল এই বিশ্বাস যে মানুষের উদ্ধারকল্পে যীশু খৃষ্টের ধরাতলে অবতীর্ণ হবার নিদর্শন বাইবেল গ্রন্থের মধ্যেই ভগবানের সকল বাণী গ্রথিত রয়েছে। এ মতানুসারে যীশুর সরল ধর্ম্ম ক্যাথলিক্ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রমশঃ বিকৃতরূপ ধারণ করেছে, সুতরাং আদি গ্রন্থ বাইবেলকেই একমাত্র প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত স্বীকার করা উচিত। ক্যাথলিক্ সম্প্রদায় এর উত্তরে বলে থাকে যে যখন বাইবেল যীশুর স্বরচিত নয় এবং তার মধ্যেও যখন অস্পষ্ট বা আপাত বিরোধী কথার অভাব নেই তখন খৃষ্টের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচর ও প্রিয় সহকর্ম্মীদের কাছ থেকে শিষ্য-পরম্পরায় যে-জ্ঞান ও ধর্ম্মব্যাখ্যা চলে এসেছে, বহুযুগ সঞ্চিত সে ঐতিহ্যকে বাইবেলের সঙ্গে সমান আসন দেওয়া কিছুমাত্র অন্যায় নয়। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যার আশ্রয় একবার নিলে যে মতান্তরের বন্যা আসবে, অসংখ্য প্রটেষ্টাণ্ট সম্প্রদায়ের উৎপত্তি তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। এ অবস্থায় সনাতন চার্চ্চের অনুজ্ঞানুসারে জীবন যাপনই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?

স্বাধীন চিন্তার অধিকার স্থাপন অথবা ধর্ম্মের নামে মানুষের উৎপীড়ন নিবারণের উদ্দেশ্যে রেফর্মেশনের অভ্যুদয় হয় নি। লুথার্, জুইংলি, ক্যাল্‌ভিন কেউই স্বীকার করেন নি যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল মানুষের নিজের মতন ভাববার এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলবার স্বাধীনতা আছে। নিজ নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে তাঁরা একমাত্র সত্য বলে ঘোষণা করতেন, ক্যাথলিক্ মত তাঁদের কাছে ভ্রান্ত বলেই পরিত্যাজ্য হয়েছিল। কাজেই অবস্থা বিশেষে ক্যাথলিক্ এমন কি ভিন্ন মতাবলম্বী সংস্কারকদের উপরেও প্রটেষ্টাণ্টেরা অত্যাচার করতে ছাড়ে নি। ব্রিটিশ ইতিহাসে বহুদিন পর্য্যন্ত ক্যাথলিক ও পিউরিটানদের প্রতি শাসকদের ব্যবহার এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রায় বারো শ' বছর যে সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান ইয়োরোপকে আশ্রয় দিয়ে এসেছিল তার ঐক্য ভাঙ্গবার অপরাধে ক্যাথলিক লেখকেরা তাই সংস্কারকদের দোষী সাব্যস্ত করেন। তর্কের খাতিরে তখনকার সমাজের দুরবস্থা মেনে নিলেও অভিযোগ থাকে যে বিনা বিদ্রোহে কি অন্যায়ের প্রতিকার অসম্ভব ছিল? লুথার প্রভৃতি নেতারা নাকি অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই বিপ্লবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। অথচ প্রয়োজনানুসারে যুগে যুগে চার্চ্চের ছায়া ত্যাগ না করেও ধর্ম্মভাবের পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়ে এসেছে, ক্যাথলিক লেখকদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।

এ ভাবে তর্কের সমুদ্র পার হয়ে আমরা শেষে সিদ্ধান্ত করতে পারি যে ষোলো শতকের ধর্ম্ম সংস্কারকে সত্য মঙ্গলের জয় লাভ বলে গণ্য করবার বৈধ কারণ নেই। এ সম্বন্ধে হয়ত সম্পূর্ণ

নিরপেক্ষ ভাব আজকের দিনে সম্ভব, কেন না অনেক ঐতিহাসিক এখন ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্ট কোন দলভুক্ত নন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আলোচ্য গ্রন্থে সে নিরাসক্তির অভাব রয়েছে, এর মধ্যে তাই প্রটেষ্টাণ্ট আত্মপ্রসাদ খণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, ক্যাথলিকদের পরাজয়ে ক্ষোভ এবং প্রটেষ্টাণ্ট সভ্যতার প্রতি আক্রোশ ও বৈরীভাব গোপন করা হয় নি। শুধু একজন লেখকের সম্বন্ধে এ মন্তব্য প্রযুজ্য নয়—পাওয়িকের লেখা সুসংযত পরিচ্ছেদগুলি অক্সফোর্ডের রীজিয়াস্ অধ্যাপকের উপযুক্ত বলা চলে। ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও সমাজ প্রীতি আজ ইউরোপে নানা অঞ্চলে এত ব্যাপক বলেই এ ব্যাপারে স্পষ্ট চিন্তার আবশ্যক আছে।

প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়ে—রেফর্মেশনের কারণ কি? বইখানির লেখকেরা স্থানে স্থানে এমন ইঙ্গিত করেছেন যে রেফর্মেশনের কারণ জার্ম্মানিতে লুথার, ফ্রান্সে ক্যাল্‌ভিন্, স্কটল্যাণ্ডে জন নক্স। অথচ এই নেতারা মহাপুরুষ হওয়া দূরে থাক, লেখকদের মতে তাঁদের প্রায় কোন গুণই ছিল না। এ কথা সত্য হলে মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে ষোলো শতকের ধর্ম্মসংস্কার হয় বিধাতার দুর্জ্ঞেয় লীলারহস্য নয়ত শয়তানের কারসাজি মাত্র। গোঁড়া ক্যাথলিক ছাড়া অন্য কেউ এতে তৃপ্ত হতে পারেন না।

অবশ্য গ্রন্থকারেরা প্রকাশ্যে লৌকিক ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে পরাঙ্মুখ হন নি, প্রটেষ্টাণ্ট সাফল্যের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কারণ তাঁরাও অল্প বিস্তর নির্দ্দেশ করেছেন। রেফর্মেশনের পিছনে এ-জাতীয় চারিটি শক্তির অস্তিত্ব সহজেই বোঝা যায়—দেশে রাষ্ট্র-শাসকদের সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তৃত্ব বিস্তারের স্পৃহা, অভিজাতবর্গের চার্চ্চ-সম্পত্তি হস্তগত করবার বাসনা, প্রাচীন সমাজের নানা বিধিব্যবস্থা অপসারণের মধ্য শ্রেণীর স্বার্থসন্ধান এবং জনসাধারণের ভিতর স্বজাতি প্রীতির খাতিরে বিদেশী পোপদের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ। এ ঝোঁকগুলির প্রভাব প্রমাণ করা বিশেষ শক্ত নয়—এমন কি ইয়োরোপের যে অংশ পুরাতন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানকে আঁকড়ে রইল সেখানেও এদের ফলে ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও সমাজের প্রভূত পরিবর্ত্তন হয়েছে, বাহ্যিক আড়ম্বর বজায় থাকলেও মধ্যযুগের প্রতাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা আশ্রয় করাতে ক্যাথলিক লেখকদের উপর জড়বাদের ছায়া পড়লেও তাঁদের স্বকীয়তা কিন্তু বিনাশ পায় না কারণ মধ্যযুগ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস ও রেফর্মেশনের প্রতি অবজ্ঞাই তাঁদের মনোভাবের প্রধান অঙ্গ। এ প্রসঙ্গে দুটি প্রস্তাব বোধ হয় অবান্তর হবে না।

ইতিহাসের সাধারণস্বীকৃত লক্ষ্য হল ঘটনা-পরম্পরার বিবৃতি এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা। তাই অতীত যুগবিশেষ কিংবা যুগসন্ধির আলোচনায় ঘটনাস্রোতের একটা দিকনির্ণয় ভিন্ন ঐতিহাসিকের অন্য উপায় থাকে না। পরিবর্ত্তনের গতি যেদিকে তার সহায়ক

শক্তির নিন্দাবাদ বোধ হয় তখনই শোভা পায় যখন সে পরিবর্ত্তন সভ্যতার ধ্বংসের নামান্তর মাত্র। কিন্তু ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির আধুনিক যুগকে সভ্যতার নবরূপ ধারণ না বলে বর্ব্বরতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ভাবা নিতান্তই কষ্টকল্পনা নয় কি? বুদ্ধিমান ক্যাথলিকেরা কি সত্যসত্যই ইয়োরোপের গত চার শতাব্দীকে সর্ব্বাঙ্গীণ পতনের কাহিনী মনে করেন? সভ্যতা আজ ইয়োরোপ থেকে অন্তর্হিত-প্রায় হয়েছে এ কথা আন্তরিকভাবে স্বীকার না করলে রেফর্মেশনকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করা চলে না কারণ আধুনিক ইয়োরোপ অনেকাংশে এরই সৃষ্টি। আর ইয়োরোপকে আজ বর্ব্বর আখ্যা দেওয়া ভাববিলাসী কবি, গভীর দার্শনিক বা ব্যাকুল ধর্ম্মপ্রচারকের মুখে শোভা পেলেও স্থিরবুদ্ধি ঐতিহাসিকের কাছ থেকে এ ইঙ্গিত প্রত্যাশা করা যায় না।

ষোলো শতকের সংস্কারকে তাই উপহাস করা অসম্ভব, তার বিষয়ে একদেশদর্শিতা তাই অনুচিত। তেমনই ক্যাথলিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি অযথা ভক্তিরও প্রতিবাদ প্রয়োজন। পুরাতন প্রথার সমর্থকেরা অনেক সময়ে অতীতের দোষ চেপে যান, তার দুর্ব্বল দিকের আলোচনা এড়াবার কৌশল হয় তাঁদের প্রধান অবলম্বন। এই গ্রন্থকারেরাও এ-দোষ পরিহার করতে পারেন নি। প্রটেষ্টাণ্ট অতিকথনকে অবিশ্বাস করলেই ক্যাথলিক সমাজের সমর্থন অবশ্যকরণীয় হয় না। পনেরো শতকের সংস্কার চেষ্টার ব্যর্থতা ভুললে চলবে না—একথাও মনে রাখা উচিত যে রেফর্মেশনের আংশিক জয়লাভের পরেই ক্যাথলিক সম্প্রদায়কে বাধ্য হয়ে গৃহসংস্কার করতে হয়েছিল, তার আগে নয়। তার পরেও ক্যাথলিক সমাজ পরিবর্ত্তন ও স্বাধীন চিন্তার পরিপন্থী হিসাবেই ইতিহাসে স্থান পেয়ে এসেছে। আজকের দিনের ক্যাথলিক-প্রীতিও পুরাতন সমাজের আত্মরক্ষার উপায়মাত্র। তাছাড়া ষোলো শতকে আভ্যন্তরীণ সংস্কার কখনই অনেক মূল আপত্তি খণ্ডন করতে পারত না। সৎকার্য্যের নামে বাহ্যিক আচারের দাসত্ব, পুরোহিত শ্রেণীর অলৌকিক শক্তি স্বীকার, পুরাতন ব্যবস্থা রক্ষার ছলে আন্তরিক পরিবর্ত্তন, নেতৃত্বের মাহাত্ম্যে পোপদের যথেচ্ছাচার—শত শত লোকের কাছে এসব সেদিন পীড়ার কারণ মনে হওয়া অস্বাভাবিক ও বিচিত্র নয়। ধর্ম্মসংস্কারের ধারণার উৎপত্তি এই অসন্তোষের থেকে এ কথা তাই বস্তুবাদের বিরোধী নয়। মণ্ডলীর মধ্যে বহুদিন থেকে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল—উইক্লিফ ও হাস লুথারের অগ্রগামী ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগে আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিবর্ত্তনের ঝোঁক শক্তিশালী হয়ে ওঠে নি। পরে সে স্রোত প্রবল হয়ে উঠেই অবশ্য অসন্তোষকে বিপ্লবে পরিণত করতে পেরেছিল। রেফর্মেশনকে তাই শেষ পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয় মধ্যশ্রেণীর প্রগতির এক অধ্যায় মনে করা অন্যায় নয়।

শ্রীসুশোভন সরকার

ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মৈত্র প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)

Dambaru—The Futurist Publishing House

মনোমুকুর—শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)

এক ভাষা থেকে আর এক ভাষায় কবিতা অনুবাদ করা যে মূল রচনার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন, একথা যাঁরা একাজে কখনো হস্তক্ষেপ করেন নি, তাঁদের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। প্রত্যেক ভাষারই একটা ক'রে নিজস্ব জান্ আছে, যা ভাষান্তরিত হ'তে পারে না—যে বিশেষ ঢঙ, বা বিন্যাস মূলরচনায় সৌষ্ঠব, অনুবাদে তা একান্ত কিম্ভূত হ'য়ে দাঁড়ানোও আশ্চর্য্য নয়। তারপর আছে 'প্রত্যেক ভাষার সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত সেই ভাষা-ভাষীর সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নানা ভাবস্মৃতি—ভাষান্তরিত ক'র্‌লে যার সার্থকতাই থাকে না, যা উপভোগ্য না হ'য়ে অনুবাদে সজারুর কাঁটার মতো মাথা খাড়া ক'রে থাকে। কাজেই কাব্যানুবাদ সম্বন্ধে প্রথমেই সতর্ক হওয়া দরকার—বিশেষ ক'রে ব্রাউনীঙের কাব্যানুবাদে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মৈত্র কাব্যানুবাদে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি লাভ ক'রেছেন—তাঁর ভাষা স্বচ্ছ, বেগবান,ছন্দের হাতও সহজ; সর্ব্বোপরি তিনি কবি, কাজেই কাব্যের প্রাণ-সম্পদ আহরণ করা এবং তাকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে কতকটা অনায়াসলভ্যই বলা যেতে পারে। তবু তিনি বিষয় নির্ব্বাচনে স্বভাবতঃই যে অসুবিধা স্বীকার ক'রে নিয়েছেন, তার ক্ষতি পূরণ ত তাঁকে দিতেই হবে! তিনি যদি টেনিসন অনুবাদ ক'র্‌তেন, তা'হলে তা একযোগে অনুবাদ এবং কাব্য দুইই হ'ত এবং তা হ'ত অনায়াসে—কিন্তু ব্রাউনীঙের বিশেষত্বই তাঁর অননুকরণীয় স্বাতন্ত্র্যে, সে দৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গী উভয়তঃই, যাকে বাংলা ভাষার সুস্নিগ্ধ পরিবেষ্টনীর মধ্যে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তাই এই অনুবাদে বাংলা কবিতার নিজস্ব মৃদুতা মধুরতা অনেকখানি পেলেও, তার আড়াল থেকে ব্রাউনীঙের ঝাঁজটুকু যেন সর্ব্বত্র সমান ভাবে পাচ্ছি না। একে লেখকের অকৃতার্থতা ব'ল্‌বনা—এ হ'ল ব্রাউনীঙের স্বধর্ম্মের অনতিক্রমণীয় আভিজাত্য! কাব্যানুবাদে মূল কবিতার বক্তব্য সবটুকু থাকাই যে বড় কথা নয়, এ কথা বিশেষ ক'রে প্রমাণের প্রয়োজন নেই। পোপের হোমার, ড্রাইডেনের ভার্জিল, কেরীর দান্তের পরও তা হ'লে আবার নূতন ক'রে এই সব ক্ল্যাসিকের অনুবাদ করা দরকার হ'ত না—বস্তুতঃ কাব্যের আসল জিনিষ, তার অলঙ্করণ, তার প্রকাশ, তার প্রচ্ছন্ন রহস্য মধুর ইঙ্গিত—এক কথায় তার প্রাণ, বাদ দিলে বা দিতে বাধ্য হ'লে, তার আর থাকে কি? ফিট্‌জেরাল্ড ওমর খৈয়ামের কবিতা অবলম্বনে নিজে ইংরেজী কবিতা লিখেছেন—মূলের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ অনেকটা চিনি ও সন্দেশের সম্বন্ধের মতো—এ তিনি ক'রেছেন এই জন্যে যে মূল ফার্সির প্রাণ-সম্পদ ইংরাজীতে আসে না; অথচ 'নেহাত' অনুবাদ ক'র্‌লে রচনা নিষ্প্রাণ হয়, কাজেই অনুবাদে তিনি আর কবিতার জাত্যন্তর না ক'রে জন্মান্তর ক'রে ফেলেছেন। এ ছাড়া উপায়ও নেই—অথচ এ মূলের প্রতি যথেষ্ট অবিচার!

অবশ্য এ সব উক্তি বিশেষ ক'রে বিচার ক'র্‌তে গেলে—নচেৎ ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা প'ড়ে আমরা বিশেষ আনন্দই পেয়েছি—Last Ride Together, Love Among the Ruins প্রভৃতির তর্জ্জমায় তিনি সত্যই খুব শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এইখানে একটা কথা সঙ্কোচের সঙ্গে ব'লে রাখি—ছাত্রাবস্থায় এই সব কবিতা আমার পাঠ্য ছিল, এবং অতি-সান্নিধ্যে নিঃসন্দেহ সব জিনিষের মতো কাব্যও তেতো হ'য়ে ওঠে—তাই বহুদিন পরে আজ আবার তাদের অনুবাদ পড়্‌'তে প'ড়্‌তে মনে হ'ল ব্রাউনীঙের এই সব সাজানো কবিতার অনেক জায়গাতেই যেন বেশ ফাঁকি আছে—বিশেষ ক'রে Last Ride-এর শেষের দিকটায়। অনুবাদক সেটা ঢাক্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু সেই প্রয়াসে ব্রাউনীঙের পঞ্জরাস্থি যেন আরো স্পষ্ট ভাবেই প্রকট হ'য়ে উঠেছে। 'অন্বেষণ' নামের অনুবাদটি সত্যই খুব চমৎকার হ'য়েছে; আর গোটাকতক অনুবাদও প্রথম শ্রেণীর। Meeting at Night, Parting at Morning-এর যতীন বাগচি আরো ভাল তর্জ্জমা ক'রেছিলেন, Sumum Bonum সত্যেন্দ্র দত্তের তর্জ্জমাতেই বোধ করি উৎকৃষ্টতর। তবু সব শুদ্ধ জড়িয়ে মৈত্র মহাশয়ের প্রয়াস যেমন প্রসংসার্হ, তেমনি রসজ্ঞতাপূর্ণ।

সত্যেন্দ্র দত্তের চেয়ে অনুবাদে তাঁর লেখনীর অধিকতর সাচ্ছন্দ্য লক্ষিত হয় কিনা, সে আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন—তবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ কথা ব'লেছেন।

ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদের পর বাংলা কবিতার ইংরাজী অনুবাদ সম্বন্ধে দু'কথা অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। আলোচ্য (দ্বিতীয়) বইটির সব কবিতাই যে বাংলা কবিতার অনুবাদ তা নয়; কয়েকটি মূল কবিতাও আছে, যেমন হারীন চট্টোপাধ্যায়ের একটি, কাইকেনীর (বোম্বাইয়ের ইংরাজী লেখক তরুণ কবি) দুটি এবং আরো দু'একজনের কয়েকটি। এ ছাড়া সমস্তই অনুবাদ—গত পাঁচ বৎসরে যে সব নূতন কবি আবির্ভূত হ'য়েছেন, এই সব কবিতা প্রধানতঃ তাঁদেরই। এর ভেতর থেকে অনেকে বাদ প'ড়েছেন, অনেকে অকারণ প্রাধান্য পেয়েছেন এ কথা সত্যি, তবু এ চেষ্টারও যে এক জাতীয় সার্থকতা আছে, তা স্বীকার কর্‌তেই হবে। বাংলার বাইরে আধুনিক বাঙালীর সাহিত্য-প্রয়াসকে এই বই হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে পরিচিত কর্‌বে—কিন্তু তার জন্যে যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে এর নির্ব্বাচন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা হ'য়েছে কি না, আধুনিক বাংলার কাব্য-কীর্ত্তির চরমোৎকর্ষই এই বইয়ে ফুটিয়ে তোলা হ'য়েছে কি না, এ সব প্রশ্ন অবশ্য বর্ত্তমানে না ওঠাই বাঞ্ছনীয়।

এই বইয়ের ভূমিকায় ডাঃ ভবানী ভট্টাচার্য্য আধুনিক বাঙালী কবিদের গতানুগতিক পদ্ধতির নিন্দা ক'রেছেন এবং ব'লেছেন যে সমরোত্তর পৃথিবীর সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক আদর্শ যখন উল্টে-পাল্টে তছ্‌নছ্‌ হ'য়ে গেছে, তখনো আধুনিক বাঙালী সুলভ প্রেমকাব্য রচনা নিয়েই ব্যস্ত—তার চিন্তার মধ্যে বাস্তবতার আহ্বান এসে পৌঁছায় নি। মোটের উপর এ কথা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের বিবাদ নেই—তবে ভবানী বাবুর এ কথাও ভুলে যাওয়া সঙ্গত নয় যে বাংলা সাহিত্যে এখনো পূর্ণ মাত্রায় রবীন্দ্রনাথের আধিপত্য চ'ল্‌ছে এবং তাঁরই জীবৎকালে তাঁকে

ছাপিয়ে উঠে নূতন ক'রে কাব্যের ঐতিহ্য স্থষ্টি করার মতো শক্তিমান রাতারাতি জন্মাতে পারে না—বিশেষতঃ দেশে-দেশে কাব্যাদর্শ নিয়ে যখন মতদ্বৈধই আছে। তবু মোহিতলাল, যতীন সেনগুপ্ত, নজরুল এবং আরো কয়েক জন আধুনিক কবির রচনায় রবীন্দ্র দৃষ্টিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে—বাস্তব সংসারের তুচ্ছ প্রাত্যহিকতা, গ্লানি বা ক্লেদকে তাঁরা কাব্যের বিষয়ীভূত ক'রতে অল্পবিস্তর চেষ্টাও পেয়েছেন। তা ছাড়া বাংলা কাব্যের ধারণা-শক্তি ও প্রকাশ-শক্তি নিয়ে নিত্য নূতন পরীক্ষাও অল্প-বিস্তর চ'লেছে—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আছেন তার মধ্যে, কয়েকজন আধুনিকও আছেন। এ অবস্থায় এক কথায় কিছু হয় নি বলাকে আমরা কোন মতেই সমর্থন ক'র্‌বনা।

বাংলা কাব্যে অ-বাংলা ভাবাদর্শ বা রসাদর্শের অনুসরণের তিনি নিন্দা ক'রেছেন—আমরাও করি। কিন্তু সেই সঙ্গে রোমান্টিসিজম্ সম্বন্ধে তিনি যে বক্রোক্তি ক'রেছেন, তার ওপর আমার কিছু বক্তব্য আছে। রোমান্টিসিজমের দোষে আধুনিক বাংলা কাব্য তাঁর বিচারে অপাংক্তেয় হ'য়ে গেছে, কিন্তু অডেন, স্পেণ্ডার, ডে লিউইস্‌কে তিনি প্রশংসার জয়মাল্য দিয়েছেন, যেন এরা পুরোদস্তুর রোমান্টিসিজম্-প্রুফ! অথচ তিনি এদের প্রসঙ্গে ব'লেছেন, "They are continuing the tradition of Marlowe, Milton and Shelley, but on a higher level!" এ কথার কি মানে হয় তা আমি বুঝি না; তেমনই এলিয়ট, পাউণ্ডের দিন গেছে—"Today they lie shelved in history"—এ কথার মানেও আমার নিকট দুর্গম—কারণ আমি মনে করি অডেন, স্পেণ্ডার প্রভৃতি এলিয়ট, পাউণ্ড, লরেন্সের ভাঙা হাটে কাঁসর বাজানোর চেয়ে বড় কাজ আজও কিছু করেন নি এবং তাঁরা আকারে যতটা আধুনিক, প্রকারে ততটা নন্। মোটের ওপর ভবানী বাবুর ভুল হ'য়েছে, রসধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম দুটোকে এক ক'রে দেখায়, তাই একাধিক বার তিনি বাংলা কাব্যে social theme নেই ব'লে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—অবশেষে একটি 'রিক্সাওয়ালা'র কবিতা পেয়ে তবে আশ্বস্ত হ'য়েছেন; কিন্তু সাঁওতাল নারীর যৌবন-পুষ্ট দেহের সাগ্রহ বর্ণনা করতে করতে তিনি নিজেও যে অজ্ঞাতসারে রোমান্টিসিজমের বেড়াজালে ধরা প'ড়ে গেছেন একথা তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।

আলোচ্য বইয়ে যাঁদের রচনা স্থান পেয়েছে তাঁদের লেখা সর্ব্বদাই বাংলা কাগজে আমরা পড়ে থাকি—তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের রচনাশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয়—গদ্যে পদ্যে তাঁরা অনেক রকম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের ভালো কবিতা নির্ব্বাচিত না হওয়ায় এবং অনুবাদ সুষ্ঠু না হওয়ায়, পড়ে তেমন আনন্দ পাওয়া গেল না। কতকগুলি কবিতার গায়ে বাঙালী পরিচালিত ইংরেজী খবরের কাগজের আঁতুড়ে গন্ধ অত্যন্ত স্পষ্ট—ভাষার আড়ষ্টতা এবং খেলোমিকে ম্যানারিজম ব'লে চালাতে গেলে চলবে কেন? তৎসত্ত্বেও আমরা এই নবীন সাহিত্য-ব্রতীদের অভিনন্দিত করছি। হারীন চট্টোপাধ্যায়ের মূল কবিতাটি আমার আদৌ ভালো লাগে নি। হুমায়ুন কবীরের অনুবাদটি ভালোই হ'য়েছে বলা যেতে পারে। আর চ্যাপ-

ম্যান, আর্চার প্রভৃতির রচনা সম্বন্ধে কিইবা বলার আছে? মলাটের চিত্রণ থেকে হাস্যরসকে বর্জ্জন করাই অধিকতর সুরুচির পরিচায়ক হ'ত মনে হয়।

তৃতীয় বই মনোমুকুরে সাবিত্রীবাবুর আধুনিকতম কতকগুলি কবিতা স্থান পেয়েছে। সাবিত্রীবাবুর যে কাব্য-ধারার সঙ্গে বাঙালী পাঠক পরিচিত, আলোচ্য কবিতাগুলিতে তা থেকে একটি স্বতন্ত্র সুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—তার ভেতর রাবীন্দ্রিক অনুরণনের অভাব নেই এবং তাকে প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রোত্তর আখ্যাও দেওয়া চলে না—তবু তার বিশেষত্ব আছে। যে প্রেম জীবন্তকে আশ্রয় ক'রে, প্রাত্যহিক পৃথিবীর বস্তু-সীমাকে কেন্দ্র ক'রে যার স্ফুরণ, বাস্তবতার সঙ্ঘাতে ফেনায়িত অথচ গভীর এবং সুদূর-প্রসারী—এমন প্রেম বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ—সে জন্যে একা সাবিত্রীবাবুকে দায়ী করা চলে না। যে আপাত জটিলতা যুগধর্ম্মে এ দেশে মিষ্টিসিজম্ আখ্যা লাভ ক'রেছে—তাও একা সাবিত্রীবাবুরই বৈশিষ্ট্য নয়—এ সবের মূল কোথায় তার নির্দ্দেশ দেওয়া আমার কর্ত্তব্য নয়। আমি কাব্যের দিক থেকে মনোমুকুরের উৎকর্ষাপকর্ষ দেখাতে চেষ্টা করবো।

সাবিত্রী বাবুর ভাষা অলঙ্কৃত অথচ অসংযত নয়; ধ্বনি-মুখর কিন্তু কাকলীক্লিষ্ট নয়—এর ওপর তাঁর প্রকাশভঙ্গী মধুর, মনোজ্ঞ এবং স্থানে স্থানে স্বপ্নালু...এতদিন আমরা যে কাব্যাদর্শকে সস্নেহে লালন করে এসেছি, তার অনুসারে এই কবিতাগুলি নিখুঁত। যে বেগবত্তা এবং অবাধ্যতা লিরিক্ কাব্যের ষোল আনা না হ'লেও অন্ততঃ চোদ্দ আনা, মনোমুকুরের কবিতায় তা এতই অনায়াস এবং অজস্র যে সে দিক থেকে আমরা কবিকে অনেকের চেয়ে ভাগ্যবান ব'লেই মনে করি। 'স্বপ্ন বাসবী', 'মাণিক মালা', 'প্রস্থায়িনী', 'শ্রাবণ শর্ব্বরী' প্রভৃতি কবিতার কথা দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। সর্ব্বশেষ কবিতাটি এবং 'শ্রাবণ শর্ব্বরী' নিঃসন্দিগ্ধ প্রথম শ্রেণীর রচনা। 'চন্দ্রাবতী অঘোরে ঘুমায়'ও 'বাতায়ন' এদুটির মধ্যে আধুনিক সুর প্রবল এবং অপরাপর কবিতা থেকে বিচ্ছিন্ন...এইখানেই সাবিত্রী বাবুর নবতন পরিণতির পূর্ণ প্রকাশ ধরে নেওয়া যাক।

কিন্তু মনোমুকুরের কবিতায় বৈচিত্র্যের আরোহ-অবরোহের চেয়ে প্রশান্তির ক্রমিকতা বেশী। ফলে কবি বহু স্থলে নিজেকে নিজে অনুকরণ করে বসেছেন—যা পূর্ণাঙ্গ রসানুভূতিকে বাধা দেয়। আর 'লীলাময়ী' ও 'চিরন্তনী' কবিতা দুটি বইয়ে দেওয়ার আমি সমর্থন করি না। সনেটগুলি, 'সূর্য্যমুখী' এবং 'প্রভাতের প্রেম' সত্যিই সুন্দর কবিতা—প্রকাশে বিন্যাসে রূপে রঙে এরা সুন্দর নয়, সুন্দরই এদের উপজীব্যও। কিন্তু এখানেই হয়ত আধুনিকরা আপত্তি তুলবেন—কিন্তু তার আগেই আমি ইতি ক'রে ফেলি।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

Hindu Civilisation—By Dr Radha Kumud Mookherji (Longmans), 15/-

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আলেকজাণ্ডারের আগমন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লেখা হয় নি। জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি সাধারণের অগম্য ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় ছড়ান রয়েছে। আমাদের এই যুগ সম্বন্ধে কৌতূহলেরও অবধি নেই। এই যুগেই আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতার উত্থান ও পতন, সিন্ধু সভ্যতার প্রসার, আর্য্যদের প্রবেশ, নতুন সভ্যতার সাথে পুরাতনের আদান-প্রদান, ঋগবেদের ভিত্তি, সর্ব্বপ্রথম রাজ্যগঠনের প্রয়াস, সূত্র, পাণিনি, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্ম্মশাস্ত্রের জন্মকাল, মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, নারদের প্রাথমিক সমাজ পত্তন, কোশল, অবন্তী, বংশ, মগধ রাজ্যের অভ্যুদয়, সাধারণতন্ত্রের আভাস, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার, পারসিক প্রভাবের ছায়াপাত। এই যুগের পরে ভারতবর্ষের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল—যেটিকে বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিতবর্গ যত্ন সহকারে পুনরুদ্ধার করেছেন। কলেজ ষ্ট্রিটে পুরানো বই-এর মতন আমাদের ইতিহাস, প্রথম কয়টি পৃষ্ঠা হয় নেই, না হয় ছেঁড়া, তাও আবার অন্য মলাটে বাঁধাই, কখনও বা প্রচ্ছদপটে সিনেমা-সুন্দরীর ছবি দিয়ে মনোহারী করবার চেষ্টা। রাধাকুমুদ বাবু ছেঁড়া পাতা কুড়িয়ে নতুন করে ছাপিয়ে আমাদের সামনে রাখলেন বলে তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। এতদিন পরে আমরা ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যের সন্ধান পেলাম।

ঐক্যের দুটি দিক, পর্য্যায়ক্রমের, এবং অনুপ্রস্থের। ঘটনা যদি বহুল ও সংকটময় না হয় তবে পর্য্যায়ের আগ্রহ উদ্রেক করা কঠিন, যদিও অসম্ভব নয়। সমাজ পরিবর্ত্তনের ও পরিশীলনের অভিব্যক্তির সাহায্যে নাটকীয় ঘটনা দৈন্যের খানিকটা ক্ষতিপূরণ করা যায়। সে জন্য অন্য জাতীয় কৃষ্টির সংঘাত, কিম্বা আভ্যন্তরীণ কোন বিপ্লবসাধক জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহের উপায় আবিষ্কার ও প্রসারের বিবৃতির প্রয়োজন। ধীর অভিব্যক্তি পাঠকের মনকে সজাগ রাখতে পারে না, যদি তার পিছনকার সমাজ-শক্তি সম্বন্ধে কোন মনোজ্ঞ মতামত লেখক ধারণ না করেন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তারও কোন সুযোগ নেই। অতএব ইতিহাসের ঐক্যসন্ধান নির্জীব হতে বাধ্য। রাধাকুমুদ বাবু পণ্ডিতজনোচিত পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন, তাই ইতিহাসের প্রেরণা সম্বন্ধে সাহসভরে কিছুই খোলাখুলি বলেন নি। ইঙ্গিত দিয়েছেন যথেষ্ট, সেটি হল একটি আদর্শ সমাজের। বোধ হয়, তাঁর মতে ঐ যুগের হিন্দুসমাজে ভারসাম্য এতই সুষ্ঠু ছিল যে তার পরিবর্ত্তনের কারণই ছিল না। যদি কোন পাঠক প্রশ্ন করেন, তবে কি হিন্দুসমাজ বেদেরই মত অপৌরুষেয় ছিল, অনার্য্য-আর্য্য সভ্যতার দান-প্রতিদানে কিছুই ফল হয় নি, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু ও পাণিনির কল্পিত সমাজে কোন পার্থক্যই নেই? তা হলে রাধাকুমুদ বাবুর এই বইখানি থেকে কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না মনে হয়। রাধাকুমুদ বাবুর কৃতিত্ব স্থিতিশীল সমাজের বর্ণনায়, গতিপ্রাণ সমাজের শক্তি বিশ্লেষণে নয়। লেখক নিতান্ত সাবধানী ব্যক্তি। তবু মনে হয় তিনি আদর্শবাদী, অতএব পরিবর্ত্তনে বিশ্বাসী নন, নচেৎ ৩১৯ পৃষ্ঠার

মধ্যে কোথাও হিন্দুসভ্যতার সমালোচনার ও তার প্রতি সন্দেহের সাক্ষাৎ পেলাম না কেন? আমার বক্তব্য এই, ঐক্যের পিছনকার শক্তি-পরম্পরা বিশ্লেষণের জন্য আমাকে অন্য বই পড়তে হবে। অন্য ভাষায় বলতে গেলে রাধাকুমুদ বাবু সভ্যতার ইতিহাস লেখেন নি, কালচার্-এর উৎকৃষ্ট বিবরণী লিখেছেন।

হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, রাধাকুমুদ বাবুর মতে, পরিশীলনে, তার সমগ্র দেশব্যাপী চিন্তা, ধর্ম্ম ও সমাজের সমন্বয়ে। দেশের মধ্যে প্রাদেশিক, জাতিগত, আনুষ্ঠানিক বৈষম্য থাকলেও সেগুলির সাথে মাটির ও প্রাণের যোগ থাকার জন্য ভারতীয় সমন্বয়, একছত্র সাম্রাজ্যশাসনের সময়ও, যান্ত্রিক সমতায় পরিণত হয় নি। সমন্বয়ের সাধারণ গুণ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও সংস্কৃত ভাষা। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, ও জাতি-বিভাগে অর্থনৈতিক বৃত্তি ক্ষুণ্ণ হয় নি। সংস্কৃত ভাষার আধিপত্যের অর্থই হল সমাজ-বন্ধন। গোষ্ঠী, গণ, পুগ, জাতি, গ্রাম্য-সভা, পৌর-সভা যেন হর, ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণের আধিপত্য যেন লব, দু'এর সমতায় হিন্দুসভ্যতা পূর্ণ সংখ্যা।

সহজেই এই ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু রাধাকুমুদ বাবুর বইখানি আদ্যোপান্ত পড়লে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাঁর তথ্য-সমাবেশ এতই সুচারু, এতই বাহুল্য ও ভাববর্জ্জিত যে তাঁর পদ্ধতিকে নিষ্ঠুর পর্য্যন্ত বলা যায়। কোন স্থানে তিনি নিজের মত খোলাখুলি প্রচার করেন নি। যেখানে ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেও সংযমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এক, দুই, তিন করে তাঁর বক্তব্য সাজান। তাঁর বাক্যে কোন মোহ নেই। গোপন মূলবাক্যে গলদ আছে কি না পণ্ডিতবর্গ বিচার করবেন। অ-কথিত বাক্যের ইঙ্গিত আছে নিশ্চয়, সেটি প্রথমে ধরা না পড়লেও পুস্তক পাঠের শেষে চক্রবৃদ্ধির হারে মনকে অভিভূত করে। সে জন্য রাধাকুমুদ বাবুকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না। দোষ পড়ে ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারের ওপর। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও আধুনিক পদ্ধতির মধ্যে রফা করতে গেলে এ-টুকু ঝোঁক থাকতে বাধ্য, নচেৎ ইতিহাস লেখা নিরর্থক।

রাধাকুমুদ বাবুর শ্রেষ্ঠ গুণ কিন্তু অন্যত্র—হিন্দুসভ্যতার এক একটি অংশের অখণ্ডতা বর্ণনায়। এটি হল ঐক্যের প্রস্থবিচার। আধুনিক অনেক ঐতিহাসিকের মতে এই পদ্ধতি পরিশীলন-বিচারের উপযোগী, সংস্কৃতি-বর্ণনার নয়। জীবতাত্ত্বিক যেমন কোন নমুনাকে আড়ভাবে কেটে তার গঠন-পদ্ধতি অণুবীক্ষণের সাহায্যে লক্ষ্য করেন, লেখক তেমনিই পর পর প্রাক্‌বৈদিক, বৈদিক, সংহিতা, পাণিনি প্রভৃতি যুগের যথাসম্ভব সর্ব্বাঙ্গীণ বিবরণ দিয়েছেন। পূর্ব্বে লিখেছি যে তাদের মধ্যে যোগসূত্র তিনি ধরিয়ে দেননি। কিন্তু যোগ যে আছে তাঁর বর্ণনায় প্রমাণিত হয়। সে যাই হোক, ভারতের পুরাতন ইতিহাসের এক একটি বিশেষ অবস্থার অমন সম্পূর্ণ বিবৃতি আমি অন্ততঃ অন্য কোন পুস্তকে পাইনি। ছাত্রবৃন্দ অবশ্য এ-বই পড়তে বাধ্য, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়কেও আমি পড়তে অনুরোধ করি। রাধাকুমুদ বাবু যে চমৎকার সাজাতে জানেন, এ-টুকু বলা আজ নিতান্ত অনাবশ্যক। তবু বলি তাঁর অন্যান্য বই-এর সঙ্গে যাঁদের

পরিচয় আছে তাঁরা পর্য্যন্ত এই বই পড়ে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন। হিন্দু বৈদগ্ধ্যের এমন নক্সা তিনিও পূর্ব্বে আঁকেন নি। আমি তাঁকে দ্বিতীয় সংস্করণে বই-এর দাম কমাতে ও মুখবন্ধটি অন্যভাবে লিখতে অনুরোধ করি।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

থাপছাড়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত ; বিশ্বভারতী প্রকাশিত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি—শ্রীজীবনানন্দ দাশ প্রণীত ; ডি, এম্ লাইব্রেরী প্রকাশিত।

থাপছাড়া কবিতার ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। বোধহয় ভূমিকাস্বরূপ এটুকু বলা যেতে পারে যে অর্থ ও বুদ্ধির সাবধানী আইন কানুনের বাইরে অনর্থ ও অসঙ্গতির মধ্যে মানুষের মন আরাম ও রসতৃপ্তি খুঁজে পায় ; থাপছাড়া তারই ওপর আসন বিছিয়েছে। বইটিকে শ্রীরাজশেখর বসুকে উৎসর্গ করে গ্রন্থকার লিখেছেন—

যদি দেখো কথা তার
কোন মানে যোদ্দার
হয়ত ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় ক্ষ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার দাও যদি ধিক্কার
সুধাব বিধির মুখ চারিটা কি কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে,
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে॥
নিশ্চিত জেনো তবে
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তার ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া॥

এ শ্রেণীর কবিতা লেখায় কবিবর যে সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর "কৌতুক" (মোহিত সেন সম্পাদিত) প্রভৃতি পূর্ব্বতন কবিতায়। থাপছাড়ার রসের সন্ধান তিনি তখনই পেয়েছিলেন যখন তিনি লিখেছিলেন—

সংসারেতে সংসারী ত ঢের,
কাজের হাটে অনেক আছে কেজো,

মেলাই আছে মস্ত বড় লোক ·
সঙ্গে তাদের অনেক সেজো মেজো,
থাকুন তাঁরা ভবের কাজে লেগে ;—
লাগুক মোরে সৃষ্টিছাড়া হাওয়া !
বুঝেছি ভাই কাজের মধ্যে কাজ
মাতাল হয়ে পাতাল পানে ধাওয়া !

বহুদিন পরে আবার তিনি খাপছাড়া কবিতাকে পুনর্জীবিত করলেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার রায়ের "আবোল তাবোল"-এর কথা মনে উদয় হয়—বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যে এ কবিতাগুলি চিরন্তন হয়ে আছে। সুকুমার রায়ের কবিতায় ছিল শব্দ ও বাক্যে অপরূপ বাদ্যধ্বনি কিন্তু ভাব ও বিষয় সম্পূর্ণ আজগুবি। রবীন্দ্রনাথের খাপছাড়ার ভাব দানা-বাঁধা, তার ওপর আছেছন্দ, ধ্বনি ও অনুপ্রাসের যাদুময় সমন্বয়। আশা করি খাপছাড়া নবীন কবিদের এই শ্রেণীর কবিতা লিখতে উৎসাহিত করবে। খাপছাড়ার প্রত্যেক কবিতার সঙ্গে কবিবরের অঙ্কিত একটি করে চিত্র আছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপির মধ্যে স্থানে স্থানে কাঁচা হাতের ছাপ চোখে পড়ে, সুন্দর ও সার্থক পংক্তির প্রাচুর্য্য থাকলেও সমগ্র কবিতা মাঝে মাঝে নিষ্প্রভ ও অস্পষ্ট মনে হয়। কতকগুলি ভাব, উপমা ও বাক্যের পুনঃ পুনঃ সমাবেশ কবিতাগুলির দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে, তথাপি এ বইয়ে এমন সৌন্দর্য্য-সাতন্ত্র্য ও কবিত্ব-বিকাশ আছে যা কবির অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরিচায়ক। অন্ততঃ বইটির কতকগুলি কবিতা জীবনানন্দের জন্যে আধুনিক কবিদের প্রথম শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ করবে।

আধুনিক কবিদের মধ্যে দুই শ্রেণীর কবি দেখা যায়। এক যাঁদের কবিপ্রতিভা তর্কাতীত কিন্তু যাঁরা বাংলা কবিতার চিরপ্রচলিত পন্থার অনুসরণকারী ; আর এক শ্রেণী আছেন যাঁরা বাংলা কবিতায় নূতন সৃষ্টির—নূতন অবদানের গৌরব-প্রার্থী। জীবনানন্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বাংলা কবিতায় যে নূতন অবদানের প্রচেষ্টা আরব্ধ হয়েছে একথা কাব্যামোদীর অবিদিত নেই এবং একথাও বলা বাহুল্য যে এটা বাংলা কাব্যের প্রাণেরই লক্ষণ, যদিও এই নূতন প্রচেষ্টার বাহ্যলক্ষণ বড় করে যা চোখে পড়ে তা হোল কূল ভাঙার লক্ষণ ও তাতে যথেষ্ট শঙ্কার কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণে বাংলা কবিতার কৌলীন্য অক্ষয় হয়েছে—তাঁর ছন্দ মিল অলঙ্কার উপমা কাব্যযোজনা এতই সর্ব্বময় যে সে প্রভাব ছিন্ন করতে পারে এমন শক্তিশালী কবির প্রাদুর্ভাব বিরল। শেষোক্ত শ্রেণীর আধুনিক কবিরাই শুধু এই কূল ভাঙার দুরূহ ব্রতে ব্রতী। অবশ্য তাঁদের বিদ্রোহই কাব্যসৃষ্টির একমাত্র উপায় নয়। মোহিতলালের লেখা পড়লে বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আবিষ্ট থেকে বাংলা কবিতাকে কি পরিমাণে মাধুর্য্যমণ্ডিত করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে বিষ্ণু দে-র কবিতা সে প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবার পথে অগ্রসর, যদিও তাঁর দুঃসাহসিকতা অনেককে অবাক করে।

জীবনানন্দের কবিতা হয়ত এই দুই সীমার মাঝামাঝি। তাতে বলাকা ও পূরবী-র ছন্দের প্রভাব খুঁজে পাওয়া যায়। তবু জীবনানন্দের মিল, অন্তর্মিল—তাঁর মিলের চাতুরী অতুলনীয়,—

বিষয়, উপমা, অনুপ্রাস সর্ব্বতোভাবে তাঁর নিজস্ব। তা ছাড়া তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, কবিতার একটা অশ্রুত সুর তাঁর স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করে। যখন পরিচয়ে তাঁর "ক্যাম্পে" কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল তখনই তাঁর কাব্য-প্রতিভা নিঃসন্দেহে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ক্যাম্পের রীতিতে কবিতা ধূসর পাণ্ডুলিপিতে আর নেই ; অন্য রীতির কবিতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অবসরের গান, ১৩৩৩, পিপাসার গান, পাখীরা, প্রেম, পরস্পর। জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য শব্দ স্পর্শ রং রূপ গন্ধের অনুভূতিমুখর বাণী। এগুলি ঠিক সোজাসুজি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি নয়— তিনি কল্পনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে অনুভূতিমুখর। এটুকু সত্যই বড় অভিনব ; তাঁর কবিতায় এ রকম অনুভূতি জীবন ও রূপ লাভ করে, বিশ্বময়ী প্রকৃতি, জীবন, মৃত্যু, কাল (eternity) সমস্তই তাঁর কাছে রক্তে-মাংসে জীবন্ত। এঁর লেখা থেকে কয়েকছত্র তুলে দিলে বোধহয় পরিচয়ের পাঠকদের অমার্জ্জনীয় হবে না—

কান দিয়ে শব্দ তার শুনে'
দাঁড়ায়েছিলেম গিয়ে মাঘরাতে, কিম্বা ফাল্গুনে।
* * *
জমানো ফেনার মত দেখা গেল তারে
নদীর কিনারে!
হাতীর দাঁতের গড়া মূর্ত্তির মতন
শুয়ে, আছে—শুয়ে আছে—শাদা হাতে ধবধবে স্তন
রেখেছে সে ঢেকে'!
বাকীটুকু,—থাক্—আহা, একজনে দেখে শুধু দেখে না অনেকে
(পরস্পর)

আহ্লাদের অবসাদে ভ'রে আসে আমার শরীর,
চারিদিকে ছায়া-রোদ-ক্ষুদ-কুঁড়া-কার্ত্তিকের ভিড় ;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!
(অবসরের গান)

জীবনানন্দের কাব্যে ভরসার বস্তু আছে, আশা করি আজ যার উন্মেষ দেখা যাচ্ছে ভবিষ্যতে তা ব্যর্থ হবে না। বইটির ছাপা অনিন্দনীয়, প্রচ্ছদপট রবীন্দ্রনাথের চিত্রের অনুকরণে রচিত, সুন্দর।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

পশ্চিম-যাত্রিকী—শ্রীমতী দুর্গাবতী ঘোষ প্রণীত (রঞ্জন পাবলিশিং হাউস)

আবিষ্কার-যাত্রী—শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রণীত (গোল্ডকুইন এণ্ড কোঃ লিঃ)

আজকাল ইয়োরোপের ভ্রমণকাহিনী পুস্তক আকারে অথবা মাসিক পত্রের পাতায় প্রায়ই দেখা যায়। যিনি কিছুমাত্র লিখতে পারেন, তিনি একবার ইয়োরোপে গেলে মাসিক পত্রের পাতা আক্রমণ না করে আর ছাড়েন না। এধরণের লেখবার উৎকট ব্যাধি ক্রমশই যেন অতি দ্রুতগতিতে প্রায় সকল পশ্চিম যাত্রীর মধ্যেই সংক্রামিত হচ্ছে। বলা বাহুল্য এঁদের প্রায়

লেখাতেই আনন্দের বস্তু এতই কম থাকে যে বেশীক্ষণ পড়বার ধৈর্য্য পাঠকের আর থাকে না। কিন্তু আলোচ্য ইয়োরোপের ভ্রমণকাহিনীটি যিনিই পড়বেন তিনিই আরাম পাবেন। বোম্বায়ের জাহাজ থেকে আরম্ভ করে সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পাঠকের মন লেখিকার সঙ্গে যেতে একেবারেই বাধবে না। অথচ এত বড় ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে কোথাও আড়ম্বর নেই, চেষ্টাকৃত পাণ্ডিত্যের বালাই নেই, সুক্ষ্ম বর্ণনার চাপে বইয়ের পাতা কোথাও এতটুকু ভারাক্রান্ত হয়নি, সাধারণ বাঙালী মনের অতি সহজ স্ফূর্তির সঙ্গে বইখানি লেখা হয়েছে। লেখিকার এই সংযম এবং ঝরঝরে ভাষা অনেকেরই ভাল লাগবে। একটা জিনিষ বিশেষ করে লক্ষ্য করলুম যে, পশ্চিমের ট্রামে বাসে টিউবের মধ্যেও লেখিকাকে ইংরেজ মহিলা বলে ভুল হয় না। একজন সাধারণ বাঙালী মহিলার অন্তঃকরণ ইয়োরোপীয় সভ্যতার তীব্র জাঁকজমকের ভেতরেও বিচলিত না হতে দেখে একটু আশ্চর্য্য ঠেকল। ছোটদের পক্ষেও বইটি খুবই ভাল হয়েছে। পাতায় পাতায় ছবি, পরিষ্কার ছাপা এবং সুন্দর প্রচ্ছদপটটি ছেলেমেয়েদের মন নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে।

"আবিষ্কার যাত্রী"র লেখক মহেন্দ্র বাবু লেখক সমাজে খুবই পরিচিত। এঁর বহু প্রবন্ধ, সমালোচনা নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিশোর সাহিত্যের ওপরও এঁর বিশেষ নজর আছে। কয়েক বছর আগে কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা "কিশলয়" নামে এঁর একখানা বই পড়েছিলাম। তখন লেখকের মন হয়ত তীব্র স্বদেশানুরাগে পুর্ণ ছিল, ফলে সে বইখানার স্থানে স্থানে বিদ্রোহের বাণী অনেকটা বারীন ঘোষ জাতীয় শোনাচ্ছিল। তবুও তাঁর উদ্দেশ্য খানিকটা নিশ্চয়ই সার্থক হয়েছে। কারণ অনেক তরুণ বন্ধুদের কাছে বইখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম। আলোচ্য পুস্তকখানি কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা হলেও একেবারে ভিন্ন টেকনিকে লেখা। অর্থাৎ পুরোনো স্বদেশী আমলের টেকনিক লেখক এবারে বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু বিদেশী আবিষ্কার যাত্রীর জীবনী সংগ্রহ করে বইখানা লেখা হলেও তরুণ মনের উপকার পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী বই কম হবে না। অন্ততঃ কাল্পনিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেয়ে সত্যিকারের জীবনোল্লাসের স্বাদ পাওয়া যে অনেক বেশী বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে বোধ হয় কারুর মতদ্বৈধ থাকবে না। লেখক তরুণ মনকে খুশী করবার জন্যে সব রকমের উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অথচ বইখানা নেহাৎ সস্তার গল্পের বইও হয়নি। আবিষ্কারকদের জীবনী লিখতে গিয়ে মহেন্দ্র বাবু ইতিহাস এবং ভূগোলকে এমন সাবধানে ব্যবহার করেছেন যাতে বইখানা অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের text book গোছের না হয়ে পড়ে। বইখানার মধ্যে অনেক ছবি, নকশা ইত্যাদি থাকার জন্য ছোটদের পড়াটা বেশ জমবে ভাল এবং শিক্ষার দিক থেকেও অনেক উপকার হবে।

শ্রীচঞ্চল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক ২৪।১এ, কলেজ স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪

পরিচয়

বাংলা ও হিন্দি গান

বহুদিন পূর্ব্বে 'পরিচয়ে' বাংলা ও হিন্দি গানের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলাম। তাতে পরস্পরের বৈশিষ্ট্য দেখানোরই ইচ্ছা ছিল, কে বড় কে ছোট প্রতিপন্ন করার কোনো স্পৃহা ছিল না। তারপর দিন অতীত হয়েছে; নানাবিধ সমস্যায় ও আলোচনায় বিষয়টি জটিল হয়ে পড়েছে। গায়ক গানের সঙ্গে নিবিড় ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে তারও কিছু বলবার আছে এবং এই প্রবন্ধ সেইজন্যে লেখা।

সাহিত্যিকের কাছে হিন্দি ও বাংলা গানের সমস্যা তাদের ভাষাগত বৈষম্য নিয়ে যতটা প্রবল হয়ে দেখা দেয়, সাঙ্গীতিকের কাছে ততটা গুরুত্বপূর্ণ হবার অবকাশ পায় না। কারণ সঙ্গীতে ভাষা সঙ্কীর্ণ কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, তার বাইরে যন্ত্রসঙ্গীতে হিন্দি ও বাংলার কোনো অর্থ হয় না। সঙ্গীতে কথার যদি কোনো বিশেষ মূল্য থাকত, তাহলে য়ুরোপীয় যন্ত্রসঙ্গীত তার বিরাট ঐশ্বর্য্য নিয়ে এত মহীয়ান হয়ে উঠতে পারত না। সেতার বা সরোদ বাজানোর সময় সাহিত্যিকের ক্ষোভ হতে পারে যন্ত্রসঙ্গীতে কথার কোনো স্থান নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যন্ত্রসঙ্গীতের সুনির্দ্দিষ্ট অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না।

বাংলা ও হিন্দি গানের আলোচনার পূর্ব্বে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। কৃষ্ণধন বাবুর 'গীতসূত্রসার' থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :—"রাগ রাগিণীযুক্ত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা বাঙ্গালীর জাতীয় গান নহে। উহা হিন্দুস্থানের আমদানী, সুতরাং উহা বাঙ্গালীর পক্ষে নূতন।·· বঙ্গদেশের জাতীয় গান কীর্ত্তন ও কবি ; পাঁচালী কবিরই প্রকার ভেদ। বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে

কীর্ত্তন ও কবির চর্চ্চা হইতেছে। পূর্ব্বে বাঙ্গালীর যে সকল জাতীয় গ্রাম্যসুর ছিল, তাহা লইয়াই প্রথম কীর্ত্তন ও কবির সৃষ্টি হয়। পরে ক্রমে বহু আলোচনা বশতঃ উহাতে বাহির হইতে নূতন নূতন সুর সন্নিবেশিত হইয়াছে। (৯১ পৃষ্ঠা)।

"ভারতে চারি প্রকার সঙ্গীত প্রধান :—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, বাঙ্গালা সঙ্গীত, মহারাষ্ট্রীয় সঙ্গীত এবং কর্ণাটী সঙ্গীত। এই কয় প্রকারের মধ্যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর ও উৎকৃষ্ট। ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম খণ্ডে পঞ্জাব হইতে পাটনা পর্য্যন্ত প্রদেশকে হিন্দুস্থান বলে। হিন্দুস্থান ভারতীয় সভ্যতার আদিস্থান; অতএব এইস্থানে বহুকাল হইতে সঙ্গীতের বহুবিধ চর্চ্চা হওয়াতেই, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সমধিক উন্নতি সাধন হইয়াছে। তানসেন, বৈজুবাওরা, গোপাল নায়ক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত গায়কগণের শিক্ষা হিন্দুস্থানেই হয়, এবং হিন্দুস্থানেই তাঁহারা কীর্ত্তিস্থাপন করেন। এইজন্য ভারতের সর্ব্বত্র হিন্দুস্থানী ওস্তাদের আদর অধিক; এবং হিন্দুস্থানী ওস্তাদের নিকটে সকলে গান শিখিতে পছন্দ করেন। ইদানীন্তন বঙ্গদেশে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহাতিশয় হইয়াছে" (উপক্রমনিকা)।

বাংলা দেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কীর্ত্তন ছেড়ে দিয়ে বাকি যা ছিল তাকে গ্রাম্য-গীত বলা চলে। সুতরাং এককালে পশ্চিম ভারতীয় উন্নত হিন্দুস্থানী সঙ্গীত নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন বাংলা দেশে আরবী ফারসী পড়ার চল্ ছিল, তখন থেকেই কালোয়াতী গানের চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। এর প্রধান কারণ পশ্চিম ভারতে দীর্ঘকাল বিশেষজ্ঞের হাতে সঙ্গীতের চর্চ্চা ন্যস্ত থাকায় তার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল এবং বাঙ্গালীর দৃষ্টি তার দিকে সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল। এককালে কলিকাতা যে নিষ্ঠাপূর্ণ চর্চ্চার ফলে হিন্দুস্থানী গানের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াবে না এমন কোনো কথা নেই।

যাহোক ক্রমে বাঙ্গালীর কাছে দুটি সঙ্গীতের কথার উচ্চারণের বিভিন্নতা ধরা পড়ে। কৃষ্ণধন বাবু লিখছেন "বঙ্গভাষার অকার যে রূপে উচ্চারিত হয়, তাঁহাতে মুখ ও কণ্ঠ যথেষ্ট প্রসারিত না হওয়াতে, স্বরোচ্চারণ তত পরিষ্কার ও সুললিত হয় না। এই জন্যই, যাঁহারা হিন্দুস্থান হইতে হিন্দী গান উত্তমরূপে অভ্যাস করিয়া আইসেন, তাঁহারা বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষার গান হিন্দীর ন্যায় মিষ্টি হয় না। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। বাঙ্গলার স্বর সকল বোজা; হিন্দী স্বর সকল খোলা। বিশেষ বাঙ্গালা ভাষার লঘু গুরুর বিচার না থাকাতে

উহা অস্থিশূন্য হইয়া নিতান্ত নিস্তেজ ও একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে ; এবং অন্যান্য অভাব প্রযুক্ত হিন্দীর ন্যায় বঙ্গভাষার উচ্চারণে বিচিত্রতা নাই। এই হেতু উহা সঙ্গীত কার্য্যে হিন্দীর ন্যায় বিচিত্রতা উৎপাদনে অক্ষম" (৯০ পৃষ্ঠা)।

হিন্দি স্বরবর্ণের উচ্চারণ অন্য কারণেও যে বিভিন্ন, তার অন্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। "হিন্দুস্থানী ও বাংলা সঙ্গীতে স্বরবর্ণের প্রয়োগে তারতম্য আছে। স্বরবর্ণের সাঙ্গীতিক মূল্য খুব বেশী, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের মত তারা কণ্ঠ দিয়ে আসবার সময় জিহ্বা, তালু ইত্যাদি দ্বারা ব্যহত হয় না এবং তারা মুখে দুটি স্বরকক্ষের সৃষ্টি করে। স্বরকক্ষগুলিতে কণ্ঠের স্বর ছাড়া অন্য স্বরের অনুরণণ হয় এবং ঠোঁট গোলাকার ক'রে গালে অল্প জোরে আঘাত করলেই সহজেই সে অনুরণণ শোনা যায়। এই কারণে স্বরবর্ণের ব্যবহারে গানে খানিকটা অভিনবত্ব আসে। হিন্দুস্থানী গানে স্বরবর্ণগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রত্যেক ভাগই 'আ'তে গিয়ে শেষ হয়—

ই (মোরি)	উ (ঝুম)
এ (কহে)	অ (যব, ইংরাজীর cup-এর u-এর ন্যায়)
আ (যাবো)	আ—

'ই'-তে ওষ্ঠ দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হয়ে প্রায় মিলিত হয় এবং 'এ'-হয়ে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই গোলাকার হয়। 'উ'-তে মুখ ক্ষুদ্র গোলাকার হয় এবং 'অ'-হয়ে 'আ'-তে যাবার পথে ক্রমেই বিস্তারিত হতে থাকে। হিন্দুস্থানী গানে স্বরবর্ণের উচ্চারণ বাংলার মত স্থির থাকে না, একের থেকে অন্যতে যেতে চেষ্টা করে, যে কথা 'উ'-তে আরম্ভ হ'ল, সে 'উ' ছাড়িয়ে 'ও'-তে যেতে চায়। বাংলাতে স্বরবর্ণ প্রায় খাড়াখাড়া থাকে। হিন্দি 'মোসে' ও বাংলা 'মোর' কথাটি গানে পাশাপাশি ব্যবহার করলে অর্থ পরিস্ফুট হবে। মুসলমান গাইয়েরা বিশেষ ক'রে স্বরবর্ণের বৈচিত্র্য দেখান। বাংলা গানে স্বরবর্ণের অচল অবস্থা গায়কের কল্যাণে সামান্য সচল হয়েছে—গানে খানিকটা হয়ই। কিন্তু ঠিক হিন্দুস্থানী কথার মোচড় তাতে দিতে গেলে, নমনীয়তার বদলে বিকৃতিরই সম্ভাবনা" (পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৩৮)।

কৃষ্ণধন বাবুর মনে ধ্রুপদ খেয়াল বাংলা ভাষায় রচিত হতে পারে এই রকম একটা আশ্বাস ছিল বলে বোধ হয়, কিন্তু তখন তাঁর বাংলা কথার এই অভাবগুলির

কথা স্মরণ ছিল না। কিন্তু সর্ব্বদাই তিনি ভবিষ্যতের ভরসাই করে গিয়েছেন এবং তাঁর সমসাময়িক লোকদের রাগরাগিণী শিক্ষার জন্য হিন্দি গান শেখার পরামর্শ দিয়ে গিয়েছেন। তিনি লিখছেন "খেয়াল ও ধ্রুপদীয় সুরে, ঈশ্বর বিষয়ক ব্যতীত, অন্যান্য উত্তম বিষয়ক বাঙ্গলা গান নাই বলিলেই হয়; এই একটা আমাদের বৃহৎ অভাব রহিয়াছে। এইজন্য এত দিনেও খেয়াল ধ্রুপদ বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত হইতে পারে নাই। অতএব আমাদের বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালী কালাবঁৎ, উভয়ে একত্র হইয়া ঐ সকল সুরে সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য নানা বিষয়ে উত্তমোত্তম বাঙ্গলা গীত রচনা করা উচিত" (৯১ পৃষ্ঠা)।

"যে সকল গান দেওয়া হইয়াছে, তাহারা তানসেন, সুরদাস, সদারঙ্গ, শোরী প্রতি জগৎপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ওস্তাদদিগের রচনা হইতে নির্ব্বাচিত; অতএব উহাদের প্রত্যেক গানই এক একটি রত্ন। ঐ সকল গানের কথা প্রায়শঃই হিন্দী। অনেকের হিন্দী গান অভ্যাস করিবার প্রবৃত্তি নাও হইতে পারে। কিন্তু রাগ-রাগিণী বিশুদ্ধ শিক্ষা করিতে হইলে হিন্দী গান ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। বাঙ্গালা ভাষায় ঐ প্রকার বিশুদ্ধ রাগরাগিণী যুক্ত ধ্রুপদ খেয়াল এখনও প্রস্তুত হয় নাই। যাহা দুই একটি পাওয়া যায় তাহা উহাদেরই নকল। কিন্তু আসল থাকিতে নকল কেন? যাঁহার রাগরাগিণী শিক্ষা করিতে ইচ্ছা না থাকিবে, তাঁহার হিন্দী গানের প্রয়োজন নাই" (দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকা)।

বাংলা কথা দিয়ে যে হিন্দুস্থানী গান হতে পারে না তার এর চেয়েও গুরু-তর কারণ আছে। হিন্দুস্থানী গানে কথার উচ্চারণের বিকৃতি ঘটে। কৃষ্ণধন বাবু লিখছেন "হিন্দুস্থানী ওস্তাদেরা যথা রসানুসারে গান গাওয়া দূরে থাক, তাঁহারা কথা সকলও পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ রূপে উচ্চারণ করেন না। কোন শব্দের উচ্চারণ দোষ ধরিয়া দিলেও, তাঁহারা এরূপ তর্ক করেন যে ভুল উচ্চারণ ব্যতীত সুরের 'লজ্জৎ' হয় না।...যাত্রার বালকেরা সুস্পষ্টরূপ গানের কথা উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হয় না" (১০৩) পৃষ্ঠা)। এইখানে আমার মনে হয় কৃষ্ণধন বাবুর গাইয়ে-দের কথায় আর একটু মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। বিষয়টা গাইয়েদের অমনোযোগী ও মূর্খ বলে উড়িয়ে দেবার মত সহজ নয়। বৈদিক সঙ্গীতে এর নজির পাওয়া যায়। প্রত্যেক সামের কয়েকটি (একটি থেকে তিন চারটি) সাঙ্গীতিক সংস্করণ আছে। গানেতে কথার অক্ষরগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়ে,

অকারণ দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে অবোধ্য হয়ে পড়ে কিন্তু সামগরা এই অবোধ্য সংস্করণগুলি সযত্নে রক্ষা করেন। সায়ণ তাঁর সামবেদভাষ্যে সামগানে এগুলি যে প্রয়োজনীয়, তা শবরস্বামীর উক্তির সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন। য়ুরোপীয় সঙ্গীতে আমাদের রাগসঙ্গীতের মতন তোম, তা, না, দেরে, দানি ইত্যাদি অর্থহীন শব্দ দিয়ে আলাপ গান করার রীতি নেই, কিন্তু সেখানেও এই বিকৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়— "It is even possible to attend a London concert where all the performers are in the first rank without having understood the meaning of a single song on the programme"—Gordon Heller—Voice in Song and Speech p. 190। হিন্দুস্থানী গানে, যাত্রায়, বৈদিক সঙ্গীতে, য়ুরোপীয় গানে যখন শব্দ-বিকৃতির প্রবণতা দেখা যায় তখন তার একটা কারণ থাকাই সম্ভব মনে হয়। সঙ্গীতে কথার কথাত্বই যদি না থাকে, তার পূর্ব্বে হিন্দি ও বাংলাকে বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করার কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ দেখি না।

এর থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে শব্দের উচ্চারণ-ভঙ্গির বিভিন্নতায় কিছু অর্থ প্রকাশের সম্ভাবনা থাকতে পারে। সঙ্গীতে ত হয়ই, ভাষাতেও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। "হরি!" এই কথাটি একটি নামবাচক বিশেষ্য কিন্তু উচ্চারণ-ভঙ্গির বিভিন্নতায় তার মানে হতে পারে (১) হরি, আমি তোমায় কত ভালবাসি! (২) তুমি কি করে এ কাজ করলে? (৩) তোমায় দেখে বড় খুসী হোলাম (৪) হরির কথা বলছ! আমি ভেবেছিলাম রাম—ইত্যাদি (Jespersen—Philosophy of Grammar p. 307)। 'হরি' এই একক কথার মধ্যে এসব অর্থ প্রকাশের সুদূর সম্ভাবনাও থাকত না, যদি না সুর তার সহায়তা করত। ভাষায় আবেগ-প্রসূত বিস্ময়, ক্রোধ, আনন্দ, দুঃখসূচক অব্যয় পদগুলির (interjections) প্রকৃতি সাঙ্গীতিক কথার সহধর্ম্মী। সঙ্গীতের মুখ্য কাজ হচ্ছে সুর দিয়ে কিছু প্রকাশ করা। কথা না থাকলে তা অনেকটা দাঁড়ায় হেঁয়ালির মত, কিন্তু এই অনির্দ্দিষ্ট আবেগ দিয়ে মানুষকে এত অভিভূত করা যেতে পারে যে অন্য যে কোনো চারুকলার আবেদন তার কাছে অনুভূতির প্রবলতার দিক থেকে তুচ্ছ হয়ে দাঁড়ায়।*

* কথা ও সুর ঠিক এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত না হওয়াতে এর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়; আমার বই Words and the Melodyতে সবদিক দিয়ে বিষয়টি আলোচিত হবে।

হিন্দি গানের বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ যে গানের কথাগুলি অতি তুচ্ছ এবং একথা অস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন নেই। হিন্দিতে ভাল কথার গান নেই তা নয়, কিন্তু তুচ্ছ কথার অংশও যথেষ্ট। কিন্তু অনেক নতুন গান তৈরি হচ্ছে এবং এ বিষয়ে গায়করা যে অনবহিত তা বলা যায় না। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শ্রীকৃষ্ণ কিছু হিন্দি গান (লক্ষণ গীত ছাড়া) তৈরি করেছেন, সেগুলি গায়করা গেয়েও থাকেন। সেদিন বোম্বাইয়ের একজন খ্যাতনামা গায়ক তাঁর রচিত গান আমায় দেখিয়েছিলেন। তবে হিন্দি গান তৈরী করার সময় কথার সঙ্গে সুরের যেন সামঞ্জস্য থাকে এর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন এবং নিজে গায়ক না হলে তা সম্ভব হয় না। যেখানে কথার কোনো মূল্য নেই, সেখানে গানে কবিত্ব বাধা হয়েই দাঁড়ায়। কারণ সুন্দর কথার গান বিকৃত করে গাইতে স্বভাবতই মায়া হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একজন হিন্দি কবি আমাকে একটি বই পাঠান, তাতে দেখি কয়েকটি প্রসিদ্ধ গানের উন্নত ও আধুনিক সংস্করণ রয়েছে। একটি উদাহরণ দিই।

রাগ কেদার এক তাল

(চাল—তুম সুধর চতুর বৈয়াঁ।)

অয়ি ভুবন বিদিত বালে, গুণ গরিমা তেরী
গা কর ন পার পাতী প্রতিভা মুগ্ধ মেরী
জিসকো দিবা-রাত্রি সরিত স্রোত সুমধুর গান করেঁ
আহ্বান করেঁ, মেরে মন কো, নভ মে তারকনাথ
আরতি লে সঙ্গে খড়ে, দিখলাব বহ মধুরিমা
জী কো ভাবে। অয়ি ভুবন বিদিত বালে॥

গানটি খুব সংক্ষেপে বলতে গেলে খেয়ালে একেবারে অগেয় এবং আমি তাঁকে বাঙ্গালী হয়েও হিন্দি গান রচনায় নিরস্ত হতে বলি। কোন্ কোন্ কথা বদলানোর দরকার তার একটি তালিকাও পাঠিয়েছিলাম। আমার মনে হয়, ওস্তাদদের কথা না শুনলেও তিনি আমার কথা শুনেছিলেন।

কিন্তু বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ যখন হিন্দি গানের তুচ্ছতাকে ত্রুটিস্বরূপ

এ প্রসঙ্গে দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের সুবিখ্যাত দীর্ঘ প্রবন্ধ The Origin and Function of Music'এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

বিবেচনা করেন তখন হিন্দি গানের একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। যখন হিন্দি গানে খাটপালঙ্কের প্রতি আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয় এবং কম্বল কিনে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় তখন আমরা ভুলে যাই যে এগুলি পশ্চিমের গ্রামগীতি এবং সচ্ছল নাগরিক সভ্যতার প্রতিচ্ছবি নয়। পশ্চিমে ওস্তাদেরা প্রায়ই গ্রামগীতি নিয়ে ঘসে মেজে সেগুলির কথার কোনো পরিবর্ত্তন না করে রাগসঙ্গীতে পরিণত করেন, কারণ তাঁরা নিজেরা অনেকেই গ্রামবাসী। লক্ষ্ণৌতে একই তুচ্ছ গান বাজারের ফলওয়ালী ও বড় খেয়ালীকে গাইতে শুনেছি। এ গানগুলির উৎস গ্রাম্য জীবনের নিতান্ত অনাড়ম্বর এবং আমাদের দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ জীবন-যাত্রায় নিহিত রয়েছে*। কিন্তু এ নিয়ে আক্ষেপের কোনো প্রয়োজন দেখি না, কারণ সমস্ত পৃথিবীর পল্লীগীতি এমনি সাধারণ ও তুচ্ছ কথায় পরিপূর্ণ।

কথা উঠতে পারে বাংলা কথা দিয়ে এ অভাব পূরণ করা যায় কিনা। বাংলা কথার উচ্চারণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হয়েছে। এ ছাড়া অন্য সমস্যাও আছে। হিন্দি গান গত চার পাঁচ শ বছর ব্রজভাষার আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে এবং সঙ্গীতের দিক থেকে কথাগুলি যে অত্যন্ত সুললিত তা মারাঠী, গুজরাটী বা বাঙ্গালী উচ্চ সঙ্গীতের গায়করা কেউ অস্বীকার করেন না। গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে ও বাংলায় সর্ব্বত্রই মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চসঙ্গীতের চর্চ্চার প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছে কিন্তু কোনো ভাষাই এ পর্য্যন্ত হিন্দি ভাষার স্থান অধিকার করতে পারেনি। এর কারণ হিন্দি কথার সঙ্গে হিন্দি সুরের ঢং অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'ননদিয়া'র জায়গায় 'ননদিনী' এবং 'সামলিয়া'র স্থানে 'শ্যাম' ব্যবহার করলে হিন্দিগানের আবেষ্টন ভেঙ্গে গিয়ে কীর্ত্তনের কথাই মনে হবে। হিন্দি খেয়াল ধ্রুপদ ঠুংরির রস বাংলা গানে পরিবেশন করা সম্ভব নয়। বাংলা কথা কোনোদিন যদি হিন্দির মত নমনীয় ও বিকৃতির দিক দিয়ে সহনীয় হয় তবেই এটা সম্ভব হবে, কিন্তু তখন সেই কতকগুলি ধ্বনিসমষ্টিতে বাংলা ভাষাত্ব আরোপ করার সুযোগ কোনো সাহিত্যিকেরই থাকবেনা, সে দাঁড়াবে একটি সাঙ্গীতিক বাংলা ভাষা। কিন্তু ততদিনের কথা ছেড়ে দিলেও বর্ত্তমান বাংলা গানে যে সৌন্দর্য্য নেই একথা কেউ বলবেন না। কথার সম্ভ্রম রেখে সুরের পরিমিত বিস্তারের যথেষ্ট দাম আছে ও বর্ত্তমান বাংলা গান এবিষয়ে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

* পশ্চিমের গ্রাম্যজীবনের পরিচয় শ্রীরামনরেশ ত্রিপাঠীর 'গ্রামগীতি'র ভূমিকায় ও গানগুলিতে পাওয়া যাবে।

কিন্তু সে শ্রীবৃদ্ধির পনরো আনার জন্য আধুনিক বাংলা গান হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের নিকট ঋণী। বাংলা গানের সমপ্রকৃতি পশ্চিমের ভজন সঙ্গীতে এবং কিছু পরিমাণে গজলে কথার দিকে দৃষ্টি রাখা হয়। বাংলা দেশে যদি কোনো দিন হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের চর্চ্চা কমে যায় তবে শুধু বাংলা গানই যে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এমন নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সঙ্গীতশিক্ষা প্রায় লুপ্ত হবে, কারণ ভারতীয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান হিন্দুস্থানী গানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। বর্ত্তমান কালে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলতে সমগ্র উত্তর ভারতীয় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তর বিভাগীয় সঙ্গীত বোঝায়।

সুতরাং হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতের গায়কেরা বাংলা গানে যদি হিন্দুস্থানী গানের রস না পেয়ে বাংলা গানের নিজস্ব সৌন্দর্য্য অনুভব করেন তাতে এমন কিছু একটা মহাপাতক হয় না। এখন বিশেষজ্ঞের যুগ, যাঁর যা ভাল লাগে তিনি তাতে পারদর্শিতা লাভ করুন। হিন্দুস্থানীর কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, বাংলা গানের সকল শাখা প্রশাখার সঙ্গে ক'টি গায়কের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে? পেশাদার কীর্ত্তন গায়কের মত কীর্ত্তন গাওয়া কোনো আধুনিক বাংলা গানের অন্য ঢংএ অভ্যস্ত গায়কের পক্ষে কি সম্ভব? তাই বলে কি এটা প্রমাণিত হবে যে কীর্ত্তন গায়ক এবং আধুনিক বাংলা গানের গায়ক পরস্পরকে হীন চক্ষে দেখেন?

তারপর একটি কথা বারবার কাগজপত্রে দেখতে পাই যে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মৃতপ্রায়। এই হাস্যকর কথার প্রতিবাদ যুক্তি দিয়ে কয়েকবার করেছি, বারান্তরে বিস্তারিত ভাবে লিখবার ইচ্ছা রইল।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

আবর্ত্ত

১০

সকালে অক্ষয় সুজনের বিছানায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। সুজন মুখ বুজে শুনে গেল। গল্পের বিষয় একজন নামজাদা শিক্ষিত সাধুর পতন। অক্ষয়ের মজা করে তারিয়ে তারিয়ে বলার ভঙ্গীতে সুজনের হাসি পাচ্ছিল। খগেন বাবুর সঙ্গে কাল দেখা হয়নি, অনেক রাত পর্য্যন্ত বাইরে ছিলেন। সকালে দেখা করতে যাবার কথা না লিখে এলেই হত। সুজন একবার উঠতে গেল, কিন্তু অক্ষয় টেনে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, 'কতদিন একত্র খাওয়া দাওয়া হয় নি, আজ ছুটি, সেই বিকেলে একবার আমার ঘুরে এলেই চলবে।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সুজন খগেন বাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। মোড়ের মাথায় তেষ্টা পেল। সামনেই একটা সরবতের দোকান। পূর্ব্ববঙ্গীয় একটি যুবক এক গেলাস আঙ্গুরের সরবৎ দিলে। বসবার ঘরের কোণে পর্দ্দা টাঙ্গানো, তার আড়ালে সরবৎ তৈরী হয়। পূর্ব্বে দোকানটা ডিস্‌পেন্‌সারি ছিল নিশ্চয়। ভেতর থেকে চাপা গলার আওয়াজ এল। পর্দ্দার তলা দিয়ে গোড়ালি তোলা মেয়েলী জুতা দেখা যাচ্ছিল। সুজন চোখ ফিরিয়ে নিলে, ফিস্ ফিস্ কথা শুনবে না মনঃস্থ করলে। সন্দেহ হল যেন গোপন পরামর্শ চলছে, তাকে বাদ দিয়ে। টাকার চেঞ্জ নিয়ে কান চোখ বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে এল। খগেন বাবুর কাছে গিয়ে কি হবে! মাসীমার বাড়ি গেলে হয়।

মাসীমা বিশ্রাম করছেন। সুজন পা টিপে ঘরে ঢোকে। মাসীমার চোখ বোজা, কিন্তু তারা ছুটির একটুখানি দেখা যায়, সাদা অংশটাই বেশী; ঠিক সাদা নয়, ঘোলাটে। যেন শিবনেত্র, সমাধির নয়, মৃত্যুর। হাতের চামড়া লোল, কনুই-এর কাছে অত্যন্ত কোঁচকানো, হাজার কেঁচোর গাঁদি লেগেছে। গোড়ালি ফাটা, মুখ ফাটেনি, গালের হাড় দেখা যায় না, এখনও কচি। শোনের নুড়ির মতন সাদা চুল, কিন্তু একটি গোছার ডগা এখনও কোঁকড়ানো। পাশ ফেরবার সময় মাসীমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসে এক গেলাস জল খেলেন।

'কখন এলে বাবা? ডাক নি কেন? তেষ্টা পায় নি? এত রোদ্দুরে কি বেরোতে আছে?'

'আপনি একটু জিরুচ্ছিলেন, তাই আর বিরক্তি করিনি।'

'খগেন কোথায়?'

'আমার সঙ্গে আসেন নি। নিশ্চয়ই বাড়িতে।'

'মিছরীর সরবৎ করে দেব?'

'না। মাসীমা আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। আপনাদের ছেলে-বেলার কথা শুনতে বড় ইচ্ছে হয়। কখনও কারুর কাছে শুনিনি। আমার মাসীমাও ছিল না।'

মাসীমা সুজনের 'না' বোধ হয় শুনতে পান নি, মিছরীপানা ঢালাউবুড় করে দিলেন, সুজন এক চুমুকে খেয়ে ফেল্লে।

'মাসীমা, আপনার ক'বছরে বিয়ে হয়?'

'ন-দশ বছরে।'

'বিয়ের ব্যাপার মনে আছে? বলুন না, মাসীমা।'

'একটু একটু মনে পড়ে। ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলে···পাড়ার মেয়েরা জল সইতে গেল, আমারও যেতে ইচ্ছে করছিল, নিয়ে গেল না। উপোস করে ক্ষিধে পাচ্ছিল, ঠাকুমা বল্লেন, খেতে নেই। আমাদের সময় রোসন-চৌকী বাজত। বেশ লাগছিল। সন্ধ্যাবেলাতেই শাঁখ বেজে উঠল, পাড়ার মেয়েরা দোতালার বারাণ্ডায় ছুটে গেল···বর আসছে, বর আসছে, রব উঠল, আমারও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু পা ভারী ঠেকল। তারপর মনে নেই···ভারি ঘুম এল··· ভোর রাতে লগ্ন ছিল।'

'শুভদৃষ্টি মনে পড়ে?'

'একটু একটু।'

'মাসীমা, তুমিই বলি, কেমন? তোমাদের মধ্যে, পরে, ঝগড়া হত না?'

'হত বৈকি! তবে, বোম ভোলানাথ মানুষ, বেশীক্ষণ রাগ রাখতে পারতেন না, আমিই মরতাম গুম্‌রে গুম্‌রে।'

'আচ্ছা, মাসীমা, কিছু মনে কোরো না, তুমি হিংসে করতে না?'

'হিংসে সকলেই করে।'

'তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি ছিল ?'

'সবই ছিল। আমি আদরের বৌ ছিলাম।'

'তোমরা স্বামী ছাড়া আর কাউকে জানতে না, নয় ?'

'জানব না কেন ? আত্মীয় স্বজন সকলকেই জানতাম।'

'স্বামীকে নিয়ে পৃথক সংসার পাততে চাইতে না ?'

'চাইবার সময় পেলে কি করতাম বলা যায় না। তখন বোধ হয় আমরা ও-রকম সুখ চাইতাম না।'

'তোমরাই ছিলে ভাল। খগেন বাবুকে তুমিই মানুষ করেছ শুনি, তুমিই নাকি তাঁর বিয়ে দাও, তারপর কি করে ছেড়ে কাশী এলে ভেবে অবাক্ হই।'

'আমারও ত' ধর্ম্মকর্ম্ম আছে, না, পরের সংসারে চিরকাল থাকব, বাবা ?'

'খগেন বাবুকে মানুষ করলে, আর সে হল পর !'

'বড় হলে, বিয়ে দিলেই ভাবতে হয় পর। শক্ত জানি, কিন্তু পরকালের চিন্তা আমার হয়ে কে করবে ?'

'আমাদের ও-সব বালাই নেই, তাই বোধহয় ছেড়ে দেওয়ায় আমাদের অত কষ্ট ! কষ্ট নয়, মাসীমা ? তোমার অবশ্য খগেন বাবুর ওপর ভালবাসা কমে নি, নিশ্চয়ই নয়, নচেৎ, অত উদ্বিগ্ন হও কেন ? আমি বুঝতে পারি।'

'তাই কখনও কমে ! খাদটাই কমে, সোনাটাই বাড়ে।'

'আমি জানি না কিনা তাই জিজ্ঞাসা করছি। নিশ্চয়ই কমানো যায়। কি ভাবে যায় ঠিক বলা যায় না। এমন যদি হয়, সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হল শরীরটা বেশ হাল্‌কা হাল্‌কা—বেশ হত তা হলে।'

'রোজ দেখছ, রোজ রোজ সেবাযত্ন, মেলামেশা করছ, শেকল পড়ছে। অভ্যাস চলে যাক, শেকলে মরচে পড়বে, তার জোরও কমবে।'

'কিন্তু মরচে পড়লে বড় ভারী ঠেকে। অন্য উপায় আছে নিশ্চয়। নেই মাসীমা ? জান না ?'

'কি করে জানব বল। লেখাপড়া শিখিনি, কেউ শেখায় নি, শিখতেও চাই নি। তবে মনে হয়, কেবল ভেসে বেড়ালেই মায়া কাটানো যায় না, বরঞ্চ বাড়ে, যত শেওলা এসে জোটে। জোর করে কাটাতে হয়।'

'জোর চলে কি ? ভাসাটাই সহজ। সকলেই তাই সহজ উপায় নিতে চায়।

কে আর অত ভাবে বল! তোমরাও ভাস মাসীমা, সংস্কারের স্রোতে। যেটা সহজ সেটাই ভাল।'

'কোনটা ভাল কোনটা মন্দ কে জানে বল! তবে গোটাকয়েক অভ্যাস গুরুজনেরা ভাল বলে এসেছেন, তাই তাদের বিচার না করেই ভাল বলি। তেমনই লোকে বলে খারাপ অভ্যাস, আমরাও বলে থাকি।'

'মাসীমা, বিধবাদের বিয়ে দেওয়া উচিত?'

'আমার মুখ থেকে শুনে কি হবে!'

'তবু, বলই না!'

'ছোট্ট বেলা বিধবা হলে বড় যন্ত্রণা। যদি না পারে থাকতে কেউ তবে সে বিয়ে করুক। বিদ্যাসাগর মশাই-এর তাই মত ছিল।'

'না পারলেই যদি স্বাধীনতা পাবার অধিকারী হয় তবে যারা স্বামীর ঘর করতে পারে না, তারাও স্বামী ত্যাগ করুক! তার পর যা হয় হোক!'

'স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কোথায় আসবে? বাপের বাড়ি?'

'যাদের তিন কূলে কেউ নেই?'

'তারা যেন ঝগড়া না করে।'

'স্বামী যদি যন্ত্রণা দেয়?'

'মেয়ে মানুষ কি করে খাবে?'

'যদি ধর রোজগার করতে জানে?'

'রোজগার করুক—কিন্তু······'

'কিন্তু কেন মাসীমা?

'সে মেয়ে আজ না হয় কাল বিয়ে করবেই। যে একবার স্বাদ পেয়েছে...'

'বাঘের মতন! ঠিক বলেছ মাসীমা। অথচ, অশিক্ষিতা মেয়েদের বেলা অমত করছ।'

'তাদের কাছে বিয়েটা মানুষের গা চাটা নয়, রক্ত খাওয়াও নয়।'

'মাসীমা, তুমি আজকালকার শিক্ষিতা মেয়েদের জান না।'

'না বাবা, মেমসাহেবদের চিনি না। মুকুন্দ যাকে মেমসায়েব বলে সে মেয়েটি কে?'

'তিনি? খগেন বাবুর বন্ধু।'

'সেদিন বল্লে, বৌমার আলাপী ?'

'সেই থেকেই খগেন বাবুর সঙ্গে মেলামেশা ।'

'বৌমা মারা গেল কি ওঁরই জন্যে ?'

'না, না, মাসীমা, ও-সব ভুল । অবশ্য, আমি কিছুই জানি না ।'

'তার স্বভাবে ছিল হিংসে···যেমন সকলের থাকে···। উনি কাশী এলেন কেন ? স্বামী কোথায় ?'

'আমি সঠিক জানি না । তবে, শুনেছি, লোকটি সুবিধের নয় ।'

'মার-ধোর করে ? অসচ্চরিত্র ?'

'আমি জানি না ।'

'সেদিন বল্লে তোমার আত্মীয় । ঝগড়া করে এসেছেন বুঝি ? ওঁরই কথা বলছিলে এতক্ষণ ?'

'ধরুন, ওঁরই কথা । ওঁর এখন কি করা উচিত ?'

'ওঁর কাশী থেকে চলে যাওয়া উচিত । অন্য জায়গায় মাষ্টারী করুন গে, অনেকেই অমন করছেন ।'

'টাকার অভাব নেই ।'

'তবে পয়সা নিয়ে ঝগড়া ? নিজে বড়লোকের মেয়ে আর স্বামী বুঝি গরীব ?'

'অতশত জানি না । টাকার দরকার নেই শুনেছি ।'

'ছেলেপুলে নিশ্চয়ই নেই, থাকলে ভদ্রঘরের মেয়েরা চলে আসতে পারে না । একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে, নইলে কপালে অশেষ দুঃখ আছে ।'

'মাসীমা উনি খুব ভাল মেয়ে ।'

'যতই ভাল হন, দুঃখ আছে কপালে । ভালদেরও অব্যাহতি নেই ।'

'আমারও তাই সন্দেহ হয় । দু'জনেরই কপালে দুঃখ ।'

'দুজন কে ? খগেন ?'

'মাসীমা, আপনি কী বলছেন !'

'আমি ভুল বুঝেছি কি ?'

'খগেন বাবুকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন । আমি সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করছিলাম ।'

সুজন উঠে পড়ল । মাসীমার চিবুক ঝুলল, এবার হাড় দেখা যায়, চোখের

জ্যোতি মলিন হয়, অস্বচ্ছ ঘোলাটে আবরণ জীবনের সকল চিহ্নকে এক মুহূর্ত্তে লুপ্ত করে। শীর্ণ, লোলচর্ম্ম হাত দুটি কোলের ওপর ন্যস্ত, একটি সিবীল্, পাথর নয়, হাড় নয়, বহু পুরানো কাঠ, মাটির মধ্যে থেকেও ঠাট বজায় রেখেছে, সাবধানে ছেঁায়া চাই, নচেৎ ধূলিসাৎ হবে·· চোখের পাতা নড়ল তখন বিশ্বাস হয় এ মূর্ত্তি গুঁড়ো হয়ে যাবে না অত সহজে।

সুজন খগেন বাবুকে এবারও বাড়ি পেল না। পাবে না যেন প্রত্যাশা করেছিল। তবু কেন বিরক্তি আসে? মুকুন্দ হাত নেড়ে বল্লে, 'কোথায় আর যাবেন! দেখুন গে মেমসায়েবের বাড়ি।' মুকুন্দর মন্তব্য শুনে সুজন অপ্রস্তুত হল, কিন্তু মুকুন্দর ভঙ্গীতে তার অপরাধ সম্বন্ধে সজ্ঞানতার কোনো চিহ্ন নেই। শান্তকণ্ঠে সুজন বল্লে, 'মুকুন্দ যত বুড়ো হচ্ছ ততই যেন কি হচ্ছে তোমার! তুমি কোলকাতায় ফিরে যাও।'

'যেতে পারলেই বাঁচি, কিন্তু কোন চুলোয় যাব! ঠাকরুণকে দেখবে কে!'

কথা কইবার ও ঝাঁজ প্রকাশের সুবিধা পেয়ে মুকুন্দ আপ্যায়িত করে সুজনকে দোতালায় নিয়ে গেল। 'বসুন, কখন ফিরবেন জানি না। বাবাঃ—দম্ আটকে মরব এবার। ঠাকরুণকে যদি না দেখতে হত, তবে কোন্···'

'এতদিন তিনি কি তোমার তদারকেই ছিলেন?'

'তা বলছি না। অমন পাপিষ্ঠ আমি নই। বাবা বিশ্বনাথই দেখেছেন, এখনও দেখবেন, সেই সঙ্গে আমিও কাছে কাছে থাকব।'

'তা ভাল। আচ্ছা, মুকুন্দ, তোমার বাবুর কি দশা হবে ভেবেছ?'

'বাবু! তাঁকে দেখবার ভাবনা! চিন্তামণি দেখবে, ইংরেজী জানে, কত কেতা তার দুরস্ত! আমি মুখ্খু মানুষ, গেঁয়ো ভূত, ঠাকরুণই আমাকে বাবুর কাছে পাঠালেন, নইলে, আমি ত ঠাকরুণেরই লোক, তা বুঝি জানেন না?'

'খুব ছেলে বয়সে বুঝি মাসীমার কাছে আস?'

'আমার ভগ্নীপোত কর্ত্তার খাস চাকর ছিল—বেয়ারা যাকে বলে গো। কবে অনাথ হলাম জানি না, দিদিটাও মরে গেল। তখন ভগ্নীপোত বল্লে, তুই ছাড়া আমার দুকুলে কেউ রইল না রে। আমাকে আনলে কর্ত্তার কাছে। আমি হলাম গিন্নীর চাকর। একটা ঝি ছিল তাঁর নিজের—তার বাড়াভাতে নুন পড়ল ভেবে প্রথম প্রথম সে খুব পেছনে লাগত। একবার আমার খুব জ্বর হল, বুকে সর্দ্দি,

ঝিটা, তাকে পিসী বলতাম, কি সেবাটাই না করলে বাবু! গরম মাসকড়াই-এর তেলে আমাকে চুবিয়ে রাখলে। এই মরি কি এই বাঁচি! একদিন ভোরবেলা শুনি, ভগ্নীপোত বলছে, মোক্ষদা, এর কেউ নেই, তুই ওর সত্যিকারের দিদি। মেয়ে মানষের প্রাণ, আবার ছোট লোকের প্রাণ। আমিও মলামনা, দিদিও সেই থেকে রোজ লুকিয়ে ভাজা মাছ খাওয়াত, খুব আমসত্ব খাওয়াত—সোনার মতন রঙ বাবু—বড়বাজারের কালো ঘুঁটে পাওনি।'

'ছেলেবেলা বেশ ছিলে তবে?'

'আমাদের আর থাকাথাকি! তবে হাঁ কর্ত্তা বাবু! কর্ত্তা বাবু ত' কর্ত্তা বাবু! কোলকাতা থেকে ফি শনিবার কাঠের বাক্স ভর্ত্তি করে রকম রকম বোতল আসত। শনিবার রোববার আমাকে ভগ্নীপোত বৈঠকখানায় যেতে দিত না। ভালই করত। বাবাঃ…একদিন শনিবার রাত্রে লুকিয়ে দেখলাম কর্ত্তা বাবু মেজের ফরাসে শুয়ে আছেন, আর মাথায় ভগ্নীপোত ঘড়া ঘড়া জল ঢালছে। ছুট্টে গিন্নীর কাছে এসে বল্লাম, বাবুর অসুখ, শীগ্‌গির যান্ গে। গিন্নী শুনে চুপ করে বসে রইলেন। উনি ঐ রকম, চিরটাকাল। সে-রাতে গিন্নীর খাটের নীচে ঘুমিয়ে পড়লাম—এত ভয় লেগেছিল। খুব দিল্ ছিল কর্ত্তার—দু'হাতে বখশিষ…। তারপর কর্ত্তা মারা গেলেন, সজ্ঞানে, তুলসী তলায়। তারপর যা হয়…পেয়াদা এল। গিন্নী কোলকাতায় চলে এলেন, আমাকে আর ছাড়েন কি করে! সেই থেকেই কাছে কাছে ছিলাম—!'

মুকুন্দ নিজের মনেই বলে চলল, 'বাবুকে গিন্নীমা মানুষ করলেন, বিয়ে থা' দিলেন, ঘর-সংসার পাতালেন। বৌমা যেন কেমন কেমন ছিলেন, ছেমো ছেমো… গিন্নী দেখে শুনে বন্দোবস্ত করে কাশী চলে এলেন। থাকলে আর ও-সব কাণ্ড ঘটত না। আমি বাবুর সঙ্গে আসতে চেয়েছিলাম, গিন্নী বল্লেন, 'ওরা ছেলেমানুষ, একজন পাকা লোক থাকা চাই।' তাই রইলাম। কতই দেখতে হল, আর কতই না দেখব! যে-কটা দিন বাঁচব বাবা বিশ্বনাথের শ্রীচরণে আর ঠাকরুণের কাছে কাছেই যেন থাকি। আচ্ছা বাবু, আপনি ত' বন্ধুলোক, ফেরেণ্ড মানুষ, আপনিই না হয় আমাদের বাবুকে অন্য কোথায় বেড়িয়ে আনুন না? কত দেশবিদেশ ত' রয়েছে! আর না হয়, জোরজাবুরি করে, ভুলিয়ে ভালিয়ে, যা করে পারেন, বিয়ে থা' দিয়ে দিন।'

'ও-প্রস্তাবটা তুমিই কর মুকুন্দ।'

'থালে আর বাঁচতি হবে না! এই কট মট চাউনি···যাকগে আপনার সঙ্গে আলাপ হল যেন···'

'খেপেছ মুকুন্দ!'

'ভদ্দর লোকেরাই বলে দেয়। আমি এখন বাড়ি আগলে কতক্ষণ বসে থাকব কে জানে! কখন যে ফিরবেন তার পাত্তাই নেই। একটা কাজ থাকত, তবু! চললেন বাবু?'

সুজন বড় রাস্তা পার হয়ে রমলা দেবীর বাড়ির পথ ধরল। ঝাণ্ডা নিয়ে একটা দল বেরিয়েছে। সামনে ব্রহ্মচারী, দণ্ডী, পিছনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবৃন্দ, সকলেরই কপালে ত্রিশূল আঁকা। সালুর ওপর তুলোয় লেখা, 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়', দেবনাগরী অক্ষর, যেন ঝামা, ষ্টেশনের সাইডিংএ লাইন থেমেছে মাটির ঢিবিতে, কয়লাগাড়ি এসে ঘুমোয় সেখানে, সেই লাইনে শ্লীপারের ফাঁকে ফাঁকে ঝামা পড়ে রয়েছে কতদিন থেকে। দুজন দণ্ডীধারী দুটো ঝাণ্ডা ধরে চলেছে। বৃদ্ধেরা কি আবৃত্তি করেছেন স্পষ্ট বোঝা যায় না। চা-এর দোকান থেকে একজন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ক্যা চিল্লাছে জী, ঘেউ, ঘেউ?' উত্তর এল, 'পণ্ডিত মদনমোহনের বিপক্ষে সনাতনীরা ক্ষেপে উঠেছে, হরিজনদের শিবমন্ত্র দেবার জন্যে, তাই বলছে, 'পাষণ্ডেণ যৎকথিতম তদ্ধেয়ম্।' তদ্ধেয়ম্, তদ্ধেয়ম্, তদ্ধেয়ম··। সুজন পাশ কাটিয়ে রমলা দেবীর বাড়ি এল।

খগেন বাবু ঘরে একলা বসে আছেন। সুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি সকালে গিয়েছিলে? আমার একটু দরকার ছিল। বিশেষ কোনো কাজ আছে কি?'

'বিশেষ? না, তেমন নয়। মাসীমা...'

রমলা দেবী ঘরে প্রবেশ করলেন, সোনালি চাঁপা রঙের সাড়ি, কনে-দেখা-বেলার রঙ, ভি-কাটা ব্লাউস, সমগ্র হাত খোলা, বাঁকা তলোয়ার, সাড়ির পাড়ে বলাকার নক্সা···সূর্য্যাস্তের আভা লেগেছে মুখে, বুকে হাতে···।

'সুজন!'

'এই বেড়াতে বেড়াতে এলাম।'

'যাবে নাকি?'

'কোথায় ?'

'বেড়াতে ? আমরা একটু বেরুচ্ছিলাম···'

'না।'

'ভাল কথা, বিজনকে চিঠি লিখেছ ?'

'লিখেছি। আপনারা ঘুরে আসুন। আমার একটু···আপনি একবার, যদি পারেন, মাসীমার সঙ্গে আজ দেখা করবেন।'

খগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মাসীমার অসুখ ? ডেকেছেন ?'

'অসুখ নয়। জানি না কি কাজ—অমনি···'

রমলা দেবীর মুখে কে যেন কালি মেড়ে দেয়। সুজন চলে গেল।

'এ সাড়িটা খুব ভাল ত !' রমলা দেবী সাড়ির আঁচল দিয়ে হাত ঢাকেন। দুজনে নীচে নামলেন।

'যেখানে নিয়ে যাব বলছিলাম সেইখানেই যাবে ?'

'না, যাব না সারনাথে। ভাল লাগে না।'

'মূলগন্ধকোটি বিহারে একজন ভিক্ষুণী দেয়ালে ছবি আঁকছেন। জাতকের গল্প, রঙের সমাবেশ ভাল, ভালই লাগবে।'

'পুনর্জ্জন্ম, পূর্ব্বজন্ম কিছুতেই বিশ্বাস নেই, না আমার, না বুদ্ধের। এই জন্মই যথেষ্ট—এই আমার সার্থক হোক্।'

'অন্য গল্পেরও ছবি আছে। অশোকের এক রাণী ছিলেন, নাম দেবী, মধ্য ভারতের এক জঙ্গলী রাজার মেয়ে। অশোক তখন যুবক, সম্রাট হননি, বাপের প্রতিনিধি হয়ে সেখানে রাজ্যশাসন করেন। দেবীর সঙ্গে দেখা হয়, একটি ছেলেও হয়। অশোক পরে রাজা হলেন···তারপর ধর্ম্মশাসন সুরু হল। ছেলেকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দেবী ভিক্ষুণী হন। পুরাতন স্মৃতিরক্ষার জন্য সাঁচির বিহার তৈরী হচ্ছে—এ ছবিটা ভাল।'

'অশোকের অনেক স্ত্রী ছিল ?'

'চার পাঁচটি ত' বটেই। তিষ্যরক্ষিতার কাহিনী নিশ্চয়ই শুনেছ ?'

রমলা দেবী জোরে ঘাড় নেড়ে বল্লেন, 'আমি সারনাথ যাব না। ঘাটে যাই চল। লোকালয় তোমার আজকাল প্রিয়, নয় ? এই যে শুনলাম কাল।'

'এইখানেই বসবে?' খগেন বাবুর দৃষ্টি পড়ল রমলা দেবীর হাতের ওপর··· হগ্ সাহেবের বাজারে মাংস ঝোলানো রয়েছে, পাউডার ঘামে জড় হয়ে চর্ব্বির মতন দেখাচ্ছে। 'বাইরে চল, বাইরে চল বলছি, এখানে বসা যায় না।' রমলা দেবী বিস্মিত হলেন দেখে খগেন বাবু একটু চেঁচিয়ে বল্লেন, 'চল ঘাটে, এখানে আমি আর বসতে পারছি না। তাই চল, রমা। নিশ্চয় বসবার জায়গা পাব আমরা। ভিড় হয়, নৌকায় বেড়ানো যাবে, সেই ভাল, কেমন? চল, একসঙ্গে বসে সানাই শুনব। না হয়, চুপ করে বসে থাকব। কথায় বাধা তোলে, নয় রমা? তুমি আর এ-কাপড় এ-জামা পোরো না। একজন লোক ছিল সে তার স্ত্রীকে রঙ্গীন কাপড় পরতে দিত না, তার কষ্ট হত। তুমি তাকে চেননা। ঘাটের এক ধারে বসব। পুরো হাতার জামা তোমার নেই? আজ থাক্, পরে তাই পোরো। কেমন?'

দুজনে ঘাটের দিকে এগোলেন। সন্ধ্যা হয় হয়, এখনও অন্ধকার নামে নি। বড় রাস্তা থেকে একটা গলি বেরিয়েছে, পার হবার সময় একটা মোটর এসে থামল। অক্ষয় এঞ্জিনীয়ার তাড়াতাড়ি নেমে গলির মধ্যে অদৃশ্য হলেন, যাবার সময় চাঁপা রঙ্গের সাড়ির দিকে চাইতে চাইতে। রমলা দেবী আঁচল দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ জড়িয়ে নিলেন। খগেন বাবু ও রমলা দেবী হাঁটতে হাঁটতে ঘাটের অনেক দূর পর্য্যন্ত এগোলেন।

'তোমার খারাপ লাগছে? লোকজন?'

রমলা দেবী মন্ত্রমুগ্ধের মতন সামনে চেয়েই রইলেন, কোনো উত্তর দিলেন না।

'আমি ওদের চিনি না, তবে চিনতে চাই। এইবার বসবার জায়গা পাওয়া গেল।'

'আরো দূরে চল। ওটা কি সুর?'

'পুরিয়া, পঞ্চম পাবে না, তীব্র মধ্যম তার বদলে, গোড়ায় কোমল রেখাব। বড় জমাটি সুর···'

'মাসীমা তোমাকে ডেকেছেন।'

'আমি যাব না। ও-সব এখন থাক।' দুজনে বসলেন।

কাছেই একটা নৌকা ভিড়ল। অক্ষয় এঞ্জিনীয়ার লাফিয়ে ঘাটে নেমে একটি মেয়ের হাত ধরে নামায়, মেয়েটি ঝোঁক সামলাতে না পেরে খিল খিল করে হেসে অক্ষয়ের গায়ের ওপর ঢলে পড়ে। দুজনে চলে যায়। মাঝি পয়সা চায় না, চেনা-লোক বোধ হয়, পুরানো খদ্দের······

রমলা দেবী বল্লেন, 'বাড়ি চল। আমার গা কেমন করছে···'

'চল পৌঁছে দিই।'

'মাসীমার বাড়ি···মাগো! মাগো! ঐ ছ্যাখ কি ভেসে এল!'

'ও কিছু নয়, খড়।'

'পোড়া বাঁশ···ঐ ছ্যাখ মুণ্ডু···তুমি বাড়ি নিয়ে চল আমাকে।'

খড়, বাঁশ আর হাঁড়িটা ঘাটে এসে ঠেকল।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মাথুরের পর মিলন

গতবারের পরিচয়ে আমরা 'মাথুরের' কথা বলিয়াছি। ক্রূর অক্রূর কংস-বধের জন্য শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবন হইতে মথুরায় লইয়া গেলে ব্রজবাসী কিরূপে বিরহের অগ্নিতে জর্জ্জরিত হইয়াছিল—কিরূপে 'যশোমতী নন্দ অন্ধসম বৈঠল,' সখাগণ কিরূপে 'ধেনু বেণু' বিস্মৃত হইয়াছিল—বিশেষতঃ শ্রীমতী রাধা কিরূপে বিরহের দশ দশায় 'বিয়াকুল' হইয়াছিলেন—গতবারে আমরা তাহার কিছু কিছু আস্বাদন করিয়াছি।

মাধব! ঘোরবিয়োগ-তমসি নি-পপাত রাধা
বিধুর মলিন মূর্ত্তিরধিকম্ অধিরূঢ় অতি-বাধা।

তাঁহার আর্ত্তি—তাঁহার বেদনা—তাঁহার রোদন—তাঁহার হা হুতাশ—নবম দশায় তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা—এসকল আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিরহের শেষ দশা মৃত্যু। রাধার এখন সেই দশা উপস্থিত—যখন মৃত্যু অতি সন্নিকট। বৃন্দা যখন দেখিলেন শ্রীরাধার দশম দশা, তখন তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—

রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং, অহং গচ্ছামি মথুরায়ে
ঢুঁড়ব পুরী প্রতি ঘরে ঘরে যাঁহা দরশন পাওয়ে।
অতি ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং গতি গমনা
অবিলম্বনে মথুরাপুরে প্রবেশ করল ভ্রমণা।

পথে মথুরাবাসিনী এক রমণীর সঙ্গে বৃন্দার দেখা হইল। বৃন্দা বললেন—'শ্যাম শুক পাখী'র সন্ধান দিতে পার?' শ্যাম শুক-পাখী?

শ্যাম শুক পাখী সুন্দর নিরখি
(রাই) ধরেছিল নয়ান ফাঁদে
হিয়ার পিঞ্জরে রাখিত সাদরে
প্রেমহি শিকলে বেঁধে।
হ'য়ে অবিশ্বাসী কাটিয়ে আঁকসি
আসিয়াছি মধুপুরে
সন্ধান করিতে পাইলাম শুনিতে
কুব্জা রেখেছে ধ'রে।

মথুরাবাসিনী এ হেঁয়ালি কি বুঝিবে, নিরুত্তর রহিল। বৃন্দা তখন—

মথুরা বাসিনী এক রমণী তা'কর দূতী পুছে।
(বল) নন্দজাত কৃষ্ণখ্যাত কাহার ভবনে আছে?

নন্দনন্দন কৃষ্ণ? আমরা জানি গোপিকা সেই নন্দনন্দনকেই চিনে—অপরকে নয়।

গোপিকা-ভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয়
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা অন্যত্র না হয়।
—চরিতামৃত

কিন্তু সেই মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী হলেও ত' শ্যামবিলাসিনী নয়—সে বসুদেবসুতকে চিনে, গোপিকানন্দনের ধার ধারে না।

শুনি সো ধনী কহয়ে বাণী সো কাঁহা হিঁয়া আওব?

হাঁ আমাদের যিনি রাজা, তাঁর নামও কৃষ্ণ বটে কিন্তু তিনি ত'

বসুদেব-সুত কৃষ্ণখ্যাত কংস-রিপু মাধব।

দূতী বলিল—হাঁ হাঁ শুনেছি বটে, মথুরায় এসে আমাদের সেই নটবর কানাই রাজা সেজে বসেছে—

সোই সোই কই কই, দরশনে মম আসা

—হাঁ হাঁ সেই বটে—তাকে দর্শন করিতেই আসা।

'শ্যাম শুক-পাখী'র কথা শুনে সে বৃন্দাকে ভেবেছিল—'demented woman'—এখন একটু pity ক'রে বললে—

মধুপুর নাগরী　　হাসি কহত ফিরি
গোকুল গোপ গোঁয়ারী
সপ্তম দ্বার পরে　　রাজা বৈঠত
তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী?

কৃষ্ণচন্দ্র রাজা হ'য়ে বসেছেন—দ্বারে দ্বারপাল—সহজে কি প্রবেশ করা যায়? দ্বারী রুখলে—but বৃন্দা is not the person to take a refusal—প্রত্যাখ্যান মানিবার পাত্রই নয়—এ সেই বৃন্দা—যার নামে বৃন্দাবন—বৃন্দা যত্র তপস্তেপে তদ্ধি বৃন্দাবনং স্মৃতং।

মহা বচসা বাধিয়ে দিলে—দ্বারী ত' চোবে—রেগে হয়ত দুএক ঘা দিয়েই ছিল—তখন

হাহা বর নাগর গোপী জীবনধন
দূতী ডাকত উভরায়ে
হৃদয়নাথ বাত শুনি কাতর
তৈখনে দূতীক পাশ আওয়ে।

—গোলযোগ শুনে কৃষ্ণ দেখিতে এলেন। এই সুযোগে দূতী রাজ সভায় প্রবেশ করলেন—কৃষ্ণ হঠাৎ চিনিতে পারিলেন না—

কাঙালিনি! তুমি কে বট হে।
তোমায় চেন চেন চেন করি
ঘর মথুরা কি ব্রজপুরী?

দূতীর এইবার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল—হইবারই কথা—বলিলেন,

বলি হে কুব্জার বন্ধু!
পাশরেছ রাই মুখ-ইন্দু
হে পাগধারী
পাশরেছ নবীন কিশোরী? * *
রাধা পাঠাল মোরে, দাসখত দেখাবার তরে।
যাতে মোরা আছি সাক্ষী পদতলে নাম দিলে লিখি॥

—ভক্তেরা 'ইসাদিকৃত্য' ক'রে খাতক শ্রীকৃষ্ণকে দিয়ে বৃন্দাবনে যে দাসখত লিখাইয়াছিলেন—এ সেই খত! অর্থাৎ, অহং ভক্তপরাধীনঃ হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!

ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়ে!
ছি ছি নাহিক লাজের লেশ
এক দেশ এলে আগুনে পোড়ায়া
মজাইতে আর দেশ! * *
বহুদুখে আমি এসেছি মথুরা
ভ্রমিব সবার ঘরে
সব রমণীকে কব তোর কথা
দেখি কে পীরিতি করে।

এই threat-এ কৃষ্ণের ভয় হ'ল কিনা জানিনা—বোধ হয়, না। কারণ, জগতের ইতিহাসে এত বড় Lady-killer (রমণীমোহন) আর হয় নাই। চণ্ডীদাস ঠিক্ বলেছেন—

যেখানে বসতি করে নয়ানে দেখিয়া গো
যুবতিধরম কৈছে রয় ?
পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে কুলবতীর কুল নাশে
আপনার যৌবন যাচায়॥

কিন্তু তিনি ভক্তের আর্ত্তি সহিতে পারেন না—

যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র
তথাপি স্বভাবে হও প্রেম-পরতন্ত্র

সেই জন্য দেখি, 'সুরনররিপু হিরণ্যকশিপু' হরিভক্ত পুত্রকে বিনাশের জন্য নাগপাশে বাঁধিয়া তাহার বক্ষে পাষাণের স্তূপ চাপাইয়া দিলে, ভগবান্ সেই স্তূপ নিজে বহন করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদের উক্তি ঃ—

আহা বড় ব্যথা লেগেছে করে হে
জীবের ব্যথাহারী হরি!
ফেলে দাও পর্ব্বতের চূড়া!

ঐ দেখ—

আঁকা বাঁকা চূড়া শিলায় লেগে
বাঁকা চূড়া আরও গেছে গো বেঁকে
আহা! বিন্দু বিন্দু ঘাম ঝুরে বিশাল উরস মাঝে।
বদন-ইন্দু যেন মেঘে ঢাকা
বেঁকে গেছে চূড়ার শিখি-পাখা
হরি! কাজ নাই আর গিরি ধ'রে
ফেলে দাও হে ত্বরা করে।

আরও দেখি, দুর্ম্মতি দুঃশাসন কুরুসভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে গেলে, দ্রৌপদী যেমন বসন ছে'ড়ে দুই হাত তুলে যুক্তকরে আর্ত্তস্বরে তাঁহাকে ডাকিলেন—গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়! বিপদার্ণবমগ্নাং মাম্ উদ্ধরস্ব জনার্দ্দন!—অমনি ভগবান্ বসনরূপে তাঁহাকে বেষ্টন ক'রে দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ করিলেন—তিনি এমনিই আর্ত্তি-হরণ! তা'ই দূতী যখন ব্রজপুরীর দশা বর্ণন করিলেন

তুহুঁ রহলি মধুপুর
ব্রজকুল আকুল   দুকুল কলরব
কানু কানু করি ঝুর

—বিশেষতঃ তাঁহার বিরহে রাধিকার দশম দশার বর্ণনা করিলেন—

কুর্ব্বতিকিল কোকিলকুল উজ্জ্বল কলনাদং
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদং
মাধব ! ঘোর বিয়োগতমসি নি-পপাত রাধা
বিধুর মলিন মূর্ত্তিরধিকম্ অধিরূঢ়-অতি-বাধা।

তখন—

নাগরী শেষ-দশা শুনি মাধব
ছল ছল লোচনে পানী
অবনত মাথ   করহি অবলম্বন,
বয়ানে না নিকসয়ে বাণী

অবশেষে বলিলেন—

রাই বচন শুনি কাতর পরাণ মোর
সোহি মুখ হিয়া মাঝে জাগে
তুই এক পলকে   হাম ব্রজে যাওব
কহবি রাইকো আগে।

পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণনা করিয়াছেন—

বাঁধিতে বাঁধিতে চূড়া   তিলক হইল মূঢ়া,
অবসর নাহি বাঁশী লতে।
নূপুর বিহনে পায়,   অমনি চলিয়া যায়,
পীতধড়া পরিতে পরিতে॥
ননী জিনি সুকোমল,   দুখানি চরণ তল,
কোথা পড়ে নাহিক ঠাওর।
দয়া করি চাতকীর,   পিপাসা করিতে দূর,
ধায় যেন নব জলধর॥
সেই সে রাধার ধাম,   আসি উপনীত শ্যাম,
বিরহিণী জিউ হেন বাসে।

গোবিন্দদাস কয়, মৃত তরু মুঞ্জরয়,
বসন্ত ঋতু পরকাশে॥

শ্রীকৃষ্ণ উপনীত হইলে চণ্ডীদাস রাধার মুখ দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বেশ একটু মধুর ভৎর্সনা করেছেন—ঐ পদটি classical

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে।
দেখা না হইত পরাণ গেলে॥
এত যে সহিল অবলা বলে।
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥
দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল।
মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল॥
এসব দুঃখ কিছু না গণি।
তোমার কুশলে কুশল মানি॥
ও সব দুঃখ গেল হে দূরে।
হারান রতন পেলাম কোরে॥
কোকিলা আসিয়া করুক গান।
ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥
মলয় পবন বহুক মন্দ।
গগনে উদয় হউক চন্দ॥

পাঠক দুইটি ছত্র লক্ষ্য করিলেন কি?

সহিল এতেক অবলা ব'লে
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে!

কি fine touch! কবিরাজরাজ ভবভূতি লিখিয়াছেন—

অপি গ্রাবা রোদিতি অপিস্ফুটতি বজ্রস্য হৃদয়ম্—'পাষাণ রোদন করে, ফুটে বুঝি বজ্রের হৃদয়!' চণ্ডীদাসের ঐ touch আরও মনোহারী।

এই বার রাধা-কৃষ্ণের পুনর্মিলন হইল।

মিলল দুহুঁ জন উপজল প্রেম।
মরকত যৈছন বেড়ল হেম॥
কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পূরল মদনতরঙ্গ॥

আঁধারে জ্বলিছে কিয়ে রসের দীপকে।
তমালে বেঢ়ল যেন কাঞ্চন-লতিকে॥
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ করু পান।
গোবিন্দদাস কহে দুজনে সমান॥

কবি বিদ্যাপতির বর্ণনা শুনুন ঃ

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি।
মধুর কুসুম-মধু-মাতি॥
মধুর বৃন্দাবন মাঝ।
মধুর মধুর রসরাজ॥
মধুর যুবতিগণ সঙ্গ।
মধুর মধুর রসরঙ্গ॥
মধুর যন্ত্র রসাল।
মধুর মধুর করতাল॥
মধুর নটন গতিভঙ্গ।
মধুর নটিনী নটরঙ্গ॥
মধুর মধুর রসগান।
মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥

এ প্রসঙ্গে ভক্তপ্রবর নরোত্তম ঠাকুরের একটি পদ আস্বাদনীয়—

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল,
ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি।
পরিমলেতে ভরল, বৃন্দাবনেতে সকল,
কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥
রাই কানু বিলাসই রঙ্গে।
কিবা রূপ-লাবণি, বৈদগ্ধ-ধনী ধনি,
মণিময় আভরণ অঙ্গে॥
রাধার দক্ষিণ করে, ধরি প্রিয় গিরিধরে
মধুর মধুর চলি যায়।
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ
কোন সখী চামর ঢুলায়॥

পরাগে ধূসর-স্থল, চন্দ্র করে সুশীতল,
মণিময় বেদীর উপরে।
রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি,
পরশে পুলকে তনু ভ'রে ॥
মৃগমদ চন্দন করে করি সখীগণ,
বরিষয়ে ফুল গন্ধরাজে।
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু শোভা করে মুখইন্দু,
অধরে মুরলী নাহি বাজে ॥
হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ,
নরোত্তম মনোরথ ভরু।
দুহুঁক বিচিত্র বেশ, কুসুমে রচিত কেশ,
লোচন-মোহন লীলা করু ॥

এই মিলনকে খৃষ্টীয় Mysticismএ 'Orison of union' বলা হয়—তখন

Our satisfaction lies in submission to the Divine Embrace
—Ruysbroecke.

ঐ মিলনে কি আনন্দ! কি 'Perfiniteness of joy'—ঐ আনন্দ অতিম্নীম্ আনন্দস্য—আনন্দং নন্দনাতীতং। তখন 'fly, run and rejoice'. (A. Kempis)। তখন

'The soul swims in the sea of joy'—Underhill p 523.

শ্রীরাধা ঐ আনন্দসিন্ধু মাঝে অবগাহন করিতে রহুন—আসুন আমরা অলক্ষ্যে থাকিয়া দর্শন করি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

কেশব ভট্চায্যির কন্যাদায়

(১)

'ভট্চায্যি' ব'লতেই চোখের ওপর ভেসে ওঠে একটি ফুলবাঁধা সুস্পষ্ট টিকি, একটি ঘৃতপুষ্ট তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দেহ, একজোড়া চশমা—যা'র একটি ডাল রূপোর ও অপরটি সুতোবাঁধা, বগলতলে ছাতা, ট্যাঁকে নস্যের ডিবা, পায়ে তালতলার চটি, মুখে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শ্লোক—কিন্তু কেশব ভট্চায্যির বেলায় এ সবের কিছুই খাটে না। কেশব বাবুর মাথায় একটি সুচিক্কণ নাতিবৃহৎ টাক, অজীর্ণ রোগে দেহ কৃষ্ণবর্ণ ও কৃশ, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পায়ে তালিদেওয়া হুড্‌বার্নিশ জুতো, পকেটে বিড়ির কৌটা। ছোট্ট মানুষটি বেলা দশটা থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত মার্চেণ্ট অফিসে কর্ম্ম করেন—মুখে সংস্কৃতের বদলে উচ্চারিত হয় কেবল পয়সা আর পয়সা।

কেশব বাবুর বাড়ীটি সাবেক কালের। একতলা বাড়ী কিন্তু জায়গা কিছু বেশী, মাঝখানে একটা বড় উঠান। উঠানের মাঝখানেই একটি নিমগাছ—ওদিকে একটি তুলসী-মঞ্চ—তারই তলায় একটি তৈলবিহীন মলিন প্রদীপ,—উঠানময় শুকনো নিমপাতা ও নিমফল। নিমগাছের গুঁড়ি ঘিরে একটি সিমেণ্ট-করা ছোট্ট বেদী—তারই গায়ে একটি হুঁকো ঠেসানো। গাছের ওদিকে গায়ে মাটিলেপা রান্নাঘর, তারই নর্দ্দমায় প্রতিদিন দেখা যায় দু'চারটি ভাত সমেত ফেন, ডিমের খোলা, পেঁয়াজের খোসা—কখনও কখনও একটা আধটা করমচা কিম্বা কচি আমড়া।

কেশব বাবুর নিজের মুখে শুনলে শোনা যায়—"ডাক্তার, বদ্যি—একেবারে বাজে কথা। অতবড় ডাক্তার অন্নদা—ঘোড় দৌড়ের মাঠে 'গৌরীশঙ্কর' বলতে জুয়াড়েদের চোখে যে রকম আলো ফুটে ওঠে, এই কলকাতায় ঐ অন্নদা বলতে লোকের ঠিক সেই রকম হয়—কিন্তু আমার করলে কি? এই অজীর্ণ রোগে আজ পনেরো বছর ধরে ভুগছি, পারলে সারাতে? কা'র কথাই বা বলি? কব্‌রেজি? তা'ও ঢের দেখেছি! আগে সারা দিনরাতে বড়জোর গোটা পঁচিশেক ঢেঁকুর উঠত কিন্তু হেদোর ঐ নামজাদা হরিশ কব্‌রেজের ওষুধ খেয়ে বলব কি—সারা দিন রাত ঢেঁকুর ঢকাস্ ঢকাস্ উঠছে ত উঠছেই—যেন অন্ধমুনির ছেলে পুকুরে ঘড়ায় জল

ভরছে, থামবার নাম নেই। ঢেঁকুরের জন্যে প্রায় চাকরিটা খুইয়েছিলুম আর কি? বড় সাহেব দু'তিন দিন লক্ষ্য করে' একদিন বললে—কেশব, তোমার চাকরিটা এবারের মত রয়ে গেল—আমি অবাক্।—বললে—আমি মনে করতুম, তুমি তোমাদের classical music-এর জন্যে এখানে গলা সাধছ, তারপর খোঁজ নিয়ে জানলুম—না, however, be careful। আরে বল কেন দাদা—তা'র চেয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিয়েছি। এখন ঢের ভাল আছি। নিয়মমত থাকলে সব রোগই কম পড়ে। খালি পেটে বাসি মুখে একটি ছিলিম তামাক, সপ্তায় এক-দিনের বেশী দুদিন স্নানটি করেছ কি মরেছ। ঠিক বেলা আটটায় ভাতে বস—গরম ভাত, দুটো ডিম সেদ্ধ, একটু পেঁয়াজ ভাজা, আর সামান্য একটু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে হয় আমড়ার নয় করমচার একটু টক্ —ব্যস্। দই না, দুধ না—দিব্যি আছি রে দাদা, দিব্যি আছি—

কিন্তু দুপুরের দিকে কান একটু সজাগ রাখলে কেশব-গিন্নির কান্নাভেজা গলায় শুনতে পাওয়া যায়—আর দিদি বোলো না—সত্যি বলছি, একদিনের তরেও আর বাঁচতে ইচ্ছে হয় না। কোনও অভাব নেই তবু ঐ রকম তাঁর স্বভাব। আমার আট-ন বছরের ছেলে—বাছা লেখাপড়া আরম্ভ করেছে, মনে করলুম—ছেলেটা রোগা হ'য়ে যাচ্ছে এক পো ক'রে ওর জন্যে দুধ বলে দিই—বোধ হয় দেড় মাস হয় নি। সে দিন দেখি সকাল বেলা বাছা আমার ঘুম থেকে সবে উঠে চোখ রগড়াচ্ছে, উনি ডাকলেন, জগা শোন্। আমি তখন কাপড়টা কেচে, ভিজে কাপড়টা দালানে মেলে দিচ্ছি, উঁকি দিয়ে দেখি, বাছাকে দাঁড় করিয়ে ভুরু কুঁচ্‌কে তার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন—আমি ভাবলুম, বুঝি জামা-টামার মাপ নিচ্ছেন, তবু ভাল। ওমা—গয়লা দেখি দুধ দিয়ে গেছে এক পো কম। আমি প্রথমটা কিছু বুঝিনি। রাত্রে খেতে বসেছেন, জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁগা, আবার দুধ কমিয়ে দিলে নাকি? মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—হুঁ। বললুম—কেন? বললেন—গায়ে অযথা মাংস বেড়ে যাওয়া ভাল নয়, একেবারে অকর্ম্মণ্য হ'য়ে পড়বে। বল দেখি, দিদি, মা হ'য়ে কি ক'রে সহ্য করি, বুক আমার ভেঙ্গে যায়—ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করলে—মা আমার দুধ? আমি চোখে কাপড় চাপা দিয়ে ওঁর দিকে দেখিয়ে দিলুম। ওঁর তখন খাওয়া হ'য়ে গেছে, ঢেঁকুর তুলে বললেন—বোস্ জগা আমার পাতে বোস।

আজ টক্‌টা বড় চমৎকার হ'য়েছে রে, খেয়ে দেখ—ছেলে আমার হাসিমুখে ব'সে পড়ল। বলব কি দিদি, কেবল পয়সা আর পয়সা, ডাক্তার বদ্যির খরচের ভয়ে নিজের চিকিৎসা পর্য্যন্ত করেন না। অথচ অভাবটা কি তাই শুনি! ঐ যে হল্‌দে রঙের বাড়ীটা—যেটায় ফিরিঙ্গিরা ভাড়া রয়েছে—ঐটা থেকেই মাসে সত্তর টাকা ভাড়া আসে—তারপর ধর আমার শ্বশুরের শিষ্যির যে তিন-চার ঘর এখনও আছে—তা থেকেও মাসে প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ টাকা, তারপর ধর নিজের মাইনে পঁয়ষট্টি টাকা—হিসেব ক'রে দেখ দিকি কতগুলি টাকা হয়। অবিশ্যি পুষ্যিও তেমনি আছে। (কপালে হাত ঠেকিয়ে) মা ষষ্ঠীর কৃপায় বলতে নেই, আমার সাতটি ছেলেমেয়ে। তাও দেখ, আমার বড় মেয়ে চারু, তাকে পার করলে, দিদি, সে এক জন্তর হাতে। অবশ্য বিয়ের আগে মেয়ে ধিঙ্গি হ'য়ে বেড়াচ্ছিল দেখে তাঁকে খুব ব্যস্ত করেছিলুম সত্যি, তা ব'লে ঐ রকম একটা যা' তা' ধ'রে দেওয়া কি ঠিক হ'ল। এ যেন আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া।—

তারপর গলা নামিয়ে কেশবগিন্নি যেসব কথা বলেন আর শোনা যায় না। পরে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ, কাঁপা গলা ও শেষে নাক ঝাড়ার শব্দে বোঝা যায়, তিনি কাঁদছেন।

(২)

ভট্‌চায্যি বাড়ী ফিরিঙ্গিপাড়ায় হওয়া অস্বাভাবিক ; কিন্তু কেশব বাবুর বাড়ীটি ফিরিঙ্গিপাড়ায়। প্রায় একশ' বছর আগে এ পাড়ায় যা দুচার ঘর বাসিন্দা ছিল তার মধ্যে ফিরিঙ্গির নামগন্ধ ছিল না—সবাই ছিল ভটচায্যি এবং পাড়ার নামও ছিল ভটচায্যি পাড়া। তবে সামিয়ানায় তালি পড়ে পড়ে সেটা যেমন 'তালিয়ানায়' দাঁড়ায় তেমনি যে বছর কলকাতায় প্রথম বেরিবেরি হয় সেই বছর এই পাড়ার ভটচায্যিরা কতক মারা যায় ; কতক মাড়োয়ারীর কাছে স্বল্প মূল্যে ভিটে বেচে নবদ্বীপে আশ্রয় নেয় ; এবং তারপর ঠিক কবে যে এই সব খোলার ও মেটে ঘরের জায়গায় ফ্যাশানওলা মেড়োর বাড়ী ওঠে এবং একে একে ফিরিঙ্গি ভাড়াটে জুটে ভটচায্যি পাড়া থেকে ফিরিঙ্গিপাড়ায় দাঁড়ায় তা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

কিন্তু কেশব ভটচায্যির সঙ্গে একটু বেশীক্ষণ গল্প করলেই শোনা যায়—আরে ভাই ঐ যে সামনে গেটওলা বড় বাড়ীটা দেখছ আর ঐ যে রাস্তার ওপর

জলের কল বসেছে, আর ঐ যে এখনও ঐ বড় অশথগাছটা রয়েছে—এই সমস্তটাই ছিল জঙ্গল—এমন সময় এতক্ষণ ওর ভেতর তু'দল শিয়ালের ডাক শেষ হ'য়েছে। তবে ঐ যে পশ্চিম দিকের বড় বাড়ীটা—যেটায় এখন ট্রাম কোম্পানীর টিকিট-কাটা সাহেব বাস করছে—ঐখানটায় ছিল সিদ্ধির জঙ্গল। এখন যেখানে ছোকরা টম্ সাহেব মনিহারী দোকান করেছে, যাতে এখন চাটনী, টফি, বিস্কুট, ডিম, ক্রোচেট স্থতো, গ্রামোফোন রেকর্ড, পুরানো সেলাই-এর কল পাওয়া যায়, ঐখানে ছিল একটা ছোট শিবমন্দির, আর ওরই পুরুত ছিল এক কুঁজো বুড়ো তার বয়স তখনই হবে একশ' তু বছর, সে যখন চলত তার মুখটা হাঁটুতে গিয়ে ঠেকত, আর হাত তুটো দাঁড় বাইবার মত একবার পিঠের দিকে একবার মাথার কাছে উঠত। সে রোজ সকালে সন্ধ্যায় সাজি হাতে, খড়ম পায়ে বেরুত আর টপাটপ কচি সবুজপাতা ছিঁড়ত। আমি রোজ দেখতুম—একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বাবাঠাকুর, ওগুলো কি পাতা? বিল্বিপত্তর বুঝি? বাবাঠাকুর কুঁজো অবস্থাতেই নীচু দিক থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "তুই বুঝি শ্যামের নাতি, একটা আস্ত অনড্বান্ কোথাকার!" পরে বড় হয়ে খোঁজ নিয়ে জানলুম ওটা সিদ্ধির জঙ্গল। সে কি আজকের কথা! ঠাকুর্দ্দার নাম ছিল শ্যামশিব ভট্‌চায্যি! কিন্তু লোকে বলত 'লণ্ঠন ভট্‌চায্যি'। কেননা তিনি লণ্ঠন হাতে বাড়ী বাড়ী রাত্রে আরতি সেরে আসতেন। তিনি মারা যান নিরানব্বই বয়সে। তারপর বাবা, তারপর আমি—

কেশব বাবুর সব কটি ছেলেমেয়েদের নামকরণ হ'য়েছে দেবদেবীর নামের অনুকরণে, কেবল ব্যতিক্রম ঘটেছে বড় মেয়ে চারুশীলার বেলায়। এই রকম ব্যতিক্রম ঘটার একটু কারণ আছে। কেশব বাবুর শ্বশুর বাড়ী নবদ্বীপ এবং তাঁরা পরম বৈষ্ণব। বড় মেয়ের অন্নপ্রাশনের সময় কেশব বাবুর সঙ্গে কেশব বাবুর ম্লেচ্ছ অফিসে চাকুরি করা, পেঁয়াজ ও ডিম খাওয়া প্রভৃতি কারণে মতদ্বৈধ হয় ও মনোমালিন্য ঘটে। কাজে কাজেই মামারা যথাবিধি নিমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও না আসায় কেশববাবু অত্যন্ত ক্রোধান্ধ হ'য়ে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করেই মেয়ের নামকরণ করলেন—চারুশীলা।

এই সময়ে কেশববাবু শ্বশুরবাড়ীর ওপর বিরক্ত থাকায় আইনতঃ নিজের স্ত্রী ব্রজবালার ওপরেও চটলেন। স্নুতরাং চারুশীলা মায়ের বিরক্তি নিয়ে ও বাপের

কোলে চেপে আদর খেয়ে মানুষ হ'ল। তারপর একে একে নিমে হ'ল, মেনকা হ'ল, জগা হ'ল এবং আরও হ'তে থাকল। কেশববাবু তখন প্রথমে নিজের ওপর, পরে স্ত্রীর ওপর এবং সারা বিশ্ব ও বিশ্বকর্ত্তার ওপর বিরক্ত হ'য়ে বড়মেয়ে চারুশীলাকে ব্রজবালার হেপাজতে ফেলে দিলেন এবং নিজে আশ্রয় নিলেন নিমগাছের তলায় ও তামাকের ধোঁয়ায়।

নিমগাছের তলায় রাত্রে হুঁকো টানতে টানতে বোজা চোখে তন্দ্রা লাগলে যেমন কেশব ভট্‌চায্যির হাত থেকে হঠাৎ হুঁকোটি পড়ে যায় ঠিক তেমনি করেই চারুশীলার শিক্ষার দিকে গত কয়েক বছর চোখ বুজে থাকায় চারুশীলার শীলতাটুকু কোন সুযোগে খসে গেল। সে পনেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত পরল ফ্রক আর ইজের আর প্রাণভরে মিশল ফিরিঙ্গি সমবয়সী প্রতিবেশী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে। এই নিয়ে ভট্‌চায্যি পরিবারে বিশেষ একটু অশান্তি; কেশবগিন্নি কান্নাকাটি করেন, মাঝে মাঝে অভিমানে আহার বন্ধ রাখেন ও চারুকে 'আপদ্', 'জ্বালা', 'শত্রু' আখ্যা দিয়েও শান্তি পান না।

পাড়ার ঐ সব অখ্যাতনামা ফিরিঙ্গি পুঙ্গব ও পুঙ্গবীদের সঙ্গে মেশার ফলে তার নাম 'চারু' থেকে 'চেরী'তে দাঁড়াল। পাশের বাড়ীর মেয়ে 'ডোরি'—লম্বা ঢেঙা গড়ন, মুখে বসন্তর দাগ, চোখ দুটো বড় বড়, মাথার চুল পাতলা, পরণে আধ-ময়লা ফ্রক, পায়ে গোড়ালি-ভাঙ্গা ফুল-শ্লীপার,—চারুর বিশিষ্ট বন্ধু—ওদিকের নীচু পাঁচিলের ওপর অর্দ্ধেক বুক ঝুঁকিয়ে প্রায়ই ডাকে—চে—রী—

নিমগাছের সরুসরু ডালের আড়ালে তার মুখখানা অস্পষ্ট দেখা যায়। ব্রজবালা রান্নাঘর থেকে খুন্তি হাতে তেড়ে আসে—দাঁড়াত রে, চেরী বলা ঘোচাই—তোদের মুণ্ডু, চেরী না চেড়ী।

ইতিমধ্যে চেরী টুক্ ক'রে পাঁচিল টপ্‌কে ডোরিদের বাড়ীতে লাফিয়ে পড়েছে ---মা ধরতেই পারে না।

তারপর দুপুরে ফাঁকা রাস্তায় হয়ত চাকার ফাঁকে সরু লোহার শিক্ লাগিয়ে এ মোড় থেকে ও মোড় পর্য্যন্ত ছুটে বেড়ায়; নয়ত একটা টেনিস্ বলকে পায়ে ক'রে কাড়াকাড়ি করে; নয়ত ডোরিদের উঁচু রকের ওপর পা ঝুলিয়ে, কিটি, অ্যান্সীর সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে মানে না বুঝেই "বেদিং ইন্ দি মুন্‌লাইট" করে; কখনও বা লাফিয়ে পড়ে "ক্যাচ মি" ব'লে এক ছুটে নিজের বাড়ীতে মার রান্নাঘরের দরজায়

এসে পৌঁছয়—পেছনে পেছনে আসে তার ক্ষুদ্র দলটি। মা বেরিয়ে এসে তাড়া দেয় —বের, বের। চারু এগিয়ে গিয়ে বলে—দেখনা, ধরছে—ব্রজবালা দাঁত খিঁচিয়ে বলে—ছুঁসনে, ছুঁসনে আমায়, চারী।

এর ফলে চারু শিখল—ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরিজি বলতে, চলতি ইংরিজি কথা বেশীর ভাগই বুঝতে, ছুটতে শিখল হরিণীর মত, যে কোনও পুরুষের মত সাইকেল চালাতে শিখল, ভাইবোনদের প্রহার দিতে শিখল,"My God", "By Jove","No fear" ইত্যাদি বলতে বেশ অভ্যস্ত হ'ল; আর শিখল না—ভাল ক'রে গুছিয়ে সাড়ী পরতে, তুলসী তলায় গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করতে, মা বাপের কথা ধ্রুব সত্য ব'লে মেনে নিতে, পান খেতে, মাইরি বলতে—

কিন্তু এ ছাড়া সে আরও অনেক জিনিষ শিখল। সে বাপের তামাক সেজে দেয়, তাঁর হাত পায়ের আঙ্গুল মট্‌মট্‌ ক'রে মটকে দেয়, রাত্রে ভূতের ভয় না পেয়ে যে কোনও জায়গায় যেতে পারে, বাপের সঙ্গে বাজার করে' মুটে বেশী পয়সার জন্যে গোলমাল করলে ধমক দেয়—অর্থাৎ এক কথায় দরকারি অনেক জিনিষ সে শিখল না, অদরকারি অনেক কিছু শিখল।

চারুর নামে ব্রজবালা স্বামীর কাছে হাজার রকম নালিশ করে—মেয়েটার মাথা তুমিই সত্যি খেলে, বল দেখি---চারু, এটা কর, তুলসীতলায় পিদিমটা একবার দেখা ত। কে কার কথা শোনে, ততক্ষণ জগা, নিমের সঙ্গে মারামারি করবে। আজ কি করেছে, জান? নিমগাছে কোত্থেকে একটা বাঁদর এসেছে—চারীর অমনি টনক পড়ল। সারা দুপুর দুহাতে দুটি কলা নিয়ে ধিঙ্গি মেয়ে ছাদের সমান সমান ঐ যে নিমের মোটা ডালটা—তারই ওপর চেপে বসে আছে—কিছুতে নামল? ভাল কথায় বললুম, গালাগাল দিলুম, সারা দুপুর আমার বুকের ভেতর টিপ্‌টিপ্‌ করতে থাকে, কখন যে হাতটা ভাঙ্গে কি পাটা ভাঙ্গে তার কিছু ঠিক আছে। সত্যি বলছি তোমাকে আমার আর ভাল লাগে না, এর যা হয় একটা ব্যবস্থা কর। শুনছ? না, এক মনেই খেয়ে চলেছ—কথাগুলো বোধহয় কানেই ঢুকছে না—

কেশব ভটচাযি্য জলের গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন—হুঁ।

ব্রজবালা বিরক্ত হ'য়ে উঠে প'ড়ে বলে—তোমার মুখে কেবল 'হুঁ'-টাই লেগে আছে।

কিন্তু যে কেশব ভটচাযি্যকে চেনে সে তার 'হুঁ'-টাকেও চেনে। আপিসের

সাহেব কেশব বাবুকে কোনও কাজ দিয়ে আগে কেশব বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে—yes বলে কি 'হুঁ' বলে। কেশব বাবুর মুখ থেকে যদি 'হুঁ' বেরুল, ত সাহেব একটা শিস্ মেরে সিগ্রেট টানতে বসল। অর্থাৎ ভাবনা নেই, রাত্রি বারোটাও যদি বাজে কেশব কাজ শেষ না ক'রে বাড়ী যাবে না। আপিসের দারোয়ান যাবে, মেথর ঝাঁট দিয়ে যাবে—কেশব ঠিক কাজ করবে।

(৩)

সুতরাং একদিন কেশব ভট্চায্ আপিস থেকে রাত করে বাড়ী এসে গলার চাদরখানি গিন্নীর হাতে তুলে দিলে এবং একটা টুলের ওপর বসে পায়ের তালি দেওয়া হুড বার্নিশ জুতোর এক পাটি টেনে খুলে ফেলে গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—সোমবার চারীর পাকা দেখা, আর এই ২৯শে ফাল্গুন বিয়ে। প্রায় একমাস সময় আছে, এরই ভেতর সব যোগাড় যন্তর করে নিতে হবে। পাত্র আশীর্ব্বাদ সেরে এলুম—

ব্রজবালা হাতের হুঁকো আলমারির গায়ে ঠেসিয়ে রেখে দিলে। তার সাধারণতঃ বড় বড় চোখ দু'টো আরও বড় হয়ে উঠেছে। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—তার মানে?

মানে করার লোভ কেশব বাবুর নেই। দেয়াল-ঠেসানো হুঁকোটি তুলে নিয়ে সটান নিমগাছের তলায় বেদীর ওপর গিয়ে আশ্রয় নিলে।

ব্রজবালাও পাছু নিলে।

সত্যি সত্যিই একদিন ২৯শে ফাল্গুন এল। কেশব বাবুর বাড়ীময় কচি নিমফুল, ফল ও পাতার একটা তেতো অথচ সোঁদা মিষ্টি গন্ধ। কেশবগিন্নীর মুখ ভার, নিমে, জগা, মেনকা, পঞ্চা সকলের আনন্দ ধরে না—দিদির বিয়ে—সকাল হ'তে না হ'তেই তাদের হাতে দু'টো করে পান্তুয়া। কর্ত্তার বাঁ হাতে হুঁকো, এক ট্যাঁকে খুচরো ভাঙ্গানো পয়সা, অন্য ট্যাঁকে একটা বটুয়া—কিছু খুচরা টাকা। দুটি ট্যাঁক উঁচু হওয়ায় দুপায়ের কাপড় হাঁটুর ওপর। ভোর রাত্রে কখন হাটে মাছ কিনতে গেছলেন। এইমাত্র উঠানে একমোট মাছ এনে ঢেলেছেন।

চারুর এক মাসী উলুবেড়ে থেকে এসেছেন; তাঁরই পাঁচ-সাতটা ছেলে মেয়ে সারা বাড়ীময় সোরগোল করে বেড়াচ্ছে।

চারুর ছোট মামা ও মেজ মামা এসেছেন। বড় মাসী ও তাঁর বড় ছেলে এসেছেন, কিন্তু বড় মামা আসেননি---এখানে আসা তাঁর পোষায়না—কেশবের বাড়ীতে যা সব ম্লেচ্ছয়ানি কাণ্ড। তবে চারুর জন্যে একখানি ভারী সোনার বাজু পাঠিয়ে দেছেন।

কেশব ভটচায্যি সারাদিন ঘোরাফেরার মধ্যে একটা জিনিষ ভোলেননি, ইতিমধ্যে ব্রজবালাকে অনেকবার আড়ালে ডেকে এনে বলেছেন, দেখো, হাত টেনে চলো, এরই মধ্যে সব কুলান করা চাই। কিছু সন্দেশ আর পান্তুয়া আলাদা সরিয়ে রেখে দাও, বাড়তি থাকে ত ফণে ময়রা ফেরৎ নেবে বলেছে। বাড়তি থাকবে বলে ত বোধ হচ্ছে না—ঐ উলুবেড়ের মাম্‌দোগুলো সকাল থেকে যে পরিমাণে চালাচ্ছে—

ব্রজবালার কানে এসবের কিছুই পৌছচ্ছেনা, কাজের বাড়ীর অপরিষ্কার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ ছুটো মুছে নিয়ে বল্‌লে, হ্যাঁগা এখনও সত্যি করে বল, পাত্তরটি ভাল ত? মেয়ে আমার সুখী হবে ত? আমার বুকের মধ্যে যে থেকে থেকে কি রকম করে উঠছে, আমি যে হাতে পায়ে জোর পাচ্ছি না, একে পাড়াগাঁ, তায় বয়স কিছু বেশী, এখনও বল—দিদি বলছিল ওর সম্পর্কে ভাসুর হয়, হাওড়ার উকীল—তারই এক ছেলে, ছাব্বিশ-সাতাশ বয়েস, লেখাপড়ায় নাকি খুব ভাল—

ব্রজবালার বাকি কথা অর্দ্ধেক ঠোঁঠে অর্দ্ধেক মনেই রয়ে গেল।

'ধুত্তোর' বলে কেশব ভটচায্যি তীর বেগে ছুটে গিয়ে নিমের গালে একটি চড় বসিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে লম্বা এক ফালি কাগজ কেড়ে নিয়ে বাইরের দিকে চলে গেল।

দালানের মাঝখানে মেজ শ্যালা শচীতুলালের সঙ্গে দেখা—শচীতুলাল অল্প একটু হেসে বল্‌লে, কি হে কেশব, ব্যাপার কি—নিমেটাকে ওরকম চড়ালে কেন। আজকের দিনে আর মার ধোর ক'রনা।

"আরে ভাই জ্বালাতন! গয়লার ফর্দ্দটা এখনই ছিঁড়ে দিয়েছিল। বেটা প্রত্যেকটায় একআনা করে মন পেছু চড়িয়ে দাম ধরেছিল। আধঘণ্টা ধরে কষে ঠিক করে রেখেছি, ন্যায্য পাওনা এলেই ফেলে দেব"—

অসমাপ্ত অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলেন।

বিয়ে বাড়ীর গণ্ডগোলের মধ্যে মাঝে মাঝে চারুকে দেখা যায় না। হাঁক ডাকের পর দেখা গেল চিলকোটায় বসে—সঙ্গে ডোরি পরণে, তার গায়ে-হলুদের হলুদ মাখা কাপড়, হাতে তেঁতুলের আচার।

সকলেই চেঁচিয়ে উঠল—ফেলে দে, ফেলে দে, ফেল্—আজ খেতে নেই।

চারু বিরক্ত হয়। ডোরি কিছু না বলে একবার সকলের মুখের দিকে তাকায়, পরে এক সময় পাঁচিল টপকে বাড়ী পালায়।

সুখে, দুঃখে, শান্তিতে, গণ্ডগোলে চারুর বিয়ে হয়ে গেল। আজ সে চলে যাবে। পাত্রের নাম রামপদ—বয়স সাঁইত্রিশের এদিকে নয় বর্দ্ধমানের এক গণ্ডগ্রামে বাড়ী, অনেক জোতজমি, গোঁড়া ব্রাহ্মণ, কলকাতায় জীবনে এই প্রথম আসা—মামলা সম্পর্কে দু'একবার বর্দ্ধমান সহরে এসেছে। দেশের গোবর্দ্ধন পণ্ডিতের পাঠশালায় কাঠাকালি, বিঘাকালি পর্য্যন্ত কষেছে! শ্বশুরের মতই চটপট হিসেব কষে ফেলতে পারে। কতখানি আখ বসালে কোন জমিতে কতখানি গুড় পাওয়া যায়; পুকুরের মাছ প্রথম বছর যে পরিমাণে বাড়ে ফিরে বছর সে পরিমাণে বাড়তে পারে কি না; এবারের ধানে মন পেছু এক আনা পেতে হলে আরও পনেরো দিন কি পঁচিশ দিন আটকে রাখতে পারা যায় কিনা ইত্যাদি।—

কেশব ভট্‌চায ভারি খুসী—জামাই-এর মত জামাই। শ্যালারা সকলে কাণ্ড দেখে চুপচাপ। হয়ত এক একবার ভেবেছে মন্দ কি, মোটা কাপড়, মোটা ভাতের অভাব হবে না।

ব্রজবালার চোখ লাল,—সারা দিনরাতই ঝাপসা,—তার কান্নার বিরাম নেই—কোনও সান্ত্বনাই নেই। আপন মনেই কেবল বলে—বাপ হয়ে কি করে পারলে। চোখে জল ভরে আসে। কর্ত্তার ভয়ে মুছে ফেলে।

সকালে বর-বধূর বরণ হল—দুজনেরই লাল চেলি—চারুর কাপড় পরা অনভ্যাস। কিছুতেই কাপড় সামলাতে পারছিল না। বাঁ হাতে হাঁটুর কাছের কাপড় ধরা। কাল থেকে হঠাৎ আপন মনে খিল খিল করে হেসে উঠছিল। ব্রজবালা অনেক শাসন করেছেন। কিন্তু তবু তার হাসি বাগ মানে না। ব্রজবালা ধমক দিলেই বলে—"মা, ডান হাতে ছটা আঙ্গুল—দুটো বুড়ো আঙ্গুল। বাড়তি

বুড়ো আঙ্গুলটার কথা মনে হলেই আমার হাসি পায় যে।" ব্রজবালা বলে, "ছিঃ, বলতে নেই,—স্বামী হয়। আর ওরকম হেসোনা।"

নিমগাছের তলায় জগা, নিমে, পঞ্চা ইত্যাদি যত ছেলে পুলে, ওদিকে ব্রজবালা, চারুর মাসী, বড় মাসী ইত্যাদি, এদিকে মামারা, কেশববাবু,—ওদিকে পাঁচিলে ডোরি, বিলি, মার্সেল—

কাল থেকে অনেক গবেষণার পর চারু তার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি ভাইবোনদের মধ্যে ও কিছু ডোরিকে দিয়ে দিয়েছে। নিমের ভাগে একটা ভাল খাঁজ কাটা চাকা ও ইস্পাতের বাঁকানো শিক। ডোরির ভাগে একটা বড় ঘাঘরা পরা 'ডল' পুতুল, এইটি চারুর অত্যন্ত প্রিয় জিনিষ। ডোরি ফেরৎ দেয়, নিতে চায় না, বন্ধুই যখন চলে যাচ্ছে, কি হবে তার পুতুল!

বিদায়ক্ষণে চারুর মা, মাসী, মামা, প্রভৃতি সকলেই যখন নাক মুছছে, চারু তখন ডোরির দিকে তাকিয়ে শেষ বারের মত মুখ ভেংচে জিভ দেখাতে গিয়ে ফুঁপিয়ে কেদে উঠল। তার দু চোখ জলে ভাসছে, ডোরি কেঁদে ফেলে ফ্রকের আধখানা ভিজিয়ে ফেলেছে।

কেশববাবু রাস্তার উঠানে চুপচাপ বসে আছে। মুখে তার একটা কথা নেই। ট্যাকসী ছাড়বার আগে হঠাৎ চীৎকার করে উঠে' একাকার বাঁধিয়ে দিলেন। "কদম, কদম, গেলি কোথায়—যা, যা, উঠে পড় আর দেরী করিসনে, ট্রেণের সময় হল—দুর্গা, দুর্গা,—ওগো, ছেড়ে দাও হয়েছে, দেখো বাবাজী ট্রেণে একটু সাবধানে যেও।"

ব্রজবালার চারুকে দেখা যেন আর শেষ হয় না, মেয়ে জামাইকে কি বলতে যান, কিন্তু বলতে পারেন না, ঠোঁঠ দুটো বারবার কেঁপে উঠে থেমে যায়।

এরই মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে। ডোরি গাড়ী ছাড়ার ঠিক আগেটাই ছুটে বাড়ী চলে গেছে, বিদায়-ব্যথা বন্ধুর পক্ষে অসহনীয়—কেশববাবুর মুখে এক অদ্ভুত হাসি—"যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, ভালয় ভালয় চুকল, বুঝেছ শচী"। চোখ দুটি তাঁর ছলছলে, শচী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ব্রজবালাকে এক রকম ধরাধরি করেই বাড়ীর মধ্যে নিয়ে যেতে হয়। কেশব বাবু নূতন করে তামাক ধরান।

নুটবিহারী মুখোপাধ্যায়

জাপানের শিল্পসঙ্কট

সে বেশী দিনের কথা নহে যখন জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকার ছিল না, আজ তাহার পণ্য দ্রব্যের আক্রমণে পাশ্চাত্য জগত সন্ত্রস্ত। অতি অল্প কালের মধ্যে জাপান শিল্প-সাধনায় এমন সিদ্ধি লাভ করিয়াছে যে তাহার রপ্তানী কেবল কাপড়, খেলনা বা গালায় তৈয়ারী দ্রব্যাদিতেই সীমাবদ্ধ নহে; আজ জাপানী বিদ্যুত্‍উৎপাদক যন্ত্র, মোটরকার, সাইকেল, গ্রামোফোন, বেতার যন্ত্র কেবল দেশবিদেশের হাটে বাজারে ছড়াইয়া পড়ে নাই, পশ্চিম ইউরোপের শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে নির্ম্মিত ঐ সকল দ্রব্য যে দরে বিক্রয় হয় তাহার অপেক্ষা শতকরা দশ-পনেরো টাকা সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। বস্ত্রবয়নের প্রধানতম কেন্দ্র ম্যাঞ্চেষ্টার জাপানী বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় বিপন্ন এবং জাপানী টয়োডা তাঁতের শ্রেষ্ঠত্ব তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

জাপানী শিল্পের এই দ্রুত উৎকর্ষ বাস্তবিকই ইন্দ্রজাল বলিয়া মনে হয়। যে যে সুবিধা বর্ত্তমান থাকিলে শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে পারা যায়, জাপানে তাহার একান্ত অভাব। দেশে কাঁচামাল যথেষ্ট পরিমাণে মেলে না, লৌহ ও কয়লার জন্য বিদেশীর নিকট হাত পাতিতে হয়, অথচ কি করিয়া জাপান এত সস্তাদরে দূরদূরান্তের হাটে আপন পণ্য যোগাইতে পারে, তাহা বুঝিতে হইলে জাপানী শিল্পসংগঠনের আলোচনা আবশ্যক।

জাপানী শিল্পধারার প্রধান বিশেষত্ব তাহার বহুমুখিতা। জাপান অনেকাংশে ইউরোপীয় আচার ব্যবহার গ্রহণ করিলেও, স্বদেশীয় প্রথা একেবারে ত্যাগ করে নাই। বিলাতী ধরণের চামড়ার জুতার যেমন চলন হইয়াছে, জাপানী তাবিরও আদর কিছুমাত্র কমে নাই। সেইজন্য জাপানী শিল্পকে নবীন ও প্রাচীন জাপানের চাহিদা যোগাইতে হইতেছে, ইহার ফলে তাহাকে বহুপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইতেছে এবং সাবেক শিল্পপ্রথার সংরক্ষণের সহিত আধুনিক কলকারখানার উন্নতিসাধনে সমভাবেই মনোযোগ দিতে হইয়াছে। অনেকস্থলে সেকেলে ধরণের কারখানাকে আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া স্বদেশী ও বিদেশী ধরণের দ্রব্য প্রস্তুতের উপযোগী করা হইয়াছে। ওসাকার এক সুবৃহৎ কারখানা

তাবির সঙ্গে পরিবার মোজা প্রস্তুত করিত ; এখন সেখানে বিলাতী মোজা বোনারও ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমাদের দেশে কুটীরশিল্পগুলি একে একে লোপ পাইতেছে এবং তাহার স্থলে বৃহদাকার কারখানার উদ্ভব হইয়াছে। জাপানের নূতন শিল্পসৌধ পুরাতন কুটীরশিল্পের ভগ্নাবশেষের উপর গঠিত হয় নাই। সেখানে কুটীরশিল্প সুসংস্কৃত হইয়া আধুনিক কারখানাকে নানাপ্রকারে সহায়তা করিতেছে, এবং যে যে শিল্পে যন্ত্রের প্রয়োগ আধুনিক প্রণালীতে হইয়াছে, সেখানেও অতিকায় কারখানার সৃষ্টি সর্ব্বত্র হয় নাই। জাপানী কার্পাস বস্ত্রের শতকরা আঠারো ভাগ, পশমী বস্ত্রের আঠাশ, রেশমী বস্ত্রের অর্দ্ধেক, বাইসিকেলের ছেষট্টি ভাগ ও প্রায় সমস্ত জাপানী পেন্সিল তৈয়ারী হয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানায়, যেখানে পাঁচ জনেরও কম শ্রমিক খাটে। জাপানে প্রস্তুত মোট মালের দশভাগের একভাগ এই সকল কারখানায় প্রস্তুত। ইহা অপেক্ষা কিছু বড় কারখানায়, যেখানে দশ হইতে পঞ্চশ জন শ্রমিক খাটে, জাপানের এক তৃতীয়াংশ মাল প্রস্তুত হয়। মোটকথা জাপানী মালের অর্দ্ধেক ছোট ও মাঝারি কারখানায় তৈয়ারী এবং এই ছোট ও বড়র সমন্বয় জাপান অতি সুকৌশলে করিয়া শিল্পজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। গত বারো বৎসরের মধ্যে এই সকল কারখানার সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। ইহার প্রধান কারণ জাপানের কৃষিকর্ম্মে লাভের স্বল্পতা ও জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি। জন্মের উচ্চহার ও মৃত্যুর নিম্ন-হারের ফলে ওই দেশে লোকসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধি দশ লক্ষের বেশী। কৃষি বিস্তারের সুযোগ কম, যেখানে যত কর্ষণোপযোগী জমি আছে তাহা কারখানার কাজে লাগানো যাইতেছে ; সুতরাং কৃষিকর্ম্মে বেশী লোকের স্থান হইতে পারে না। বিদেশে গিয়া বসবাস করিবার আগ্রহ জাপানীর কমই এবং দেশবিদেশের বিধি-নিষেধের ফলে সুযোগও বেশী নাই ; সুতরাং শিল্পবৃদ্ধিই ইহাদের একমাত্র ভরসা। জাপানের কলকারখানায় এখন পঁচিশ লক্ষ লোক খাটিতেছে, তাহাদের তৈয়ারী দ্রব্য এখনই অন্যান্য দেশের ত্রাসের কারণ হইয়াছে। বাৎসরিক এই হারে যদি লোক-সংখ্যা বাড়িতে থাকে তাহা হইলে এই উদ্বৃত্ত জনসংখ্যাকে উপযুক্ত কাজ দিবার জন্য কলকারখানার সংখ্যা প্রতিবৎসর এক তৃতীয়াংশেরও অধিক বাড়ানো আবশ্যক, কিন্তু ইহা কার্য্যে পরিণত করা সুকঠিন, কারণ শিল্পের আয়তন বৃদ্ধির জন্য মূলধন ও কাঁচামালের যেমন প্রয়োজন উৎপন্ন দ্রব্যকে দেশবিদেশে বেচিবার ব্যবস্থাও তদ্রূপ

অবশ্যকর্ত্তব্য। সুতরাং এখন শিল্প সকলকে স্থান দিতে পারিতেছে না। জাপানী শ্রমিক নামমাত্র মজুরীতেও কাজ পাইলে বাঁচিয়া যায়। ক্ষুদ্র কারখানাগুলি এই সুযোগের যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিয়াছে। জাপানী ফ্যাক্টরী আইনের বিধি-নিষেধ ক্ষুদ্র কারখানার উপর খাটে না বলিয়া এখানে দৈনিক দশ ঘণ্টার অধিক লোক খাটানোয় কোন বাধা নাই বা শ্রমিকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কাহাকেও কৈফিয়ত দিতে হয় না। ক্ষুদ্র কারখানায় মালিকের কর্ত্তৃত্ব অপ্রতিহত, কারখানার শ্রমিক তাঁহার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্য দেশের তুলনায় ইহারা প্রায় পেট-ভাতায় খাটে বলিয়া তৈয়ারী খরচ পড়ে কম। বৈদ্যুতিক শক্তি সস্তায় সরবরাহ ও উৎপন্ন মাল বিক্রয়ের সুব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্র কারখানায় মালের পড়তা বেশী নহে, সেই জন্য প্রতিযোগিতায় ইহারা আত্মরক্ষা অতি সহজেই করিতে পারে। আবার অনেকস্থলে এই ক্ষুদ্র কারখানাগুলি অতিকায় ধনিক সংঘের কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয় বলিয়া বৃহৎ কারখানার স্বার্থের সহিত ইহাদের সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিশেষ নাই। অনেক স্থলে ইহারা বৃহৎ কারখানার অধীনে ফুরণে কাজ করে এবং ইহার ফলে প্রতিযোগিতার পরিবর্ত্তে সহযোগিতার সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে।

জাপানী কারখানায় মালিক ও শ্রমিকদের সম্বন্ধ ঠিক প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ নহে, বরং অনেকাংশে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ, সেইজন্য অপরাপর দেশ অপেক্ষা মজুরীর হার অনেক কম ও কার্য্যের সময় অনেক বেশী হইলেও উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতির অভাব নাই। এই কারণে জাপানে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন কখনও প্রবল হয় নাই। শ্রমিক কারখানায় প্রবেশ করে শিক্ষানবিশ হইয়া এবং এই সময় সে অতি সামান্য নগদ মজুরী পাইলেও তাহার আহার ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। নিয়মিত ভাবে কাজে উপস্থিতির জন্য সে যথোচিত পুরস্কার পায়। জাপানী শ্রমিকের মজুরী কম হইলেও সে অসুখী নহে কারণ তাহার অভাবও বেশী নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি পরিবারের উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্বামী, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নী, মাতা, শ্যালিকা ও দুটি শিশু লইয়া এই শ্রমিক পরিবার। স্বামী কর্ম্মদক্ষ এঞ্জিন-চালক, প্রত্যহ নয় ঘণ্টা কাজ করিতে হয়, মাসিক বেতন ছেচল্লিশ টাকা। তাহার ভগ্নী, বয়স বাইশ, এক পেট্রোলের পাম্পে প্রত্যহ এগারো ঘণ্টা খাটিয়া মাসিক বিশ টাকা উপার্জ্জন করে। তাহার শ্যালিকা এক মোজার কারখানায় কাজ করিয়া দশ টাকা পায়। মাতার বয়স হইয়াছে, ভ্রাতা চিররুগ্ন এবং স্ত্রীকেই গৃহকর্ম্ম দেখিতে হয়,

সুতরাং পরিবারের ভরসা এই তিনজনের বেতন ছিয়াত্তর টাকা। বাসাটি দ্বিতল,উপরে নীচে চারখানি ঘর, ভাড়া তেইশ টাকা। এই চারখানি ঘরই বসিবার ও শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। গৃহে আসবাব যৎসামান্য, প্রত্যেকের জন্য একখানি মাতুর আছে, দিনে এই মাতুরগুলি ও বস্ত্রাদি সিন্ধুকে রাখা হয়। খাদ্যের মধ্যে চাউল ও ডাল (মিসো), চাট্‌নী ও দধি সর্ব্বপ্রধান। খোরাকী, সংবাদপত্র, সিনেমা প্রভৃতিতে মাসিক ব্যয় বাহান্ন টাকা, চব্বিশ টাকা বাঁচে। ইহা হইতে মহাজনের প্রাপ্য দিয়া বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। বৎসরান্তে পুরস্কার হিসাবে যাহা পাওয়া যায়, বস্ত্রাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হয়।

দ্বিতীয় পরিবারের গৃহস্বামী পেন্সিলের এক ক্ষুদ্র কারখানায় কাজ করে, মাসিক বেতন চব্বিশ টাকা। কার্য্যকাল—সকাল সাতটা হইতে সন্ধ্যা ছয়টা, মধ্যে এক ঘণ্টা ছুটী। তাহার গৃহে সে একটি ছোট কারখানা খুলিয়াছে। কারখানা হইতে পেন্সিল আনিয়া সেখানে বাণ্ডিল বাঁধা হয়। এই কারখানায় সন্ধ্যার পর সে ও তাহার স্ত্রী সেই কাজ করে, এক প্রতিবেশীর তিনটি ছেলেও সাহায্য করে। খরচ বাদে এই কাজে তাহাদের মাসিক আয় নয় টাকা। বাড়িভাড়া পাঁচ টাকা, কয়লা, গ্যাস ও ইলেক্‌ট্রিকের ব্যয় দুই টাকা, খোরাকী চৌদ্দ টাকা, বস্ত্রাদি তিন টাকা, সাকে, তামাক ও সিনেমা বাবদ চার টাকা, স্বাস্থ্যবীমার দরুণ দেয় এক টাকা, অর্থাৎ মোট ব্যয় ঊনত্রিশ টাকা, সুতরাং প্রতিমাসে চার টাকার বেশী বাঁচে না এবং কোন অপ্রত্যাশিত ব্যয় ঘটিলে, ধার করিতে হয়।

গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জাপানী শ্রমশিল্পে আর এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মহাসমরের পূর্ব্বে জাপানী মালের অর্দ্ধেক যোগাইত কাপড়ের কল কিন্তু এখন যদিও কাপড়ের কল সংখ্যা ও আয়তনে যথেষ্ট বাড়িয়াছে, জাপানী শিল্পজগতে তাহার আর সে প্রাধান্য নাই, কারণ ধাতব শিল্প, কলকব্জা নির্ম্মাণের কারখানা, রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের কারখানার দ্রুত বৃদ্ধি হইয়াছে। কাঁচামালের অপ্রাচুর্য্যবশতঃ জাপান এখন চেষ্টা করিতেছে, সেইসব বস্তু প্রস্তুত করিতে যাহা জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয়। এই সকল সামগ্রীর চাহিদা সর্ব্বত্রই বেশী এবং ইহাতে লাভও যথেষ্ট। তাহার লক্ষ্য বিদেশে সস্তায় মাল পাঠনো, যাহাতে অতি দরিদ্রও তাহার কাম্য বস্তু হইতে বঞ্চিত না হয়। জাপানের চেষ্টা সকলকে তাহাদের প্রয়োজনমত দ্রব্য যথাসম্ভব সস্তাদরে যোগানো,সেইজন্য এক গজ ফ্লানেলের দাম দশ পয়সা, এক ডজন সাদা কামিজের দাম পাঁচ টাকা, এক ডজন থার্ম্মস্ ফ্লাস্ক

ছয় টাকায় পাওয়া যায় ও পাঁচ টাকা হইতে পনেরো টাকার মধ্যে মজবুত সাইকেল বিক্রয় হয়। ল্যাঙ্কাসায়ারে প্রস্তুত কাপড়ে এক ডজন কামিজ তৈয়ারী করিতে খরচ পড়ে কুড়ি টাকা আট আনা, অথচ জাপানী কাপড়ের কামিজ ম্যাঞ্চেষ্টারে বিক্রয় হয় তেরো টাকা দশ আনায়। একই ধরণের গ্রামোফোন, লণ্ডনে পড়তা পড়ে বাহাত্তর টাকা অথচ জাপান বিক্রয় করে সাতাশ টাকায়।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে রাষ্ট্রশক্তির আনুকূল্য জাপানের দ্রুত শিল্পোন্নতির মূলে। গভর্ণমেণ্ট কেবল উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া, মূলধন যোগাইয়া, জাপানের কৃতী ছাত্রের বিদেশী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শিল্পসৌধের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন। আবশ্যক হইলে আর্থিক সাহায্য-দানেও গভর্ণমেণ্ট কার্পণ্য করেন নাই। জাপানী পণ্য দেশবিদেশে সরবরাহ করিবার নিমিত্ত নৌবহর গঠন সরকারী অর্থসাহায্যে হইয়াছে। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করিতে গভর্ণমেণ্ট জাপানী মালের শতকরা ষোলো ভাগ নিজেই ক্রয় করেন। অন্যান্য দেশের তুলনায় শিল্পের উপর কর জাপানে অনেক কম। কৃষিকেই করভার বেশী বহন করিতে হয়। গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্বে কারখানাগুলি ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হইতেছে এবং এই সংঘগুলি বিদেশ হইতে একত্র কাঁচামাল আনয়ন, পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ও আবশ্যক মূলধন সংগ্রহে সহায়তা করিয়া শিল্পকে পোষণ করিতেছে। এই সংঘের চেষ্টার ফলে কেবল যে জাপানী শিল্পজাত পণ্য দেশবিদেশে কম খরচে পাঠানো সম্ভব হইয়াছে তাহা নহে, জাপানের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কারখানা একযোগে কার্য্য করিয়া পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে।

জাপানী শিল্পের ভিত্তি তাহার রপ্তানী বাণিজ্যে—তৈয়ারী মালের বিনিময়ে কাঁচামাল খরিদে। জাপানী কারখানার কাঁচামালের চাহিদার দুই তৃতীয়াংশ আসে বিদেশ হইতে এবং বিদেশে মাল বেচিয়া যে অর্থ আসে তাহার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ ব্যয় এই কাঁচামালের ক্রয়ে। গত বিশ বৎসরে জাপানের রপ্তানীর পরিমাণ পাঁচগুণ বাড়িয়াছে। আজ পৃথিবীর কাপাসবস্ত্রের বাণিজ্যে জাপানের অংশ শতকরা চল্লিশ ভাগ। নকল রেশমের রপ্তানীতে জাপানের স্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরেই। গত চার বৎসরের মধ্যে তাহার পশমী বস্ত্রের রপ্তানী চতুর্গুণ বাড়িয়াছে। নানা কারণে রপ্তানীর এই ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে বাধা পড়িতেছে এবং কি করিয়া, সুলভে কাঁচামাল সংগ্রহ ও দেশবিদেশে অবাধে প্রস্তুতমাল বেচিয়া শিল্পবৃদ্ধি করিবে,

ইহাই জাপানের এখন প্রধান সমস্যা। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিল্পজাগরণ আসিয়াছে, সকলেই আপন ঘর সামলাইতেই তৎপর, সেইজন্য অনেক দেশেই বাণিজ্যে পারম্পর্য্যনীতি অনুসৃত হইতেছে, ইহাতে পণ্যের কেনাবেচা, পরস্পরকে কি সুবিধা দিতে পারা যায়, তাহার উপর নির্ভর করিতেছে। এই দরদস্তুরে কাঁচা-মালের দারিদ্র্যের জন্য জাপান মুস্কিলে পড়িয়াছে। ভারতবর্ষকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছে যে জাপানী কাপড়ের রপ্তানীর বিনিময়ে সে ভারতীয় কার্পাস ক্রয় করিবে। যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে তাহার বিপদ হইয়াছে আরও বেশী। মার্কিনী কার্পাসের বিনিময়ে জাপান কাঁচা রেশম পাঠায়। রেশমী বস্ত্রের চাহিদা কমে বাড়ে দেশের আর্থিক অবস্থা অনুসারে কিন্তু জাপানের রেশম বেচিতে না পারিলে জাপানী কৃষকের অনাহার—সুতরাং কাপাসের যে কোন দরেই জাপানকে রেশম পাঠাইতে হয়। ইহাতে অনেক সময়ই জাপানকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ১৯২১ হইতে ১৯২৭-র মধ্যে জাপান এক পাউণ্ড রেশমের বিনিময়ে ত্রিশ পাউণ্ড কার্পাস পাইয়াছিল কিন্তু ১৯৩৪-এ নয় পাউণ্ডের বেশী পায় নাই। পূর্ব্বে জাপান যে মাল রপ্তানী করিত তাহাতে কাপাসের দাম বাদেও কিছু নগদ মুদ্রা আসিত, ১৯৩৪ হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। জাপানের বস্ত্রশিল্প বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনী কাপাসের চাহিদা বাড়িয়াছে কিন্তু জাপানী রেশমের চাহিদা যুক্তরাষ্ট্রে সে পরিমাণে বাড়ে নাই। ইহার ফলে জাপানের অবস্থা হইয়াছে শোচনীয় কারণ কাপাস ব্যতীত অন্যান্য কাঁচামালও জাপান যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রয় করিতে চাহে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র রেশম ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে, বরং কাপাস বস্ত্রের আমদানীতে বাধা দিতে দৃঢ়সংকল্প। এই অবস্থা বেশী দিন চলিলে হয়ত জাপানী রেশমশিল্প লোপ পাইবে।

শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্কটমোচন রাজ্য-বিস্তারের দ্বারা হইতে পারে, এই বিশ্বাসে চীন ও পূর্ব্ব সাইবিরিয়া গ্রাসে তাহার এত আগ্রহ। কিন্তু সত্য সত্যই যদি তাহাকে কোন প্রবল শত্রুর সহিত রণাঙ্গনে নামিতে হয় তাহা হইলে কি জাপানী শিল্পের মঙ্গল হইবে? যতদিন যুদ্ধ চলিবে, রপ্তানী কমিয়া যাইবে, কারণ কারখানাগুলি যুদ্ধের উপকরণ প্রস্তুতেই নিয়োজিত থাকিবে এবং যুদ্ধান্তে যে সহজেই আবার পূর্ব্বের খরিদ্দারকে ফিরিয়া পাওয়া সম্ভব হইবে, তাহা মনে হয় না। দেশের বেকার সমস্যা ও কৃষকের ঋণভার ক্রমশঃই বাড়িতেছে। গভর্ণমেণ্ট ঋণ করিয়া সামরিকশক্তি বৃদ্ধি করিতেছেন এবং এখন অনেক লোকই ইহার ফলে কাজ পাইয়াছে কিন্তু

ইহা যেদিন শেষ হইবে সেইদিন হইতে দেশে অশান্তির অনল জ্বলিয়া উঠিবে। জাপানের সৈনিকসংঘ ইহা বুঝিয়াছে, সেইজন্য তাহাদের চেষ্টা শাসনপদ্ধতি ও শিল্প-গঠনের আমূল সংস্কার। তাহারা বুঝিয়াছে যে জাপানকে সুরক্ষিত করিতে হইলে তাহার সামরিক শক্তি-বৃদ্ধির যেমন প্রয়োজন, অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানও তেমনই অত্যাবশ্যক। রাজনীতিবিদ্ ও ব্যাঙ্কারের নেতৃত্বে দেশে বৃহৎ বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিলেও জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বিশেষ বাড়ে নাই, সুতরাং এই দল কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতিকল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে জাপানের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্বাতন্ত্র্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মুষ্টিমেয় লোকের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইলেও জনসাধারণের দুর্দ্দশার সীমা নাই। শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধিত হইবে। ধনিক সম্প্রদায়ের মতে জাপানের কৃষির অবস্থা এত মন্দ যে তাহার উন্নতির প্রয়াস বাতুলতা, অতএব শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন বিস্তারই দেশের শ্রীবৃদ্ধির একমাত্র উপায়। ইহার প্রত্যুত্তরে সামরিকসংঘ বলেন যে কৃষিকে রক্ষা করা সকলের অবশ্যকর্ত্তব্য এবং ভবিষ্যতের শিল্পগঠনে বৃহৎ কারখানার প্রাধান্য হ্রাস করিয়া দেশের সর্ব্বত্র, নগরে ও গ্রামে, কুটীরশিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন কারখানা খোলা একান্ত প্রয়োজন যাহাতে অধিকাংশ লোকেরই কর্ম্মপ্রাপ্তির সুযোগ ঘটে। শিল্প বাণিজ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশের লোকের অভাব দূরীকরণ এবং দেশের চাহিদা মিটাইয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিবে, কেবল তাহাই বিদেশে পাঠাইবার প্রয়োজন হইবে। বিদেশী কাঁচামালের লোভে অধিক পরিমাণে মাল তৈয়ারী করিয়া তাহাকে সস্তাদরে না বেচিয়া জাপানের পক্ষে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরের মালমশলার উপরই নির্ভর করা বাঞ্ছনীয়। ইহার ফলে হয়ত সাময়িকভাবে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান কিছু কমিয়া যাইবে কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে ধনবণ্টনের বৈষম্য অনেকাংশে দূর হইবে এবং জনসাধারণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। মাঞ্চুকুয়ো করতলগত হইয়াছে এবং আবশ্যক হইলে সৈনিকদল চীনের অপরাংশ গ্রাস করিতে পশ্চাদপদ নহে কারণ সৈনিকসংঘ শিল্পের কাঁচামাল সংগ্রহে বৈদেশিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার পরিবর্ত্তে আত্মকর্ত্তৃত্বের পক্ষপাতী। এই সংঘের প্রাধান্য জাপানে ক্রমশঃ বাড়িতেছে, সুতরাং ইহারাই যে ভবিষ্যতে জাপানী শিল্পের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বাংলা শব্দের নূতন বানান

সকল বিষয়ের আদিম অবস্থায় কর্মসাধনই মানুষের প্রথম চিন্তা হয়; সে-সময়ে অনিয়মও আসিয়া পড়ে। পরে যখন অনিয়ম বড় হইয়া কর্মসাধনের পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়, তখন মানুষ নিয়মের কথা ভাবে, অনিয়মের সংস্কার কামনা করে। বাংলা ভাষারও লিখন-পঠনের আদিম অবস্থায় যে-অনিয়ম তাহাকে আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা আজ গুরু হইয়া সংস্কারের প্রয়োজনকেও গুরু করিয়া তুলিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সংস্কারের কাজে অগ্রণী হইয়া লেখক ও পাঠক সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার সমিতির পণ্ডিতগণ বাংলার বিশিষ্ট লেখকগণের অভিমত বিচার করিয়া বাংলা বানানের যে-নূতন নিয়ম বাঁধিয়াছেন, আমি সে-নিয়মের কিছু সমালোচনা করিতে চাই। কোন্ কোন্ আদর্শের মুখ চাহিয়া সমিতি এই নিয়ম গ্রথিত করিয়াছেন তাহা স্পষ্ট হইলে আমার সমালোচনার কাজ সহজ হইবে, এবং পাঠকেরও সুবোধ্য হইবে।

সমিতির প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য,—বাংলা শব্দের বহুরূপ বানানের একটি রূপ নির্দেশ। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য,—বাংলা বানানের সরলতা-সাধন। তৃতীয় উদ্দেশ্য—ছাপার কাজ যাহাতে সহজ হয়, বাংলা বানানের সরলতা-সম্পাদন-কালে সে-বিষয়েও লক্ষ্য রাখা।

সমিতির মতে কি কি করিলে উক্ত উদ্দেশ্যানুযায়ী বানান সহজ ও নির্দিষ্ট হইতে পারে তাহাও স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(১) সংস্কৃত ও অসংস্কৃত, এই উভয় শব্দেই যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জন। (২) অসংস্কৃত শব্দে ই-স্বরের এবং উ-স্বরের* যথাসম্ভব একটি গ্রহণ (অবশ্য উভয়ত্র প্রথম রূপের, অর্থাৎ ই এবং উ-এর প্রাধান্য মান্য)। (৩) ব্যঞ্জন বর্ণসমূহের মধ্যেও যে-বর্ণগুলির রূপ একাধিক, অসংস্কৃত শব্দে যথাসম্ভব তাহাদেরও একটি রূপ গ্রহণ; যেমন,—ণ এবং ন স্থানে শুধু ন ইত্যাদি। (৪) উচ্চারণ, ব্যুৎপত্তি ও

* ই-স্বর এবং উ-স্বর বলিতে যথাক্রমে ই, ঈ এবং উ, ঊ দুই-ই বুঝায়।

অর্থভেদ প্রদর্শনার্থে ও-কার, ঊর্ধ্ব-কমা, হস্‌-চিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্নাদির যথাসম্ভব বর্জন।

সমিতির প্রথম নিয়ম,—রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব লোপ। এই নিয়ম সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত। ইহাতে লেখা ও ছাপার কাজ অনেক সহজ হইবে। কিন্তু সমিতি নিয়মের প্রথমেই বলিতেছেন,—"যদি ব্যুৎপত্তির জন্য আবশ্যক হয় তবেই রেফের পর দ্বিত্ব হইবে। এই কথাটির অর্থ স্পষ্ট নহে। ইহা সাধারণের পক্ষে সংশয়জনক। কেন, তাহা বলিতেছি।

প্রথমতঃ,—এ-ক্ষেত্রে 'ব্যুৎপত্তি' কথাটির অর্থই সাধারণের নিকট অস্পষ্ট। অভিধান বলিবে, শাস্ত্রীয় সংস্কার; বলিবে, ব্যাকরণে শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়াদির নিষ্পত্তি। সাধারণে এ-ক্ষেত্রে সংশয়ে পড়িবেন। সূত্রটির উদাহরণযুক্ত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা সমিতির কর্ত্তব্য ছিল।

তাহার পর;—যদি মানিয়া লওয়া যায়, 'বৃত্ত' হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া 'বার্ত্তা' লেখা বিহিত হইয়াছে, তাহা হইলে "যদি আবশ্যক হয় তবেই" কথাটির কোন সংগত অর্থ খুঁজিয়া পাই না। আবশ্যক না হইলে কোথাও 'বার্তা' লেখা চলিবে কি? কাজেই দেখা যাইতেছে, সংশয় এখানেও প্রবল থাকিবে। আর, এমন যদি কেহ মনে করেন, যে, নিয়মটি আমি বুঝিতে পারি নাই বলিয়া এ-সকল কথার উত্থাপন করিতেছি, তাহা হইলে আমার এই না বুঝিতে পারাই সমিতির নিয়ম-লেখনের অস্পষ্টতার প্রমাণ হইবে।

সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে 'কার্তিক, বার্তা, মার্তিক, প্রভৃতি বানান অশুদ্ধ নহে।* 'বার্তা, বার্ত্তা উচ্চারণেও এক। যেখানে সর্বত্র রেফাক্রান্ত বর্ণের দ্বিত্ব-বর্জন শাস্ত্রানুমোদিত, সেখানে ব্যুৎপত্তি দেখাইবার জন্য ব্যতিক্রম-বিধান কেন? অথচ অন্যত্র দেখিতেছি, সমিতি বানান সরল করিবার জন্য অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় নিয়মে সমিতি ক, খ, গ, ঘ পরে থাকিলে ঙ্‌ স্থানে ং লিখিবার বিধান দিয়াছেন। অর্থাৎ 'অলঙ্কার, সঙ্গম' প্রভৃতি স্থলে 'অলংকার, সংগম' প্রভৃতি লেখা

*সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে 'কার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য' প্রভৃতি শব্দের অন্তর্গত রেফাক্রান্ত মৌলিক বর্ণদ্বয়ের প্রথমটির বিলোপ-সাধন ঐচ্ছিক; যথা,—'কার্ত্তিক, বার্দ্ধক্য' বিকল্পে 'কার্তিক, বার্ধক্য' ইত্যাদি। ("ঝরোঝরিসবর্ণে"। ৮।৪।৬৫।—পাণিনি)।

চলিবে বলিয়াছেন। ইহাতে কি উপকার হইবে? ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ এই চারিটি যুক্তাক্ষর কম হইবে, লেখা ও ছাপার কাজ সহজ হইবে। সূত্রের ব্যাখ্যা স্থলে সমিতি বলিতেছেন,—সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার লিখিত হইবে, বিকল্পে,—ঙ্। কাজেই, যে সকল শব্দে ম্ স্পষ্ট নহে সে সকল শব্দে ং লেখা সমিতির অভিপ্রেত নহে মনে হইতেছে। অথবা সমিতি সে-কথা স্পষ্ট করেন নাই। সমিতির লেখা নিয়মাবলির এক স্থানে 'অঙ্গীভূত' দেখিয়াছি। ইহার অর্থ কি?—অনুমান করতেছি, সমিতি ইহা চাহেন না, যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম এ-স্থলে লঙ্ঘন করা হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে অনেক স্থলে স্পষ্ট ম্ থাকা সত্ত্বেও ং লেখার বিধান নাই; সমিতি সে-সম্বন্ধে তবে স্পষ্ট করিয়া কিছু বলেন নাই কেন, বুঝিতে পারি নাই।

আরও কথা আছে। সমিতি ঙ্, স্থানে ং লেখার নিয়মটি সংস্কৃত শব্দের বেলায় বিধিবদ্ধ করিয়াছেন; অসংস্কৃত শব্দের বেলায় সমিতি নিরব। সাধারণের পক্ষে সংশয় ও দ্বিধার ইহাও আর এক কারণ হইয়াছে। কেহ মনে করিবেন,—যখন সংস্কৃত শব্দেই পারতপক্ষে ঙ্ স্থানে ং লেখার চেষ্টা চলিতেছে, তখন অসংস্কৃত শব্দে যে সহজেই তাহা করা চলিবে, এ-কথাও কি আর বলার প্রয়োজন আছে? কিন্তু আমরা স্পষ্ট কথাটি জানিতে চাই। 'বঙ্কিম, শিঙ্গা' না লিখিয়া 'বংকিম, শিংগা' লিখিতে পারি? লিখিতে পারি কি,—'ধিংগি, কলুংগি, চাংগা, ডংকা, দংগল'?

স্পষ্ট দেখা গেল, সমিতির এই নিয়মে আমাদের কোন লাভ হয় নাই। বরঞ্চ ক্ষতি। কেন এবং কি কি তাহা বলিতেছি।—

(১) ছাপাখানায় ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ এই চারিটি যুক্তাক্ষর আমাদিগকে রাখিতেই হইবে। কারণ, (ক) সর্বত্র আমাদের ংক, ংখ, ংগ, ংঘ লিখিবার স্বাধীনতা থাকিবে না; (খ) এই নিয়মের বৈকল্পিক বিধান। ইহা ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু অলাভ। (২) অতঃপর ঙ্ক, ঙ্গ প্রভৃতি বানানের দুইটি রূপ হইবে। (৩) সংশয়-মুক্ত হইয়া ংক, ংখ, ংগ, ংঘ, লেখা চলিবে না, দ্বিধার জালে হাত জড়াইয়া থাকিবে। ইহা ক্ষতি। বাংলা বানানে ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ এই রূপ সুনির্দ্দিষ্ট। নূতন নিয়মে সংশয়াক্রান্ত হইয়া এই নির্দেশ পরাহত হইবে।

'সংখ্যা, সংগীত' প্রভৃতির সাদৃশ্যে 'সংগ, বংগ' প্রভৃতি লেখা চলে। এ-কথা

পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন। সেইহেতু বলিতে চাই, সমিতি সর্বত্র ংক, ংখ, ংগ, ংঘ লিখিবার একটি ব্যবস্থা দিতে পারেন, নতুবা ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ লিখিতে আমাদের কষ্ট হইবে না। এই বানান দেখিতে এবং লিখিতে আমরা অভ্যস্ত।

যদি সমিতি মনে করিয়া থাকেন, সাধারণকে উপস্থিত এক মাত্রা বিধান সেবন করাইয়া দেখা যাক, সুবিধা বুঝিলে কালক্রমে সকল শব্দেই ং চালাইবার ব্যবস্থা করা যাইবে; তাহা হইলেও এ-নিয়ম সার্থক হয় নাই। কারণ, এ-নিয়মের বৈকল্পিক বিধান। এত সংশয়, সন্দেহ ও গোলমালের মধ্যে কেহই যাইতে চাহিবেন না, সকলেই এই বিকল্প-বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঙ্ক, ঙ্গ প্রভৃতিই লিখিতে থাকিবেন।

বরঞ্চ সমিতি ঙ্ স্থানে ং লিখিবার বিধান না দিয়া ঙ্ পৃথক্ লিখিবার বিধান করিতে পারিতেন। ইহাতে সকল দিক্ রক্ষা করা হইত। ক, খ, গ, ঘ, পরে থাকিলে সকল শব্দেই, অর্থাৎ যে-সকল শব্দে ম্ নাই সে-সকল শব্দেও, কালক্রমে ঙ্ স্থানে ং চলিয়া যাইত। 'বাঙ্গলা' কালক্রমে 'বাংলা' হইয়াছে, 'অঙ্ক, গঙ্গা শঙ্কর, সঙ্গম'-ও কালক্রমে 'অংক, গংগা; শংকর, সংগম' হইতে পারিত।

তৃতীয় নিয়মে সমিতি বলিতেছেন, বাংলা লেখায় সংস্কৃত পদের শেষের বিসর্গ বর্জনীয়, যেমন—'চক্ষু, ছন্দ, জ্যোতি, ক্রমশ' ইত্যাদি। তাহার পর বলিতেছেন, উক্ত বিসর্গমুক্ত পদগুলির সহিত অন্য পদের সন্ধিবদ্ধ হইবার সময় পদগুলিকে আবার বিসর্গ-চিহ্ন ফিরাইয়া দিতে হইবে; যথা,—'ছন্দঃ + পতন = ছন্দোপতন, জ্যোতিঃ + ঈশ = জ্যোতিরীশ' ইত্যাদি। বিসর্গ-সন্ধির এই নিয়ম বাংলায় আগেও ছিল। অবশ্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া; যথা,—'চক্ষুদান, চক্ষুগোচর, চক্ষুরোগ' ইত্যাদি। কিন্তু শব্দগুলির এই ব্যতিক্রান্ত রূপ অনেক লেখায়, অনেক প্রচলনে বাংলায় নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। নূতন নিয়মে এই শব্দগুলির নির্দিষ্ট বানান অতঃপর ব্যাহত হইল। নিয়মের সামঞ্জস্যের জন্য এইরূপ দু একটি পরিবর্তন অবশ্য আমাদের মানিয়া লওয়া উচিত। অনেকে ওই রকম ব্যাকরণবিরুদ্ধ অথচ বহুপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার স্বীকার করেন। সমিতিরও সে মত হইলে অবশ্য 'চক্ষুর্গোচর, চক্ষূরোগ' প্রভৃতি আর লিখিতে হইবে না। কিন্তু এ-কথা স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়, নিয়ম পুস্তিকার কোনখানে সমিতির উক্ত মতের কথা জানা যায় না।

সমিতি বলিয়াছেন, "বহুস্থলে সংস্কৃত রীতিতেই সমাস-সন্ধির দ্বারা নূতন

শব্দ গঠন করা হয়। এ-জন্য সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়"। ইহা হইতে বুঝিতে পারি, অনেক স্থলে সমাস-সন্ধিতে সংস্কৃত রীতি মানা হয় না, এবং সেই না মানায় সমিতির নিষেধ নাই। কিন্তু অনেক স্থলে একই শব্দের গঠনে সমাস-সন্ধির বেলায় সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত, এই উভয় রীতি মানা হয়; যথা,—'অধিবাসিগণ, অধিবাসীগণ; কর্মচারিগণ, কর্মচারীগণ' ইত্যাদি। এ-সম্বন্ধে সমিতির আদেশ কি? বিকল্প-বিধান?

সমিতি বলিয়াছেন, "সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ অবিধেয়"। কিন্তু যে-সকল শব্দের বানানে ইতিপূর্বেই হস্তক্ষিপ্ত হইয়াছে, অথচ যাহাদের অশুদ্ধ রূপ বাংলায় সুনির্দিষ্ট এবং সুপ্রচলিত, সেই সকল শব্দ কলমের মুখে আসিয়া পড়িলেই দ্বিধায় পড়িতে হয়;—তাই তো কি লিখি! 'ইতিপূর্বে' না 'ইতঃপূর্বে'? 'পিতাঠাকুর' না 'পিতৃঠাকুর'? 'সৃজন' না 'সর্জন'? 'পাশ্চাত্য' না 'পাশ্চাত্ত্য'? ইত্যাদি। সমিতির উক্ত মত এখানে স্পষ্ট হইলে অনেক বিড়ম্বনা হইতে আমরা নিষ্কৃত হইতে পরিতাম।

সপ্তম বিধানে সমিতি বলিতেছেন, খাঁটি সংস্কৃত শব্দে যদি ঈ বা ঊ থাকে তাহা হইলে সেই শব্দ হইতে জাত—তদ্‌ভব বা তৎসদৃশ—শব্দে ঈ বা ঊ বিকল্পে ই বা উ লিখিতে হইবে। অর্থাৎ 'কুমীর (কুম্ভীর), রানী (রাজ্ঞী), পূব (পূর্ব), অথবা 'কুমির, রানি, পুব? হ্রস্ব ই থাক্ অথবা দীর্ঘ ই থাক্, এতদিন শব্দগুলির একটি নির্দিষ্ট রূপ বাংলায় প্রচলিত ছিল। এই নিয়মে শব্দগুলির দুইটি করিয়া কলেবর-প্রাপ্তি ঘটায় সে-নির্দেশ নষ্ট হইয়াছে।

'ভীতু' শব্দটির বানান বাংলায় সুনির্দিষ্ট। ই-উ-পন্থীগণ অতঃপর 'ভিতু' লিখিলে তাহা নূতন নিয়মে অশুদ্ধ নহে। কারণ, সংস্কৃত 'ভীত' হইতে অসংস্কৃত 'ভিতু'। এইভাবে 'ভীমরতি, নীচু' প্রভৃতি একরূপ শব্দগুলির অতঃপর দুইরূপ হইবে। সংস্কৃত 'পথিন্' শব্দের প্রথমার এক বচনে 'পন্থাঃ', বিসর্গমুক্ত হইয়া শব্দটি অসংস্কৃত হয়,—'পন্থা'; 'পন্থা' হইতে 'পন্থী'; নূতন নিয়মে 'পন্থী, পন্থি' দুই-ই হইতে পারিবে। আরও অগ্রসর হইলে,—'চরমপন্থী, চরমপন্থি; ই-উ-পন্থিগণ, ঈ-ঊ-পন্থীগণ' ইত্যাদি। সংস্কৃত পদ বা শব্দের উত্তর অসংস্কৃত শব্দ বা অসংস্কৃত বিভক্তি-প্রত্যয়াদির যোগহেতু যদি সমগ্র শব্দটির অসংস্কৃতত্ব ঘটে, তাহা হইলে, এইরূপ উত্তরসংযুক্ত অসংস্কৃত শব্দ বা বিভক্তিপ্রত্যয়াদির পুরোবর্তী ঈ-ঊ-স্বরযুক্ত—

এবং যেহেতু সমিতি অসংস্কৃত শব্দসমূহ হইতে ণ বর্ণটির বিলোপ বিহিত করিয়াছেন, অতএব ণ-যুক্ত—সংস্কৃত পদের বা শব্দের বানানের বৈপ্লবিক পরিবর্তনও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সমিতি এ-সব ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি না জানি না। সাধারণে কি ভাবিতেছেন তাহাও বলিতে পারি না। হয়তো সরল পথের লোভে-লোভে নূতন পথে পা বাড়াইয়া উচোট খাইতেছেন।

তাছাড়া চারিদিকেই বৈকল্পিক বিধানের ছড়াছড়ি। এত বিকল্প-বিধান থাকিলে শব্দের বানান নির্দিষ্ট হইবে কি করিয়া? এক অর্থব্যঞ্জক বিভিন্ন শব্দ ভাষার সমৃদ্ধির পরিচায়ক; কিন্তু একই শব্দের বিভিন্ন রূপ ভাষার বিড়ম্বনা মাত্র। সমিতি ভোট গণিয়া নিয়ম বাঁধিয়াছেন; তবে এই উভয় পন্থা আসিল কেন? বোধ হয়, শুধু মাথাগণতি নয়, কাহার মাথা তাহাও দেখা হইয়াছে।

সমিতি সুপ্রচলিত বাংলা শব্দের উচ্চারণ, উৎপত্তি বা অর্থের ভেদ বুঝাইবার জন্য ও-কার ও অন্যান্য চিহ্ন-যোগ যথাসম্ভব বর্জন করিতে বলিয়াছেন। এই নিয়মটি এবং তদন্তর্গত উদাহরণগুলি পাঠ করিয়া আপাতত মনে হয়, সমিতির বক্তব্য স্পষ্ট। পরে লিখিতে লিখিতে নিয়মটির অস্পষ্টতা ধরা পড়ে। সমিতির 'যথা-সম্ভব' কথাটিই নির্দেশবিরোধী। একটি উদাহরণ দিলে কথাটি স্পষ্ট হইবে। ছুঁচ (সূচ) ও ছুঁচোর (ছুঁচা) আর্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য আমাদের যুক্তিতে ও-কার বর্জন সম্ভবপর নয়; কারণ, সাধু 'ছুঁচা' হইতে মৌখিক 'ছুঁচো'। কিন্তু অপরের যুক্তিতে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে। শেষ মতাবলম্বীরা বলিবেন, 'বাক্যের অন্বয় হইতেই শব্দটির অর্থ স্পষ্ট হয়, ও-কারের প্রয়োজন কি? 'ছুঁচর গন্ধ বেরুচ্ছে' দেখিলে 'ছুঁচ' যে এখানে গন্ধমূষিক তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় কি?' তেমনি, অনেকে 'চোখ' লিখিবেন, অনেকে 'চখ' লিখিবেন; ইত্যাদি। কিন্তু এখন কথা এই, যে, কে এইসব য-থা-স-ম্ভা-ব-নার নিরিখ নির্দিষ্ট করিবে? ভবিষ্যতে শব্দগুলির দুই বানান হইয়া দাঁড়াইবে। তখন সমিতি কাজটা সোজা পাইবেন না!

ক্রিয়াপদের বানানে ণিজন্ত ধাতুসমূহের সামান্যরূপে এইরূপ বানান বিহিত হইয়াছে,—'করান, পাঠান ইত্যাদি। ইহাদের নিত্যবৃত্ত-বর্তমান রূপেরও এক বানান। এই দুই রূপের একই বানান সাধু বাংলায় প্রতিষ্ঠিত। বাক্যের অন্বয় হইতেই বুঝিতে পারা যায়, কোন্‌টি 'করানো', আর কোন্‌টি 'করান্'। সমিতির

দেওয়া উক্ত উদাহরণদ্বয়ের সামান্যরূপে সাধু এবং মৌখিক বাংলায় একই বানান; যথা,—'তাহাকে দিয়া এ-কাজ করান ভাল হইবে না' (সাধু); এবং 'তাকে দিয়ে এ-কাজ করান ভাল হবে না' (মৌখিক) ইত্যাদি। কিন্তু এই শ্রেণীর (ণিজন্ত) অন্যান্য ধাতুর সামান্যরূপে মৌখিক ও সাধু বানানে পার্থক্য আছে; যথা,—'ভুলান, ঘুরান, দুলান, ঘুমান' (সাধু); এবং 'ভুলন, ঘুরন, দুলন, ঘুমন' (মৌখিক) ইত্যাদি। শব্দের অন্ত্য ও উপান্ত্য বর্ণ একক হইলে (অর্থাৎ অন্য স্বরযুক্ত না হইলে) বাংলায় শেষ বর্ণটির উচ্চারণ নিয়মিত হসন্ত হয়। ধাতুরূপগুলির বানানে ইহাদের সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিয়া দিলে, হসন্ত উচ্চারিত হইবার ভয়ে শব্দগুলির এই রূপান্তরের সম্ভাবনা আছে,—'দুলনো, ভুলনো' ইত্যাদি। সমিতি 'উঠন' (আঙ্গিনা), 'উনন' (উনান) লিখিতে বলিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন,—'পুরন' না লিখিয়া 'পুরনো' লিখিও। ভিতরের যুক্তি সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না, 'পুরনো'-র সাদৃশ্যে 'ঘুমনো' লিখিবেন।

আর একটি তর্ক এই, যে, 'ছুঁচা, সুতা, পুরানা' প্রভৃতির মৌখিক বানান যদি 'ছুঁচো, সুতো, পুরনো' হয়, তবে 'করানা, ঘুমানা' প্রভৃতির মৌখিক বানান 'করানো, ঘুমানো' হইবে না কেন?

সমিতি নিয়মের সামঞ্জস্য চাহেন; সর্বত্র একই নিয়মের পক্ষপাতী হইয়াছেন। মৌখিক বাংলার ধাতুরূপগুলির বানানে দু-একটি অসামঞ্জস্য-দোষ দেখাইতেছি।

হ-ধাতু।—'হল, হত, হলে' বিকল্পে 'হ'ল, হ'ত, হ'লে' ইত্যাদি; অথচ 'হোক, হোন'। সামঞ্জস্য হেতু এ-দুটিরও 'হক (হ'ক), হন (হ'ন)' হওয়া উচিত ছিল। সমিতি হয়তো বলিবেন, 'প্রথমগুলি যে আসলে 'হইল, হইত, হইলে' ইত্যাদি এবং শেষের দুইটি যে 'হউক, হউন'! ই এবং উ-এর ভেদ দেখাইব না? শেষে যদি লোকে মনে করে, ও-দুটিও 'হইক, হইন?' কিন্তু সমিতি অর্থের ভেদ, ও উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য ও-কার প্রভৃতির ব্যবহার যথাসম্ভব বর্জনীয় মনে করেন।

আর এক কথা;—সমিতি কহ্-ধাতু (এবং স্বতই কহ্-আদিগণীয় ধাতু-সমূহের) মৌখিক রূপগুলির বানান-সংস্কার করেন নাই।

নিয়মাবলিতে আছে,—"'করিয়ো, দিয়ো' ইত্যাদি বানানে য় অনাবশ্যক,'

'করিও দিও' বিধেয়"। সেই অনুয়ায়ী খা-ধাতু এবং দি-ধাতুর মৌখিক রূপের বানানে ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞায় যথাক্রমে এই বানান বিহিত হইয়াছে,—'খেও' এবং 'দিও'। কিন্তু শু-ধাতুর বেলায় বানান 'শুয়ো' হইয়াছে কেন? এখানে য়-এর আবশ্যক কি? হ-ধাতুর বর্ত্তমান-অনুজ্ঞায় 'হও' বানান আছে বলিয়া এবং ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞায় এই বানানের বর্ণদ্বয়ের মধ্যে ঈষৎ ই-এর উচ্চারণের আবশ্যক আছে অথচ সম্ভাবনা নাই বলিয়া 'হও' না হইয়া 'হয়ো' বিহিত হইয়াছে বুঝি; কিন্তু শু-ধাতুর বেলায় এরূপ বাধ্যতা তো কিছু নাই! বর্ত্তমান-অনুজ্ঞায় এই ধাতুর রূপ,---'শোও'। এবং ভবিষ্যৎ-অনুজ্ঞার বানানের বর্ণদ্বয়ের মধ্যে ঈষৎ ই বস্তুত দৈবাৎ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কাজেই, যখন 'শুও' এবং 'শুয়ো'র মধ্যে উচ্চারণগত পার্থক্য তেমন কিছু নাই, তখন সামঞ্জস্য-বিধানহেতু শব্দটির 'শুও' বানান হওয়াই যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষ করিয়া যখন সমিতি স্বয়ং বানানের সরলতা-সাধনের জন্য অর্থের ভেদ, উৎপত্তি ও উচ্চারণকে যথাসম্ভব অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন।

ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশীয় শব্দের বাংলা বানানে অ-এর বিবৃত উচ্চারণ (but-এর u) দেখাইবার জন্য সমিতি কোন বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই। বলিয়াছেন, শব্দের আদিতে আ লিখিও, অন্যত্র,—অ; যথা,—'কাট (cut), 'ফোকস (focus)'। এইরূপ দু-মুখা বিধান কেন? সমিতি যখন মনে করেন, ইংরেজী শব্দের বাংলা বানানে কাছাকাছি বাংলা রূপ হইলেই বাংলা লেখার কাজ চলে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়াই শিখিতে হয়, তখন একবার আ এবং আরবার অ করিয়া ফল কি? এখানে সামঞ্জস্যই বা কোথায়? বাঙ্গালীর মুখ অ-স্বরের সংবৃত উচ্চারণেই অভ্যস্ত, 'অর্ডর, বর্ডর, কর্নর, নম্বর' দেখিলে সে কি ঠিক 'order, border, corner, number' উচ্চারণ করিতে পারিবে? অভিজ্ঞ লোকের মুখে শুনিয়া উচ্চারণ শিখিবার সৌভাগ্য খুব কম লোকের হইয়া থাকে। সাধারণের হাত পড়িয়া এইরূপ বহুব্যবহৃত শব্দের উচ্চারণ যে ভবিষ্যতে বিকার-গ্রস্ত হইয়া পড়িবে না, তাহার কোনরূপ নিশ্চয়তা আছে কি? সমিতি যদি নূতন কোন ব্যবস্থা না-ই করিতে পারেন, প্রচলিত রীতিটিকেই থাকিতে দিন না! অ-এর বিবৃত উচ্চারণ অ এবং আ-এর মধ্যবর্ত্তী বলিয়াই কি সমিতি এইভাবে দুই নৌকায় পা রাখিয়া, মধ্যপন্থাবর্ত্তী হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?

সমিতি আরও দু-একটি বানান-সমস্যার সমাধান বিষয়ে বিরত থাকিয়াছেন।

ঐ-উচ্চারণ ও ঔ-উচ্চারণযুক্ত অসংস্কৃত শব্দগুলির বানান বাংলায় দুই রকম ; যথা 'কৈ, কই ; দৈ, দই ; ঐ, ওই' ইত্যাদি। সমিতি ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বানান স্থির করেন নাই। সমিতি ইচ্ছা করিয়াই এ বিষয়ে বিরত হইয়াছেন। কেননা, নিয়ম-বন্ধনের পূর্বে বিশিষ্ট লেখকবর্গের নিকট যে-প্রশ্নপত্রী প্রেরণ করিয়া সমিতি বানান বিষয়ে তাঁহাদের অভিমত সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই পত্রীতে উক্ত মর্মের প্রশ্ন আছে, অথচ নিয়ম-পত্রীটিতে সে-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই। উক্ত শব্দগুলির বানান-নির্দেশ বিষয়ে সমিতির এই বিরতি হইতে আমরা বুঝিব,—ইহাদের বানান সম্বন্ধে সাধারণের স্বেচ্ছাচারিতা সমিতি অনুমোদন করেন। অর্থাৎ, সমিতির ভাষায় বলিতে গেলে, এখানেও সেই,—বৈকল্পিক বিধান।

এই প্রসঙ্গে 'কি' এবং 'কী'-এর বিষয়ও লক্ষ্য। ইহাদের বানান সম্বন্ধেও উক্ত পত্রীতে প্রশ্নোত্থাপন করা হইয়াছে, অথচ বানানের নিয়মে সে-সম্বন্ধে কোন নির্দেশ নাই। বাংলায় একক থাকিলে, অর্থাৎ 'কিরূপ, কিভাবে, কিরকম' প্রভৃতির মত অন্য পদে বা শব্দে যুক্ত হইয়া না থাকিলে, 'কি' শব্দটির দুই অর্থ,—what এবং whether। অর্থাৎ 'তুমি কি খাইতেছ ?' কথাটির দুই অর্থ—(১) 'কোন্ জিনিস খাইতেছ ?' (২) 'খাইতেছ না আর কিছু করিতেছ ?' 'কি'-এর এই আর্থিক পার্থক্য লইয়া অনেক সময় পাঠকদের মনে সংশয় বাধে। সেই-জন্য, সর্বনাম বুঝাইতে 'কী' এবং প্রশ্নার্থক অব্যয় বুঝাইতে 'কি' লিখিবার রীতি প্রথম রবীন্দ্রনাথ অবলম্বন করেন। তাঁহার 'কী' ও 'কি' নির্দিষ্ট রীতিতে চলে ; কিন্তু আর যাঁহারা 'কী' ও 'কি' লিখিয়া থাকেন, তাঁহাদের লেখায় কুত্রাপি যাথার্থ্য দেখা যায় না। এ-ক্ষেত্রে সমিতির নিরবতার কি অর্থ, জানিতে ইচ্ছা হয়। 'কী' লেখা সমিতির অনুমত হইলে 'কি' ও 'কী' বানানের যাথার্থ্য সমিতির ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া উচিত। অন্যপক্ষে নিয়ম করিয়া 'কী' লেখা নিষেধ করিয়া দেওয়া উচিত।

আদিতে 'অ্যা'-উচ্চারণযুক্ত অনেক শব্দের বানান বাংলায় নির্দিষ্ট নহে ; যেমন,—'নেড়া, ন্যাড়া ; নেকা, ন্যাকা ; বেটা, ব্যাটা' ইত্যাদি। ইহাদের বানানেরও একটা ব্যবস্থা হওয়া ভাল।

সমিতি তদ্ভবাদি শব্দে ই, ঈ ; উ, ঊ ; ণ, ন ; শ, ষ, স প্রভৃতি বিচার করিয়াছেন, কিন্তু জ, য বিচার করেন নাই। অন্তত বিদেশীয় শব্দে জ, য

বিচার করিলে 'যাতুঘর, জাতুঘর ; যাতুমণি, জাতুমণি' প্রভৃতি কয়েকটি শব্দের বানান নির্দিষ্ট হইত।

আর একটি কথা। সমিতি 'সাধু ভাষা' এবং 'চলিত ভাষা' এইরূপ লিখিয়াছেন। 'সাধু ভাষা'-র অর্থ বুঝি, কিন্তু 'চলিত ভাষা' কেন? সাধু ভাষা কি অচল? 'চলিত' শব্দটির পরিবর্তে 'মৌখিক' শব্দটি অধিক যুক্তিসিদ্ধ। সাধুভাষাও চলিত, মৌখিক ভাষাও চলিত। অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ভাষার লেখনে 'সাধু' ও 'মৌখিক' এই উভয় রীতি চলিতেছে। সকল প্রদেশের মৌখিক চলিতেছে না বটে, কিন্তু যে-মৌখিক চলিতেছে, তাহা 'চলিত মৌখিক', 'চলিত ভাষা' নহে। 'মৌখিক ভাষা' লিখিলে লেখাপড়ায় উক্ত 'চলতি-মৌখিক' বুঝিতে কোন অসুবিধা নাই ; কিন্তু 'সাধু-ভাষা'-র সহিত 'চলিত ভাষা' চলিতে দেখিলে বিসদৃশ ঠেকে, মনে হয়, সাধু ভাষার বুঝি পা ভাঙ্গিয়াছে।

সমিতি সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিয়াছেন ; সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়াছেন। এমন-কি সামান্য হস্-চিহ্নটুকুরও গায়ে হাত দিবার উপায় নাই। আমার মনে হয়, বাংলা ভাষার পক্ষে ইহা আদৌ মঙ্গলকর হয় নাই। এই ভাষা আপন প্রয়োজনানুযায়ী এতদিন সংস্কৃত ভাষার অপরিমেয় শব্দভাণ্ডার হইতে শব্দ সংগ্রহ করিয়া আপন প্রকৃতি অনুযায়ী তাহাকে ভাঙ্গাচুরা করিয়া আত্মসাৎ করিয়া আসিয়াছে। বহুদিন হইতে বহু বহু সংস্কৃত শব্দ এইভাবে অপভ্রষ্ট হইয়া তদ্‌ভবাদি রূপে বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ্ পুষ্ট ও পরিবর্ধিত করিয়াছে ; তাহাকে প্রাণময় করিয়াছে। কিন্তু এই নিয়মে অতঃপর তাহা বন্ধ হইয়া গেল। ইহা কি ভাল হইল?

সমিতি উৎপত্তি, উচ্চারণ ও ভেদ প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য ও-কার, ই-কার ও ইলেক প্রভৃতি চিহ্নসমূহের ব্যবহার বর্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ একই বানানযুক্ত অনেক শব্দের একাধিক অর্থ ও একাধিক উচ্চারণের প্রসার বাড়াইয়াছেন। "প্রেসিয়া" ও লেখকের সুবিধা দেখিয়াছেন, কিন্তু পাঠক-পাঠিকার কথা ভাবিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা ভুক্তভোগী তাঁহারা জানেন, আধুনিক বাংলা ভাষায় বহু উচ্চারণ ও বহু অর্থযুক্ত একই বানানের একাধিক শব্দসমন্বিত লেখা পড়িতে পড়িতে কত অসুবিধা হয়, কত স্থানে অর্থ গ্রহণে পরিশ্রম ঘটে। নূতন নিয়মে এই সকল দোষের নিরসন হওয়া দূরে থাক্, তাহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

"প্রেসিয়া" একজন ; লেখক একজন ; কিন্তু পাঠক বহু। বহুর সামান্য অসুবিধা ও সামান্য পরিশ্রম লাঘবের প্রয়োজন হইলে একের পক্ষে অধিক পরিশ্রমও বাঞ্ছনীয়। বহুর শ্রম-লাঘবে একের শ্রম-গৌরব ! বেশি নয়, সামান্য দুই-একটি স্বরচিহ্ন ও অন্য চিহ্নের ব্যবহারে যদি কয়েকটি বিশেষ শব্দের জাতি ও ধর্ম রক্ষা এবং উক্ত সমস্যাসমূহের কিছু কিছু সমাধানও সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে সমিতির তাহাই করা উচিত নয় কি ? সামান্য দুই-একটি চিহ্নাদির প্রবর্তনে বাংলা ভাষা নিশ্চয়ই এমন কিছু মারাত্মক রকমের জটিল হইয়া পড়িবে না।

বানান-নিয়মের সমালোচনা শেষ করিয়াছি। নূতন নিয়মে লেখার অভ্যাস করিতে গিয়া যে-সকল দোষে বাধা পাইয়াছি, সংস্কারমুক্ত চিত্তে, সংক্ষেপে মাত্র সেগুলিরই আলোচনা করিয়াছি। দেখাইয়াছি, সমিতির নিয়ম সাঙ্গ নহে ; এবং তাহা অস্পষ্ট। দেখাইয়াছি, নিয়মাবলির মুখবন্ধে সমিতি যে-সকল আদর্শের উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুত তাহা পালন করিতে পারেন নাই ; বরং তাহার বিপরীত ঘটাইয়াছেন। বানান সরল না হইয়া জটিল হইয়াছে, নির্দিষ্ট না হইয়া অনির্দিষ্ট হইয়াছে, একরূপ না হইয়া বহুরূপ হইয়াছে। দেখাইয়াছি, অনেক সুনির্দিষ্ট বানানকেও অযথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে ; ইহাতে সংশয়-বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন ফল হয় নাই। পরিশেষে বিনীত ভাবে বলিতে চাই, বর্তমানে বাংলা ভাষার অগ্রগতি দ্রুত ঘটিতেছে। এই অতি দ্রুতির অবস্থায় তাহাকে বানানের সহজ, মসৃণ, সংশয়রহিত, বিকল্পমুক্ত একটিমাত্র স্পষ্ট পথ না দেখাইয়া দিলে তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ঠাণার নবীন প্রবীণ আমলা বন্ধু প্রায় সকলের কথাই বলেছি। একজনের নাম এখনও করা হয় নেই। অথচ তাঁর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা আমাদের সব চেয়ে বেশী হয়েছিল। তবে মানুষটী ছিলেন খামখেয়ালী। ছিলেন কেন, আজও বুড়ো বয়সে প্রায় সেই রকমই আছেন। তাই তাঁর সঙ্গে মৈত্রীর মাত্রা চিরদিন এক সমান রাখা শক্ত ছিল। অল্প কথায়, সামান্য বিষয় নিয়ে, মৈত্রীতে অনেকবার ভাঁটা পড়েছে। বন্ধু বয়সে ছিলেন তরুণ, কিন্তু চাল-চলন ধরণ-ধারণ সবই ছিল অতি প্রবীণের মত। তাস পাশা খেলতেন না, এমন নয়। তবে তাঁর সঙ্গে ব্রীজ খেলা ছিল প্রায় সাংখ্য বেদান্ত চর্চ্চার মত। এতটুকু হাসি ঠাট্টা হালকাপনা চলত না। ভদ্রলোক অসাধারণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন, অর্থে বিদ্যার্জ্জনও করেছিলেন, কিন্তু সাংসারিক বুদ্ধি প্রবল ছিল না। নিজের জীবনে অনেকবার অনেক রকমে ঘোট-মণ্ডল পাকিয়েছেন। তবু, সময় সময় যখন গম্ভীর চালে মাথা নেড়ে আমার বুড়ো পলিতকেশ রাও সাহেবকে উপদেশাদি দিতেন তখন তাঁকেই বয়োবৃদ্ধ দেখাত। আমাদের ত কথাই নেই। আলাপ পরিচয় হওয়া মাত্র ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে থাকতে। বেশ কিছুদিন তাঁর কাছেই আটক রইলাম। নিজেদের ঘর-কন্না সুরু করার নাম করলেই ধমকে উঠতেন, "আমি তোমাদের বড় দাদার মতন, আমার কথার উপর কথা কইও না।"

বন্ধুবর তখনকার দিনে উৎকট সাহেব ছিলেন। দেশী চাল-চলন, দেশী সাজ-সজ্জা, এমন কি দেশী ভাষাও খুব অবজ্ঞার চোখেই দেখতেন। অন্ততঃ বাইরে সেই রকম জাহির করতেন। ইংরেজী বলতেনও অতি সুন্দর। পাশের ঘর থেকে শুনলে বোঝা যেত না যে নেটীবে কথা কইছে। কিন্তু মুস্কিল ছিল এই যে মাতৃ-ভাষা মরাঠীও বলতেন ভীষণ সাহেবী ধরণে। ফলে দেশের লোকের কাছে তাঁর নিন্দার অন্ত ছিল না। তারা ত তাঁর অন্তরটা দেখতে পেত না। রাও সাহেব ও আমি অনেক চেষ্টা করেও বন্ধুর সঙ্গে নেটীব সমাজের একটা বোঝাপড়া করে দিতে পারি নেই। বন্ধু ধরাই দিতেন না।

ইংরেজ আমলা-সমাজের সঙ্গেও তাঁর বড় একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। সাহেব দেখলেই ভদ্রলোক কেমন যেন আরও কাঠখোট্টা মূর্ত্তি ধরতেন, বড় অস্বাভাবিক দেখাত। কথাবার্ত্তা খুব কমই কইতেন। ওরা মনে করত, লোকটার কি দেমাক!

একদিন ক্লাবে এক ইংরেজের সঙ্গে তাঁর খুব তর্ক লেগে গেল ভারতীয় রাষ্ট্রনীতি নিয়ে। তর্কে ইংরেজটী প্রায় হেরে যাচ্ছিল। এমন সময় সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ভারতবর্ষের লোক সবাই যদি তোমার মত ইউরোপীয়ান হয়ে যেত, তা হলে আমরা রাজ্য কারবার তাদের হাতে ছেড়ে দিতে পারতাম। কিন্তু তা ত আর নয়, তারা নেটীব, তোমার চোখেও নেটীব, আমার চোখেও নেটীব!" এই টিপ্পনী শুনে বন্ধুবর রেগে লাল হয়ে উত্তর দিলেন, "আমি ইউরোপীয়ান নই, আমিও নেটীব।" সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, "You don't look it, you know, friend M! সেটা বলে না দিলে ত আর বোঝা যায় না!" বন্ধু কোনও উত্তর না দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে উঠে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল বেলায় M-এর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে দেখি তিনি গম্ভীর হয়ে বসে একখানা ভারতের ইতিহাস পড়ছেন। আমি একটু উপহাসের ছলে বললাম, "কি হে! নেটীব হওয়ার চেষ্টা করছ না কি!" M খুব মুরুব্বীয়ানা চালে উত্তর দিলেন, "বন্ধুবর দত্ত সাহেব, আপনি বলতে পারেন যে আপনার এই দেশের লোক কখনও কোন দিন একটা বড় কাজ, কাজের মতন কাজ, করতে পেরেছে কি?" আমার চট করে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। উত্তর দিলাম, "কোন বিদেশী এই প্রশ্ন করলে তার নাকের উপর একটী ঘুষো বসিয়ে দিতাম। কিন্তু তুমি এই দেশে জন্মেছ, তোমাকে শুধু এইটুকু বলব যে তুমি দূর হও, যত শীঘ্র পার বিলেতে গিয়ে বাস কর।" M আমার দিকে তাকালেন, হঠাৎ তাঁর চোখ জলে ভরে এল, ভারী গলায় বললেন, "কাল ক্লাবে ইংরেজটা বললে যে আমি ভারতীয় নই, ইউরোপীয়ান। আজ তুমিও সেই কথা বলছ। আচ্ছা, ভাই, আমাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও, যাতে আমি যথার্থ ভারতীয় হতে পারি।" লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল, বন্ধুর হাত ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। কিন্তু যেটা সত্যি কথা সেটা বলতে পারলাম না—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যে বড় শোচনীয়!

বন্ধুবর খুব উৎসাহী প্রার্থনা সমাজী ছিলেন। হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ অদম্য ছিল। যখন তখন, যেখানে সেখানে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুর

ধর্ম্ম ও রীতিনীতিকে গালাগালি করতেন। আমারও যে কুসংস্কারের প্রতি আস্থা ছিল, তা নয়। কিন্তু একজন লোক ক্রমাগত "তোমরা হিন্দুরা এই কর, তোমরা হিন্দুরা ওই কর" বললে বরদাস্ত করা শক্ত। তাই মাঝে মাঝে খুব লেগে যেত দুজনের। আমি যা বলতাম ঠাট্টার ছলে, পরে সব ভুলে যেতাম। কিন্তু M তর্কের পর কেমন মুষড়ে যেত। মানুষটা প্রতিবাদ সহ্য করতে পারত না মোটে। তখনকার দিনের প্রার্থনা সমাজ বড় গোলমেলে ব্যাপার ছিল। অধিকাংশ সমাজের চাঁইদের বাড়ীতে দেবঘর ছিল, নিয়মিত মূর্ত্তিপূজা হত। বন্ধু M-এর বোম্বাই-এর বাড়ীতেও সেই ব্যবস্থা ছিল। এই সমাজের একজন নেতা কিছুদিন আগে পুণাতে পাদরী সাহেবদের বাড়ী চা খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণ করেছিলেন। একদিন এই রকম সব ব্যাপার নিয়ে একটু ঠাট্টা তামাসা করাতে বন্ধুবর আমার উপর এমন চটে গেলেন যে মাস দুই আমার সঙ্গে কথাই কন নেই। তিনি রেগে গেলে শুধু এই কথা বলতেন, "তুমি ত সত্যি হিন্দু নও, হিন্দু সমাজের তরফদারী তুমি কেন করবে? তোমার কোন অধিকার নেই প্রার্থনা সমাজের নিন্দা করার।"

পাঠক হয় ত মনে করছেন, আমার বন্ধু সত্যি একজন সেকেলে গোঁড়া ব্রাহ্ম গোছের মানুষ ছিলেন। মোটেই না! তিনি ঠাণা ছাড়বার বছর খানেক পরে তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হল, তখন দেখি তিনি স্নান করে ফোঁটা কাটছেন, পট্টবস্ত্র পরে ভাত খেতে বসছেন। আমি পায়জামা পরে ভাত খেলাম বলে আমাকে খুব বকুনি দিলেন। এ ভাবও যে বেশী দিন রইল, তা নয়। শেষ পর্য্যন্ত সমাজ সংস্কারের ঝোঁকও গেল, পট্টবস্ত্রও উবে গেল, যা রইল তা মামুলী সিবিলীয়ানী চাল-চলন।

M-এর সম্বন্ধে আর একটা কথা উল্লেখ-যোগ্য। ধর্ম্ম বিষয়ে এমন উদার মতামত সত্ত্বেও তাঁর মনোবৃত্তি কতকটা আধুনিক হিন্দু সভার অনুরূপ ছিল, অর্থাৎ পারসী, খৃষ্টান, মুসলমানদের বিষয়ে যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ ছিল। এটা আজকাল আমরা খুব দেখি, কিন্তু তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল। আমি গরীবগুরবো মুসলমান ছাত্র প্রভৃতিকে একটু আধটু সাহায্য করতাম। এই নিয়ে বন্ধু যখন তখন আমার সঙ্গে প্রচণ্ড তর্ক জুড়ে দিতেন। দেশকে তিনি যথেষ্ট ভালবাসতেন তবে সেটা কতকটা কেতাবী রকমে। সত্যি তাঁর কাছে দেশ মানে ছিল হিন্দু সমাজ। দেশ-নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন রানাডে ও গোখলেকে, তৈয়বজী, দাদাভাই বা ফিরোজ-

শাহের নাম বড় একটা মুখে আনতেন না। লোকমান্য টিলকের সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রায় সরকারী মতামতেরই অনুগামী ছিল। এ সব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের দুজনের বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুন্ন ছিল।

M-এর মারফতেই আমার বোম্বাই হিন্দু সমাজের অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। সেজন্য আমি চিরদিনই তাঁর কাছে ঋণী। তবে শুধু তাই নয়, ঠাণাতে ছেলেবেলায় তাঁর কাছ হতে অনেক কিছু শিখেছিলাম। বন্ধুবর পরের জীবনে যে চাকরীর উন্নত শিখরে উঠেছিলেন, সরকারী খেতাবে বিভূষিত হয়েছিলেন, সে সবের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। সে সময়ে আমি বহুদূরে ছিলাম। তবে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম বই কি! কারোয়াহি নইলে ত জগতে উন্নতি হয় না। বন্ধুবর M-এর ভাবপ্রবণ চরিত্রের সঙ্গে কারোয়াহি কি করে খাপ খেয়েছিল, তা আজও বুঝি না।

গেল বারে আমার পুলিসের বন্ধু P-র কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে ঐ সময়ে ঠাণা জেলাতে অনেক ডাকাতী হচ্ছিল। এই ডাকাতীগুলোর একটু বিশেষত্ব ছিল। দুই একটা গল্প বললে পাঠকের ভাল লাগতেও পারে। আমি যেটুকু জানি তা অবশ্য আমার এজলাসের মোকদ্দমার নথিপত্র থেকে। আমাদের জেলার লাগা জওহর রাজ্যে এক ডাকাতের দল গড়ে উঠেছিল। তাদের প্রধান আড্ডা যে ঠিক কোথায় ছিল তা কেউ জানত না। কিন্তু তাদের কার্য্যক্রম বড় বিচিত্র ছিল। গভীর রাত্রে ডাকাতরা গ্রামের মাহার (বাগদী) পাড়ায় উপস্থিত হয়ে হাঁক মারলে, কে আছ, বেরিয়ে এস। মাহার চৌকীদার সন্তর্পণে বেরিয়ে এসে দেখতে পেলে যে অন্ধকারে জনা কুড়িক লোক বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললে, "চৌকীদার, যা, পাটিলকে ডেকে নিয়ে আয় জলদী। তুই যতক্ষণ না ফিরে আসিস আমরা তোদের পাড়া ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে আছি। মনে থাকে যেন, কিছু দাগাবাজী করিস্ ত ছেলেপিলে সব কুচো কুচো করে কুটে ফেলব, ঘরদোর সব জ্বালিয়ে দেব।" চৌকীদার কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে পাটিলকে এনে হাজির করলে। দলপতি তখন গম্ভীর স্বরে হুকুম করলেন, "আমরা অমুক সরদারের সিপাহী। সরদারের প্রাপ্য চৌথাই আদায় করতে এসেছি। তোমার গ্রামের দেয় স্থির হয়েছে—ময়দা এত, ঘি এত, দুটা মুরগী, দশ টাকা নগদ। চৌকীদারকে পাঠিয়ে দাও নিয়ে আসুক আধ ঘণ্টার মধ্যে। তুমি জামিন রইলে।"

পাটিলের ঘাড়ে কটা মাথা, যে সে হুকুম অমান্য করবে ! সে জানে যে হুকুম না মানার ফল কি ! কত পাটিলকে এরা মেরে আধমরা করে দিয়ে গেছে, কত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যথা সময় চৌথাই এসে পৌঁছল। ডাকাতরা সব তুলে নিয়ে সরে পড়ল। সময় সময় এরা আবার সরদারের তরফ থেকে রসীদ লিখে দিয়ে যেত, এ বছরের খাজনা পেলাম। যে দলের বিচার আমি করেছিলাম তারা বেশ বছর দুই এই রকম কাণ্ড করার পর ধরা পড়েছিল, তাও শুধু গৃহবিবাদ হয়েছিল বলে। এরা যে সবাই সত্যিকার বন্দুক ঘাড়ে করে আসত, তা নয়। এই দলে দুটো একটা গাদা বন্দুক থাকত, বাকী সব কাঠের নকল বন্দুক, আলকাতরার রঙ্গ করা।

আর এক দল ডাকাতের কথা মনে পড়ছে। তাদের দলপতির নাম ছিল আউ। আউয়ের নামে সারা তল্লাট কাঁপত। কত লুটতরাজই যে এই দল করেছিল, তার গুণতি নেই ! অনেক সময়ে নালিশই হত না। আউয়ের দল বড় একটা মারধর করত না। করতে হতও না, কারণ গৃহস্থ যখন শুনত যে কার দলের শুভাগমন হয়েছে তখন আপন হতে সর্ব্বস্ব ধরে দিত। এই রকম প্রবল প্রতাপে আউ সারা উত্তর কোকনে নিজের আধিপত্য প্রায় তিন বছর অক্ষুণ্ন রেখেছিল। কিন্তু চিরদিন কারও সমান যায় না। আস্তে আস্তে দলে ভাঙ্গন ধরল। এক একজন করে ডাকাত ধরা পড়তে লাগল। কিন্তু চোরাই মালেরও পাত্তা লাগে না, দলপতিরও সন্ধান মেলে না। এই ভাবে কিছুদিন কাটল। পুলিসের বড় বদনাম হল। শেষ, একদিন ঘাট প্রদেশের এক পাটিল থানায় এসে এত্তেলা দিয়ে গেল যে প্রতিদিন ভোর বেলা ও সন্ধ্যার পর একজন কোলী তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে এক চাঙ্গারী খাবার নিয়ে বনের দিকে চলে যায়। খবর শুনে দারোগা সেই গ্রামে গিয়ে চুপি চুপি চারি দিক ঘুরে ফিরে দেখে এলেন। গ্রামটী পাহাড়ের গায়ে। অদূরে অন্ধকার গভীর বন। সেই বন নেমে গেছে একেবারে নীচে পর্য্যন্ত, যেখানে এক সঙ্কীর্ণ দরীর মধ্য দিয়ে বহে যাচ্ছে এক ছোট্ট পাহাড়ী নদী। দারোগা সন্দেহ করলেন যে ঐ দরী ও বনের মাঝে কোন ডাকাত বা ফেরারী আসামী লুকিয়ে রয়েছে, হয়ত বা স্বয়ং আউ সেখানে আছে। কিন্তু সঙ্গে বেশী লোকজন ছিল না বলে তখনই জঙ্গলে ঢুকতে সাহস পেলেন না। পরদিন সকালবেলা বন্দুকধারী পুলিশ ও বহু গ্রামের চৌকীদার জমা করে—সব

সুদ্ধ দেড়শো দুশো লোক হবে—চারিদিক থেকে সেই দরীতে নামতে সুরু করলেন। যখন অর্দ্ধপথ নেমেছেন একটা বন্দুকের আওয়াজ হল, সঙ্গে সঙ্গে একজন চৌকীদার শুয়ে পড়ল। নীচে থেকে হাঁক এল, "তফাৎ দারোগাসাহেব! পালাও! নইলে আউয়ের হাতে আজ তোমার রক্ষা নেই।" তার পর খানিকক্ষণ দুই দিক হতেই দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ হতে লাগল। পুলিসের দল এগিয়ে চলল। আস্তে আস্তে নীচের আওয়াজ থেমে এল। দারোগা যখন নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলেন, দেখলেন যে তিন জন লোক মরে পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সনাক্ত করার লোক ছিল। তিন জনের একজন যে আউ তা নির্ব্বিবাদে প্রমাণ হতে দেরী হল না। কিন্তু লাশ তুলতে গিয়ে দেখা গেল যে দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সরদার আউ একজন আধ বয়সী স্ত্রীলোক! যেখানে মৃত ডাকাত তিনজন পড়েছিল তার কাছেই পাহাড়ের গুহা-কন্দরে দুই তিন জায়গায় প্রায় কুড়িটা ডাকাতীর মুদ্দেমাল পাওয়া গেল।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ডাচ্ ছবি

যাত্রারম্ভের পূর্ব্বে সাড়ম্বরে পাঁজী দেখবার কি প্রয়োজন বা সার্থকতা আছে জানিনে। কিন্তু একটা জাতির দিক হ'তে তা'র গৌরব-সৃষ্টির লগ্ন জাতীয় ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রতিভার জন্ম বা কর্ম্মসাধনার নিয়ম স্থির করা কঠিন হ'লেও প্রত্যেক জাতির ভাগ্যে এমন এক-একটা সময় আসে যখন সমগ্র জাতি তা'র সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও উন্নতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হ'তে পারে। এমনই একটি সময় রিনেসাঁসের বছরগুলি। যখনই এ-যুগটি কোন দেশে উপস্থিত হয়েছে, তখনই সে-দেশের জয়জয়কার আরম্ভ হয়েছে—শিল্পে, সাহিত্যে, বাণিজ্যিক ও রাজনীতিক সমৃদ্ধিতে। চিত্রালোচনার দিক থেকে নবযুগ সর্ব্বপ্রথম ইটালীতে উপস্থিত হয়েছিল। ইটালী হ'তে আল্পস্ পর্ব্বতমালা অতিক্রম করে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকে রিনেসাঁস্ হল্যাণ্ডের দ্বারে আতিথ্য-স্বীকার করল।

ডাচেরা * এ অতিথিটিকে পরম আদরে ঘরে তুলে নিল। তা'দের হৃদয়ের আশা ও অনুভূতি, নয়নের সত্যদৃষ্টি কেমন করে জানিনে এক মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হয়ে উঠল। এ উদ্দীপনা বাইরের নয়, অন্তরের।

ডাচ্‌দের শিল্প-প্রতিভা ও ছবির জগতে তা'রা কি দিয়েছে—তা' ভাল করে বুঝতে হ'লে সাহসী, সরাইপ্রিয়, স্বাধীনমনা এবং উৎসাহী জাতিটিকে বুঝতে চেষ্টা করতে হ'বে। তা'দের ইতিহাস-ও জানতে হ'বে। কারণ তা'দের ছবির রাজ্যে জাতীয় জীবন ও চরিত্রের বৈশিষ্ট্য যতটা ফুটেছে, তেমন আর কোন কালে কোন জাতির ভাগ্যে ঘটেনি। বাংলা দেশে তো অন্ততঃ নয়!

রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক ইতিহাস এবং অন্যান্য ঘটনা যাঁরা জানেন, তাঁরা যেমন তাঁর কবিতা বেশী বুঝেন, তেম্‌নি ডাচ্‌দের স্বভাব ও ইতিহাস যাঁরা জানেন,

---

* ডাচের পরিবর্ত্তে ওলন্দাজ বলার পক্ষে যে যুক্তি আছে, তা' উপেক্ষা করা খুব অন্যায় নয়। ইংরেজিতে তাতারকে বলা হয় Tartar—যদিও Tatar বলাই উচিত। আমেরিকার আদিমদের এখনও কেউ কেউ Indian বলেন। যেন এখনও ঠিক বুঝা যাচ্ছে না যে India ও Americaর অধিবাসীদের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কিনা! আশার কথা যে ওয়েলস্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ তা'দের Amerindian বলছেন।

তাঁরা ফ্রান্স হালস্ ও রেম্‌ব্রাণ্টকে ভাল বুঝবেন। হালস্, রেম্‌ব্রাণ্ট, কাইপ্, ভারমিয়ার, রুজ্‌ডেল্ প্রভৃতি বড় বড় চিত্রকরগণ সবাই ছিলেন খাঁটি ডাচ্—অন্তরে বাইরে পুরা দেশী। বিখ্যাত শিল্প-দক্ষ (art critic) ম্যাক্‌ফল ডাচ চিত্রের সমালোচনায় বলেছেন: Dutch instinct was too virile, and far too alien to Italian ideals, to suffer much loss in mimicry. Raphaelism made no overwhelming conquest। আমাদের ঘরের কোণে, বাসাবাড়ির ছাদে, দেশের পথে-ঘাটে, আমাদের গ্রামের হাটে-মাঠেও যে ছবি আছে বা থাকতে পারে, তা'রই ইঙ্গিত আমরা ডাচ্ চিত্রালোচানায় পাই।

ডাচ্ ছবির সব চাইতে বড় বিশেষত্ব এখানেই যে হল্যাণ্ডের প্রতিভাবান শিল্পী তা'র নিজের অভিজ্ঞতা হ'তে প্রাপ্ত জ্ঞান বা তা'র আপন দেশের ও সমাজের বিষয়বস্তুকেই শুধু চিত্ররেখায় রূপমূর্ত্তি দিয়েছে। 'ঈশ্বরকে আঁকব না, কারণ তাঁ'কে দেখিনি; নিতান্ত পরিচিতের মত অপরিচয়ের পরিচয় দিয়ে ছ্যাঁচড়ামি করব না'—ডাচ্ চিত্রের এটাই মূল নীতি। ডাচ্ ছবির এক হাজার এ্যাল্‌বাম খুঁজেও পাঁচটি ভাল ম্যাডোনা বা 'পায়েটা' বা সাধু জন্ বা সিবাষ্টিয়েনের মৃত্যুদৃশ্য পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ইংরেজের 'জাতীয় চিত্রশালা'র ভূতপূর্ব্ব ট্রাষ্টি লর্ড গাওয়ার "Figure Painters of Holland" নামক একখানা বই লিখেছিলেন। মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: While Rubens was buying indulgences from the priests by painting pictures for churches, Rembrandt would take some old Jew from out of the slums of Amsterdam, and paint a portrait of the old Shylock with as much care as Rubens would bestow on St. Peter or St. Paul। তিনি আরও বলেছেন যে লর্ড বেকনের সংজ্ঞা—Ars est homo additus naturae—হল্যাণ্ডের চিত্রসাধনায় সুপ্রমাণিত হয়েছে। ডাচ্‌চিত্রের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে একটি হিতোপদেশ পাওয়া যায়; স্বাধীন মনোবৃত্তি বা আন্তরিকতার অভাবে জুয়াচুরি চলে, রসসৃষ্টি হয় না।

হল্যাণ্ডের চিত্রশিল্পীই সবার আগে উদ্ধত বিদ্রোহীর মত ঘোষণা করেছে যে রামাশ্যামাকেও যীশু বা সাধু পলের মত আঁকা যায়; কৃষককন্যাও যীশুমাতার মত যোগ্য বস্তু—শিল্পীর স্বাধীন ও সার্ব্বজনীন সৃষ্টির জন্য। হল্যাণ্ডেরই নিজস্ব—

একান্তভাবে সত্যিকার আপন হালস্ ও কাইপের সৃষ্টি। হল্যাণ্ডের পথঘাট, নদী-সাগর, হল্যাণ্ডের পারিবারিক জীবন—চাষা, বণিক, শিকারী, ফেরিওলা, জমিদার, চাষার মেয়ে, সৈন্য, গাড়ি-ঘোড়া, গরু, বায়ুযন্ত্র (wind-mill), মরাই, সরাবখানা, নাপিতের দোকান, সরাই, হল্যাণ্ডের যুদ্ধবিগ্রহ, সুখদুঃখ, গৌরব অগৌরব, গায়ক, বাদক, শিল্পী, কবি—সব কিছুই এরা এঁকেছে সশ্রদ্ধ আদর ও যত্নের সহিত। সমস্ত দেশ ও জাতির অন্তর-বাহির ছবির রাজ্যে রূপায়িত হয়েছে—অথচ বিদেশীর পক্ষে এ রাজ্যে বিচরণ বা তা'র সৌন্দর্য্য পান করায় এতটুকু বাধা নেই। কোন কিছুকেই হল্যাণ্ডের শিল্পী ঘৃণা করে অযোগ্য-জ্ঞানে দূরে ঠেলে নি। গীর্জা ও ধনিকের দুর্গ-প্রাচীরের বাইরে আর্টকে টেনে এনেছে হল্যাণ্ড। বাধা এসেছে, কিন্তু পথ রুদ্ধ করতে পারে নি। শ্রষ্টা শক্তির প্রাচুর্য্যে রয়েছে অমলিন, আর শিল্প পেয়েছে অসীমবিস্তৃত উদার মুক্তি। হল্যাণ্ডের এ মহাসাফল্যের মূলে ছিল তা'র অনুভূতির প্রচণ্ড আন্তরিকতা এবং অনমনীয় পৌরুষ। ফ্লেমিশ্ চিত্রকর অনুরূপ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তা'র চেষ্টা সফল হয় নি। হল্যাণ্ডের ঘরবাড়ির গঠন, সাধারণতন্ত্র স্থাপনের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রাম ও গৌরবময় সাফল্য, বণিকসার্থগুলির ব্যাপক প্রভাবও তা'র চিত্রজগতে রেখাপাত করেছে। বোধ হয়, কোন ডাচ্ আর্টিষ্টই এমন কিছু সৃষ্টি করতে যায় নি, যা' সে আপন অনুভূতিতে পায় নি বা স্বচক্ষে দেখেনি। এক হিসেবে তা'ই অন্যান্য দেশের চিত্রপ্রাচুর্য্যের একটা মোটা অংশকে এ্যাফেক্‌টেশন্ বলে সন্দেহ হয়।

অন্যান্য দেশের মত, বিশেষ করে ইটালী ও ফ্রান্সের মত, হল্যাণ্ডে বিভিন্ন সংঘ (ইস্কুল বা আর্টে দলাদলি) ছিল না। হার্লেম ও এ্যাম্‌ষ্টারড্যাম্—এই দুইটি শহর সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু ডাচ্ চিত্রকরগণ যখন যেখানে আর্থিক সুবিধা হ'ত তখন সেখানে থাকতেন। আর্টের মতভেদ নিয়ে শহর বদল বা কোনও এক শহরে কামড় দিয়ে পড়ে থাকার দৃষ্টান্ত হল্যাণ্ডের ছবির কথায় পাওয়া শক্ত। আর, সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডে যতবেশী রীতিমত ভাল চিত্রকরের আবির্ভাব হয়েছিল, তত আর কোন দেশে (হল্যাণ্ড হ'তে আয়তনে যতই বড় হোক) মাত্র একশত বছরের মধ্যে হয় নি। ডাচেরা খুব ডিমোক্র্যাটিক্ জাতি, তা'ই বোধ হয় একচোখো ভগবানটি তা'দের অনেকের মধ্যে শিল্পপ্রতিভা ভাগ করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এরা প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি করেছে। অথচ প্রায় সকল

বড় বড় ডাচ্‌চিত্রকরের জীবনই দুঃখ ও অভাবের পীড়নে ভারাক্রান্ত হয়ে কালস্রোতে ডুবে গেছে। প্রায় সমস্ত ডাচ্ শিল্পীর কাছেই সরাবখানার মত প্রিয় স্থান দুনিয়ায় আর ছিল না ; আর অনেকের পারিবারিক জীবনও আমাদের আদর্শানুযায়ী মন্দ ছিল।

হল্যাণ্ডের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্রকর—ফ্রান্স হালস্ (১৫৮২—১৬৬৬)। তিনি যে-দিন পুলিসের হাত থেকে (স্ত্রীলোক-ঘটিত একটি কুৎসাজনক ব্যাপারের জন্য) অব্যাহতি পান, সে-দিন চিত্রকরজীবনের সুরু করেন। আরম্ভ যদিও ভাল হয় নি—ফল যে অত্যুত্তম হয়েছিল, তা' অনেকেই আজ মেনে নিয়েছেন। পৃথিবীতে খুব ছোট অবস্থা হ'তে বড় হয়ে যাঁ'রা যথেষ্ট খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থোপার্জ্জন করেছেন—ডাচ্ চিত্রকর হুচ্ তাদের অন্যতম। প্রথম জীবনে তিনি সামান্য চাকর ছিলেন। কিন্তু মধ্যজীবনে আপনার গুণ ও অধ্যবসায়ের দৌলতে খুব উন্নতি করেছিলেন। কিন্তু মরবার সময়ে তিনি (১৬২৯—১৬৭৭) নিঃসম্বল ও দুঃখীর মত মরে ডাচ্ চিত্রকরদের সমগোত্রীয় বলে নিজকে চিরচিহ্নিত করে গেছেন। ডাচ্ চিত্রকরদের জীবনকথা একদল জঁা ক্রীসতফের কাহিনী।

...   .

হাল্‌সের (১৫৮২—১৬৬৬) অভ্যুদয়ের পূর্ব্ব হ'তেই কয়েকজন চিত্রকর এবং চিন্তাশীল পণ্ডিত হল্যাণ্ডের জাতীয় জীবনের উপকণ্ঠে রিনেসঁাসের আগমনী গাই-ছিলেন। ব্লোয়েমার্ট এঁদের অন্যতম। ব্লোয়েমার্টের শিক্ষাধীনে চিত্রকর ওয়েনিক্‌স ও কাইপের পিতা অনেকদিন হাত পাকিয়েছিলেন। হালস্ যখন এ্যাণ্টোয়ার্পে আসেন, তখন নুর্ট নামক একজন চিত্রশিক্ষকের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নুর্ট ছিলেন পুরাপুরি ডাচ্। তিনি যে শুধু হাল্‌সকেই খাঁটি স্বদেশী শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা' নয়। রুবেনস্ এবং ভ্যান্ ডাইকও তাঁর কাছে সত্যসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন।

হাল্‌সের জন্ম হার্লেমের কোন সম্ভ্রান্ত বংশে, কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ তিনি এ্যাণ্টোয়ার্পে কাটিয়েছিলেন এবং জীবনের এক-দ্বাদশাংশ তাঁর সরাবখানাতেই ব্যয়িত হয়েছে। ৩৪ কি ৩৫ বছরে তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হয় এবং সে-সময়ে তিনি তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য চিত্র "সাধু জোরিসের ভোজ" আঁকেন। এটি আঁকবার জন্য তিনি শহরের একটি বণিকসংঘকর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন। ইটালীর চিত্রশিল্প

যেমন পোপ, মেডিচি ও ডিয়েস্তি পরিবার দ্বারা লালিত হত, হল্যাণ্ডের চিত্রকরেরা তেমনি দেশের বণিকসংঘগুলির প্রত্যাশা করত এবং এ-গুলির সাহায্যে বঞ্চিত হ'লে চিত্রকরের দুর্দ্দশা চরমে উঠত। "সাধু জোরিসের ভোজ"-এ হাল্‌সের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। এর পর থেকে তাঁর যশ ও সম্পদ লাভ হ'তে থাকে এবং তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন।

অনেক চিত্রাভিজ্ঞের মতে হাল্‌সের নাকি মর্য্যাদাবোধ বা সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল না; অথবা অতিশয় কম ছিল। এ অভিযোগ শুধু হালস্ নয়, অনেক ডাচ্ চিত্রকরের বিরুদ্ধেই করা যেতে পারে। কারণ, যীশু বা যীশুমাতা কুমারী মেরী তারা আঁকে নি। কিন্তু সৌন্দর্য্য যে কোন কালেই আর্টের একমাত্র বিষয়বস্তু বা উপাস্য হ'তে পারে না এবং পবিত্র পুণ্যশ্লোকদের বাদ দিয়েও যে আর্টের অবলম্বন মিলতে পারে, হাল্‌স তথা ডাচ্ চিত্রকরগণ একথা তাদের শিল্পীসুলভ অনুভূতিতে ভাল করেই জানত।

সত্যকেই হাল্‌স এঁকেছেন, মিথ্যাকে রূপ দিয়ে নাম কিনবার মত বিড়ম্বনা তাঁর হয় নি। হালসের ছবিগুলি কুৎসিত হতে পারে। কিন্তু সেগুলি সত্য এবং তার বাড়া সেগুলি 'impressive and vigorous'। 'সাধু জোরিসের' পরবর্ত্তী চিত্রাবলীতে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে—ততই শিল্পীর চোখ ও হাত নিপুণ-তর সৃষ্টি করছে, অধিকতর সততা ও impressiveness-এর সহিত। লুভ্রে হাল্‌সের 'নিকলাস্ বেরিষ্টন, তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গে'র ছবি আছে। যে-কোন অনভিজ্ঞ চক্ষুর কাছেও এই ছবিগুলির স্রষ্টার শক্তি এবং বিশেষ করে ভঙ্গী ও সংস্থাপনার জীবন্ময়তা ও জ্ঞান ধরা পড়বে। হলবাইন-চিত্রিত স্যর টমাস্ মোরের পরিবারের ছবি বহুখ্যাত। কিন্তু হাল্‌সের চিত্র-শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করতে অনেকে অহেতুক লজ্জা বা অমানুষী ভয় পান।

হাল্‌স অত্যন্ত দ্রুত আঁকতে পারতেন। তাঁর নিজস্ব কতগুলি কায়দা আছে। যাঁরা হালসের অনেকগুলি ছবি ভাল করে দেখেছেন, তাঁরাই তা' ধরতে পারেন। ঈষৎ কৃষ্ণাভ লাল এবং শাদা রংয়ের ব্যবহার হাল্‌স এত পারিপাট্যের সঙ্গে করতে পারতেন যে যখন খুব দ্রুত আঁকবার প্রয়োজন হ'ত, তখন এ দু'টি রং-ই তিনি বেশী লাগাতেন। অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, চমৎকার ড্রেপারি বা ফুলকাটা

কাপড়, ষ্টাডেড কণ্ঠভূষণও তিনি যা' এঁকেছেন—তা' এক ইংরেজ চিত্রকার মিলেস্ ভিন্ন আর কেউ করেন নি। হাল্‌সের মত উচ্ছৃঙ্খল ও প্রচণ্ড শিল্পীর পক্ষে অসীম ধৈর্য্যের সহিত অতি সূক্ষ্ম কারুকলার সৃষ্টি পৃথিবীর ইতিহাসে একান্ত বিরল।

এ্যামষ্টারডামে এবং প্যারিসের কোন ব্যক্তিগত সংগ্রহে "ডার্‌নার" নামে একটি ছবি আছে। (প্যারিসের ছবিটিই আসল, এ্যামষ্টারডামেরটি তাঁর ছোটভাই ডার্ক হাল্‌সের আঁকা) ছবির বিষয়—একজন যুবক ম্যাণ্ডোলীন বাজাচ্ছে, তার মুখে-চোখে এক অসম্ভব দুষ্টামির ছাপ। আধবোজা চোখে সে কি দেখছে—তা' ধারণা করা যেতে পারে। এ যুবকটিকে হাল্‌সের প্রিয় শিষ্য ব্রুয়ার বলে অনেকে সন্দেহ করেন। যারই হোক এমন একটি ছবি সারা ইটালীর চিত্রসম্ভার তন্নতন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। এ ছবিটিতে হাল্‌সের চরিত্র এবং চিত্রশক্তির অনেক-গুলি দিকের আভাস আছে। প্রথমতঃ হাল্‌স খুব রসিক আমুদে লোক ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি দু' একটি তুলির টানে অসামান্য বর্ণব্যঞ্জনা ও ভাবসংবেদনের সৃষ্টি করতে পারতেন। "সুখী অশ্বারোহী" এবং "ধাত্রী ও সন্তান"—ছবি দুটিও হাল্‌সের প্রতীক-সৃষ্টি।

ব্যক্তিগতভাবে কোন বড় শিল্পীর কোন একটি বিশেষ চিত্রকে একটা বিশিষ্ট মূল্য দিতে আমি রাজী নই। অমুকের অমুক ছবিটি সকলের চাইতে ভাল—এ ভাবের কথা আমি কোথাও বলব না। আপনারা আপনাদের বিশিষ্ট এবং নিজস্ব মনোভাব ও রুচি নিয়ে দেখবেন। অন্য একজন বাইরের মানুষের রায় দিয়ে নিজের বিচারদৃষ্টি ও সমালোচনাকে বাঁধবার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু প্রত্যেক শিল্পীরই একটি সবিশেষ ধারা আছে, যার নির্দ্দেশ না দিলে আমার এ সামান্য আলোচনারও কোন মূল্য থাকে না। "সিষ্টাইন্ ম্যাডোনা" রাফেলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি —এমন কথা বলা অন্যায়। কিন্তু ম্যাডোনা-মূর্ত্তিতে আমরা "Raphael par excellence" পাই, এ কথা বলা উচিত এবং একান্ত আবশ্যক। হাল্‌সের বিশেষত্ব অসাধারণ সাধারণত্ব।

হাল্‌স-এর জীবনের সঙ্গে বাংলা দেশের কোন কবির জীবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। হাল্‌স-এর শেষ জীবন দুঃখদৈন্যে বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল এবং আশী বছর বয়সেও পেটের দায়ে তাঁকে ছবি এঁকে রোজগার করতে হত। তাঁর বয়স যখন ৮৩

তখন তিনি "শ্লাউচ টুপীপরিহিত যুবক" আঁকেন। ক্যাসেলে এ ছবিটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়—রীতিমত চমক লাগে। চেয়ারের পিঠের উপর যুবকটির হাত, পিছনের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে সে চেয়ে আছে। চোখের সজীব দৃষ্টি প্রত্যেককে একটু বিচলিত করে। তখন হয়ত ভাবতে হয় যে ঐ ছবিটি যে এঁকেছিল, তার বয়স ছিল আশীর উপরে; সে মদ্যপান করত, তার চরিত্র খুব ভাল ছিল না *। কিন্তু এ বয়সেও সে এমন ছবি আঁকতে পারত!

হাল্স-এর জীবনকাল হল্যাণ্ডের আত্মপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধের সময়। এ গৌরব ও বেদনাময় যুদ্ধের সাথেই তাঁর জীবনের তুলনা। হাল্স-এর প্রতি যে-ব্যবহার তাঁর দেশবাসী করেছে, তার জন্য আজও তারা অনুতপ্ত। বিশ্বের শিল্পদক্ষরা যে অনেক-দিন পর্য্যন্ত হাল্স-এর মত মৌলিক স্রষ্টাকে যথাসময়ে ন্যায্য সম্মান দিতে পারেনি—সেজন্য তারা লজ্জিত। হাল্স-এর স্থান সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের যে-কোন দশজন চিত্রশিল্পীর মধ্যে। তিনি সব রকম কন্‌ভেন্‌শান ভেঙ্গে-চূরে শিল্পকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাঁর বিশেষত্ব, স্বাধীন রচনা ও মৌলিকত্ব প্রত্যেক চিত্ররসিকের সমাদর ও শ্রদ্ধার বস্তু।

হাল্স-এর মৃত্যুর পরে একদল চিত্রকর তাঁকে অনুসরণ করতে থাকে। ডার্ক হাল্স, ব্রুয়ার এবং এলাইস্ তাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ব্রুয়ার মদেই ডুবে রইলেন। হাল্স মদের গেলাসের স্বচ্ছতায় কলালক্ষ্মীর ধ্যানমূর্ত্তি প্রতি-ফলিত দেখতেন; কিন্তু ব্রুয়ারের সে ভাগ্য হয় নি, কারণ তার আগেই ব্রুয়ারের মৃত্যু হয়। ব্রুয়ারের সত্যিকার শিল্পীপ্রতিভা ছিল। "ঘুমন্ত বুর", "টোপার্স", "পাঁচটি লোকের বিবাদ", "বংশীবাদক", "এক গেলাসের প্রেম", "নাপিতের দোকান"—প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত ছবি। এর ভিতর তিনটি প্রকাশের দিক দিয়ে খুবই উঁচুদরের, যদিও বিষয়বস্তু মান বা গৌরবহীন।

নিজস্বের গৌরব এবং সম্পদ স্প্যানীয় চিত্রে, বিশেষ করে ভেলাজকুয়েজে, যথেষ্ট আছে। কিন্তু ভেলাজকুয়েজের মৃত্যুর পর স্প্যানিশ্ আর্ট ইটালীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে পড়ে। কিন্তু ডাচ্ আর্টের বিশেষত্বই এখানে যে হাল্স-এর পরেও স্বদেশী

* অধুনা অনেকের মত এই দাঁড়িয়েছে যে হাল্স চরিত্রহীন বা নেশাখোর ছিলেন না। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদের কি সার্থকতা আছে?

আন্দোলন বেঁচে রইল। হল্যাণ্ডে স্বদেশী চিত্রানুশীলনার ধারাটি অনায়াসেই সৃষ্ট হয়েছিল ডাচ্ চরিত্রের গুণে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এ নিয়েই বিলক্ষণ বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল এবং খুব সম্ভবতঃ রাস্কীন সাহেব না-থাকলে রক্ষণশীল ইংরেজ চরিত্রের কাছে রসেটিকে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। হাল্স-এর পরে যে প্রদীপ্ত প্রতিভা হল্যাণ্ডের চিত্রাকাশ মধ্যাহ্নকিরণে উদ্ভাসিত করেন, তাঁর নাম রেম্ব্রাণ্ট—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তস্বীর-চিত্রক।

(২)

লাইডেনে রেম্ব্রাণ্টের জন্ম হয়। তাঁর জন্মের বছর হাল্স-এর বয়স ছিল ২৬, রুবেন্স-এর ২৮, ভেলাজকুয়েজ-এর ও ভ্যান ডাইক্-এর ৭ বছর।

রেম্ব্রাণ্টের (১৬০৬—১৬৬৯) বাবা ময়দার কল খুলে ধনী হয়েছিলেন, তাই লাইডেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেকে পড়াতে তাঁর অসুবিধা হয় নি। কিন্তু পুত্রের শিল্পীপ্রকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কীর্ত্তির স্বপ্ন ভেঙ্গে হাতে রং-তুলি দিয়ে তাকে চিত্রপটের সাম্নে দাঁড় করে দিল। রেম্ব্রাণ্টের প্রথম চিত্রগুলি এখন আর পাওয়া যায় না, তবে তিনি বোধ হয় বাইবেলের উপখ্যানগুলিই প্রথম আঁকতে আরম্ভ করেছিলেন। "বাট্টাদার" রেম্ব্রাণ্টের প্রথম বয়সের উল্লেখযোগ্য ছবি। কিন্তু যে-ছবিটি হতে তাঁর স্রষ্টা জীবনের সুরু হয়েছিল, তার নাম "দেহবিজ্ঞান।

অনেকেই জানেন যে রেম্ব্রাণ্টের মত নিজের ছবি নিজে আঁকতে কেউ পারে নি। তাঁর প্রত্যেক চিত্রের আপনার অবস্থাবিশেষ ও ইমোশন্ আছে। কোন কোন ছবিতে তিনি হাসছেন, কোন কোন ছবিতে গম্ভীর হয়ে আছেন। তাঁর শত-শত চরিত্রচিত্র (portrait) ইওরোপের নানা চিত্রসমাবেশে রয়েছে। ব্যক্তিগত চিত্রসঞ্চয়ন থেকে প্রায়ই দু'-একটা বিক্রীর জন্য নীলামে উঠে। ছবিগুলির কি-রকম ডাক হয়, তা' যাঁরা জানেন, তাঁরা বুঝতে পারেন যে বর্ত্তমান কালে রেম্-ব্রাণ্টের ছবির কি রকম আদর! কিন্তু ৭০।৮০ বছর আগে রেম্ব্রাণ্ট সম্বন্ধে চিত্রামোদীর ধারণা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না।

যখন রেম্ব্রাণ্টের যশ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তখন সাস্কিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সাস্কিয়া সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে ছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের বিয়ে হয়। সাস্কিয়া প্রথমে ছবি আঁকতে এসেছিলেন। তখন এবং বিয়ের

পর রেম্‌ব্রাণ্ট সাস্‌কিয়ার অনেক ছবি এঁকেছিলেন—সাস্‌কিয়া তাঁর ছবিতে-ছবিতে আজও বেঁচে আছেন।

১৬৩৪-এ তিনি "একটি বৃদ্ধা" আঁকেন। বর্ত্তমানে National Galleryতে ছবিটি রক্ষিত আছে। এখানে "একটি বৃদ্ধা"র উল্লেখ করবার বিশেষ কারণ আছে। এ-ছবিটি দেখে মনে হয় যে রেম্‌ব্রাণ্ট এ-সময়েই বেশ সম্পূর্ণত্ব ও নিপুণতা লাভ করেছেন। বার্দ্ধক্যের রূপ এর চাইতে ভালো আর কোথাও দেখিনি। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার চরিত্র কিরূপ—এ নিয়ে ভাববার এবং পরীক্ষা করবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আমার মনে হয় যে এ বিষয়ে উৎসাহীরা অনেকগুলি মনোবিজ্ঞানের পুঁথিতে যে উপকার না পাবেন, এই একটিমাত্র ছবিতে তা পাবেন। জেরোম্ কে জেরোমের The Diary of a Pilgrimage গ্রন্থে বুড়োদের চরিত্রের একটু বর্ণনা পড়েছিলাম:

"What grand pictures some of these old, seared faces round us would make if a man could only paint them—paint all that is in them—all the tragedy and comedy that the playwrights put in the drama! Life has written upon the witherd skins joys and sorrows, sordid hopes and fears, *child-like strivings to be good*, mean selfishness and grand unselfishness, have helped to fashion these old wrinkled faces. The curves of cunning and kindliness lurk round these fading eyes. The lines of greed hover about these bloodless lips that have so often been tight pressed in patient heroism" ('and parted by nervous, uncertain - almost foolish smiles at the recognition of their follies and failures.')

রেম্‌ব্রাণ্টের ছবিটিতে এরকম বহুদূরব্যাপী, বহুস্মৃতি-সম্বলিত একটি ইতিহাস এক বৃদ্ধ মুখে প্রতিফলিত হয়েছে। যখনই কোন বুড়ো মানুষ দেখি, তখনই রেম্‌ব্রাণ্টের ছবিটি চোখের উপর ভেসে উঠে।

খ্যাতিলাভের পর অনেক ছাত্র তাঁর নিকট চিত্রাভ্যাস করতে আসত। কিন্তু রেম্‌ব্রাণ্ট কখনও তাদের দিয়ে নিজের ছবির কাজ করাতেন না। প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি আলাদা ঘর দিতেন—যেন কেউ কাউকে প্রভাবিত করে মৌলিকত্ব-টুকু নষ্ট করতে না পারে। যথেষ্ট উপার্জ্জন সত্ত্বেও সর্ব্বদা তাঁর অর্থকষ্ট ছিল।

কারণ, তিনি ব্যবসাদারি জানতেন না, আর ভীষণ বাজে খরচ করতেন*। রেম্‌ব্রাণ্ট খুবই prolific ছিলেন এবং খুব দ্রুত আঁকাতে পারতেন। কিন্তু একটা সামান্য ঘটনা থেকে তাঁর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটে।

এ্যামষ্টারডামে "রাতের পাহারা" নামে তাঁর একখানা ছবি আছে। ছবিটি যদিও দিবাদৃশ্যের তবুও এত dark যে এর নাম হয়েছে, "রাতের পাহারা।" এ ছবিতে শহরের অনেক গণ্যমান্য লোককে তিনি অন্ধকারে রেখেছেন বলে তাঁর জনপ্রিয়তা ও পেট্রন্ মহলে সাহায্যের আশা নষ্ট হয়। তাঁর আয় আশাতীত রকমে কমে গেল এবং এ-সময়েই সাস্‌কিয়ার মৃত্যুতে তাঁর নিজের জীবনও "রাতের পাহারা"র মত কালো হয়ে উঠল। সাস্‌কিয়া যেন দুঃখের জন্য ছিলেন না। রেম্‌ব্রাণ্টের জীবনে এক সৌভাগ্যের দিনে তাঁর আগমন এবং দুঃখশৈত্যের আক্রমণে তাঁর নিষ্ক্রমণ। সাস্‌কিয়ার গর্ভে তাঁর এক ছেলে হয়েছিল। কিন্তু এই পুত্ররত্ন টাইটাসের উত্তরাধিকারের অংশ নিয়ে রেম্‌ব্রাণ্টকে খুবই ভুগতে হয়েছিল।

কিন্তু দুঃখের দিনে করুণার দান মহিমময়ী হেন্‌ড্রিজ ষ্টোফেলস্ তাঁর কালো জীবনাকাশে স্মিতহাস্যে উদিত হন। সাস্‌কিয়ার মত ষ্টোফেলস্‌কেও তিনি অমর করেছেন। ষ্টোফেলস্ সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূতা ছিলেন না; এমন-কি, তিনি লিখতে-পড়তেও জানতেন না। কিন্তু নিমেষের মধ্যে তিনি শিল্পীর দুঃখতপ্ত জীবন শান্তি ও সুষমায় ভরে তুললেন। আবার তাঁর হাতের তুলি ছবির পর ছবিতে অভূতপূর্ব্ব দীপ্তি ফুটিয়ে তুলতে লাগল। তাঁর এ সময়কার ছবিগুলি লক্ষ্য করলে আমাদের photo-artistরা আলোকসম্পাত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবেন।

"Harmony, position and the grip of character of this period are masterly and cannot be compared to any other achievement of any similar character".

এলবার্ট কাইপের মত প্রতিভাশালীও তাঁর এ সময়ের চিত্রাবলী দেখে নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকতেন; ষ্টোফেল্‌সের সাহচর্য্যে রেম্‌ব্রাণ্টের জীবনের

* রেম্‌ব্রাণ্ট সম্বন্ধে সব চাইতে ভাল বই বোধ হয়: Life and Times of Rembrandt by Hendrik Van Loon. (Published by Garden City Publishing Co. N. Y.) এ বইটিতে রেম্‌ব্রাণ্টের জীবন-কথা ভিন্ন আরও অনেক মনোজ্ঞ বিষয় আছে। জীবনী হিসাবেও এইটি চমৎকার বই।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে। ষ্টোফেল্‌সের নানা অবস্থার বহু ছবি তিনি এঁকেছেন। অনেক দুঃসাহসী চিত্রদক্ষ বলতে চান যে রাফেলের ম্যাডোনা-চিত্রের চাইতেও এ ছবিগুলি শ্রেষ্ঠ। ফরাসী চিত্রশিল্পী দেলাক্রোয়া বলেছিলেন,

"You would discover in time that Rembrandt was a greater artist than Raphael."

১৬৭১-র পর তিনি প্রায়শঃ ইজেল ছবি আকতেন। উফিজিতে রেম্‌ব্রাণ্টের বৃদ্ধবয়সের যে প্রতিকৃতি আছে তার পূর্ণাকার 'আসল' আমি দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখতে পারিনি। তবে খুবই ভালো অনুকৃতি দেখেছি এবং তাতে মুগ্ধ হয়েছি।

অনেকে বলেন যে রেম্‌ব্রাণ্ট ছিলেন দার্শনিক। কোন আপত্তি নেই কেননা দার্শনিক হওয়া খারাপ নয়। কিন্তু সবার আগে এবং সবার উপরে তিনি ছিলেন শিল্পী ও স্রষ্টা। চিন্তা হতে অনুভূতি, মগজ থেকে হৃদয় তাঁর অনেক বড়। রাস্‌কীন সাহেব রেম্‌ব্রাণ্টের রুচির প্রতি একটু কটাক্ষ করেছেন। রেম্‌ব্রাণ্ট স্পষ্ট স্বীকার করতেন ঃ স্বাধীনতাই তাঁর ধ্যান ও কামনা। সম্মানজনকতা তার নীচে।

রেখাচিত্র ধরে তাঁর প্রায় ১,৬০০ ছবি পৃথিবীর নানা স্থানে আছে। তাঁর মত বর্ণব্যঞ্জনা (colour-effects) আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি। তাঁর এক-বর্ণ এবং রেখাচিত্রে পর্যান্ত "subtle understanding of highly impressive colour-effects"-এর পরিচয় মিলে। ভারমিয়ার বা ভ্যান ডাইকের মত তাঁর রং স্বচ্ছ নয়; টিশিয়ান বা রুবেন্‌সের মত উজ্জ্বলও নয় তাঁর রং; সেগান্তিনি বা টার্নারের বর্ণবিন্যাসের সঙ্গে তাঁর মূলগত পার্থক্য আছে। রেম্‌ব্রাণ্টের বর্ণাভা গভীর অর্থপূর্ণ। রহস্যময় প্রদোষালোকের মত রেম্‌ব্রাণ্টের ভারী রঙে মানব-প্রকৃতির অতলের অনেক রহস্য দেখা যায়; কতক শুধু উঁকি দেয়, কতকগুলি ধরা দিয়েছে আর কতগুলি মোনা লিসার হাসির মত চিরকাল আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলবে।

রেম্‌ব্রাণ্টের ছাত্রদের মধ্যে ডু, ডার্ড, কাবেল, মেইস্ (১৬৩২—১৬৯৩) ও ফেব্রিটিয়াস্ এবং অনুকারীদের মধ্যে লেওনার্ড ও কোনিক্ উত্তরকালে যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। মেইস্‌কে খুবই ভাল লাগে। কিন্তু তাঁর রসভঙ্গের দু-একটু নমুনা না দিয়ে পারা যায় না। "প্রার্থনা" একখানি অনবদ্য, কিন্তু স-খুঁত ছবি।

আলোচ্য চিত্রে তিনি একটি পরিপ্লুত স্নিগ্ধতা ও শান্তি ফুটিয়ে তুলেছেন ; যে লোকটি চোখ বুজে যোড়হাতে কৃপা প্রার্থনা করছে—তার কপালের প্রত্যেকটি কুঁচ্কানির দাম লাখ টাকা। কিন্তু ঠিক টেবিলের সমুখ বেয়ে উঠছে একটা বিড়াল। বিড়ালটি সমস্ত ছবির effect নষ্ট করেছে। বিড়ালের প্রতি এই চিত্রকরটির একটু অন্যায় প্রীতি ছিল। অবশ্যই প্রার্থনাকালে বিড়াল রুটির টুক্রা নিয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু তা' আঁকা শিল্পীসুলভ রুচির পরিচয় দেয় না—বিশেষ আলোচ্য পরিবেশের মধ্যে। কিন্তু স্থানবিশেষে আবার এ বিড়ালই রসসৃষ্টির জন্য আবশ্যক হ'তে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মেইসেরই "আলসে চাকরাণী" উল্লেখ করা যেতে পারে। মাছ নিয়ে পলায়মান বিড়ালটি না থাকলে কখনো এ ছবিটি এমন জমত না। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅপরূপ মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

বৃষমুণ্ড

পাষাণের বৃষমুণ্ড অধিষ্ঠিত শ্মশানের পরে
নির্জ্জন প্রান্তরে।

দেহ তার সমাহিত মেদিনীর মর্ম্ম-আবরণে
মাটির গহনে।

চেয়ে আছে নির্নিমিখ এক চক্ষু মেলিয়া সদাই
দুই চক্ষু নাই।

নিষ্পলক সে চক্ষুর পানে চাহি সূর্য্যচন্দ্রতারা
হয় আত্মহারা।

তাহারে ঘিরিয়া নিত্য লক্ষ চিতা নেভে আর জ্বলে
সে প্রান্তর তলে।

সে নিকষ কৃষ্ণ শিরে লুপ্ত হয় ঢালিয়া প্লাবন
অযুত শ্রাবণ।

সে-পাষাণ জিহ্বাতলে উচ্ছলায় এই বসুধার
সবুজ সুধার
প্রাণপাত্র। সন্ধ্যা উষা নেত্রে তার স্বপনের মত
সাধে বর্ণব্রত।

দিনে দিনে জীর্ণ হয় চূর্ণ হয় করোটী কঙ্কাল,
যায় কতকাল;
তাহারে করিয়া কেন্দ্র জগতের জীবন মরণ
করিছে নর্ত্তন;
সৃষ্টির জলধি হ'তে সংখ্যাহীন তরঙ্গ উঠিয়া
পড়িছে টুটিয়া

সে অচল-চেতনায়। আছে চাহি নির্জ্জন প্রান্তরে
শ্মশানের পরে
পাষাণের বৃষমুণ্ড একচক্ষু মেলিয়া সদাই,
দুই চক্ষু নাই।

নিশিকান্ত

শাড়ী

কি শাড়ী পরবে তুমি ?
তার আমি কি জানি ?
ঠাট্টা নয়······
দিতে নেই মন্ত্রণা কোনো মেয়েকে,
বিশেষ করে শাড়ী নিয়ে।
তবু ? তা হ'লে শোনো।
যে-খানাই অঙ্গে ছোঁওয়াও,
সফল হবে তার বস্ত্রজীবন,
আর মানুষের চোখ।

ঝিল্‌মিলিয়ে উঠুক্ তোমার দেহ।
আমি ভালোবাসি রঙ্-এর খেলা······
কম্‌লা, আকাশী, ঘাসের রঙ,
সী-গ্রীন্, শ্যাম্পেন, রাস্প্‌বেরী—
আরো অনেক কিছু।
কিন্তু বেশী ডীপ্ নয়······
না, না,—মানাবে বই কি ?
তবু আমার জন্যে না হয় পরলেই বা
ঘোর রঙ্-এর ফিকে এডিশ্যন।

মাইসোর, মারহাট্টী, ব্যাঙ্গালোর,
বিষ্ণুপুরী, মুর্শিদাবাদী,—সাদা অথবা রংলা,
যেটা খুসী সেইটে পরো।

শুধু পরো না বীডিং-দেওয়া
চুম্‌কি-বসানো জর্জেট্
কিংবা হাল্‌কা বাতাসী ভয়েল্—
ও যেন তনু দেহের উগ্র বিজ্ঞাপন।

আমার পছন্দ, দক্ষিণী কানাড়ী শাড়ী,
মাঝাড়ি-চওড়া পাড়, আঁচল রমণীয়,
তাতে খড়্‌কে-ডুরে।
লাল মাটীর রঙ্—মনে হবে যেন
গঙ্গাজলে শুভ্র দেহ সদ্য মেজেছো,
যায়নি মুছে এখনো
ভাগীরথীর স্নিগ্ধ আভা।

হাসালুম্? কেন? ছবির বিয়েতে যাচ্ছো না
তা হলে পরো ঢাকাই।
বুটীদার, সূক্ষ্ম হাতের কাজ—
নতুন খোসা-ছাড়ানো
বাতাবী নেবুর রঙ্।
তাও নয়? শুধু বাড়ীর জন্যে?
পরো সাদাসিদে তাঁতের কাপড়।
নাঃ—শান্তিপুরী গুল্-বাহার নয়,
ও আমার চক্ষুশূল!
ফরাস্‌ডাঙ্গা, ধনেখালি, সস্তার বাগেরহাট—
সেও ভালো, কিন্তু মিলের শাড়ী নয়।
খস্‌খসে মোটা পাড়
নরম গায়ে লাগবে যে!

রঙীন? নিশ্চয়ই! সাদা শাড়ী পরার বয়স
তোমার আসেনি এখনো।
চল্লিশ অবধি দিব্যি চালাতে পারো।

তবে হিজিবিজি, চমক-লাগানো
পাহাড়-মন্দির পাড় নয়।
'চাঁদের আলো' জমির সঙ্গে ঢালা কালো পাড়
একবার পরে দেখো আয়নাতে।

যদি আমার কথাই শুনতে চাও
পরো ঘাস-রঙের শাড়ী,
আর পায়ে ঘাসের চটি,
বেড়িয়ো ঘাসের ওপর—সেটা সকালে,
দেখাবে ঠিক্ যেন মূর্ত্তিমতী উষা।

দিনের বেলায় পরো স্কাই-ব্লু।
খর রোদের ঝাঁঝে আকাশ-বাতাস যখন তপ্ত,
তোমার শাড়ীর রঙে চোখ জুড়োবে।
মনে হবে এ কোন সাদা ছায়ার নীল মায়া?

সন্ধ্যায় পরো গেরুয়া—
স্নিগ্ধ, নয়নাভিরাম।
মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজ্‌লে পরে
মনে হবে—ঘরে এ কোন্ উদাসী তাপসী?

আর রাতে—অগ্নিশিখা স্কারলেট্?
ছিঃ, আমার কি রুচি নেই?
জ্বেলো না নতুন আগুন। পরো কম্‌লা—
আকুল হবে মিলন-রাত।

কিংবা সেই কালো শাড়ী, লাল-পাড়
দিয়ো সুডৌল বাহুর পাশে ঘুরিয়ে।
সেদিন আবার একবার করো নিজকে মায়াময়ী
রহস্য আবরণে। নীচু মুখে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ো
চেনা-অচেনার বিস্ময়ের মতো।
পাবে উচ্ছ্বসিত আদর—যেমন আজ,
হ্যাঁ, এখুনি—
তাতে কী হয়েছে?

শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

রাত্রির রহস্য

ঘুমের ঘোম্‌টা টেনে দাও সখি, নয়নে ঘনা'ক্‌ মায়া ;
মৃত্যুর মতো ঘিরিয়া নামুক হৃদয়ে গভীর ছায়া।
সন্ধ্যামাধুরী-মুগ্ধ তোমার শ্রান্ত মনেরে ঘিরে'
রাতের বাউল একতারা হাতে ঘুম-গীতি গাহে ধীরে।
পাইন্‌ পাতারা তাই দেখো ঢুলে, পাম-তরু শিহরায় ;
তারকার পাখা ঝিমাইয়া আসে, আলো কাঁদে আলেয়ায়।
তমিস্রা-ঝড়ে কুঞ্চিত মেঘ কোথায় হয়েছে হারা,
স্বপন-পশরা শিরে সারা রাত ফিরিবে উদাস-পারা!
যতখন নাহি দেখা দেয় পূবে রবির উত্তরীয়—
জীবন-সোরাহী উজাড় করি' সে স্বপন-শরাব পিয়ো॥

অবসাদ-ভরা মহাকাশ হ'তে নীলাস্তরণ-সম
খসিয়া পড়েছে ধরাতলে আজি রজনী অন্ধতম।
ঝিল্লীর সুরে অরণ্য গাহে ঘুম-ছড়া অবিরত,
প্রাচীন পৃথিবী কাতরে ঘুমায় ক্লান্ত পশুর মতো।
ধরার লোকেরা শত্রু মোদের, শুয়েছে নিরুদ্বেগে ;
জানে না তাহারা যে-কামনা জ্বলে আমাদের মনোমেঘে।
জগৎ যখন অচেতন ঘুমে, তুমিও ঘুমাও সখি,
রিম্‌ঝিম্‌ করে স্নায়ু শিরা তব ঘুমের মদিরা ভখি'।
জগতে সত্য জাগরণ শুধু, নিদ্রার নাহি দাম ;
মহান্‌ করো সে নিদ্রারে তুমি করো তা'রে অভিরাম॥

গরজে তোমার চরণ-নিম্নে অশান্ত পারাবার,
কটিতটে তব কিঙ্কিণী বোলে, দোলে যবে ফেন-হার।
তালে তালে তব তনু-দেহ কাঁপে, কাঁপিছে বুকের চূড়া ;
আমার প্রাণের সাগরে যে-ঢেউ সে-ও ভেঙে হয় গুঁড়া।

মোর মনে জাগে একটি ভাবনা, আকাশে জাগিছে চাঁদ ;
সাগরে অগাধ উতল কামনা, তব দেহে অবসাদ।
ধরার চিন্তা যে সূর্য্য সে-ও সুপ্ত ধরার সাথে ;
নিষুপ্ত নিশা, রহস্য তার জেগে থাকে বাঁকা চাঁদে।
তুমি জেগোনা কো, সারা রাত আমি জাগিব তোমার পাশে ;
তোমার রূপের রহস্য মোর ঝলসিবে চিদাকাশে॥

অমাবস্যার নিকষ আঁধারে সৃজিত আমার মন,
ছায়ার মায়ায় লীলা শুধু সেথা নিশীথ-সঞ্চরণ।
সে-আঁধারে তুমি হও গো বিলীন্ ঘুমে হয়ে নিমগনা—
হও গো মোহিনী শুচি-সুষমিতা চির-আরাধ্যজনা।
আত্মার রসে নিরালে মজিয়া নিরূপমা হবে প্রিয়া,
অপরূপা সেই তোমার মাঝারে ছাড়া পাবে মোর হিয়া।
হেরিবে মোদের সে-মধুমিলন মহাকাশ বিভাবরী—
তুমি জাগো মোর বুকের আকাশে শর্ব্বরী সুন্দরী।
রাত্রির হাওয়া চীৎকার করে, তবুও জাগিছে চাঁদ ;
স্বপনের ঘোরে জাগুক্ তোমার হৃদয়ে প্রেমের সাধ॥

যুগ যুগ ধরি' যে-তারারা জাগে রাতের স্বপন সাথে
সে-তারাখচিত নীলাম্বরীর আঁচল তোমার মাথে।
বুকে আছে তব সোহাগ-নিঝর, নয়নে প্রেমের দ্যুতি ;
আকাশ সাগর উৎসুক চাহি' সে-আলোর অনুভূতি।
ত্রিভুবন-বীণা বাজিবে তোমার অলস নিশাস-গানে,
তৃণের নূপুর মুখর হইবে স্বপ্ন-শিশির-স্নানে।
কালো কেশ তাই এলাইয়া করো নিশীথেরে সুনিবিড়,
উদয়-উষার সিঁদূরে রাঙিয়া রচো স্বপনের নীড়।
শরীর তোমার শ্লথ হ'লো ঘুমে, আঁচল পড়িছে খসি',
নীবিবন্ধন-চ্যুত রূপালোকে স্বপ্ন হেরিছে শশী॥

স্বপ্ন গড়িব আমিও তোমার মুখ-মমতার মোমে—
যত বিস্মৃত আশা-বিদ্যুৎ শিহরিবে রোমে রোমে।
প্রজাপতি-সম লঘু পাখা মেলি' ফিরিব স্বপনে তব ;
তব জীবনের গভীরতা-মাঝে আমি যে শিকারী নব।
হেরিব ও-চোখে ঘুমের বিহার মেঘ-সঞ্চার সম ;
জলের ছন্দে আন্‌মনে গাবো প্রভাতের গান মম।
জোছ্‌না ঝরিছে তব মুখে হেরি' ভুলিব বিশ্বলোক ;
ক্ষণিকের সুখ, ক্ষণিক জীবন, তবু করিব না শোক।
স্বপনের আয়ু ক্ষীণ তবু আঁখি মেলোনা ভোরের আশে ;
উদ্বেগহীন এ-সুখ জীবনে ভাগ্যে বারেক আসে॥

আব্‌দুল কাদির

পুস্তকপরিচয়

Obiter Scripta—by George Santayana—edited by Justus Buchler and Benjamin Schwartz, (Constable.)

একদা সার্ অগষ্টিন্ বিরেল্-এর এক প্রবন্ধে পড়ি সান্টায়ানা যে এত ভাল ইংরাজী লেখেন তার কারণ তিনি জাতিতে স্প্যানিশ্। স্পেন্ দেশের ভাষা ভাল জান্‌লে নাকি ইংলণ্ডের ভাষায় দখল আসে। সে দখল সান্টায়ানার প্রচুর পরিমাণে আছে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি যে সকল বিষয়ের অবতারণা করেছেন সেগুলি জটিল। সেগুলিকে জটিলতর কর্‌বার প্রয়াস তিনি করেন নি। এমন প্রাঞ্জল ভাষায় তত্ত্বকথা শুন্‌তে চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই আগ্রহান্বিত হবেন।

লেখার ভিতর দিয়ে নাকি লেখকের পরিচয় পাওয়া যায়। একথা যদি সত্য হয় তাহলে সান্টায়ানার পরিচয় আমরা তাঁর লেখায় পেয়েছি। তাঁর বিচারভঙ্গী ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেই, বোধ হয়, সম্পাদকদ্বয় বলেছেন—"There is a wide diversity of subject-matter among them, yet they complement each other in a manner peculiar to their author ;" এবং এই বৈশিষ্ট্য স্মরণ করেই লেখক ভূমিকায় "latent impulses of my mind", "the mental atmosphere in which I have lived", এই কথাগুলি ব্যবহার করেছেন।

সান্টায়ানার কাছে দর্শনশাস্ত্রের মূল্য খুবই বেশী; সাহিত্যবিচারেও তিনি দর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন—উদাহরণ, তাঁর গ্রন্থ, *Interpretations of Poetry and Religion*। সান্টায়ানার দর্শন বিশেষভাবে metaphysical, এবং তাঁর metaphysics বহুস্থলেই epistemology। জ্ঞানবাদে সান্টায়ানা কোনও বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত নন। তাঁর মতে—"Nothing can be intrinsically unknowable" (*The Unknowable*); এবং *Literal and Symbolic Knowledge* নামক প্রবন্ধে তিনি "varying degrees of knowability in things natural and ideal" স্বীকার করেছেন।

Neo-Platonist দার্শনিকবৃন্দের মধ্যে প্লোটাইনাস্ তাঁর সংযত বিচারবুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। প্লোটাইনাস্-এর শিবাশিব-প্রকৃতিবিচার সম্বন্ধে ফুলার্ যে উভয়সঙ্কট সৃষ্টি করেছেন তার শৃঙ্গদুটির মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে সান্টায়ানার অনিচ্ছা দেখা যায়। ফুলার্-মহোদয়ের মতে—"either all excellences are absolute and incomparable or there is no excellence but one।" প্রথমটি ethical naturalism, দ্বিতীয়টি ethical mysticism। সান্টায়ানার মতে ethical naturalism আসলে biological naturalism; কারণ শিবত্বের আপেক্ষিক

পরিমাণ এখানে অস্বীকার করা হয়েছে। তাঁর মতে শিব বা শুভের পরিমাণ ব্যক্তিসাপেক্ষ। তার ফলে সান্টায়ানা হয়েছেন অন্তরাশ্রয়ী নীতির পরিপোষক। Ethical mysticism তাঁর ভাল লাগেনা, কারণ তাঁর মতে শুভ অদ্বিতীয় নয়, এবং তার মধ্যে পরিমাণভেদ আছে। "The mere existence of finitude and separation was accordingly no evil but a good, although this good was inferior to that other good in the imitation or worship of which it arose". "Has the lovely creature we first fell in love with become an evil, because that frail charm may have awakened and bound us to higher loyalties ?" [*Plotinus and the Nature of Evil*] স্পষ্টই বোঝা যায় বিশেষজ্ঞের পন্থা সান্টায়ানার নয়।

আলোচ্যগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ *The Two Idealism*। এখানে সক্রেটিস্ কথক—প্লেটোর Republic-এর সক্রেটিস্; অর্থাৎ, মুখোস। সক্রেটিসের মুখোসে সান্টায়ানা দর্শনশাস্ত্রে বিভিন্ন যুগের আদর্শ নিয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে ক্রাটিলাসের মতবাদের উল্লেখ অবান্তর হবে না। ক্রাটিলাস্ ব্যাকরণ ও দর্শনের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর মতে, আবেগ-সূচক অব্যয়বাক্যের (interjection-এর) সৃষ্টি হয় সর্ব্বপ্রথমে। তারপরে আসে বিশেষণ, কারণ, গুণকথন interjection-এরই রূপান্তর। তৎপরে বিশেষ্যের সৃষ্টি, কারণ,—"the noun was but one adjective chosen among the rest because it designated the most conspicuous element in that complex experience, and, consequently, could, for brevity's sake, be used as a symbol and suggestion for all the other adjectives"। এইরূপে ব্যাকরণ-ভিত্তির উপর ক্রাটিলাসের দর্শন গঠিত হয়েছিল। ক্রাটিলাসের দার্শনিক মনোবৃত্তি সক্রেটিস্-রূপী সান্টায়ানা নব্যদর্শনে খুঁজে পেয়েছেন।

Estetica নামক গ্রন্থে বেনেদেত্তো ক্রোচে বল্‌ছেন—"aesthetics is purely and simply the science of expression"। এই expression বস্তুটির মধ্যে নিহিত আছে apperception, intuition এবং imaginative synthesis। ক্রোচের মতে অভিব্যক্তি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ; ফলে, দুটি অভিব্যক্তির চরম সৌষ্ঠব সমমূল্য। সান্টায়ানা এই মতের বিরোধী।

তিনি অভিব্যক্তির স্তরভেদ স্বীকার করেন। তিনি বীক্ষাশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের সমধর্ম্মী করতে চান। কিন্তু, সান্টায়ানার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি আর্টকে নৈতিক আদর্শের অধীন করেননি। তাঁর মতে, "Aesthetic satisfaction comes to perfect all other values ; they would remain imperfect if beauty did not supervene upon them, but beauty would be absolutely impossible if they did not underlie it. (***What is Aesthetics*** ?) একথার পর তর্ক করা নিরর্থক ও দুরূহ।

সান্টায়ানা স্পেন দেশের লোক, আমেরিকার অধ্যাপক, ইংলণ্ডের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনটি বিভিন্ন সভ্যতার স্রোতোবেগে সান্টায়ানার মনে দেশজ সঙ্কীর্ণতার একান্ত অভাব। সেই সংস্কারমুক্ত মনের প্রভাবে তাঁর ভাষা হয়েছে উজ্জ্বল, মতবাদ সংযত ও স্থিরবুদ্ধি। *Obiter Scripta*তে যে কয়টি প্রবন্ধ সংগৃহীত হয়েছে সেগুলি পড়ে আমার মনে হয়েছে যে, সান্টায়ানা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হলেও বিশেষজ্ঞের পন্থা পরিহার করেছেন। ফলে, প্রতিটি সমস্যাকে নূতন ভঙ্গীতে পরীক্ষা করবার অবকাশ তিনি পেয়েছেন। সে দৃষ্টিভঙ্গী পণ্ডিতের ভ্রূকুটি নয়, চিন্তাশীল সজ্জনের মোহমুক্ত তথ্যদর্শন। অধ্যাপক সান্টায়ানার মত যে সর্ব্বত্র নির্দ্দোষ, তাঁর যুক্তি যে অখণ্ডনীয় এমন নয়—দর্শনশাস্ত্রে মতের মিল কদাচিৎ ঘটে। কিন্তু, তার জন্য সান্টায়ানার বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা ব্যাঘাত পায় না।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

———

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (নবজীবন সঙ্ঘ)

বঙ্গ-প্রতিভা—শ্রীঅবনীনাথ রায় (পি, সি, সরকার এণ্ড কোঃ লিঃ)

মানুষের প্রতিভা কখনও একটি মাত্র বস্তু নিয়ে খুসী থাকতে পারে না, সে চায় নানা দিকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বিজয়লালের প্রতিভাও বহুমুখী। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সাহিত্যিক হিসেবে, কখনও স্বদেশ প্রেমিক ভাবে, কখনও কম্যুনিষ্ট, কখনও সাইকো-এনালিষ্ট, কখনও বা সবহারাদের কবির বেশে একাধিকবার তাঁকে দেখা গেছে। একবার রবীন্দ্রনাথের ওপর বই লিখে তাঁর জেলে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তবুও তিনি নাছোড়বান্দা। ফলে, "রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ"। বইটির ভূমিকাতে লেখক লিখেছেন, "এবারে তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেবল মনো-বিকলন তত্ত্বের (Psycho-analysis) দিক থেকে। সুতরাং ন ভেতব্যম্, ন ভেতব্যম্।" অর্থাৎ জেলের দিক থেকে তাঁর অথবা আমাদের আর কোনও ভয় নেই। কারণ এবারে লেখক শুধু ফ্রয়েডের দৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের কয়েকটি উপন্যাস ও একখানি নাটকের সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট যুক্ত বইখানির ভূমিকা থেকেই বোঝা যাবে এর দৌড় কতদূর। আসলে, ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞানের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বই হয়ত সমালোচনা করা যায়, কিন্তু তার জন্য যে পরিমাণে ফ্রয়েডকে জানা দরকার সে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বিজয়লালের নেই। অন্ততঃ এ বইখানি থেকে তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে যে, কোনও গল্পকে বিশ্লেষণ করা চলে তার পরিচয় ফ্রয়েড নিজেও দিয়েছেন। তাঁর "Delusion and Dream" নামক বইখানিতে Wilhelm Jensen-এর "Gradiva" নামক গল্পটির তিনি সূক্ষ্ম

বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই সব বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তাঁর মতবাদ খাড়া হয়েছে। কিন্তু বিজয়লালের সে ধরণের প্রচেষ্টা এ বইখানিতে কোথাও মিলবে না। কতকগুলি অসংলগ্ন যুক্তির মধ্যে পাঠকের মন কেবলি ঠোক্কর খাবে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথকে শিখণ্ডী স্বরূপ খাড়া করে বিজয়লালের ফ্রয়েডীয় উক্তির নির্লজ্জ উচ্ছ্বাস খুবই হাস্যকর হয়েছে। শশাঙ্ক শর্ম্মিলাকে ছেড়ে ঊর্ম্মিকে কেন ভালবাসল তার মনস্তত্ত্ব বের করবার জন্য লেখক যে ভাবে ফ্রয়েডের তত্ত্ব প্রয়োগ করেচেন তাতে হয়ত যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই লজ্জা পেতেন। এ ধরণের চেষ্টাকৃত পাণ্ডিত্যের মধ্যে পাঠকের মন স্বভাবতই বিরক্ত বোধ করে। একজন যে ফ্রয়েড পড়েছেন তার পরিচয় দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের গল্পের দরকার হয় না, যে কোন গল্পের বই-ই যথেষ্ট। একথা অন্ততঃ বিজয়লালের বোঝা উচিত ছিল যে, রবীন্দ্রনাথ 'পাবলিক ডাষ্টবিন' নন এবং তাতে যার যা খুসীমত আবর্জ্জনা ফেলা চলে না। এ সব ছাড়াও বইখানির স্থানে স্থানে Edward Carpenter, Romain Rolland, Bernard Shaw ইত্যাদি ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন। ফলে না চেনা যায় রবীন্দ্রনাথকে, না যায় ওঁদের কাউকে।

কিন্তু সমগ্র বইটির মধ্যে লেখকের একটি বিশেষ ইচ্ছা অতি সূক্ষ্ম ভাবে ধরা দিয়েছে। আমাদের মোটা ভাষায় তাকে ঠিক ভদ্র ভাবে প্রকাশ করা চলে না। সাইকো-এনালিষ্ট বিজয়লাল তাঁর এই ইচ্ছাকে কি সংজ্ঞা দেবেন? 'Masochism'? তবে পাঠকেরা সাধারণতঃ অতি ভদ্র এবং সংযমী, এই যা মুস্কিল।

অবনীনাথের নতুন বই "বঙ্গ-প্রতিভা" কিশোর কিশোরীদের জন্য লেখা। লেখকের উদ্দেশ্য বইটি যাতে একাধারে "টেকস্‌ট বুককে টেকস্‌ট বুক আবার সাহিত্যকে সাহিত্য" গোছের হয়। বইটি দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে বাংলা দেশের কয়েকটি বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের জীবনালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় ভাগে বেশীর ভাগই মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইত্যাদি লেখকদের বইয়ের সমালোচনা, তা ছাড়া সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধেও দু'একটি প্রবন্ধ আছে। দুঃখের বিষয় বইটি মোটেও কিশোর কিশোরীদের উপযোগী হয়নি। লেখকের জীবনালোচনা অত্যন্ত অস্পষ্ট। তাতে না পাওয়া যায় কোনো তথ্য, না বোঝা যায় তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য। তা ছাড়া স্থানে স্থানে পাণ্ডিত্যের ধূমকেতু কিশোর কিশোরীর নরম মনের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ওপর লেখাটিতে কেবলমাত্র লেখকের উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কিছুই মেলে না। ছোটদের জন্য বই লিখতে হলে যে পরিমাণে ভাষা, ভাব ও পাণ্ডিত্যের সংযম দরকার হয়, সে পরিমাণ সংযম লেখকের নেই। জীবন-কথার সঙ্গে সাহিত্যালোচনাও অত্যন্ত কাঁচা লেখা হয়েছে। ফলে কিশোর মনের কাছে লেখাগুলি খুবই দুর্ব্বোধ্য ঠেকে। একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য পেছনে না থাকলে এ ধরণের দুশো একুশ পাতা ভর্ত্তি একটি বই লিখতে যে অসাধারণ প্রতিভার প্রয়োজন সে বিষয়ে বোধহয় সকলেই নিঃসন্দেহ।

শ্রীচঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

The Stories of Three Decades—by Thomas Mann,
(Secker & Warburg)

টমাস মানের বিগত ত্রিশ বছরের গল্পগুলি একখণ্ড পুস্তকে সঙ্কলিত করার জন্যে প্রকাশকদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বরাবর মানের গল্প খুব ভাল লেগে এসেছে এবং তাঁর লিখন-ভঙ্গীর ওপর শ্রদ্ধাও আছে যথেষ্ট। অবশ্য মানের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে অনেকেই সুপরিচিত; তবু এই গল্পসঞ্চয়ন সূত্রে কিছু বলবার সুযোগ ঘটে গেল।

মনে পড়ে লেসিং প্রসঙ্গে মান্ একদা বলেন—কবির কাব্যদৃষ্টির পেছনে কোনো বিতর্ক বা অন্তর-বিরোধ থাকবে না বহির্লোকের সঙ্গে। সমস্ত কিছুকেই কবি গ্রহণ করবেন শান্ত মনে, বিনা তর্কে, অবিকৃত ভাবে। তারপর তাঁর কাব্যমগুনের ওপর কবির জয় পরাজয়। এ মহৎ দায়িত্ব কবির। এবং যেখানেই কবি বিচলিত হয়েছেন বহির্লোকের সংঘাতে, সেখানেই তাঁর অপমান।—এ কথা মানের নিজের সম্বন্ধেও খাটে খানিকটা। খানিকটা এইজন্যে, এই তথ্যের পেছনে আছে তাঁর জাতীয় শ্লাঘা, যার ফলে তিনি বলেন, এই বাস্তবকে অবিকৃত ও নির্লিপ্ত ভাবে গ্রহণ করার মনোবৃত্তি বিশেষভাবে জার্মান বা টিউটনিক্ মনোবৃত্তি। অবশ্য তাঁর পক্ষে এই ধরণের স্বজাতীয় পক্ষপাত মার্জ্জনীয়।

মোটামুটি, মান্‌কে, তাঁর গল্পগুলির ভেতরে, বহু চরিত্রের ভীড়ে, নানা হোটেলে, স্বাস্থ্য-নিবাস, সমুদ্রতীর, উৎসবমুখর রসশালা ও হট্টমন্দিরের পানশালায় নির্লিপ্ত দর্শকের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখেছি তাঁর অমোঘ রসদৃষ্টি নিয়ে। তাঁর সদা-সঞ্চরণশীল শিল্পী মন, একটা সহজ অথচ গম্ভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। যার ফলে Mario and the Magician, Early Sorrow বা Death in Venice-এর মত অত সুন্দর গল্প লেখা সম্ভব হয়েছে। তারপর তাঁর লিখনরীতির চমৎকারিত্ব, যে চমৎকারিত্বের মাত্রা আর একটু বেশী হলেই, তাঁকে ডিকাডেন্ট লেখকদের পর্য্যায়ভুক্ত করতে হত, আধুনিক গল্প লেখকদের মধ্যে বেশী মেলে না।

অন্যদিকে, মানের প্রবন্ধ ও সমালোচনাগুলি পড়লে বোঝা যায়, প্রবন্ধকার বা সমালোচক মান্ ও গল্পলেখক মান্ অভিন্ন, মনের দিক থেকে। তাঁর অনেক প্রবন্ধ, গল্পগুলির প্রায় টীকা রূপেই লিখিত, এবং তাদের অঙ্গাঙ্গিভাব সুস্পষ্ট। প্রবন্ধগুলি থেকে তাঁর ফ্রয়েডীয় "Mythical-psychological" দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। যার ফলে 'Joseph and his Bretheren' জাতীয় নভেলের সৃষ্টি। এই শিল্প-রীতি মোটামুটি হাক্সলিও অবলম্বন করেছেন। কিন্তু, হাক্স্‌লি মানের মত শিল্পী নন। তাই তাঁর 'Point Counter-point'-এর পরিণতি দেখতে পাই, অন্ধভাবে হাতড়ে ফেরা 'Eyeless in Gaza'-তে। এবং মানের গল্পগুলি সত্যিকারের গল্প, শুধু ষ্টাইলের ডিগ্‌বাজি নয়।

টমাস মানের মনোসংস্থানে Wagner-এর প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবং এই Wagner-প্রীতি তাঁর সমস্ত কিছু সাহিত্য-সৃষ্টিকে একটা বিশেষ রূপ দিয়েছে। ফলে তিনি ভুলতে পারেন নি, মানুষের জীবনের সমস্ত সমারোহ, সুখ, দুঃখের ওপরে আছে এক চরম পরিসমাপ্তি, মহাপ্রয়াণ, মৃত্যু। তাঁর এই মৃত্যু-তাড়িত মন ধরা পড়ে তাঁর গল্পে, নায়কদের পরিণতিতে। তাই তাঁর গল্পগুলি প্রায়ই morbid। অবশ্য মানের মৃত্যুতাড়িত মনের পেছনে মৃত্যু-ভীতি নেই, আছে মৃত্যুপ্রীতি; যেটা তাঁর প্রধান রোগ। তাই 'Mario and the Magician'-এ দেখতে পাই, সেই বাক্‌চতুর দুর্দ্ধর্ষ যাদুকরের ব্যর্থতা, শোচনীয় অপমৃত্যু রিভল্‌-ভারের গুলিতে। এবং Death in Venice'-এর নায়কের শেষ ক্ষয়িষ্ণু দিনগুলির করুণ ইতিহাস ব্যথিত করে তোলে আমাদের। অবশ্য এটা স্বীকার করতে হবে, আমাদের মনের ধর্ম্মে, ব্যথা পাবার ও বিয়োগান্তক পরিণতি উপভোগ করবার প্রবৃত্তি বলবতী। যার জন্যে মানের গল্প অনেকেরই ভাল লাগে। এবং যার জন্যে অনেকেই পয়সা খরচ করে সিনেমায় বা নাট্যশালায় চোখের জল ফেল্‌তে যান। কিন্তু যে অশ্রুবর্ষণ-ক্ষম বিয়োগান্তক melodrama সাধারণ সিনেমায় পাই, সে melodrama মানের সৃষ্টিতে নেই; যা আছে শরৎচন্দ্রের 'দেবদাসে'। এবং তা' নেই বলে মানের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

Polite Essays—by Ezra Pound (Faber and Faber)

এই প্রবন্ধ-সংগ্রহে যদি কেউ সংযত সমালোচনা আশা করেন, তাহলে প্রথমে কিছুদূর পর্য্যন্ত হতাশ হবেন। পাউণ্ড সাহেবের লেখার রীতি, অন্ততঃ এই বই-এর প্রথম কয়েকটি প্রবন্ধে মোটেই মুখরোচক নয়, এবং তিনি যে জাতিতে ইয়াঙ্কি তার প্রমাণ তাঁর ভাষায় বিদ্যমান। যে মনোভাবে 'পোলাইট এসেজে'র গোড়ার দিকের সাহিত্য-সমালোচনাগুলি জাত, তার পক্ষপাতী হওয়া শক্ত। লেখক অনেক উচ্চে, পাণ্ডিত্যের প্রায় শিখরে আসীন আছেন, মরলোকের সাহিত্যিকদের উপর অসীম বিতৃষ্ণা কিম্বা অসীম কৃপা তাঁর, কিন্তু তবু নাক শিঁটকানোর এবং প্রচুর পরিমাণে গালাগালি দেওয়ার প্রলোভন তিনি সামলে উঠতে পারেন নি। ফলে 'পোলাইট এসেজের' উৎপত্তি। তিনি যে সব সারগর্ভ কথা বলেছেন, তাঁর মতামত, ইত্যাদির সঙ্গে পাঠক একমত হতে পারেন, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর আতিশয্য এবং বিরক্তিকর গোঁয়ার্ত্তুমী বরদাস্ত করা প্রায় অসম্ভব। শুনেছি পাউণ্ড সাহেব ফ্যাশিষ্ট এবং সেজন্য যদি কারো তাঁর প্রতি ব্যক্তিগত বিরাগ থাকে তাহলে 'পোলাইট এসেজ' পাঠে সেটা কিছু বাড়বে বই কমবে না, অবশ্য শেষের দিকের লেখাগুলি সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

প্রথম প্রবন্ধে পাউণ্ড পরলোকগত মান্রোর এবং মান্রোর পরিবেষ্টনীর আলোচনা করেছেন। পিটচাপড়ানোর ভাবটা বরাবর থাকলেও প্রাক্‌সামরিক ইংরেজী কবিতার বিষয় জ্ঞাতব্য খবর এতে আছে। সে সময়কার সব চেয়ে বড়ো প্রয়োজন ছিল—ওজন বুঝে প্রতি শব্দ ব্যবহার, ভাষার ব্যবহারে যথাসাধ্য সংযমের চেষ্টা, ইত্যাদি। ইংরেজী কবিতার আধুনিক পরিণতির মূলে রয়েছে তখনকার আন্দোলন, এবং এই বিষয়ে পাউণ্ড ও এলিয়টের দান স্মরণীয়।

পরের কয়েকটি প্রবন্ধের একটিতে পাউণ্ড হাউসম্যানের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন; এর সঙ্গে কয়েকটি পুরানো কবিদের, বিশেষ করে মিলটনের, প্রতি লেখকের অপরিসীম বিরাগের পরিচয় আছে। আর একটিতে এলিয়টের সাহিত্যদৃষ্টির প্রশংসা করে পাউণ্ড কয়েক পাতা লিখেছেন। 'প্রোজ ট্র্যাডিশন ইন ভর্স' রচনাটিতে সংযমের এবং সুস্পষ্ট সমালোচনার দৃঢ় ছাপ আছে, এবং এই প্রবন্ধে পাউণ্ডের সঙ্গে আধুনিক কোন পাঠকের মতানৈক্য হবে না। Hueffer-এর আলোচনায় তিনি বলেছেন: I find him significant and revolutionary because of his insistence upon clarity and precision, upon the prose tradition; in brief, upon efficient writing—even in verse!

আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার নিয়ে আলোচনা এবং আন্দোলন চলছে। এই বিষয়ে পাউণ্ডের মতামত প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান ইউরোপে এবং আমেরিকায় সর্ব্বাঙ্গীণ বিশৃঙ্খলার আর বুদ্ধিহীনতার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষানীতি এই বৃহত্তর সমস্যারই একটি অংশ। বছরের পর বছর কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গের চর্ব্বিত চর্ব্বণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়, এ ধরণের একটা ধারণা প্রচলিত আছে। আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা এমন যে সমসাময়িক পৃথিবীর সঙ্গে বিশেষ কোন পরিচয় অধিকাংশ লোকেরই ঘটেনা। ইতিহাসের যে ব্যবহারিক জ্ঞান সমাজকে দূরদর্শিতা শেখাতে পারে তার লেশমাত্র শিক্ষাপদ্ধতিতে নেই। উদাহরণ স্বরূপ পাউণ্ড গত মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন। যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং সঠিক খবরাখবর কয়েকটি পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু কোন উল্লেখযোগ্য বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান জনগণকে সে সম্বন্ধে সচেতন করার প্রয়াস করে নি। কেন যে করেনি সেটা অবশ্য সহজেই বোঝা যায়।

মোটের উপর আমরা বলতে পারি যে শিক্ষা ইত্যাদির আমূল সংস্কার ততদিন হতে পারে না যতদিন বর্ত্তমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা অটুট থাকবে, কারণ আধুনিক ধনতান্ত্রিকতা এবং সামাজিক নিম্নগতি পরিচ্ছিন্ন নয়, অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সংস্কার চেষ্টার ফল আংশিক এবং অস্থায়ী হতে বাধ্য। পোলিটিকাল আন্দোলন বাদ দিয়ে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের প্রয়াস অরণ্যে রোদনের নামান্তর। এ প্রসঙ্গে পাউণ্ডের মতামত কি জানিনা। তাঁর অন্যান্য গদ্যপুস্তক পড়ার সুযোগ আমার হয় নি।

প্রথমে পাউণ্ডের প্রকাশভঙ্গীর যে বিরক্তিকর বিশেষত্বের কথা উল্লেখ করেছি, 'হাউ টু

রীড' নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ তার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এটি পাঠ করার পর প্রত্যেক পাঠকই উপকৃত হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কি করে সাহিত্য পড়ানো হয় তা এবং নিজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করে লেখক সাহিত্য নিয়ে সাধারণভাবে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। বরাবরই তিনি এই কথাটার উপর জোর দিয়েছেন—It is as important for the purpose of thought to keep language efficient, as it is in surgery to keep tetanus bacilli out of one's bandages। তবে মাঝে মাঝে তাঁর কথাবার্ত্তা হেগেলের দর্শনের মত নীচের দিকে মাথা করে দাঁড়িয়েছে, কখনো কখনো তিনি ঘোড়ার আগে গাড়ী স্থাপন করেছেন। তা ছাড়া অতি-সাহিত্যিক কোন বিভাগে কোন লেখাকে তিনি ফেলতে চান না, কারণ সাহিত্য নিরপেক্ষ; ইত্যাদি। You do not divide physics or chemistry according to social or religious categories। এই সূত্রে প্রতিবাদ হিসেবে আমরা জীন্স্, এডিংটন প্রমুখ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের কথা স্মরণ করতে পারি। তবে এ ধরণের উক্তি 'হাউ টু রীডের' আসল কথা নয়। এর একটি পরিচ্ছেদে বিগত শতকের এবং তারো পূর্ব্বের ইউরোপীয় সাহিত্যে গদ্যের পরিণতি এবং স্থান নিয়ে পাউণ্ড যে আলোচনা করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। এর থেকে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে আমরা বর্ত্তমান আলোচনার শেষ করতে পারি: The language of prose is much less highly charged, that is perhaps the only availing distinction between prose and poesy. Prose permits greater factual presentation, explicitness, but a much greater amount of language is needed. During the last century or century and a half, prose has, perhaps for the first time, perhaps for the second or third time, arisen to challenge the poetic pre-eminence.

সমর সেন

Inhibitions, Symptoms and Anxiety—By Sigmund Freud (The Hogarth Press & The Institute of Psycho-analysis).

ফ্রয়েডের এই বইখানি ভিয়েনায় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; ১৯২৭ সালে বইখানির অনুবাদ আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু ফুরিয়ে যাওয়ার পর আর ছাপান হয় নাই। বর্ত্তমান ইংরেজী সংস্করণ কিছুদিন পূর্ব্বে, অর্থাৎ মূল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার প্রায় ১০ বৎসর পরে প্রকাশিত হয়েছে। বিলম্ব হলেও, বইখানির এই ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়াতে যাঁরা ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্বের অনুশীলন করেন, বিশেষতঃ যাঁরা তাঁর আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন, তাঁদের অনেক সুবিধা হবে। কিন্তু ফ্রয়েড আলোচ্য বিষয়ের সম্বন্ধে যে রকম টেক্নিক্যাল আলোচনা করেছেন ও তাঁর পূর্ব্বে প্রকাশিত বইগুলির বিশেষতঃ The Ego and The Id বইখানায় প্রকাশিত মতের পুনর্ব্বিচার সম্পর্কে এত সূক্ষ্ম তারতম্য দেখাবার

চেষ্টা করেছেন যে পুস্তকটি বিশেষজ্ঞদের জন্যই লিখিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হয় না। কাজেই সাধারণ পাঠকের পক্ষে বইখানা সম্ভবতঃ নীরস ও দুর্ব্বোধ্য। দুর্ভাবনা, উৎকণ্ঠা, বেদনা, শোক প্রভৃতির মূল কারণ কি, এ বিষয়ে সাধারণ পাঠকের নিশ্চয়ই খুব ঔৎসুক্য আছে। কিন্তু ফ্রয়েডীয় বিকলন পদ্ধতির বাস্তব ক্ষেত্র ও টেক্‌নিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাক্‌লে, এ বইখানি পড়ে তাঁদের আশা অপূর্ণ-ই থেকে যাবে। বিশেষতঃ বইখানিতে অন্য মত নিরসন ও নিজের পূর্ব্ব মতের সমালোচনা এত বেশী আছে যে গ্রন্থকারের সিদ্ধান্তও খুব স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে নাই। মোটামুটি নীরস হলেও যায়গায় যায়গায় ফ্রয়েডের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল ও রসাত্মক হয়ে উঠেছে। যেমন, বাস্তব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কোন বিশিষ্ট বিশ্বালোচনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন: "But however much ado the philosophers may make, they cannot alter the situation. Only patient, persevering research, in which everything is subordinated to the one requirement of certainty, can gradually bring about a change. The benighted traveller may sing aloud in the dark to deny his own fears; but, for all that, he will not see an inch further beyond his nose."

উক্ত মন্তব্য থেকে হয়তো মনে হতে পারে যে ফ্রয়েড কোন রকম বিশ্বালোচনই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা ঠিক নয়। কারণ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তিনি ধর্ম্মগত বা ভাববাদী বিশ্বালোচনকে অস্বীকার করলেও, বাস্তব জগতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হলে যে বিজ্ঞান দাঁড়াতে পারে না, একথা স্বীকার করেন। কারণ, পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি বাস্তবের কষ্টিপাথরে সত্যকে যাচাই না করে পারে না। New Introductory Lectures in Psycho-analysis গ্রন্থে তিনি সংশয়বাদী ও অজ্ঞেয়বাদীদের "intellectual anarchists" বলে অভিহিত করেছেন ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে তাঁর স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক বিশ্বালোচন বাস্তব জগতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে উক্ত পুস্তকে তিনি লিখেছেন "A *weltanschauung* based upon science has, apart from the emphasis it lays upon the real world, essentially nagative characteristics, such as that it limits itself to truth and rejects illusions"। বৈজ্ঞানিক সত্য কখনো নিছক কল্পনা বা শূন্যের আশ্রয়ে বাস করতে পারে না, এই কথাটা আর একটু ভাল করে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে "ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত সত্যের বিষয়ে বাদানুবাদ ন্যায়ের কূটতর্ক মাত্র" (মার্কসের ফয়েরবাখ্‌ বিষয়ক প্রস্তাব)। আর সত্য যদি মূলতঃ বস্তুধর্ম্মী ও ব্যবহারিক হয়, তা হলে মার্কসীয় তত্ত্ব ও ব্যবহারের আত্যন্তিক সমন্বয়নীতির সঙ্গে ফ্রয়েডের বৈজ্ঞানিক বিশ্বালোচনের মূলগত কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ অযৌক্তিক ও বুদ্ধিদ্রোহী super-ego-র কঠোরতার হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নির্দ্ধারণ করে সমাজ ও ব্যক্তিকে পরিবর্ত্তিত করা ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানের অন্যতম

উদ্দেশ্য। কালধর্ম্মে যে-সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এখন ফুরিয়ে গিয়েছে, তার শক্তির অপচেতন মানসিক ভূতই এই super-ego, একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। ফ্রয়েড বা তাঁর শিষ্যেরা এখনো সমাজ থেকে এই ভূত তাড়াবার কার্য্যকারী মন্ত্র খুঁজে পাননাই; কিন্তু মার্কসের বৈপ্লবিক কর্ম্মপন্থার সাহায্যে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে super-ego-র ভূত অপসারিত হয়েছে, অথচ id যথেচ্ছাচারী হয় নাই, বরং ego শক্তিশালী হয়েছে, একথা নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষক মাত্রই স্বীকার করেছেন। রাশিয়া থেকে বিতাড়িত এই দুর্দ্দান্ত ভূত সম্প্রতি ইতালী ও জার্ম্মেনীর স্কন্ধে আশ্রয় নিয়েছে কিনা ফ্রয়েড-পন্থী মনোবৈজ্ঞানিকেরা বিচার করে দেখতে পারেন।

এ বইখানি বিশেষজ্ঞদের, বিশেষ করে যাঁরা মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা করেন তাঁদের, পক্ষে অপরিহার্য্য। ফ্রয়েড নবম অধ্যায়ে তাঁর বক্তব্য কেন্দ্রীভূত করেছেন ও দশম অধ্যায়ে তাঁর সিদ্ধান্তের বর্ণনা দিয়েছেন। একাদশ অধ্যায়, অর্থাৎ পরিশিষ্টের চারিটি অংশ আছে; এবং প্রত্যেক অংশেই অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে। আগেকার অধ্যায়গুলিতে Oedipus Complex এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে; শিশুর যৌন জীবনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ও দুর্ভাবনার সম্বন্ধ-নিরূপণ সম্পর্কে ফ্রয়েড এত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন যে, সবগুলির যথাযথ আলোচনা ১৭২ পাতার অল্পপরিসরের মধ্যে সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, প্রথম অধ্যায়ে আহারে অনিচ্ছা, বমির উদ্রেক, চলাফেরা করায় অনিচ্ছা বা শক্তির অভাব বোধ করা, কাজে অনিচ্ছা বা ক্লান্তি প্রভৃতি বিষয়ের মূল যৌন ব্যাপারে নিহত, এ বিষয়টার আরও বিশদ আলোচনা থাকলে ভাল হত। তবে পূর্ব্বেই বলা হয়েছে যে এই বইখানি বুঝতে হলে ফ্রয়েডের আগেকার লেখার সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। অনুবাদের জন্যও হয়তো লেখা কোথাও একটু অস্পষ্ট বোধ হতে পারে। কিন্তু পুস্তকখানি যে, চিকিৎসক ও মনোবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে অপরিহার্য্য, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

The Years—By Virginia Woolf. (The Hogarth Press)

অভিজাত সাহিত্য যদি কিছু থাকে তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া উলফ-এর রচনা। এই রচনার উৎকর্ষ ইহার সৌকুমার্য্য, সূক্ষ্মতা ও অপূর্ব্ব রসবিলাস। আলোচ্য পুস্তকে এই উৎকর্ষ যথেষ্ট পরিস্ফুট হইয়াছে। নিছক গদ্য রচনার দিক দিয়া বিচার করিলে 'দি ইয়ার্স'-এর মতন পুস্তক দুর্লভ। এক ভার্জ্জিনিয়া উলফ-ই ইহার রচয়িতা হইতে পারেন।

কিন্তু প্রায় পাঁচশত পাতাব্যাপী একখানি সমগ্র উপন্যাস শুধু উৎকৃষ্ট গদ্য উপভোগের জন্য কেহ ধৈর্য্য ধরিয়া পড়ে না—অন্ততঃ আমার মতন সাধারণ কোনো পাঠক। বিষয়বস্তু উপন্যাসে নিশ্চয়ই একেবারে উপেক্ষণীয় নহে। 'দি ইয়ার্স' বইটির রচনার উৎকর্ষ মানিয়া লইলে একমাত্র

বিচার্য্য বিষয় বাকি থাকে কিভাবে লেখিকা তাঁহার বক্তব্য বিষয়—অর্থাৎ এক্ষেত্রে আখ্যায়িকা—পাঠকের নিকট নিবেদন করিয়াছেন।

'দি ইয়ার্স'-এর আখ্যায়িকার মূল উপাদান উচ্চ-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের এক ইংরেজ পরিবার যাহার গোষ্ঠী-নাম পার্জ্জিটার, এবং অবস্থিতি মাতৃভূমি অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড। ১৮৮০ সালে পুণ্যস্মৃতি সম্রাজ্ঞী ভিক্‌টোরিয়ার রাজত্ব কালে এই পার্জ্জিটার-গোষ্ঠী ভার্জ্জিনিয়া উলফ-এর লেখনী মারফৎ উপন্যাসটির রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। তাহার পর বৎসরের পর বৎসরের বিবর্ত্তন এবং পার্জ্জিটার ও পৃথিবীর অন্যান্য অসংখ্য গোষ্ঠীর বিবর্দ্ধন যদি অনিবার্য্যভাবে ঘটিতে থাকে তাহার জন্য দায়ী প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম, শ্রীমতী ভার্জ্জিনিয়া উলফ নহেন। কিন্তু এই বিবর্ত্তন-ধারার সহিত সমসাময়িক কালের কি সম্বন্ধ—অর্থাৎ যুগ-পরিবেশে এই উপন্যাস-বর্ণিত নরনারীর জীবন কি-ভাবে ফুটিয়া উঠে তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনার দায়িত্ব লেখিকা ছাড়া আর কাহারও হইতে পারে না এবং এই দায়িত্ব স্কন্ধে লইয়াই ভার্জ্জিনিয়া উলফ 'দি ইয়ার্স' রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এরূপ ধারণা করা পাঠকের পক্ষে অসঙ্গত নহে।

'দি ইয়ার্স' পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে কিন্তু এই ধারণা অচিরে দূর হয়। পুস্তকটিতে পরিচ্ছেদ বিভাগের পরিবর্ত্তে আছে কাল বিভাগ। যথা ১৮৮০, ১৮৯১, ১৯০৮, ১৯১০, ১৯১১, ১৯১৩, ১৯১৪, ১৯১৭, ১৯১৮ এবং তাহার পরই সর্ব্বশেষ বিভাগ—Present Day অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল। কিন্তু এই বিভিন্ন কালের সহিত উপন্যাস-বর্ণিত নরনারীর সম্বন্ধ অতি সামান্য। এ যেন রেলের গাড়িতে চড়িয়া কয়েকটি বিশেষ লোকের দেশান্তর যাত্রা। জানালার মধ্য দিয়া ষ্টেশনের পর ষ্টেশন চোখে পড়ে, ভৌগলিক অবস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটে, পুরাতন সঙ্গীরা অনেকে নামিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন নূতন আরোহীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু একদল লোক থাকিয়া যায় প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহারা একই রকম, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন যাহাদের মনের উপর কোনোই ছাপ দিয়া যায় না। শুধু তাই নয়, এই জাতীয় রেল-ভ্রমণে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনও নিতান্ত গৌণ—মুখ্য, রেল গাড়ীর কামরায় উপবিষ্ট কয়েকটি প্রাণী।

'দি ইয়ার্স' উপন্যাসটির মুখ্য বিষয় এবেল পার্জ্জিটার নামক এক ভিক্টোরীয় ভদ্রলোকের পুত্রকন্যার ও তাহাদের সম্পর্কিত ভ্রাতাভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির জীবন। ১৮৮০ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই সম্মিলিত জীবন-সমষ্টির পরিসর নিতান্ত কম বলা চলে না, কিন্তু এই পরিসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন কিছুই ঘটে না। ষ্টেশনের পর ষ্টেশনের মতন যুগের পর যুগ চলিয়া যায়। এই কয়টি নরনারী শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে বৃদ্ধিলাভ করেন, কিন্তু ইহার মধ্যে ক্রমপরিণতির পরিচয় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য ভিক্‌টোরিয়ার পর সপ্তম এডওয়ার্ড ও তৎপর পঞ্চম জর্জ্জ সিংহাসন আরোহণ করেন, বারো বৎসর ব্যাপী মহাযুদ্ধ ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে, জীবন-যাত্রার প্রণালীর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু এই সকল বাহ্য ঘটনার সামান্যমাত্র ইঙ্গিত দিয়া লেখিকা ক্ষান্ত হইয়াছেন। কালের পরিণতির সহিত উপন্যাস বর্ণিত নরনারীর

মানসিক পরিণতির যেটুকু আভাস আছে তাও সামান্য—অর্থাৎ যেটুকু নিতান্ত না হইলে নয় সেইটুকু মাত্র। ভার্জ্জিনিয়া উলফ-এর বিশেষত্ব এইখানেই। তিনি শুধু দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন দৈনন্দিন জীবনের নানা বৃহৎ ও তুচ্ছ ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বিশেষ নরনারীর জীবন কি ভাবে বৎসরের পর বৎসর সাড়া দিয়া চলিয়াছে। এই সাড়া দিবার প্রণালী সম্পূর্ণ অন্তর্মুখী নহে, বহির্মুখীও নহে, অনেকটা মাঝামাঝি। অতি সুকুমার ও লঘু স্পর্শে লেখিকা এই প্রণালীর স্বরূপ ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছেন নিঃসন্দেহ।

কিন্তু এই প্রশ্ন না উঠিয়া পারে না, এই স্বার্থকতার মূল্য কতখানি? কেননা সমগ্র বই-খানি পড়িয়াও মন তেমন বিচলিত হয় না। যে-কয়টি নরনারীকে লইয়া এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু গঠিত তাহারা যথেষ্ট স্পষ্টভাবেই পাঠকের চক্ষে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু মনে হয়, না হইলে ক্ষতি কি ছিল? এমন কি আছে তাহাদের জীবনে যাহা গভীরভাবে স্পর্শ করিতে পারে। কি সম্পদ তাহারা আমাদের দান করিল?

এই প্রশ্নের এমন কোনো উত্তর আমি পাই নাই যাহা ভার্জ্জিনিয়া উলফ-এর স্বপক্ষে বলা যায়। সেই কারণে, 'দি ইয়াস' উপন্যাসটিকে আমি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য-রচনা বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না, যদিও একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিব বর্ত্তমান ইংরাজি গদ্য সাহিত্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শনরূপে এই বইখানি মূল্যবান।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Retour de l' U. R. S. S.—By Andre Gide. (Gallimard)

Theory and Practice of Socialism—By John Strachey. (Gollancz)

রুষ বিপ্লবের ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অভ্যুদয় সভ্যজগতে যে-বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছিল আজও তার শেষ হল না। শেষ না হওয়া অবশ্য বিচিত্র নয়, কারণ এ তর্কের আড়ালে আরও বিরাট এবং ব্যাপক যে সমস্যা বিদ্যমান আজ তার প্রভাব চিন্তাশীল মন মাত্রেরই উপর ছায়া ফেলেছে এবং ক্রমশঃ সে কথা সকল আর্থিক ও রাষ্ট্রিক আলোচনার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রুষ দেশে লোকশিক্ষা কতদূর বিস্তার লাভ করল, সোভিয়েট সরকার স্বাস্থ্যোন্নতির কি ব্যবস্থা কর-ছেন, সে-অঞ্চলে আর্ট ও ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থা কিম্বা বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎই বা কি

এই সব সাধারণ জিজ্ঞাস্যকে যে-মূল প্রশ্ন ছাপিয়ে ওঠে তার তিনটি অঙ্গ নির্দ্দেশ করা যায়—সোশ্যালিজমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, সে-আদর্শ কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কি না এবং সে-প্রচেষ্টাতে মানবজাতির শুভ বা অমঙ্গল কোনটির সম্ভাবনা বেশী।

আমাদের যুগের এই প্রধান আলোচ্য বিষয় নিয়ে যে বিচার চলছে তার মধ্যে একটা ব্যাপার সহজেই চোখে পড়ে। যাদের আন্তরিক অনুভূতি প্রচলিত বিধিব্যবস্থার সমর্থক বলে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণ্য করা চলে তারা সমাজতন্ত্রবাদের দুর্ব্বলতা অল্প আয়াসেই বোঝে কিন্তু সমাজের উপস্থিত গঠনের তীব্র প্রতিবাদ যাদের মনে জেগেছে সোশ্যালিজমের প্রতি তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস বিশেষ বিচলিত হয় না। এর থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে আজকের তর্কবিতর্কের পিছনে রয়েছে দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সঙ্ঘাত। অর্থাৎ থিওরি সেই মূল সঙ্ঘর্ষের অস্ত্রমাত্র, শ্রেণীসংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে তাকে দেখা অসম্ভব নয়। শ্রেণীপ্রত্যয় বলতে অবশ্য শ্রেণীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী ও সমষ্টিগত ঝোঁক বোঝায়, তার অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিই যে তদনুসারে কাজ করবে ও ভাববে এমন অদ্ভুত দাবী কেউ কখনও করে নি। নিয়মের ব্যত্যয় মাত্রে সাধারণ সূত্র অবৈধ হয়ে যায় না এ কথা বলা বাহুল্য।

কিন্তু বুদ্ধিবাদীরা কি এই শ্রেণীভেদের উর্দ্ধে বিচরণ করেন না, কিম্বা তাঁদের কি পৃথক শ্রেণী হিসাবে গণ্য করা সমীচান নয়? দুঃখের বিষয় তাঁদের মধ্যেও মতানৈক্য সুস্পষ্ট এবং ধনিক ও শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে তৃতীয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মতবাদ আজ পর্য্যন্ত তাঁরা গড়ে তুলতে পারেন নি। পণ্যোৎপাদনের সহায়ক সামগ্রীর সঙ্গে একটি নির্দ্দিষ্ট বিশেষ সম্বন্ধ কোনও শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্বের মূল কথা সুতরাং বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ত্র শ্রেণী নন, সকল শ্রেণীর মধ্যেই তাঁদের দেখা পাওয়া যেতে পারে। তাঁদের আসল কাজ হল শ্রেণীবিশেষের অস্পষ্ট ধারণা ও চিন্তাস্রোতকে ন্যায়সঙ্গত সুসম্বদ্ধ রূপ দেওয়া যাতে সে শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি হয়। এ-কথার অর্থ এ নয় যে সব থিওরিই প্রকৃতপক্ষে তুল্যমূল্য, তার মধ্যে যে-কোন একটা গ্রহণ করলেই চলতে পারে। কারণ সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণীর উত্থান পতন আছে—সুতরাং বিশেষ কোন যুগে মানব জাতির কাছে বিশেষ মতবাদের বেশী সার্থকতা থাকা সম্ভব। অর্থাৎ সব মতই সব সময় সমান প্রযুজ্য নয় এবং এক শ্রেণীর মতামত একযুগে পূর্ণতর সত্য রূপে প্রতিভাত হয়ে সাময়িক পরিস্থিতির সঙ্গে তার অধিকতর সামঞ্জস্য প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। ইতিহাসে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক চিন্তাধারার বিচিত্র বিবর্ত্তনও এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। অন্যদিকে আবার পরিবর্ত্তনের বেগ, ছন্দ ও রূপও অনেকখানি নির্ভর করবে কোন থিওরি কতখানি প্রসার লাভ করছে তার উপর।

সোশ্যালিষ্ট মতানুসারে আজকের আলোচনার একটা বিশাল পটভূমিকা আছে। ইয়োরোপে গত পাঁচ শতাব্দীর একটা ঐক্য বোঝা সহজ। তারও পূর্ব্বে ফিউডাল্ বিধিব্যবস্থার প্রতাপ ছিল প্রায় অপ্রতিহত। সে সমাজের প্রধান উপাদান ছিল একদিকে ভূস্বামী, অন্যদিকে অর্দ্ধদাস কৃষক। মুষ্টিমেয় সহরে বুর্জোয়া মধ্যশ্রেণী তখনও নগণ্য ছিল, কিন্তু শীঘ্রই যে-ব্যবসা-

বাণিজ্য তাদের প্রাণস্বরূপ তার দ্রুত প্রসার পরিবর্ত্তনের স্রোতকে প্রবল করে তুলল। ভৌগলিক আবিষ্কারের পর ক্রমে বণিক সম্প্রদায় ও ধনিক মনোভাব শক্তিশালী হয়ে উঠল—এদের মূলমন্ত্র আর্থিক লাভের জন্য পণ্যবিক্রয় ও পণ্যোৎপাদন। অধিক লাভের আশায় তখন ইংরাজ জমিদারেরা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে চাষীদের বিতাড়িত করে পশমের লোভে জমিতে ভেড়ার পাল চরাবার বন্দোবস্ত করতেন। তারপর লাভের তাড়নায় এল যন্ত্রশিল্পের পরমোৎকর্ষ সাধন, তার ফলে আসল ফ্যাক্টরি ও আধুনিক উৎপাদন-প্রথা। ক্রমে অভিজাতেরাও ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভূত হয়ে পড়লেন—মধ্যশ্রেণী তখন আর আসলে মধ্য রইল না। ধনতন্ত্র পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার প্রথমযুগে বৈশিষ্ট্য ছিল অবাধ প্রতিযোগিতার আদর্শ এবং তখন পর্য্যন্ত ধনতন্ত্রের ক্রমপ্রসার ও ঊর্দ্ধগতি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু অন্তর্নিহিত সঙ্কটের ফলে পরে এসেছে সঙ্কোচনের যুগ—এরই জন্য আজ প্রশ্ন উঠছে ফিউডাল্ ব্যবস্থার মতন ধনতন্ত্রেরও কি অবসান আসছে?

উপরোক্ত সঙ্কটের সম্বন্ধে সোশ্যালিষ্ট মতবাদ সব চেয়ে প্রাঞ্জল মূর্ত্তি নিয়েছিল জন ষ্ট্রেচির প্রধান কীর্ত্তি The Nature of Capitalist Crisis গ্রন্থে। তাঁর নূতন পুস্তকের প্রারম্ভেও সংক্ষেপে সে-যুক্তির পুনরাবৃত্তি রয়েছে। জমি, খনিজ সম্পদ, সঞ্চিত মূলধন প্রভৃতি উৎপাদক সামগ্রী (means of production) ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়াতে মালিকদের অনুমতি বিনা তাদের ব্যবহার অসম্ভব এবং এখন তাই একমাত্র ব্যক্তি বিশেষের আর্থিক লাভের (খাজনা, মুনাফা ও সুদ) প্রত্যাশাতেই পণ্যোৎপাদন হয়ে থাকে। বিত্তহীন লোকেরা বাধ্য হয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের পরিবর্ত্তে তাদের পরিশ্রমশক্তি ধনিকের কাছে বিক্রয় করে। লাভের হার বজায় না রাখতে পারলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে—বজায় রাখতে হলে পারিশ্রমিক সামান্য হওয়া অনিবার্য্য এবং তার ফলে অধিকাংশ লোকের অর্থশক্তি ক্ষীণ। ওদিকে সম্পন্ন লোকের আয়ের উদ্বৃত্ত মূলধনেই পরিণত হয়, ক্রয়ের কাজে লাগে না। সুতরাং জনসাধারণের প্রচুর প্রকৃত অভাব থাকলেও সাধারণ ব্যবহার্য্য দ্রব্যের (consumers' goods) আর্থিক চাহিদা (effective demand) প্রবল হয় না অর্থাৎ সে-সব জিনিষ দেশের মধ্যে লাভজনক মূল্যে বিক্রয় করা কঠিন। তাই ব্যবহার্য্য জিনিষের চাইতে অভিনব উন্নত উৎপাদক যন্ত্র ও সরঞ্জাম (producers' goods) প্রস্তুত কার্য্যে আপাততঃ বেশী লাভের সম্ভাবনা মনে হয়। তখন আবার তার সাহায্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিদেশে বাজারবিস্তার ও কর্ত্তৃত্বের প্রচেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে পড়ে। এর ফলে রাষ্ট্রে বিবাদ এবং অনুন্নত দেশ নিয়ে কাড়াকাড়ি তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। উপরে বর্ণিত মতানুসারে ধনতন্ত্রের প্রকৃতিগত সমস্যাই হল এই যে কিছুকাল পরে একদিকে দেশের আভ্যন্তরিক ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হতে থাকে অপর দিকে বিদেশী বাজারের প্রসারপথেরও একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। অথচ উৎপাদক সামগ্রী ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি হওয়াতে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকারভেদ নির্ণীত হয় শুধু ব্যক্তিগত লাভের প্রত্যাশা দিয়ে—এক্ষেত্রে সকল প্ল্যানিং-এর মূল কথা দাঁড়ায় লাভের হার বজায় রাখার প্রচেষ্টাতে।

সুতরাং কিছুদিন পর আর্থিক সঙ্কট (periodic crisis) উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক এবং ধনতন্ত্রের প্রথম প্রসারের শ্রীবৃদ্ধির পর সঙ্কোচনের জরা ও অবসাদ (general crisis) আসাই সম্ভব। সমাজতন্ত্রবাদের খণ্ডন করতে হলে এই যুক্তিগুলিকে আক্রমণ করতে হবে।

ধনতন্ত্রের পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী ইতিহাসের যে-ছবি এভাবে আঁকা হয়েছে তার মধ্যে আর একটা কথা আছে। ধনজীবী সম্প্রদায়ের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই তার ঠিক বিপরীত শ্রমজীবী শ্রেণীর অভ্যুত্থান দেখা যায়। কিছুদিন পর পর শ্রমিকেরা ধনিকদের বাধা দিতে চেষ্টা করে এসেছে—মধ্যযুগের অন্তে প্রজাবিদ্রোহ থেকে ঊনিশ শতকের চার্টিষ্ট আন্দোলন ও ট্রেড্ইউনিয়নগুলির শক্তিসঞ্চয় এর প্রমাণ। ধনিক-শ্রমিকের দ্বন্দ্বেরও তাই একটা ঐতিহাসিক ধারা আছে। আজ যদি ধনতন্ত্র সঙ্কোচনের পথে নামে তবে তার স্বাভাবিক ফল হবে শ্রমিকদের শক্তি বৃদ্ধি।

আর্থিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পা ফেলে চিন্তার প্রগতিও ইতিহাসে ছাপ রেখে গেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজের পূর্ণ রাষ্ট্রিক রূপ হচ্ছে লিবারেল ডিমক্রেসি—তার প্রসার ধনিক বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রতিপত্তির অনুসরণ করেছে দেখা যায়। অধ্যাপক ল্যাস্কি সম্প্রতি দেখাতে চেয়েছেন যে সামাজিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপের মন প্রথমে রেনেসাঁস্, পরে রেফর্মেশান্, তারও পরে 'আলোক-উদ্ভাসিত' যুক্তিবাদের মধ্য দিয়ে ইংরাজবিপ্লবের উদার মত ও ফরাসী-বিপ্লবের গণতন্ত্রে পৌঁছেছিল। ঊনিশ শতকে ধনতন্ত্রের স্বর্ণযুগ আসবার পরই লিবারেল্ ডিমক্রেসি পরাকাষ্ঠা লাভ করে। ষ্ট্রেচি প্রমুখ লেখকেরা বলেন যে সাম্প্রতিক ফ্যাশিষ্ট ঝোঁকও তেমনই আবার সঙ্কোচনোন্মুখ ধনতন্ত্রের উপযুক্ত মুখপাত্র। অন্যদিকে বহুকাল ধরে নূতন সমাজ-গঠনের আশা বিভিন্ন লেখকের স্বপ্নের মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছিল। ইংলণ্ডে এর উদাহরণ হিসাবে ষ্ট্রেচি চারজনের কথা বর্ণনা করেছেন—ষোলো শতকের প্রথমে টমাসমোর সতেরো শতাব্দীর গৃহযুদ্ধের সময় জেরার্ড উইনষ্টান্লি, গত শতকের প্রথমে রবার্ট ওয়েন্ এবং শেষের দিকে উইলিয়াম্ মরিস্। অন্ধ শ্রমিক আক্রোশের সঙ্গে নূতন সমাজ-গঠনের আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌স্ই কিন্তু আধুনিক সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন। উৎপাদন-সামগ্রীতে শ্রমজীবীদের সম্পত্তি নেই বল্লেই চলে অথচ জীবনধারণের জন্য এরা যে-শারীরিক শক্তি বিক্রয় করে উৎপাদন ব্যাপারে সেটাই অপরিহার্য্য অঙ্গ। শ্রম-প্রয়োগে যতখানি ধন উৎপন্ন হয় তার সব মূল্যটুকু শ্রমিকেরা পেতে পারে না কারণ তাহলে উৎপাদন-সামগ্রীর মালিকদের কোন লাভ থাকে না। শ্রমের এই অতিরিক্ত মূল্যের (surplus value) ন্যায্যতঃ অধিকারী সমস্ত সমাজ এই বিশ্বাস সমাজতন্ত্রের আর্থিক ভিত্তি। নূতন সমাজব্যবস্থার মূলে থাকবে জনসাধারণের প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে উৎপাদন (production for use), লাভের তাড়নায় নয়। তার সোপান হবে উৎপাদক সামগ্রীতে ব্যক্তিগত অধিকার বর্জ্জন এবং তার ফলে সমাজে শ্রেণীভেদ মিলিয়ে যাবে। সাম্যবাদের গোড়ার কথা এভাবে ব্যক্ত করা যায়।

যে-মূল প্রশ্নের উত্থাপনে প্রসঙ্গ আরম্ভ হয়েছিল এখন তাতে ফিরে গেলে বোঝা যাবে কি জন্য বাদানুবাদ অনিবার্য্য অথচ অফুরন্ত। সোশ্যালিষ্ট প্রচেষ্টার শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে প্রশ্নের সঠিক সমাধা শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাসই করতে পারবে। প্রশ্নের অন্য অঙ্গ দুটির আলোচনা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে সম্প্রতি দুটি গ্রন্থ। যে-তীক্ষ্ণ সরল নৈপুণ্য জন্ ষ্ট্রেচির রচনার গৌরব তাঁর নবতম গ্রন্থে তা' অক্ষুন্ন রয়েছে তাই সোশ্যালিজমের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বই সকলকেই জ্ঞান দিতে পারে। সোশ্যালিজমের সাধারণ সরল ব্যাখ্যার শীর্ষস্থান এ বইখানির প্রাপ্য, উপরের সুদীর্ঘ আলোচনার অনেক খানিই তাঁর লেখার সংক্ষিপ্তসার। শুধু মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাণ ডায়ালেক্‌টিকের ব্যাখ্যা থেকে ষ্ট্রেচি সর্ব্বদাই কিছু দূরে থাকেন, তাঁর মনের গড়নই বোধ হয় প্র্যাক্‌টিকাল, দার্শনিক নয়। ফরাসী সাহিত্যিকদের অগ্রণী আঁদ্রে জীদ যে বইখানি লিখেছেন কয়েক মাসে তার শতাধিক সংস্করণ বেরিয়েছে। তিন বছর আগে তিনি সোভিয়েট্ রাশিয়ার ভক্ত সমর্থক হিসাবে সকলকে চমকিত করেছিলেন কিন্তু সম্প্রতি রাশিয়া ভ্রমণের ফলে তাঁর যে-সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে আলোচ্য পুস্তিকায় তিনি তাই ব্যক্ত করেছেন। এখনও জনসাধারণের মধ্যে সমতার ভাব, "সংস্কৃতি-উদ্যান"-গুলিতে লোকশিক্ষা ও সকলের বিশুদ্ধ আনন্দ লাভের ব্যবস্থা প্রভৃতি রুষদেশের অনেক ব্যাপারের তিনি প্রশংসা করেন কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনারই মূল্য নিশ্চয় বেশী। সোশ্যালিষ্টেরাও সম্ভবতঃ স্বীকার করবে যে জীদের বই তাদের সজাগ থাকার পক্ষে সহায়ক হবে। বিশেষ করে একথা খাটে তিনটি দোষ সম্বন্ধে। রুষজাতি এখন্ সোভিয়েটের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে অতিরিক্ত আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে—বৈদেশিক অবস্থা সম্বন্ধে তাদের প্রগাঢ় অজ্ঞতা জীদকে পীড়া দিয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার লোকদের প্রতি নাকি সাধারণের একটা ঔদাসীন্যও সেখানে লক্ষিত হয়।

জীদের প্রধান অভিযোগ এই যে রাশিয়া গত দু'এক বছরের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়েছে—এখন সেদেশে নূতন বুর্জোয়া সভ্যতার উদ্ভব হচ্ছে। এই অভিযোগ ট্রট্‌স্কির অনুচরেরা কয়েক বছর থেকেই করে আস্‌ছেন। এ মনোভাব অবশ্য নিজেকে ঘোর বিপ্লবী বলে' মনে করে। কিন্তু জীদ্ কি সত্যই এ জাতীয় বিপ্লবী? আলোচ্য গ্রন্থের কতকগুলি আক্ষেপ ট্রট্‌স্কির চরমপন্থার সঙ্গে বিশেষ খাপ খায় না। রাশিয়াতে ব্যক্তিত্ব-বোধ লোপ পাচ্ছে, চিন্তার স্বাধীনতা হ্রাস পেয়েছে, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি জনসাধারণের মধ্যে এখন ব্যাপ্ত এ সব মন্তব্য ঠিক চরম বিপ্লবীর উপযুক্ত নয় বরং এগুলি "রাশিয়ার চিঠি" লেখকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তফাৎ এই যে আমাদের কবি নিজেকে কখনও সাম্যবাদী বলে পরিচয় দেন নি।

ট্রট্‌স্কির অভিযান সম্বন্ধে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। বোল্‌শেভিক্ বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ট্রট্‌স্কি সাম্যবাদী ছিলেন না এবং তখন জিনোভিয়েভ্ প্রভৃতি অনেকে লেনিনের নেতৃত্ব ঠিক অনুসরণ করেন নি; ষ্টালিন্ কিন্তু প্রথম থেকেই বোলশেভিক্ দলের অন্তরঙ্গ সদস্য ছিলেন। ট্রট্‌স্কি-ষ্টালিন-এর তর্কযুদ্ধ যাঁরা অভিনিবেশের সঙ্গে অনুসরণ করেছেন তাঁদের প্রায়

সকলেরই মত যে ষ্টালিন্ই ঠিক মার্ক্স্, এঙ্গেলস্ ও লেনিনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন, ট্রট্স্কি ডায়ালেক্‌টিক্ সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জিনোভিয়েভ্ প্রভৃতি ট্রট্স্কির সহকর্ম্মীদের যে সুবিচারের বিশেষ অভাব হয় নি ইংরাজ 'কে সি' প্রিটের এই মত প্রণিধানযোগ্য। ট্রট্স্কির দলের প্রতি ধনিক সমাজের এত সহানুভূতিরই বা কি কারণ? শ্রমিকেরা ত এই বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ আস্থাবান নয়। রাশিয়ায় যদি পূর্ব্বাবস্থা ফিরে আসবার উপক্রম হয়ে থাকে তবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার গভীর সখ্যস্থাপন হয় না কেন? ফাশিষ্টদেরই বা তাহ'লে আন্তরিক রুষবিদ্বেষের কারণ কি?

আসলে জীদ্ মার্ক্স্-তত্ত্বে অনেকখানি অনভিজ্ঞ বলে' সোশ্যালিজ্‌মের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে ও তার কার্য্যপদ্ধতির বিষয় কিছু কিছু ভুল ধারণা পোষণ করেছেন। তিনি সোশ্যালিজম্‌কে অসম্ভব কিম্বা অন্যায় ও অমঙ্গলের আকর বলে' অনায়াসে আক্রমণ করতে পারতেন, তাতে কারও কিছু আপত্তি থাকত না। কিন্তু তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করেছেন তার তাৎপর্য্য তাঁর কাছে খুব পরিস্ফুট নয়। বিবর্ত্তনের ডায়ালেক্‌টিক্ তিনি একেবারে অস্বীকার করে' কবির অসহিষ্ণু স্বপ্নচোখে রাশিয়ার কাছে অনেক জিনিষ প্রত্যাশা করেছেন—সিডনি ও বিয়াট্রিস্ ওয়েবের মতন তিনি সমগ্র রূপ ধরবার প্রয়াস পান নি। অথচ বিরোধী সমালোচকেরও এই হ'ল প্রথম কর্ত্তব্য। সমাজতন্ত্র গঠনের যে-স্তরভেদের কথা মার্ক্স্ ১৮৭৫ সালে গোথা প্রোগ্রাম্-এর আলোচনায় উল্লেখ করেছিলেন—যার উপর আজকের থিওরিতে সোশ্যালিজ্‌ম ও কমিউ-নিজ্‌মের পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয় (ষ্ট্রেচি, এগারো অধ্যায়) সেই গোড়ার কথাটুকুও জীদ্ ধরতে পারেন নি। প্রথম স্তর অর্থাৎ সোশ্যালিজ্‌মের আদর্শ হ'ল উৎপাদন সামগ্রীতে ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির বিনাশ মাত্র। রুষদেশ এখন এই স্তরে—সুতরাং প্রকৃত প্রশ্ন দাঁড়ায় এই যে ব্যক্তিগত এ জাতীয় সম্পত্তির পুনর্প্রতিষ্ঠা সেখানে হচ্ছে কি না। সমালোচকের এ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই, ষ্ট্রেচির মতে সেখানকার গতি এদিকেই নয়, জীদ্ এ প্রশ্ন ধরতেই পারেন নি।

শ্রীসুশোভন সরকার

The Letters of Lenin,—Translated and edited by Elizabeth Hill and Doris Mudie (Chapman and Hall).

লেনিনের অনেক চিঠি এখন আর উদ্ধার করার কোন উপায় নেই। যাদের কাছে চিঠি যেত, তারা প্রায়ই পুলিশের খরদৃষ্টি এড়াবার জন্য সেগুলো যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য হত। "অদৃশ্য" কালিতে লেখা চিঠি, বা বই বা কাগজের ছাপার ফাঁকে ফাঁকে লেখা চিঠি পড়া শেষ হলেই নষ্ট করতে হয়েছে। অনেক চিঠি ঠিকানায় পৌঁছত না; পত্রবাহক গ্রেপ্তার হওয়ার দরুণ বা অন্য কোন কারণে সেগুলো পুলিশের হস্তগত হত।

এ সব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও লেনিনের লেখা প্রায় এক হাজার চিঠি পাওয়া গেছে, আর সেগুলো রুষ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বইটিতে তা থেকে বাছা ৩৪০ খানা চিঠি আছে; প্রথম চিঠির তারিখ হচ্ছে ১৪ই মে, ১৮৯৫, আর শেষ চিঠি লেখা হয়েছিল ১৫ই নভেম্বর, ১৯২২। সুতরাং লেনিনের কর্ম্মজীবন সম্বন্ধে অনেক দরকারী খবর এই সংগ্রহ থেকে মিল্‌বে। কোন কোন চিঠি কয়েক লাইনেই শেষ; আর কোন কোন চিঠিতে সাম্যবাদ বা সাম্যবাদীদের কর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা আছে।

এই বইয়ে প্রথম ছ'খানা চিঠি (তাছাড়া পরে অনেকগুলো) লেনিনের মা'কে লেখা। "লেনিনের মা'কে লেখা চিঠি" শুনে একটু যেন চম্‌কে যেতে হয়। বিপ্লবী লেনিনের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না; লেনিনও বিপ্লব আন্দোলনে এমন ভাবে যোগ দিয়েছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন চাপা পড়ে গেছল, রোজনাম্‌চা লেখার মত অবসর বা ইচ্ছা তাঁর ছিল না, আত্মজীবনী রচনা করার মত অহমিকা তাঁর ছিল না। সাম্যবাদকে জয়যুক্ত করার জন্য জগতের এই শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী তাঁর গভীর অনুভূতিগুলিকে নির্দ্দয়ভাবে দমন করে রাখতেন। আত্মপ্রসাদ-লালসাকে এমন অবলীলাক্রমে অবজ্ঞা আর কেউ করতে পেরেছে বলে জানি না।

লেনিনবাদ সম্বন্ধে যাঁরা জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁরা অবশ্য এ বইয়ের চেয়ে লেনিনের গ্রন্থাবলী থেকে বেশী খবর পাবেন। তবে অনেকে হয়তো চিঠির মারফৎ সে জ্ঞানসংগ্রহকে সহজ ও সরস মনে করবেন। কিন্তু যা সহজ, তা সব সময় শ্রেয় নয়। চিঠি পড়ে বই পড়ার বিপদ থেকে পরিত্রাণ যাঁরা খুঁজবেন, তাঁদের অবশ্য পরামর্শের প্রয়োজন নেই।

একথা বলার অর্থ এই নয় যে লেনিনবাদ ভাল করে বোঝার পক্ষে বইটি বেশী উপকারে লাগবে না। লেনিনের অনেক গুণ সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থাবলীর চেয়ে পত্রাবলী বেশী খবর দেবে। তাঁর মতের দৃঢ়তা, অশ্রান্ত কর্ম্মক্ষমতা, সামান্য ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি, বিপ্লব আন্দোলনে বিপথগামীদের প্রতি কৃপাহীন প্রাতিকূল্য—এ সব বিষয়ে চিঠিগুলি থেকে আমরা অনেক কথা জানতে পারব। আরও দেখা যাবে যে প্রবাস থেকে রুষ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে খবর পাওয়ার জন্য লেনিনের কী আগ্রহ ছিল, সাম্যবাদের বাস্তব ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কিরূপ সুস্পষ্ট ছিল। সাম্যবাদপ্রচার তখন রুষদেশে বে-আইনী; তা সত্ত্বেও কি উপায়ে সাম্যবাদ সম্বন্ধে ও রুষদেশের জনসাধারণের জীবন সম্বন্ধে পুস্তিকা প্রকাশ ও বিতরণ করা যায়, সে বিষয়ে লেনিনের আগ্রহাতিশয্যের বহু চিহ্ন এই পত্রাবলীতে পাওয়া যাবে।

বৃদ্ধা মায়ের কাছে লেখা চিঠিগুলি অনেক সময় ভারী সুন্দর। ১৯০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জার্ম্মানী থেকে লেলিন মাকে লিখ্‌ছেন: "a winter without snow is not pleasant; it is not even winter, but actually a rotten kind of autumn...I get sick of the slush, it is boring and I remember with pleasure our real Russian winter—the sledges and the clear forsty air." (১২৭ পৃঃ)। প্রায় বারো

বছর পরে প্যারিস থেকে লিখছেন : "what is the spring like on the Volga ? Are you all well ?···The other day again went a bicycle ride into the forest. All the fruit trees in the gardens are in white blossom (as though milk had been poured over them), the perfume was wonderful. How delightful spring is ! It is a pity I was alone. Nadya has caught cold and has lost her voice." (২৯৯পৃঃ)। নির্ম্মম বিপ্লবী বলে যার অপবাদ, তার চিঠিতে এ রকম কথা ! একজন সমালোচক কিন্তু বেশ বলেছেন যে ব্র্যাকেটের মধ্যে কবিতা ঢোকানো লেনিনেরই উপযুক্ত বটে !

ভগ্নী উলিয়ানোভা ও এলিজারোভাকে লেখা অনেকগুলি চিঠি এই সংগ্রহে আছে। উলিয়ানোভাকে কিছুকাল জেলে কাটাতে হয়েছিল, আর ভাই তখন জেলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষা বিষয়ে বোনকে উপদেশ পাঠাত : "For mental work I particularly recommend translations. Specially *reverse* ones—namely, first a written translation from a foreign language into Russian and then translate the Russian back into the foreign language. From my own experience I learnt that this was the most rational way of learning a language. In the physical realm···daily exercises and then a rub down. This is absolutely essential in solitary confinement···I also advise you to spread your studies systematically over the available books, so a to vary them·· Sometimes depression (moods change frequently in prison) is simply the result of fatigue through monotonous impressions or mononous work. I remember that in the evening after a meal I used regularly to read fiction for relaxation, and I never enjoyed it more than when I was in prison. Above all, do not forget the daily compulsory physical exercises. Force yourself to make several dozen different movements (without stopping !). It is most important." (১৪৩ পৃঃ)। ভাই যখন জেলে, তখনও লেনিন মাকে এম্‌নি চিঠি লিখেছেন ; সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত সহকর্ম্মীদের নিঃসঙ্গতা লাঘবের জন্য সঙ্গীতের ব্যবস্থা কত দরকার তা জানিয়েছেন। স্ত্রী ক্রুপস্‌কায়াকে লেখা চিঠি এ বইয়ে চারখানা আছে ; তার মধ্যে কোথাও ভাবাবেগের চিহ্ন নেই। স্ত্রীর প্রতি তাঁর মনোভাবের চিহ্ন একটু আধটু পাওয়া যায় অন্য চিঠি থেকে, যেমন ২৯৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত শেষ লাইনে। আর ক্রুপস্‌কায়া যে লেনিনের যথার্থ সহধর্ম্মিণী ছিলেন, তা বোঝা যায় যখন লেনিন মাকে লিখছেন যে তাঁরা দুইজন একসঙ্গে বের্ণষ্টাইনের বই পড়ছেন, একদিনে অর্দ্ধেকের বেশী শেষ করেছেন আর অতি বিজ্ঞ জার্ম্মান পণ্ডিতের মার্ক্‌স্‌কে "ভদ্রস্থ" ("revise") করার চেষ্টা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছেন (৯৫ পৃঃ)।

জীবনে কখনও লেনিন আরাম খোঁজেন নি ; নানা কষ্টে অসুবিধার মধ্যে তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। কিন্তু ধনিকবাদ দূর করে সাম্যবাদ স্থাপনের সংকল্প এমনই অটল ছিল যে

বিপ্লবসংগ্রামে একদিনও তাঁর শৈথিল্য আসে নি। স্বদেশে অত্যাচার, বিদেশে অর্থাভাব, অসুবিধা, নৈরাশ্য—কিছুই তাঁকে ক্লান্ত করতে পারে নি। বিপ্লবসংগ্রামের পরম গুরুত্ব সম্বন্ধে কখনও তাঁর মনে সন্দেহ হয় নি, কৃচ্ছ্রসাধনকে একপ্রকার সূক্ষ্ম বিলাস মনে করার মত অহমিকা তাঁর কখনও হয় নি। তাঁর কীর্ত্তিস্পৃহা মুহূর্ত্তের জন্যও আন্দোলনকে ভুল্‌তে পারে নি; তিনি কাজ করে গেছেন নিজের জন্য নয়, বিপ্লব-আন্দোলনের জন্য। ১৯১৭ সালের পরও একাধিপত্যের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না; ১৯২০ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের একচ্ছত্র নেতা মস্কোর এক পুস্তকাগারাধ্যক্ষকে লিখছেন: "আমি কয়েকটী অভিধান চাই; সন্ধ্যার পর লাইব্রেরী বন্ধ হলে নেব, পরদিন সকালে লাইব্রেরী খোলার আগেই ফেরৎ দেব। পাব কি?" (৪৬১ পৃঃ)।

রুষভাষাবিদ্ এক সমালোচক এই বইয়ে অনেক অনুবাদের ভুল দেখিয়েছেন। অনুবাদকরা ২২৮-২৯ পৃষ্ঠায় S. R. D. এই তিন অক্ষরের অর্থ আন্দাজ করে বলেছেন Social Revolutionary Democrats"; কিন্তু ওরূপ কোন দল ছিল না। ঐ তিন অক্ষরের আসল অর্থ হচ্ছে "Soviet of Workers' Deputies"। 'বলশেভিক্' আর 'মেনশেভিক্,' এই দুটো কথা 'সংখ্যাধিক' আর 'সংখ্যাল্প' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অনুবাদকরা নাকি ধরে নিয়েছেন যে রুষভাষায় 'সংখ্যাধিক,' আর 'সংখ্যাল্পে'র একটা প্রতিশব্দ হচ্ছে 'বলশেভিক্' 'মেনশেভিক'। এর ফলে হয়েছে 'বলশেভিক্' 'মেনশেভিক্' এই দুটো কথা রাজনীতি ক্ষেত্রে চল্‌তি হবার আগে লেনিনের মুখে ঐ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে! এ ছাড়াও অনেক ভুল নাকি ধরা পড়েছে, আর অনুবাদকরা যে সমস্ত পাদটীকা ('ফুটনোট') দিয়েছেন, তা নাকি সবই রুষ সংস্করণ থেকে 'না বলিয়া' গৃহীত! রুষভাষায় যারা একেবারেই অনভিজ্ঞ, তারাও বল্‌বে যে সম্পাদনা আরও একটু যত্ন নিয়ে করা উচিত ছিল। অনেক চিঠি বুঝতে কষ্ট হয়; সম্পাদকদের সেগুলো সুবোধ্য করার জন্য রুষ ইতিহাস সম্বন্ধে খবর একটু ভাল করে সাজিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বইয়ের দামও বড় বেশী; প্রকাশকের সেদিকে নজর না দেওয়া অন্যায় হয়েছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২০।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৪৪

পরিচয়

শ্মশান ঘাট

এখনও সামান্য খানিকটা বেলা আছে। ঘেরা শ্মশানের ভিতর থেকে চিতার ধোঁয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে উঠছিল। তারই কালোয় পশ্চিম-দিগন্তের বর্ণচ্ছটা ম্লান হয়ে এসেছে। কিন্তু গাছগুলিকে দেখাচ্ছে স্বপ্নলোকের গাছের মতো অপরূপ। যেন পটে আঁকা ছবি।

বল হরি! হরি বোল!

শববাহকের জয়ধ্বনি। ঘেরা শ্মশানের ভিতরে বহু নর-নারীর ভিড়। কতক শববাহক, কতক দর্শক। ক'টি কুকুর এলোমেলো ঘুরছে।

শ্মশানের পিছনে গঙ্গার বাঁধাঘাটের মাথায় একটি বেঞ্চে ব'সে আছে দু'টি ছোকরা। আর তাদেরই পাশে মেঝের উপর এক সন্ন্যাসী। তাঁর পরণে গৈরিক আলখাল্লা, মুখে আবক্ষ লম্বিত পক্ক শ্মশ্রু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গৈরিক ঝুলিটি পাশে নামানো।

ছেলে দু'টিকে লক্ষ্য ক'রে তিনি বলছিলেন:

—দেখতে দেখতে শ্মশানও শহর হয়ে উঠল। এ্যাঁ! দলে দলে মেয়ে-লোকগুলো পর্য্যন্ত আসছে দেখতে। যেন চিড়িয়াখানা। মা! মা!

সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে গাঁজার সরঞ্জাম বের করলেন।

একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করলে, আগে কি ছিল?

—আগে? সত্যিকারের শ্মশান। এসব বাড়ী-টাড়ি কিছুই ছিল না। শুধু জঙ্গল। এদিকের সবটা ছিল হোগলার বন। দিনে লোকে আসতে ভয়

পেত। রাত্রে তো কথাই নেই। এমন ইলেক্টিরি আলোও ছিল না, কিছুই না। মানুষের হাত থেকে শেয়ালে খাবার কেড়ে নিয়ে পালাত। যাকে বলে সত্যিকারের শ্মশান। আর এখন? ভিড়ের ঠেলায় একটু নিরিবিলি ব'সে মায়ের নাম করার যো নেই। তারা! তারা!

গাঁজা তৈরি করতে করতে আবার বললেন, ক্ষ্যাপাবাবা ব'লে এক তান্ত্রিক ছাড়া আর কাউকে এখানে দেখিনি। ওই যে আমগাছটা, ওটা অনেক কালের। ওরই তলায় তাঁর আসন ছিল। একপাল শেয়াল নিয়ে কি শীত, কি বর্ষা ওইখানে থাকতেন।

—কোনো কুঁড়ে ছিল না?

—না। মেঘের মতো রঙ। প্রকাণ্ড দেহ, মস্ত ভুঁড়ি। দিগম্বর। স্পষ্ট মনে পড়ছে। দেখলে গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত।

—কিছু খেতেন না?

—শব মাংস। শব চিতায় শোয়ান হয়েছে। হঠাৎ গেলেন, চিমটি দিয়ে দু'খাবল তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। আবার ফিরে এসে নিজের আসনে বসলেন।

—কি হ'ল তাঁর?

—কি জানি। হয়তো দেহ রেখেছেন, নয়তো আর কোথাও চ'লে গেছেন।

ভিড় জমেছে উত্তর-পশ্চিম কোণেই বেশী। সধবা স্ত্রীলোকের ভিড়।

খাটের উপর বস্ত্রাবৃত শুয়ে আছে একটি সধবার মৃতদেহ। দেখা যাচ্ছে শুধু তার পদ্মফুলের মতো মুখখানি, আর আলতা-রাঙা পা দুখানি। সীমন্তে জ্বল জ্বল করছে হোমাগ্নিশিখার মতো সিন্দুররেখা। আয়তনয়ন নিমীলিত। শুভ্র মুখে ছায়া পড়েছে মৃত্যুর নীলাভ প্রশান্তির।

জনতার মধ্যে থেকে একটি বর্ষিয়সী বিধবা মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেললে, আহা! বড় ভাগ্যি ক'রে এসেছিলি মা। স্বামী-পুত্তুর রেখে···

বর্ষিয়সী আঁচলে চোখ মুছলে।

তার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল দুটি মেয়ে। বোধ করি সবে বিয়ে হয়েছে। তারা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলছিল ঃ

—কী চমৎকার মেয়েটি ! অল্প বয়েস।

—হুঁ। আমাদেরই বয়িসি।

—কে বলবে মারা গেছে !

—হুঁ। যেন ঘুমুচ্ছে। ওইটি বোধ হয় ওর স্বামী,—ওই যেটি মাথা নীচু ক'রে ব'সে আছে। না ?

—আহা ! বেচারার বুক ভেঙে গেছে।

মেয়ে দুটির চোখ ছল ছল ক'রে উঠল।

বর্ষিয়সী আর একটু এগিয়ে এল।

—কি হয়েছিল বাছা ?

—সন্তান হতে গিয়ে মারা গেল।

—আহা !

মেয়ে দুটি শিউরে উঠে পিছন ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু বর্ষিয়সী এদের সঙ্গে প্রায় আত্মীয়তা ক'রে ফেলেছে। জিজ্ঞাসা করলে ঃ

—আহা ! এই প্রথম বুঝি ?

—হাঁ। সবে বছর দুই হ'ল বিয়ে হয়েছে।

—তা আর দেরী করছ কেন বাছা ? পুরুত আসেন নি বুঝি ?

—না। হঠাৎ এই কাণ্ড ঘটেছে, আমরা হাসপাতাল থেকে নিয়ে আসছি। ছেলে স্কুলে পড়ে। তাকে আনতে লোক গেছে। সে না এলে তো আর মুখাগ্নি হবে না।

—ও।—বর্ষিয়সী একটু ভেবে বললে,—এটি বুঝি দ্বিতীয় পক্ষ ?

—হুঁ।

মেয়ে দুটি চকিতে আবার শোকার্ত্ত স্বামীর দিকে চাইলে। কিন্তু তাদের চোখের দৃষ্টি থেকে সে মমতার এবং সহানুভূতির অনেকখানি যেন মুছে গেছে। কিন্তু বর্ষিয়সীর কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ কান্নায় ভারি হয়ে উঠল। বললে ঃ

—আহা ! বারে বারে ঘর বাঁধতে যাচ্ছে, টিকছে না। সবই অদৃষ্ট বাবা ! এই দেখ না আমার···

বর্ষিয়সী তার নিজের অদৃষ্টের কথা বলবার জন্যে সেইখানেই উবু হয়ে বসল।

ঘাটের এধারে বকুলগাছের নীচে ঘাসের উপর ব'সে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক মালা জপ করছেন। তাঁর রক্তাম্বরে, বিপুল উদর প্রদেশে, প্রশস্ত টাকে আলো এসে পড়েছে।

—আপনি এখানে ?—

একটি যুবক এসে জুতো খুলে ভক্তিভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। প্রণামী দিলে একটি আধুলি। বললে ঃ

—আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। মাঠাকরুণ বললেন, আপনি নাকি রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত এইখানেই থাকেন। তাই ভাবলাম···

প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঠুন ক'রে আধুলিটা বাজিয়ে রক্তাম্বড়ের কোঁচড়ে গুঁজলেন।

—মা! মা! এমন ঠাঁই আর নেই হে। সমস্ত দিন পেটের চিন্তায় নানা কাজই করি। সন্ধ্যের পর এখানে বসলে সব গ্লানি কেটে যায়। কথায় বলে, মহাশ্মশান। তারা! তারা!

—তারপরে, ওটা তো এবারও উঠল না।

—উঠবে। ব্যস্ত কি ?

ভাবলাম, এবারে টিকিট কিনব কি না, আপনাকে জিগ্যেস ক'রে আসি।

—তা কিনতে পার।

—কিন্তু যদি না পাওয়া যায় ?

—নাও পেতে পার।

—তবে ?

—তবে কি ? দু'বার চারবার কিনতে কিনতে একবার লেগে যাবে। মোট কথা, শীগ্‌গিরই পাবে তুমি।

—ঠিক তো ?

—হ্যাঁ যদি তোমার কোষ্ঠী ঠিক হয়।

—কোষ্ঠী কি ঠিক নয় মনে হচ্ছে ?

জ্যোতিষী হেসে উঠলেন। বললেন, ঠিক কি না, তা এই লটারীর ওপর দিয়েই পরীক্ষা হয়ে যাবে।

—দেখবেন। আমি কিন্তু আপনার ভরসাতেই···

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

গঙ্গার ওপারে একটা সখের থিয়েটারের মহল্লা চলছে। নাকিসুরে একজন গান ধরেছে.ঃ

পাগল ক'রেছ তুমি আঁখিতে প্রাণো আমারো।

সঙ্গে সঙ্গে বহুকণ্ঠের সংমিশ্রিত কলরবঃ বা ভাই! বা ভাই! সাবাস! সাবাস! এ ছোঁড়া একাই মাৎ করবে দেখছি!

এপারে ওপাশের ঘাটে বসে একজন মধুর কণ্ঠে গাইছেঃ

বেলা গেল তোমারই পথ পানে চেয়ে।

তারই আশে-পাশে গুচ্ছে গুচ্ছে বহু নরনারীর জটলা ব'সেছে। কেউ নিঃশব্দে বসে আছে। কেউ বা আপন আপন সুখ-দুঃখের গল্প করছে।

একটি বছরখানেকের শিশুর মড়া এসেছে। দুধের মতো ধবধবে শাদা। পাতলা বড় বড় চুলগুলি হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। দেখলে মনে হয়, এখনও বেঁচে আছে।

—আহা! কোন হতভাগীর অাঁচল ছিঁড়ে এলি বাবা!

একটি মেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

—কোন পোড়াকপালীর কপাল পুড়ল! কোন অভাগীর কোল খালি হ'ল রে!

—মরে যাই। ছেলে তো নয়, যেন পূর্ণিমার চাঁদ। শ্মশান আলো ক'রে রয়েছে।

—ওই দিকে চল দিদিমা। এ দেখা যায় না।

—তাই বটে রে। এ দেখলে আর সংসার করতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, যেদিকে দুই চোখ যায় চ'লে যাই। আহা মরি! ছেলে তো নয়, যেন এক তাল সোনা।

অকস্মাৎ কীর্ত্তনের শব্দে, খোল-করতালের বাদ্যে এবং বহু কণ্ঠের হরিধ্বনিতে শ্মশান যেন মহোৎসবক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। কোনো বড় লোকের শব নিশ্চয়ই।

পুত্র-পৌত্র-দৌহিত্র এবং আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব মিলে একটা বিরাট জনতার সৃষ্টি হয়েছে। খই-বাতাসা-পয়সার লোভে কাঙালীও জুটেছে কম নয়। প্রকাণ্ড বড় একটা দামী খাটের উপর মৃতদেহ ফুলে ঢেকে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে গেল আরও যে ক'টি শব এসেছে সেগুলোও। সমস্ত মানুষ ছুটে এল এই দিকে। চারি-দিক কলরবে মুখর হয়ে উঠল ঃ

—ওহে, চন্দন কাঠের কথা ব'লে এস।

—কতটা চন্দন ?

—সে ওদের জিগ্যেস করলেই ব'লে দেবে এখন। আর ঘি। ঘি কত বলব হে ?

—মণটেক হ'লেই হবে। আর চন্দন কাঠ কত বলব ? মণ দুই, না কি ?

—পাওয়া যাবে তো ?

—আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। এ কি তোমার পাড়াগাঁ পেয়েছ ? পয়সা দিলে বাঘের দুধ মেলে এখানে। যাও, যাও, আর দেরী ক'র না।

—ওহে, ফোটোগ্রাফার এল না এখনও ?

—কী হ'ল ? কাকে পাঠিয়েছ ?

—পাঠিয়েছি পাঁচুকে। কিন্তু সে তো এক ঘণ্টা হ'ল।

—তবেই হয়েছে ! সে আর আজকে ফিরছে না। এখানে কাছে-ভিতে ফোটোগ্রাফার নেই ?

—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ! শুনছ সাহেব বাড়ী গেছে পাঁচু। ট্যাক্সিতে আসবে, এল ব'লে।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলেন। সমস্ত ভিড় এইখানে এসে জমার জন্যে বাইরেটা একেবারে খালি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক চারিদিকে চেয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন বাতাসকে শুনিয়ে বললেন, হাঁ, মরতে হয় তো এমনি ক'রে। তা না তো, খাটুলিতে চাপিয়ে নিয়ে এল, আর দিলে চিতেয় চাপিয়ে। হুঁঃ !

সেই সধবা স্ত্রীলোকটি তখনও সেই অবস্থাতেই রয়েছে। বোধ হয় তার ছেলে এখনও আসেনি। সঙ্গের লোকজন গেছে বড় লোকটির শব দেখতে। স্বামী

একা ব'সে আছে শবের কাছে। তেমনি ভূলগ্নদৃষ্টিতে, মাথায় হাত দিয়ে। ওদের সমারোহের দিকে একবার সে আরক্ত চোখ মেলে চাইলে। একবার চাইলে তার মৃতা স্ত্রীর দিকে। তার রিক্ত দুটি করপ্রকোষ্ঠে শুধু দু'গাছি শাঁখা। একখানি সাধারণ বস্ত্রে দেহ আবৃত। না ফুল, না কিছু।

সে একবার আকাশের দিকে চাইলে। একবার অদূরে ক্রমবিলীয়মান ধূম-রেখার দিকে। তারপর আবার ভূলগ্নদৃষ্টিতে নিঃশব্দে ব'সে রইল। কি যে ভাবলে সেই জানে।

জ্যোতিষীকে সেই ছোকরা বলছিল ঃ

—সন্ন্যিসী বাবার সঙ্গে দেখা হ'ল। খবর পাঠিয়েছিলেন যোগ্যদ্যার মঠে দেখা করবার জন্যে। গিয়েছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—কি বলেন সন্ন্যিসী বাবা ?

—বাড়ীটার কথা বলছিলেন। বললেন, ওটা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি। তুমি নিয়ে একটু মেরামত ক'রে বসবাস কর। নইলে যে রকম অবস্থা, ওটা কোন দিন পড়েই যাবে।

—বেশ তো। নিয়ে নাও।

—বেশ তো বটে। বড় রাস্তার ওপরেই বাড়ী, প্রাকটিসেরও সুবিধা হয়। কিন্তু সন্ন্যিসীর দান নিই কি ক'রে ?

—নেবে না তাহ'লে ?

—নিতে তো খুবই ইচ্ছে। কিন্তু ওই যে বললাম। আমি ব'লেছি, এমনি কি ক'রে নিই ? তবে নামমাত্র কিছু মূল্য নিয়ে দিলেও নিতে পারি। আমিও বুঝলাম···তা উনি তাতেও রাজি। কিন্তু কথা হচ্ছে দলিলটা···

—হ্যাঁ। দলিলে একটু গোলযোগ আছে। বড় গিন্নির স্বামী বাড়ীটা বাবাকে মৌখিক দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বড় গিন্নি একটা দলিলও ক'রে দিয়েছিলেন। কিন্তু···কি জানি বাবা, নেবার আগে বরং কোনো উকিলকে একবার জিগ্যেস ক'রে নিও।

—তাই নাকি ? তবে তো···চুলোয় যাক। এই লটারিটা পেলে আর

বাড়ীটার ওপর লোভ নেই। এখন আপনার দয়া। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু টাকার আমার বড্ড প্রয়োজন হয়েছে।

—না, পাবে। পাবে। তোমার কোষ্ঠীতে এই সময় একটা শুভগ্রহের যোগ আছে।

আমগাছটার আড়ালে ছুটো ডোম গোল বাধিয়েছে ঃ

—ও কি কাণ্ড বাবু! ও সব কাপড়-জামা হ'ল আমাদের পাওনা। ছাড়িয়ে নিলে চলবে কেন ?

—ও ছেলেমানুষ, জানে না। তাই ভালো জামা-কাপড় প'রেই এসেছে। ইস্কুল থেকে এসেই মা মারা যাওয়ার খবর শুনেছে, জামা-কাপড় ছাড়ারও সময় পায় নি। দেখছ না, নতুন জামা-কাপড়।

সেই মৃতা সধবা স্ত্রীলোকটির স্বামীর কাতর কণ্ঠ।

—আর নতুন জামা-কাপড় বাবু! মানুষটাই চ'লে গেল, তার শোক সইবে, আর এই জামা-কাপড়ই বড় হ'ল ?

—তাও দিতাম, বুঝলে বাবা। কিন্তু দেখছই তো সব। সুখের মরা তো নয়। আমাকে ধনে-প্রাণে মেরে গেছে। নইলে একখানা দিশী কাপড় আর দিতে পারতাম না ?

—আর আপনি সব দিতেন বাবু! লুকিয়ে এইখানে এসেছেন ছেলের কাপড় ছাড়াতে।

ডোম হেসে উঠল।

ছেলেটার বুকে সে হাসি বিঁধল। বললে, তা হোক গে বাবা, দিয়ে দাও এটা। কেনা তো নয়।

মুখ ভেংচে ভদ্রলোক বললে, না, নাঃ! কেনা তো নয়! ভারি নবাব হয়েছে! ঘটে যদি তোমার কিছু বুদ্ধিও থাকত! দিশী কাপড় প'রে যেন নেমন্তন্ন খেতে এসেছেন!

ছেলেটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কি ভেবে ভদ্রলোক একটু পরে বললে, তা থাক আর ছাড়তে হবে না।

কত কোন দিকে গেল, একখানা দিশী কাপড়ে সব হবে। তবে পাঞ্জাবীটা খুলে রাখ্। তোদের কথাই রইল বাপু। কাপড়খানা তোরাই নিস।

ছেলেকে বললে, চল্। আর দেরী ক'রে লাভ নেই। তোর জন্যে অনেক-ক্ষণ থেকে সব ব'সে আছে। অনেক ক্রিয়া-কর্ম্ম আছে আবার।

সন্ন্যাসী সেই তরুণ ছোকরা দুটিকে বোঝাচ্ছিল ঃ

—বাবা সকল, ভোগে সুখ নেই, সুখ ত্যাগে। ভোগের কি শেষ আছে? একটি কাপড় যদি জুটল তো গেঞ্জী চাই,—তার ওপরে জামা পিরান, পায়ে জুতো। মাথা গোঁজবার ঘর যদি একটা হ'ল তো পরিবার চাই। ক্ষ্যাপা বাবার গায়ে তো একটি গাছি সুতোও ছিল না। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, ওই আমতলায় দিগম্বর মূর্ত্তিতে কাটিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, মহাপুরুষদের কথাই আলাদা।

—তা আর নয়?

—অনেক মন্তর-তন্তর জানতেন যে! কেউটে সাপ এসে তাঁর মড়ার মাথার খুলি থেকে জল খেয়ে চ'লে গেল। সেই জল আবার তিনিও খেলেন। পারিস?

—বাবা!

—বললাম, ওটা খেলেন? ও যে বিষ! বাবা হেসে বললেন, দেখ্না, পেটের মধ্যে গিয়ে সব অমৃত হয়ে যাবে।

—আশ্চর্য্য!

—আমার তো যা কিছু বিদ্যে সব তাঁর কাছ থেকে শেখা কি না।

—ও।

—হ্যাঁ। তা ছাড়া একটা জিনিস তিনি জানতেন। রূপোকে সোনা করা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমার স্বচক্ষে দেখা। ভূতসিদ্ধ কি না, যা মনে করবেন তাই হবে।

—উঃ! এ বিদ্যেটা আপনি আদায় করতে পারেন নি?

—উঁহু।

সন্ন্যাসী প্রসঙ্গটা বন্ধ করবার জন্যে পিছন ফিরে বসলেন। ছেলে দুটি পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে তাঁর পায়ের কাছে নেমে বসল।

—বাব

সাড়া নেই।

—বাবাঠাকুর !

ওরা তাঁর পা চেপে জড়িয়ে ধরল।

গঙ্গার ওপারে গানের মহল্লা খুব জোর চলছে।

'এ ভরা যৌবন সখী'।

হাসির হররায়, বহু কণ্ঠের চীৎকারে শেষের কথাগুলো ডুবে গেল। এপারে ওপাশের ঘাটে কে একজন ভাঙা-ভাঙা মিষ্টি গলায় গান ধ'রেছে,

'আমায় মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে বলে মাতাল'।

তারই অদূরে ক'টি স্ত্রীলোকে চুপি চুপি গল্প করছে ঃ

—পুরুষদের ভালবাসার কথা আর ব'ল না ভাই। শ্মশানে এসে সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে। যেতে দাও না তিন মাস।

—হ্যাঁ। আমার ননদকে তার বর তিনটি দিন চোখের আড় ক'রতে পারত না। যখন ননদ মারা গেল, তার কী কান্না! অথচ ছ'টি মাস পেরুতে না পেরুতেই আবার একটা···

—তা যদি বললি মা, তো আজকালকার মেয়েরাও কম যায় না।

—আজকালকার মেয়েরা আবার কি দোষ করলে মাসী !

—সে সব কথা শুনতে নেই মা। বললি ব'লেই বলছি। আমাদের পাশের বাড়ীর মেয়েটি যখন বিধবা হয়ে এল, যেন বদ্ধ পাগল। খাওয়া শুদ্ধ ছেড়ে দিলে। অমন যে মটরের ডালের মতো রঙ, তা ঝলসে কালো হয়ে গেছে।

—তা কি হ'ল ?

—হবে আবার ছাই ! এখন তার কীর্ত্তি তো চোখের সুমুখেই দেখছি।

—কি জানি মা, কেমন মেয়ে !

ওদেরই অনতিদূরে ক'টি ছেলে উৎকর্ণ হয়ে এই আলোচনা শুনছিল। একজন আর একজনকে চুপি চুপি বললে, শেখভের ডার্লিং।

চোর ! চোর ! চোর !

মুহূর্ত্ত মধ্যে আমগাছটার পিছনের আলো-অন্ধকারে বহু লোক জ'মে গেল। পুলিশও আছে।

ছেলে দুটো বললে, আমরা কি করব ? উনি বললেন, সোনা তৈরি ক'রে দোব, ইদিকে আয়। তাইতে এলাম।

সন্ন্যাসী কিন্তু ভালো-মন্দ কোনো কথাই বলছে না। লোকের অসংখ্য টিট্‌কারি সত্ত্বেও। পুলিশ তার ঝুলি-ঝম্পা খানাতল্লাস ক'রে বার করলে সেরখানেক চাল, গোটা কয়েক আলু-পটল, গঞ্জিকা এবং তার সরঞ্জাম ; আর কোমরে বাঁধা একটা থলি থেকে বার হ'ল গোটা কয়েক টাকা-আনি-দুয়ানি, পাঁচখানা গিনি আর কিছু কুচো সোনা।

পাশাপাশি পাঁচটি চিতা জ্বলছে। ছোট শিশুর চিতাটি গেছে নিভে। প্রচুর ঘৃতপান ক'রে জমিদারের চিতার শিখা যেন আকাশ ছুঁতে চলেছে।

বলহরি, হরিবোল।

আবার একটি নতুন মড়া এল।

শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

মহা-মিলন

গতবারে আমরা মাথুরের বিরহের পর রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছি—আমরা দেখিয়াছি শ্রীরাধা অমৃতসাগরে সিনান করিতেছেন, আনন্দসিন্ধুর মধ্যে অবগাহন করিয়া 'Perfiniteness of joy', 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' অনুভব করিতেছেন। কিন্তু এ মিলন কি চিরস্থায়ী? তাহা ত' নয়—ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় নূতন রাজপুরী স্থাপন করিবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য নিনাদ করিয়া 'কালোস্মি লোকক্ষয়কৃৎ'রূপে দর্শন দিবেন—

নিরস্ত্র বসিয়া কৃষ্ণ অর্জ্জুনের রথে
সাধেন অম্লান মুখে ক্ষত্রিয় বিনাশ

—প্রভাসে ভূভার হরণের জন্য ধ্বংসলীলার অভিনয় করিবেন—

কেমনে নিবারি—কেন নিবারিব আমি?
নহি যাদবের আমি জগতের স্বামী!

অতএব যদি বিরহের হাত একান্তভাবে এড়াইতে হয়, তবে ভক্ত-ভগবানের মিলনই যথেষ্ট নয়—মিশ্রণ চাই, একাকার চাই—বাদরায়ণ যাহাকে বলিয়াছেন,

অবিভাগো বচনাৎ—ব্রহ্মসূত্র, ৪।২।১৬

—'a state of in-discrimination, non-duality'—দ্বৈত নয়, অ-দ্বৈত চাই। 'The soul is to be *oned* with bliss'—সেই আনন্দময়ের সহিত একীভূত হওয়া চাই। ইহাই প্রকৃত 'at-one-ment'—যাহাকে আমরা 'মহামিলন' বলিতে চাই।

—'Becoming one with God'—'self-mergence in the Principle of Love and Life.'

এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য মিষ্টিকদিগের সাক্ষ্য এই :—

The mystic experience ends with the words 'I live—yet not I but God in me'.—Racejac

'God and the Soul are made one thing in the unitive state'. 'He and I become *one* I'.—Eckhart

We are two in *one*. He is given to her, she is given to Him.

—St. Mechthild.

My 'me' is God nor do I know my selfhood, except in God.

—St. Catherine of Genoa.

ঐ মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ একটি উপমান দ্বারা বিশদিত করা যাইতে পারে। আমাদের পরিচিত জলস্তম্ভ (water-spout)-ব্যাপারে জলদ জলধির সহিত মিলিত হয়—জলদ জলদই থাকে, জলধি জলধিই থাকে; কিন্তু উভয়ের সান্নিধ্যবশতঃ সংযোগ সাধিত হয়—ইহাই মিলন। কিন্তু নদী যখন নিজের নামরূপ হারাইয়া সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন আর নদী নদী থাকে না—সমুদ্র হইয়া যায়।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়—মুণ্ডক, ৩।২।৮

—ইহাই মিশ্রণ। অর্থাৎ মিলনে সান্নিধ্য, সংযোগ (propinquity)—আর মিশ্রণে দ্বিত্ব নয় একত্ব—at-one-ment, mergence, absorption। এক কথায়, মিলনে unity, মিশ্রণে identity। পাশ্চাত্য মিষ্টিকেরা সাধকের illuminative way এবং সিদ্ধের unitive way-এর পার্থক্য প্রদর্শন করিয়া এই মিলন ও মিশ্রণের প্রভেদ প্রতিপন্ন করিয়াছেন—

This is well illustrated in mystic literature, where we are told that in the first or illuminative life, the individuality of the Subject, however profound his spiritual consciousness, however close his communion with the Infinite, remains separate and intact; whereas in the second or unitive life, the Subject disappears and loses himself in God, so that "God and the Soul are made *One* thing".—From my article 'God as Love.'

Illuminative way-তে ভগবান্ ভক্তের নিকট উপসন্ন হন—'He comes not to give Himself wholly but to be tasted by him' —এ যেন like a flash of lightning in the gathering gloom—বিদ্যুতো ব্যদ্যুতৎ আ।

এ সম্পর্কে Hugh of Victor-কৃত 'De Arrha Animae' গ্রন্থে* কয়েকটি সুন্দর কথা আছে :—

* Quoted in Underhill's Mysticism pp. 294-5.

The Soul says—'I am suddenly renewed, I am changed, I am plunged into an ineffable peace......My soul exults, my intellect is illumined; my heart is afire, I know not where I am—because my Love has embraced me. Is this then my Beloved?' 'It is indeed thy Beloved who visits thee...... He comes not to give Himself wholly but to be tasted by thee. He gives a foretaste of His delights, not the plenitude of a perfect satisfaction—and the earnest of thy betrothal consists chiefly in this that He, who shall afterwards give Himself to be seen and possessed by thee *perpetually*, now permits Himself to be sometimes tasted that thou mayst learn how sweet He is.'

অর্থাৎ Illuminative Way-তে অচিরস্থায়ী মিলন (union) এবং Unitive Way-তে চিরস্থায়ী মিশ্রণ (unification)—যে অবস্থাকে মিষ্টিকেরা 'amalgamation with God', 'immersion in the Absolute' 'absorption in the Divine Dark', 'self-loss in the All', 'annihilation of selfhood in the nudity of Pure Being' প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত করিয়াছেন। ঐ অবস্থায় 'আমার আমিত্ব থাকে না, আমার আমি তুমি হইয়া যায়'—'he disappears and loses himself in God' (Suso)। এ বিষয় লইয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়ে বিবাদ করা—dogmatise করা নিতান্ত অশোভন। এ সম্পর্কে আমি অন্যত্র লিখিয়াছি -

It is inapt to dogmatise about this ineffable experience, because, "the wonder of wonders is the human made Divine", as is the case now. When is the human made Divine? It is when in the case of a rare elect spirit, the whole man is remade according to the pattern shown him 'in the mount'—when caught and led out of himself, he, in the language of the *Mirror*, 'becomes God by condition of love"*—that is, in the graphic phrase of the *Upanishad*—ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপ্যেতি। How can we speak or even lisp about this state?—God as Love.

আমাদের পক্ষে এ যেন তিত্তিরির সমুদ্রতরণ। সুবিধার বিষয়—যাঁহারা ধ্যানরসিক, যাঁহারা প্রত্যক্ষদর্শী, এ সম্পর্কে যাঁহাদের অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়াছে,

* এ প্রসঙ্গে Mysticism-এর গ্রন্থকর্ত্রী Miss Underhill লিখিয়াছেন—The imperative need is of union between man's separated spirit and the Real, his re-making in the interests of transcendent life, his establishment in that kingdom which is both 'near and far.'

তাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ওমার খায়মের রূপকাখ্যান স্মরণ করুন। পর্ব্বতের তুঙ্গ চূড়ায় অপরিসর সাধন-মন্দির। সুফি সাধক তাহার গর্ভগৃহে (Holy of holies-এ) প্রবেশের জন্য দ্বারে করাঘাত করিলেন—কারণ, 'Knock and it shall be opened to you'। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—কে তুমি? সাধক উত্তর দিলেন—'আমি'। 'আমি'! ফিরিয়া যাও—এখানে দুই জনের স্থান নাই।' সাধক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেলেন। অনেক বৎসর নিবিড় সাধনার পর আর একবার পর্ব্বতে উঠিয়া মন্দির দ্বারে করাঘাত করিলেন। আবার প্রশ্ন হইল 'কে তুমি?' উত্তর 'তুমি'। এমনি দ্বার উদঘাটিত হইল—ভক্ত ও ভগবান্ মিশ্রিত হইলেন।

ঐ মর্ম্মে জিমি লিখিয়াছেন—

And whoever in Love's city enters finds but room for one and in oneness union.

এ সম্পর্কে সুফি কবি আত্তর তাঁহার 'Colloquy of Birds'-এ এইরূপ বলিয়াছেন—

The questing Soul ultimately reaches the 'valley of *Annihilation of self*' where the theopathetic state is attained in which the self is *utterly merged*, 'like a fish in the sea, in the Ocean of Divine Love'.

We also read in the Voice of the Silence : Where is thy individuality, lanoo! where the lanoo himself? It is the spark lost in the fire, the drop within the ocean, the everpresent ray become the All and the Eternal Radiance.

তবে কি মহামিলনে ব্যক্তিত্বের আত্যন্তিক বিলোপ ঘটে? তা' কেন? এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতী ভক্ত মধুসূদন স্বরস্বতীর উক্তি শ্রবণ করুন—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ! তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ, ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥

অর্থাৎ 'ভগবান্ সমুদ্র, ভক্ত তরঙ্গ—তরঙ্গই সমুদ্রে অস্তমিত হয়, সমুদ্র তরঙ্গে নয়। মহামিলনে ভক্ত-ভগবানের ভেদ অপগত হইলেও ভগবান্ ভক্তের পরতন্ত্র হন না—ভক্তই ভগবানের পরতন্ত্র হয়।' সেইজন্য দেখিতে পাই যে,

Those who know assure us that the mystic experience ends with the words: 'I live, yet not I, but the God in me' (Recejac). So Bishop Leadbeater says : "The dewdrop slips into the shoreless sea, but is not lost

therein' and Krishnaji: 'Liberation is not annihilation...It is not entering into a mere void and there losing yourself...True there is no separate self, but there is the Self of all.'

অর্থাৎ মহামিলনে 'আমিত্বের' সম্প্রসারণ হয়—স্বাতন্ত্র্যের, ক্ষুদ্রত্বেরই নির্ব্বাণ হয়। 'It is the annihilation of selfhood—the doing away of separateness'। এ সম্পর্কে রাজকবি টেনিসন্ (ইনি একজন প্রগাঢ় মিষ্টিক ছিলেন) সমাধি-অবস্থায় আমিত্বের সম্প্রসারণ লক্ষ্য করিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য।

I have never had any revelations through anaesthetics, but a kind of waking trance—this for lack of a better word—I have frequently had, quite up from boyhood, when I have been all alone. This has come upon me through repeating my own name to myself silently, till all at once, as it were out of the intensity of the consciousness of individuality, individuality itself seemed to dissolve and fade away into boundless being, and this not a confused state *but* the clearest, the surest of the surest, utterly beyond words—where death was an almost laughable impossibility—the loss of personality (if so it were) seeming no extinction, but the only true life. I am ashamed of my feeble description. Have I not said, "the state is utterly beyond words?"

And thro' loss of self
The gain of such large life, as matched with ours,
Were sun to spark—unshadowable in words,
Themselves but shadows of a shadow world.

—The Ancient Sage.

অবশ্য, এরূপ ভক্তও আছেন যাঁহারা ঐমত সম্প্রসারণ সহিতে পারেন না। তাঁহারা রামপ্রসাদের সহিত-সুর মিলাইয়া বলেন,

চিনি হ'তে চাহি না মা, চিনি খেতে ভালবাসি।

তাঁহাদের পক্ষে ব্যবস্থা—হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুত্তমা। ভগবানের এরূপ আস্বাদনও বেশ বরণীয়। তাঁহাদের পক্ষ হইতে Julian of Norwitch বলিয়াছেন—

And we shall endlessly be all had in God, Him verily seeing and fully feeling, Him spiritually hearing and Him delectably smelling and sweetly swallowing.

এইরূপে যাঁহারা ভগবানের সহিত একাকার হইতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে "in that apparently selfless state, 'the I, the Me, the Mine,' though spiritualised, remain intact !" সেই জন্য বৈদান্তিকেরা 'নির্ব্বাণ মুক্তি' এবং 'নির্ম্মাণ মুক্তির' ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ মুক্তি = বিদেহ কৈবল্য—সে অবস্থায় নির্ব্বাণী অন্তরতম দহরকোশ বা জ্ঞান-দেহকেও বিশীর্ণ করিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে নিঃশেষে নিমজ্জিত হন। আর যিনি নির্ম্মাণমুক্ত, তিনি প্রেমরস আস্বাদনের জন্য 'নির্ম্মাণকায়ম্‌অধিষ্ঠায়' ব্যাবহারিক ভেদের গন্ধটুকু অবশিষ্ট রাখেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মিষ্টিকদিগের সাক্ষ্য এইরূপ :

Over and over again, the mystics assure us that personity is not lost, but made more real. Mechthild of Magdelburg, and after her, Dante, saw the Deity as a flame or river of fire that filled the universe, and the 'deified' souls of the saints as ardent sparks therein, ablaze with that fire, one thing with it yet distinct. Ruysbroeck, too, saw 'every soul like a live coal, burned up by God, on the hearth of His Infinite Love,' as petals of the sempiternal (everlasting) Rose.—Underhill p. 503.

সেইজন্য বলিতেছিলাম, এ ক্ষেত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত লইয়া বিতণ্ডা করা কেবল নিষ্প্রয়োজন নয়—বেশ অশোভন।

It is not proper, as I said, to dogmatize at secondhand and squabble about *Dvaita* and *Advaita* (Monism and Dualism) when fortunately for us, we have available the firsthand testimony of some of the greatest saints and seers, both of the East and of the West.—God as Love

অতএব বিতণ্ডার কণ্টকিত ক্ষেত্রে বিচরণ না করিয়া ঐ সকল মিষ্টিকের অনুভূতির আস্বাদন করা যাউক। প্রথম বৈষ্ণবদিগের কথা ধরুন। ইহারা খৃষ্টান-দিগের মত নিপট 'দ্বৈতী'—তথাপি বৈষ্ণব সাহিত্যে মিলনের উপর মিশ্রণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। চরিতামৃতে দেখিতে পাই শ্রীচৈতন্য-রামানন্দ সংবাদে, রাম রায় মহাপ্রভুর নিকট রাধাকৃষ্ণের 'বিলাসমহত্ত্ব' ও মিলনানন্দ বর্ণনা করিলে—

রাত্রিদিনে কুঞ্জক্রীড়া করে রাধা সঙ্গে
কৈশোর বয়স সফল কৈল ক্রীড়া রঙ্গে !

—চরিতামৃত

মহাপ্রভু বলিলেন

প্রভু কহে, এই হয় আগে কহ আর।
রায় কহে আর বুদ্ধিগতি নাহিক আমার॥
যে বা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় নাকি হয়॥
এত কহি আপন কৃত গীত এক গাহিল।
প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল॥

গীতম্

পহিলহি রাগ নয়ন রঙ্গ ভেল···
না সো রমণ না হাম রমণী
দুঁহু মন মনোভব পেশল জানি।

'না সো রমণ না হাম রমণী'—

অর্থাৎ, বঁধু সে আমার এক কলেবর
দুহুঁ সে একই প্রাণ*—চণ্ডীদাস

অর্থাৎ সে অবস্থায়

নিবে যাবে গ্রহ তারা, মিশাইবে ধরাকারা
জগতে রহিবে শুধু দুটি প্রাণ মিশিমিশি॥

বিষ্ণুপুরাণে দেখি, 'সুরনররিপু হিরণ্যকশিপু' আদর্শ ভক্ত প্রহ্লাদকে নাগপাশে বাঁধিয়া বক্ষে শিলা চাপাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে প্রহ্লাদ ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান নিবিড় হইলে তিনি প্রথমতঃ ভগবানের উদ্দেশে বলিলেন—

ত্বত্তঃ সর্ব্বং ত্বংহি সর্ব্বং ত্বয়ি সর্ব্বং সনাতনে—
'তোমা হ'তে সব, তুমি হও সব, তোমাতেই সব ওগো সনাতন'

কিন্তু ধ্যান যখন নিবিড়তর হইল, তখন প্রহ্লাদ দ্বৈতের বিগমে অদ্বৈত অনুভূতিতে নিমগ্ন হইয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' অনুভব করিলেন—

মত্তঃ সর্ব্বং অহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে—
'আমা হ'তে সব, আমি হই সব, আমাতেই সব, আমি চিরন্তন'

ভাগবতের রাস-পঞ্চাধ্যায়েও দেখি শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্ধান করিলে

---

* দেবী-ভাগবতে দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ ও বামাঙ্গ রাধা—এই ভাবে এক মিলিত মূর্ত্তির উল্লেখ আছে—নাম 'গোপালসুন্দরী'।

গোপীরা গভীর ধ্যানে তন্ময় হইয়া নিজেদের কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন ভাবিয়া তাঁহার লীলার অনুকরণ করিতে লাগিল।

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ। —ভাগবত ১০।৩০।১৪

কোন গোপী অপরার স্কন্ধে ভুজবিন্যাস করিয়া কৃষ্ণের ললিতগতির অনুকরণ করিতে লাগিল।

'কৃষ্ণোঽহং পশ্যত গতিং ললিতাম্ ইতি তন্মনাঃ।

অন্যা গোবর্দ্ধন ধারণের অনুকরণ করিয়া বলিতে লাগিল 'বর্ষা-বাতে ভীত হও কেন? এই আমি পরিত্রাণের উপায় করিয়াছি।'

মা ভৈষ্ঠ বাতবর্ষাভ্যাং তৎ-ত্রাণম্ বিহিতং ময়া।

কেহ যেন যশোদাকর্ত্তৃক উদূখলে আবদ্ধা হইয়া ভীতির অভিনয় করিতে লাগিল।

বদ্ধান্যয়া স্রজা কাচিৎ তন্বী তত্র উলূখলে।
ভীতা স্বদৃক্পিধায়াস্যং ভেজে ভীতিবিড়ম্বনম্॥

সুফিদিগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ প্রসঙ্গে একটি সুফি 'কেচ্ছা' (parable) বলি অবধান করুন। এক বুলবুল গুল্‌বদনা গোলাপবালার নিকট মধুর কণ্ঠে প্রেম নিবেদন করিতেছিল—

ও আমার গোলাপবালা!
তোল মু'খানি তোল মু'খানি
কুসুমকুঞ্জ কর আলা।

এক পতঙ্গ কিছুক্ষণ এক মনে শুনিল—পরে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল 'বাচাল! থাম্ থাম্! তুই প্রেমের মর্ম্ম কি জানিস্? আমার প্রেম দেখ্—আমার প্রণয়িনী দীপশিখা—আমি তার মাঝে ঝাঁপ দিই, পুড়ে পুড়ে খাক হ'য়ে যাই তবু তাকে ছাড়ি না। এমনি আমাদের গভীর একত্ব!' ঠিক্ কথা। তাই রুমি বলিয়াছেন—

The lovers who dwell within the sanctuary are moths burnt with the torch of the Beloved's face.

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল এইখানেই সাঙ্গ করি। আগামী বারে খৃষ্টীয় মিষ্টিকদিগের অনুভূতির কথা এবং মহামিলন সম্পর্কে অবশিষ্ট কথা বলিব।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

আবর্ত্ত

(১১)

আকাশে ছোট-বড় কত তরঙ্গ ছোটাছুটি করে। আধারের শক্তি অনুসারে সেগুলি রূপায়িত হয়। খগেনবাবু ও রমলাদেবীর ভাবতরঙ্গ সুজনকে আঘাত করে, কিন্তু সহজে গৃহীত হয় না, সুজনের চঞ্চলতার সঙ্গে কাটাকুটি হয়ে যায়। রমলা-দেবী ও মাসীমার সম্বন্ধ সে ধারণ করতে পারে। প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বন্দ্বে সেটি স্বতই পরিস্ফুট। মাসীমা রমলাদেবীকে স্বীকার করতে পারবেন না। কিন্তু মাসীমারই পরাজয় হবে, কারণ মহাকাল তাঁর বিরুদ্ধে, কেবল প্রবৃত্তি নয়। অথচ, মাসীমারই দিকে সভ্যতার, অর্থাৎ সংযমের সমর্থন। সুজনের প্রতীতি জন্মায় যে খগেন বাবু রমলা দেবীর আগ্রহের একটানা স্রোতে নিমজ্জিত হবেন, এবং সে কূলে দাঁড়িয়ে দুজনেরই আত্মহত্যা দেখবে। বিজনের সোশিয়ালিজম আর খগেনবাবুর নৈর্ব্যক্তিকতার সাধনা এক বস্তু নয়। বিজনের সম্মুখে সর্ব্বনাশ, সে পুরাতনকে অগ্রাহ্য করে নতুনতর সমাজ সৃষ্টি করবে। খগেনবাবু চান মুক্তি। কিন্তু বিজনের মধ্যেও সংস্কার বর্ত্তমান, নচেৎ বিজন, সেই বিজন, সেই ছোট্ট বিজন, আজ না হয় সে কলেজে পড়ে, টেনিস খেলে, দেশের চিন্তা করে, সেই বিজন কেন তাকে রমলা-দেবীর কাছ থেকে টেনে নিয়ে যেতে চায় ? বলে গেল কোলকাতা পালিয়ে যেতে, বলে গেল, 'পারবে না।' স্নেহের দোহাই পর্য্যন্ত দিলে। প্রেম তার সমাজে থাকবে না এই কারণে নিশ্চয় নয়। ওটা কেবল যৌবনসুলভ রুক্ষতা। সেও ত' কত আদর খেয়েছে তার আদরের রমাদির কাছে। সে-রাত্রের আদরের স্মৃতি সুজনের দেহকে রোমাঞ্চিত করে। খগেনবাবু যখন আসেননি তখন মনে হত যে তাঁকে রক্ষা করা সহজ। কিন্তু রমলা দেবীর প্রবৃত্তিকে সে চিনেছিল। সে-রাতে সে তাঁর কাছে খগেনবাবুর প্রক্সি হল। পরিবর্ত্তে, চেঞ্জলিং, পরীতে সত্যকারের খোকাকে মায়ের কোল থেকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে, রেখে গেছে বোবা-খোকাকে। কিন্তু খগেন বাবুর সাধনা নিষ্ফল হয়েছে। কোথায় গেল তাঁর সাধনা, কোথায় তাঁর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, কোথায় তাঁর শিক্ষাদীক্ষা। রমলাদেবীর সাধনা যাকে

চাইছেন তাকে পাওয়ার, বোঝা যায়, খুব সোজা, কিন্তু খগেনবাবু কেবল নিজেকে ঠকিয়েই এলেন।

রমলাদেবী ডেক্ চেয়ারে শুয়ে ভাবেন তিনি আজ জয়ী। অথচ জয়ের আনন্দ অনুভব করতে পারেন না। খগেনবাবুর উজ্জ্বল সাড়ি, হাত ও গলাকাটা জামা পছন্দ না হওয়ার কারণ সন্দেহ করে লজ্জিত হন। বাড়ি এসেই টান মেরে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু থাক্, হয়ত পরে, নেহাৎ না হয় অন্য কাউকে দিলেই চলবে, নষ্ট করে লাভ কি! তাঁর সঙ্গে উচিত ব্যবহারই করেছেন। খগেনবাবুর স্বীকারোক্তি শুনে নিজেকে কঠিন রাখতে পেরেছেন এই যথেষ্ট। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, প্রলুব্ধ হয়ে যদি খগেনবাবু তাঁকে গ্রহণ করতেন তবে গৃহীতার জয়মহিমা বিজিতের বিষাদে মলিন হত। কোথায় কখন কে জেগে ওঠে কেউ জানে না। সুজন কি জেগেছে? তার ব্যবহার অপ্রত্যাশিত মনে হয়। কিন্তু কোনো অভিসন্ধি ছিল না···কেন সে চিরকাল কচি থাকবে! গ্রামোফোনের রেকর্ডে কি কখনও পিন বসবে না। তাঁর কোনো দোষ নেই। রাগ হয় মাসীমার ওপর, মুকুন্দ'র ওপর। ওরাই কেড়ে নিতে চায়, সকলকে বঞ্চিত করতে চায়। খগেন বাবুকে ভয় করে, যে-রকম মানুষ! তাঁর আত্মসংশোধনের প্রবৃত্তি দুর্ব্বলতার নামান্তর, আত্ম-বিশ্বাসের অভাব। সে অভাব দূর করতেই হবে, সে দুর্ব্বলতা বিতাড়িত করার সামর্থ্য রমলাদেবীর আছে বিশ্বাস হয়। তখন, বুকের ওপরকার জগদ্দল পাথর সরে যাবে, অশৌচের পর শীতল জলে অবগাহন করে শুদ্ধ হবেন, দুর্গের অবরোধ ঘুচবে, দুর্গাধিপতি সসম্মানে বহির্গত হবেন। মাসীমা বর্জ্জন করবেন, তবু তাঁরা সুখী হবেন। স্থিরসঙ্কল্পে রমলাদেবী চেয়ার থেকে উঠে স্নানের ঘরে যান। বড় আরশী না থাকলে নানা অসুবিধা। ছোট আরসীর সামনে মুখ আনেন, কৈ চোখের কোনে চামড়া এখনও মসৃণ রয়েছে ত'। বিজন কেন ভয় দেখালে? সে কি চায়? তার সমাজে রমলা দেবীর কি স্থান হবে? হবে একমাত্র তাদের যাদের গঠন সুদৃঢ়, ত্বক মসৃণ, জল পড়লে পিছলে যায়। তারা কি রঙের সাড়ি, কি জামা পরবে? সব সাদা, মোটা খদ্দর। পোড়াকাট সব। রমলাদেবীর বুক কেঁপে ওঠে।

খগেনবাবুর চিত্তে কোনো শান্তি নেই। আত্মশুদ্ধির অস্বাভাবিক প্রচেষ্টায় আত্মম্ভরী হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন নৈরাত্মবোধের সঙ্কল্পে চিত্তকে বহির্মুখী করাই

তার একমাত্র প্রতীকার। অন্তঃশীল প্রবাহকে বহির্মুখী না করলেই মজে যায়, অথবা আবর্ত্তের সৃষ্টি হয়। এ কি হল। এতদিন সংস্কারের মূলধন ভাঙ্গিয়ে চলল, আজ একটিকানাকড়িও নিজের হাতে নেই, যা বাকী ছিল সব গচ্ছিত রাখলেন, বাঁধা পড়ল রমলার হাতে। এখন সব তারই। তারই শক্তিতে চালিত হবেন ভাবতে আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। অতএব তার শক্তিকেও ঘোরাতে হবে, চালাতে হবে সকলের মধ্যে। সাবিত্রী কোনো সমস্যাই তোলে নি। রমলা সজীব, তাই সমস্যা সৃজন করে। চিত্তধর্ম্মী ও প্রাণধর্ম্মী মানুষের সহযোগ কি বহির্মুখী সাধনার প্রতিকূল? এতদিন তাই হয়ে এসেছে। সম্পত্তিজ্ঞানের ওপর মিলনকে প্রতিষ্ঠিত না করলেই চলল। পারা যাবে? রমলার দিকে চাইতে চাইতে অক্ষয় গলিতে ঢুকল, রাগ হল কেন? ঘাটের লোক হাঁ করে চাইছিল, খারাপ লাগল কেন? ওরা অসভ্য। না, না, শিক্ষার অভাবে অসংযত। কেনই বা শিক্ষার তারতম্য হয়? সমাজের দোষে। তাই বিজনের স্বভাব অপরিণত হলেও তার পরিণতির মূলধর্ম্মটা ঠিক। প্রকৃত মিলন সম্ভব। কেন হবে না? সম্পত্তিজ্ঞান যদি প্রাকৃতিক হত, তবে হয়ত অসম্ভব হত। মিলও প্রাকৃতিক। সেটা মানুষের রচনা, তাই নতুন শক্তিতে অনুষ্ঠানও বদলে যাবে। যথার্থ মিলনের জন্যও সামাজিক পরিবর্ত্তনের শক্তিকে সাহায্য করতে হবে। তখন, মিলন হবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সুর ও কথার মিলন, রবীন্দ্রসঙ্গীত, দুএ মিলে তৃতীয়। অতএব যে-শক্তিতে সম্পত্তিজ্ঞান লোপ পায় তারই মধ্যে নবতর সৃষ্টির বীজ রয়েছে। বিজন হয়ত বোঝে নি। তাতে কি আসে যায়! পরে বুঝবে, অন্ততঃ তাই বোঝা উচিত।

নতুন স্তরে অন্যের সঙ্গে মিলনে রমলা কি বাধা দেবে? যেমন সাবিত্রী দিত? না, রমলা দেবে না, এ-রমলা তখন থাকবে না, সে নিজেই অন্য হবে। অন্যের হবে? অত ভাবা যায় না! সুজনকে একবার ক্যাট্যালিটিক এজেণ্ট বলেছিলেন। সুজনের সমগ্র জীবনটাই মৈত্রীস্থাপনার সেতুস্বরূপ। যেন সন্দেহ হয় সে-সেতু আজ দুর্ব্বল হয়েছে। দুজনের পদচারণার কম্পনের লয়ে সেতুটি কি ভেঙ্গে যাবে? পদার্থবিজ্ঞানে একটি দৃষ্টান্ত আছে। সুজন যদি মানুষ হয় তবে সে ভাঙ্গবে না। বিজনের ধাতু কঠিনতর। দেখতে ইচ্ছে হয় তার দৃপ্ত যৌবনকে। হয়ত তার পনের আনাই সখ, তবু সখেরও সাহস আছে। বিবেকানন্দের আত্মা তাঁর ওপর ভর করুক, পরিণতির নীতিতে চলবার সাহস আসুক। মাসীমা রমলা

দেবীকে কি-অমন অপমান করলেন? রমলা দেবীকে তিনি চেনেন না, তবু কেন অপমান? কিসের পূর্ব্বাভাস? তবু মাসীমা ভাল বাসেন, এখনও। রমলা দেবীরই বা ভয় কিসের?

মাসীমা ঘুমোন। নিদ্রা গভীর হয় না এই বয়সে। বুকের মধ্যে ধড়াস করে ওঠে, সেই আগেকার মতন, যখন বয়স ছিল কম, ছিলেন সধবা, বৈঠকখানা কি বাগানবাড়ি থেকে শুতে আসতে কর্ত্তার দেরী হত, সদর মহলের বড় ঘড়িটা ঢঙ্ ঢঙ্ করে বুকে ঘা দিত, আস্তাবলের ঘোড়াগুলোর পায়ের খট্ খট্ শব্দ শোনা যেত, একটার সর্দ্দি লেগেই থাকত, ঘুমুত না যতক্ষণ না কাল ঘুড়িটা ট্যাণ্ডামে বাবুকে এনে কাঠগড়ায় না ফেরে···উনি তখনও অন্দরে আসতেন না, আসতেন আরো ঘণ্টা খানেক পরে, বুক ধক্ ধক্ করত ততক্ষণ, নিদ্রার ভাণ করতেন, কখনও ডেকে তুলতেন, কখনও জামা না ছেড়েই এলিয়ে পড়তেন. তারপর নিজে ভোর বেলায় ঘুমুতেন।···অভিমান কার ওপর! বুকের অসুখ সেরে যায় কোলকাতায় আসার পর···খগেন জোর করে ওষুধ খাওয়াত, বিধবাদের অমনি সারে···কাশীতে এর পূর্ব্বে বুকের কষ্ট হয় নি, আজ আবার কে যেন ধাক্কা দেয়, ঢঙ্ ঢঙ্ করে ঘণ্টা বাজে, খট্ খট্ শব্দ শোনা যায়, ওষুধ খাবেন না কিছুতেই···তার চেয়ে এক গেলাস জল খাবেন···ধক্ ধক্, কে রে! খগেন? আয়। মাসীমা উঠে এক গেলাস জল ঢক্ ঢক্ করে খান।

দীপা ঘুমোয় পুতুল কোলে নিয়ে। পুতুলের নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। মাথা ব্যথা করছে খুকু? কাল সকালে ওষুধ দেব, লক্ষ্মী আমার···এই ওষুধ খাও, মোটে তেতো নয়, নাক টিপে ধরছি···অক্ষয় এসে খুকীর গায়ে চাদর ঢাকা দেয়। অক্ষয় একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে বসে। খগেনবাবু তাকে দেখতে পেয়েছে। কি হয়েছে! সঙ্গে ছিলেন কে? চাঁপা রঙের শাড়ি পরা? সুজনও ভেতরে ভেতরে মজা লুটছে···বেশ ছোকরা? মুখেই যত গোঁড়ামি! খগেনবাবু লোকটা ভারি দাম্ভিক। বিজন ছোকরার ভিৎ কাঁচা, কোন দিন ধসে যাবে। ছোকরার স্বাস্থ্য ভাল—কিন্তু আগুন নিয়ে খেলছে। বিয়ে থা' করলে সেরে যাবে বদ্‌খেয়াল। দীপার একটু বয়স বেশী হলে বেয়ে চেয়ে দেখা যেত। অক্ষয় সিগারেট শেষ করে বিছানায় যায়—গিয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।

মাসীমার বুকের ধক্‌ধকানি ধাক্কা দেয় সুজনের মস্তিষ্কে।

ভীষণ পার্থক্য বৃদ্ধার আকুলতার সঙ্গে রমলা দেবীর অধৈর্য্যের। একজন ছেলের বিবাহ দিলেন, না জেনে যে ছেলে চিরকালের জন্য পর হয়ে যাবে···। অস্বীকার করলে কি হয়? মাসীমা নিশ্চয়ই পরে বুঝেছিলেন বিবাহ দিলেই নিজের প্রিয়জন পর হয়; তখনও নিশ্চয় ধারণা ছিল বউ রক্তমাংসের পুতুল, সংসার করা পুতুল খেলার সামিল। সেই সকাল থেকে দুধ না খেয়েই সাজান গোজান, তত্ত্ব পাঠান, ছেলে আর ছেলের বৌ নিয়ে। সংসার সেই শিশুকালের গৃহিণীপণারই রাজকীয় সংস্করণ। ক্রমে, বৌমা ছেলের ঘরে যায় দুপুর বেলাতেই, ছুতো করে যখন তখন দেখা করে, পান সেজে লুকিয়ে খাওয়ায়। রোজই বন্ধুর বাড়ি খেয়ে আসে, তাই রাতে খায় না। রাগ হয় না খেলে—আবার হাসিও পায়। হাসি পায় নিজেদের কথা মনে হয়ে···সেই প্রথম, প্রথম! সকলেরই এমনি হয়··· মাসীমা ভিন্ন নন্। গৃহিণী পাড়াপড়শীর কাছে গরব করেন, 'আমার ছেলে এখনও আমার রান্না ছাড়া খায় না,শ্বশুর বাড়ি যেতে চায় না,অথচ বৌকেও খুব ভালবাসে'— কথাগুলি বলে গৃহিণী জোরে হাসেন, লুকানো ব্যথা গোপন করতে, পরের কাছে নীচু না হতে। প্রেমেন মিত্রের অনাবশ্যক-গৃহিণী সার্ব্বজনীন। মাসীমার সংযম হয়ত একমাত্রা বেশী, মুকুন্দ তাই বল্লে, 'উনি বরাবরই কেমন অমনি-ধারা।' সেই ছেলে শ্বশুর বাড়ি যায়, শ্বশুর-শাশুড়ির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, অবশ্য বেয়ান ঠাকরুণের চিঠি তাঁরই কাছে গোড়ায় আসে। অন্য চিঠিও আসে, বৌমা যখন বাপের বাড়ি থাকেন, দেখতে ইচ্ছে হয়, লজ্জা আসে, পাছে কর্ত্তা ও ছেলে টের পায়, পাছে সেই কাঁচা বাঁকা লেখার প্রমাণ থাকে ছেলে অন্যের হয়ে গিয়েছে। নিশ্চয়ই মাসীমার ও-রকম ইচ্ছে হয় নি, কিন্তু সাধারণের হয়। ভয়ে আসে হিংসে, রাগ, বেয়ানের ওপর—বশীকরণ মন্ত্র জানে ও-দেশের মেয়েরা, বেয়ানের বয়স কম, বৌমাই প্রথম সন্তান। গৃহিণী নিজেই একদিন সেজে কর্ত্তার সামনে হাজির হন, কর্ত্তা দেখে ঠাট্টা করেন। অভিমানে পুরানো দামী সাড়ি আর পরা হয় না, বৌমাকেই দেবেন, সাধে, খোকা হলে···সবই তার, যদি পছন্দ হয়, আজকালকার ঠুন্‌কো মেয়েদের যা ফিন্‌ফিনে রুচি! ছেলে বৌ ঘর-কন্না করুক এবার। বৌমার হাতেই চাবি থাক, প্রথমে নেবে না, নিয়ে কলতলায় ফেলে আসবে, পরে, চাবি না হলে সাড়ি পরা হবে না। ক্রমে একটি মেয়ে, আরেকটি ছেলে। মাসীমার নাতি হলে তাঁর কাশী আসা হত না। ভিন্ন ধারাতে সকলের জীবন্ চলত, সাবিত্রী দেবী মরতেন না,

খগেন বাবুও গৃহস্থ অধ্যাপক হতেন। আর রমা দেবী! বোধ হয় তাঁর মা না হওয়াই ভাল হয়েছে। মা-জাতের কত সহ্য! খগেন বাবুর সন্তান হলে তারা তাদের ঠাকুমার কাছেই থাকত। ঠাকুমা ভাবতেন নাৎনীকে সংসারের কাজ শেখাবেন, বৌমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠতেন, খুকী চুল বেঁধে যা। ইচ্ছা হত নাৎনী পূজোর যোগাড় শেখে, খগেন বাবু বলতেন খুকী পড়বি আয়। নাতির ওপর জোর খাটে না, যতদিন শিশু ছিল ততদিন সরষের তেল মাখাবার, তুলসী পাতা মধু, চূণের জল, চিরেতা খাওয়াবার দরকার পড়ত—তাও ডাক্তারে ঘুচিয়ে দিলে, এখন অসুখ করলে ওষুধের বোতল আসে, বাবা নিজে খাওয়ায়। নাতি বড় হল, এখন কেবল পড়ে ভূগোল, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, জমায় ডাকটিকিট, ঠাকুমার উচ্চারণে, বানামে, জ্ঞানে ভুল ধরে। বড় ভাল লাগে, আরো মধুর লাগে যখন ঠাকুমার বিছানায় বসে দুলে দুলে রামায়ণ-মহাভারত পড়ে, আর পড়ায় বিজ্ঞানের কথা, সূর্য্য চন্দ্র তারা কি ভাবে চলে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ আছে কি না, চন্দ্রে খাল আছে তারখবর দেয়। দিতে দিতে সেই খাটেই নাতি ঢুলে পড়ে। বৌমা এসে বকেন, ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে রেখে দুধ খাইয়ে দেন···চমৎকার মিষ্টি আর দুষ্টু দেখায় নাতিকে···চাকরে ঘরে তুলে নিয়ে যায়। নাতি-নাৎনী দূরে সরে যায়, ছেলে পর হয়ে যায়···গৃহিণী, সকল গৃহিণী সকলের শেষে ঘুমিয়ে পড়েন।

কেউ অবহেলা সহ্য করেন, তাঁরা জনক রাজার সন্তান। কেউ বা পূর্ব্ব থেকেই সরে যান···যেমন মাসীমা···এঁরা বুদ্ধিমতী, চরিত্রবতী, দৃঢ়চেতা। যাঁদের অন্তর শূন্য, তাঁরা গুরুর কাছে শক্তি উচু হারে কর্জ্জ নেন। বিধবা হলে কাশী-বাসিনী হবার সুবিধা হয়। স্বামী যদি গৃহিণীর নামে পৃথক কিছু রেখে গিয়ে থাকেন তবেই ভাল, নচেৎ মাসের শেষেও টাকা আসে না। মাসীমার বল কোথায়? খগেন বাবু নিজের পেটের ছেলে নয় বলে? টাকার জোর? নাতি নাৎনী হয় নি তাই? কি করে মাসীমার এই তেজ আসে যার দাপে খগেন বাবুকে ভালবেসেও ত্যাগ করতে পেরেছেন, এলে যত্ন করেছেন, অথচ নিরাসক্ত ভাবে?

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, বিদ্যুতে ভরা, পূবে হাওয়ার এক ঝলকে পরিষ্কার হয়। সুজন এখন ভাবতরঙ্গ স্পষ্টভাবেই ধরতে পারে।

মাসীমা দাঁড়িয়ে আছেন কোন এক সংস্কারের ওপর। তাঁর তেজ ও রমলা দেবীর তেজে কত প্রভেদ! তাঁর বিরক্তি আর রমলা দেবীর বিরক্তি ভিন্ন জাতের।

মাসীমা সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েও স্বাধীন। পাঁকাল মাছের মত তাঁর জীবন, কাদায় থেকেও গায়ে কাদা লাগে না। রমলা দেবী একটি সম্বন্ধ ছিন্ন করেছেন অন্য একটি মনোমত সম্বন্ধে জড়িত হবার জন্য। খগেন বাবুর নিজের নিরলম্বতা নিরর্থক, সে-কেবল অবলম্বনহীনতা, তাই তাঁর অক্ষমতা রমলা দেবীর কাছে ধরা পড়ল। তিনি একলা থাকতে পারবেন না, তাঁরও সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। হাতের কাছে এই সহজ, পুরাতন, সামাজিক সংস্কার রয়েছে, তাকে ভেঙ্গে নতুন সংস্কারের কি প্রয়োজন? এক জীবনে সম্ভব? পুরাতনে নাটকত্ব নেই বলে? জন্মদিনে, নববর্ষে, উপনয়নে, বিবাহে জীবনের সব পর্ব্বেই কি ঘটা করে নতুনের বোধন করা চাই? নীচে দিন, বরষ, জীবন একটানাই বইছে। সেইটাই মূল সত্য, তাই সংস্কার, ওই সাধারণ। মাসীমার জীবন তারই সুরে বাঁধা, তাই বিপর্য্যয়ের মধ্যেও তাঁর শান্তি অক্ষুণ্ণ। রমলা দেবীর, খগেন বাবুর প্রত্যেক ব্যবহারে ঝাঁজ, উগ্রতা, খরতা, পৃথিবীর ওপর যেন ভীষণ আক্রোশ। জগৎ চলছে ছাড়া আর কি দোষ করেছে? নিজের নিজের দুর্ব্বলতা ঢাকবার জন্যই অত আয়োজন, এত অপচয়—বনেদী বংশের অধঃপতন ঘটেছে, ধারে মাথার চুল বাঁধা, চৈত্রের কিস্তীতে বসতবাটি পর্য্যন্ত লাটে উঠবে···তবু কালি পূজোর রাতে একশ' ছাগল বলি চাই—সেই বলির বাজনা বেজেছে। সংস্কার ভেঙ্গেছে তাই সকলের প্রাণে ব্যাকুলতা, শান্তি কোথাও নেই, না আছে সাহিত্যে, না আছে চিত্রে, না আছে দর্পণে, নেই খগেনবাবুর মনে, নেই রমলা দেবীর প্রাণে। এটা যুগধর্ম্ম। মাসীমা সে-যুগের, খগেনবাবু রমলা দেবী এ-যুগের। বিজন ভবিষ্যতের। সুজন নিজে কি?

কিংবা হয়ত মাসীমা ও রমলা দেবীর ধর্ম্মই পৃথক। দুজনের আকর্ষণ এক হতে পারে না, মাসীমা জননী, রমলা দেবী প্রিয়া। কামই কি যত গোল বাধায়? সামাজিক ব্যবহারে তার স্থান কোথায়, কতটুকু? একজন পণ্ডিত বলেছে বলেই তাকে প্রাধান্য দিতে হবে! ভারতীয় সমাজে কামকে সংযত করা হয়েছে, উড়িয়ে দেওয়া হয় নি। সংযমের আইনকানুন না হয় বদলাক, কিন্তু সংযমকে পরিত্যাগ করতে হবে? সভ্যতার এত বড় মূলমন্ত্রকে বাদ দেওয়া যায় না। ব্যক্তিগত জীবনের কোনো অধ্যায়ে ঐ রিপুটি হয়ত নায়ক হয়ে উঠল, কিন্তু সমগ্র বইটা পড়ে রয়েছে যে! রমলা দেবীর জীবনে না হয় দেহের ক্ষুধা মেটেনি, খগেনবাবুরও নয়। কিন্তু খগেনবাবুর কোনো আচরণেই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে কাম অবদমিত

হয়েই তাঁর আত্মসন্ধানের প্রবৃত্তিকে সদাজাগ্রত রেখেছে। রমলা দেবীর সে রাতের আচরণকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ? সে-রিপু হয়ত আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রসার। শক্তিরূপিনী রমা দেবী, জয়লিপ্সাই তাঁর প্রবৃত্তি। কিন্তু কি হবে জয়লাভ করে ! জীবজন্তুরও ও-প্রবৃত্তি থাকে। হলই বা সাধারণ, সনাতন, তবু, কি লাভ ! সুজন শ্রান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে।

বিজন আজ ঘুমুতে পারে না। সভায় প্রস্তাব করেছিল মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত করতে। সভাপতি, স্বামীজি, কড়া মন্তব্য করেন। স্বামীস্ত্রীর বিশুদ্ধ সম্বন্ধ নিয়ে অনেক ওজঃস্বিনী বক্তৃতা বিজনকে শুনতে হয়। তার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল। সোশিয়ালিষ্ট দলের এ-সব কি কথা ! তখন বিবাহ ছিল পরিবারের সঙ্গে পরিবারের। যন্ত্রের প্রথম যুগে বিবাহ একজনের সঙ্গে অন্য জনের। স্বাতন্ত্র্যই তার প্রাণ। কিন্তু আজ সেই প্রাণই রক্ষা হয় না। মেয়েরা যে গিলে খেতে চায়। ও মেয়েটা যেন পেয়ে বসেছে। ব্যাপারটা অত সোজা নয়। মাত্র একজনের, আর কারুর নয়, অর্থাৎ সম্পত্তি, জড় পদার্থ, তাই সম্বন্ধ কেবল শুষে নেবার, অন্যে আবার যেন না নিতে পারে। তাই এত হিংসে দ্বেষ, তাই অত 'প্রেম'। খগেন বাবুর স্ত্রীটা মরেই গেল প্রেমের চোটে। প্রেম বনাম সম্পত্তি, নিজের সম্পত্তি, তার ওপর একাধিপত্য। তাই লুকিয়ে প্রেম করতে হয়, চালাকি করে এগুতে হয়, তাই এত লুকোচুরি। সেই জন্য প্রেম ছাড়া কবিতা হয় না, নভেল হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ রোম্যান্টিসিজমের গোড়া, সমাজ যখন ভাঙ্গে তখনই সাহিত্যে রোম্যান্টিক মনোভাব প্রকাশ পায়।

তখনকার সমাজ কি ভাবে চলত ? সমাজ স্বামীস্ত্রীর সম্বন্ধের ওপর কখনও থাকে নি, থেকেছে বড়লোক গরীব লোকের বিরোধকে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টার ওপর। দুটো বরফের টুকরো যেমন জুড়ে যায় তেমন ভাবে কখনও কোনো সমাজে কোনো দুটি প্রাণী এক হয়ে যায় নি। সমাজের ভেতর দুটি দেবতা বাস করে স্বামীজী বললেন, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সেই হিসাবে ধর্ম্ম হোলো বিষ্ণুমায়া, স্থিতির ওপর গিল্‌টি। সেইটাই আচার, সংস্কার। কিন্তু এখন সোনালি আবরণ খসেছে, লোহা বেরিয়েছে, সংস্কার এখন শৃঙ্খল। শৃঙ্খল কিভাবে ধারণ করতে পারে ? ভাঙ্গাবাড়ির অশত্থগাছ ইটকাটগুলোকে যেমন ধূলিসাৎ হতে দেয় না। কিন্তু ঝড় আসেই আসে, মহেশ্বর ক্ষেপে ওঠেন, তখন রক্তের অণু পরমণুতে ভাঙ্গনের নাচন

লাগে, ভূমিসাৎ প্রাসাদের ধূলিই তাঁর বিভূতি, তাঁর এক পা ঊর্দ্ধে, অন্য পায়ের ভারে মেদিনী কাঁপে, ডমরুনিনাদে তেত্রিশ কোটি দেবতা মূর্চ্ছা যান। ব্রহ্মাও ভয়ে জড়সড়। ধ্বংসলীলার শেষাঙ্কে ব্রহ্মা আসেন সৃষ্টি করতে। সৃষ্টির আগমনবার্ত্তা শঙ্কর শিঙ্গায় প্রচার করেন বলেই তিনি শিব। খগেন বাবু কোন দেবতার উপাসক? সুজনদা সকলের কল্যাণ চায়, কিন্তু যে-স্তরে ধ্বংস সে-স্তরে মঙ্গল অসম্ভব। অন্য স্তরে আরোহণ করতে হবে। ব্যক্তিত্ববোধ, প্রেম, রোম্যান্টিসিজম ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। সুজনদা একি করলে! সে চলে আসুক রমাদির কাছ থেকে, কোলকাতায়।

বিজনের তীব্র বাসনায় সুজনের মানসিক গতিতরঙ্গ কক্ষচ্যুত হয়। বিজন চাইছে নতুন সমাজ, যেখানে স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকবে না—বেশ, বেশ, তাই হোক বিজন, সেই নেভি-ব্লু সার্জ্জের নাবিকের পোষাক পরা ছোট্ট বিজন···তার এত টান! কিন্তু সে কি করে বুঝবে সে যাত্রীকে যাকে সঙ্গীরা ফেলে দিয়ে এগিয়ে গেল? সে যে একলা হতে বাধ্য, যে পড়ে রইল তার স্বাতন্ত্র্যই ভয়ঙ্কর। চলবার পথে ভাই ভাই, কিন্তু যে চলছে না, তার কি দশা? বিজন বোঝে না, বুঝতে পারে না। অভিমানের মেঘ আকাশে জমে ওঠে। বিজনের বার্ত্তা শোনা যায় না।···এ দেশের এ-যুগের বিপদ এই যে একই মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্ববোধ চাই, আবার সাধারণের সাথে সংযোগবোধও চাই। চলার পথে ব্যক্তি সকলের সঙ্গে মিশবে, ব্যক্তিত্ব বর্জ্জিত হবে, সব মানুষই হবে পুরুষ। খগেনবাবু তাঁর চিঠিতে এই কথাই লিখেছিলেন। তাঁর ভাষায়, এই পুরুষসিদ্ধি। কিন্তু তাঁর বুদ্ধি ও ব্যবহারে এত পার্থক্য কেন? রমদেবী বল্লেন, 'আমরা বেড়াতে যাব ··।' কে বাধা দিচ্ছে। খগেন বাবুও কিছু বললেন না। ওঁরা দুজনে এক হলেন, পৃথিবী স্বতন্ত্র হল, বাতিল পড়ল। কিন্তু খগেনবাবু তখন ঠিকই লিখেছিলেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ না ঘোচালে নতুন যুগে নতুন স্তরে যাওয়া যাবে না। রমাদেবীর প্রবৃত্তি, তাঁর আকাঙ্ক্ষার উগ্রতা তাঁকে জড় থেকে ব্যক্তিতে পরিণত করেছে। তারপর? খগেন বাবুর সকল সাধনা পণ্ড করে দুজনে আবার সেই দুটি পৃথক জীবেই পরিণত হবেন। খগেন বাবুর বহির্মুখী হওয়া অসম্ভব। রমলা দেবী এখন নিজেকে ভুলে পরকে চাইছেন, পাওয়ার পর যে কে সেই। তার চেয়েও খারাপ। সর্ব্বনাশ এই মিলন। কাশী অতি ভয়ঙ্কর স্থান। সে নিজেই ত' কাশী আনলে রমলা দেবীকে। কাশী না এলে অন্য রকম হত।

অনেক রহস্য আছে কাশীর অলিগলিতে, বড় রাস্তায়, চা-এর দোকানে। এখানে জীবন মৃত্যু গোপনে চলে। এ রহস্যের কোন দৃশ্যে রমলাদেবী ও খগেন বাবু অভিনয় করবেন? টুকরো টুকরো স্মৃতির তরঙ্গ ধাক্কা দেয়। কতবার সুজনের গা ছম্ ছম্ করেছে সর্ব্বনাশের ইঙ্গিতে। এক সন্ধ্যায় সে ঘাটে বসে আছে, রাত বোধ হয় দশটা, রমলা দেবীকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে অক্ষয়ের সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পাবার দরুণ ঘাটে এসেছে। ঘাটে লোকজন নেই বল্লেই হয়। পাশে দুজন ছেলে এসে দাঁড়াল। যেন তাকেই লক্ষ্য করছে। একজন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, দেশলাই আছে? নেই শুনে তারা চলে গেল। একটি মেয়ে এল, সর্ব্বাঙ্গে চাদর জড়ান। সুজন মুখ ফেরালে। দূর থেকে চাপা গলায় ডাক এল··· ইস্···এইখানে। মেয়েটিও তাড়াতাড়ি চলে গেল···তারপর জোরে জোরে বাঁশি বাজল, পুলিশ পাহারা ছুটল, ইন্‌স্‌পেকটার ছুটলেন, চক্ চক্ করে উঠল তাঁর হাতের পিস্তলটা·· সর্ব্বনাশের খেলা···সকালে হৈ চৈ সারা সহরে, শস্ত্রবাদীর দল আরেকটুকু হলে ধরা পড়ত।

আরেক দিন বাঙ্গালী টোলার গলিতে। সুজন এই পাড়ার নাম শুনেছে অনেক। ছেলে বয়সে লুকিয়ে পড়া ডিটেকটিভ গল্পের নায়ক বিখ্যাত জুয়াড়ি, খুনে, সুদর্শন, দয়াশীল, দুঃসাহসী, ধনী রোসনলালের কীর্ত্তিকলাপ এই পাড়াতেই। মেয়েরা তাকে দেখে আত্মসংযম করতে পারত না। সে বাংলা বলত বাঙ্গালীর মতন, বৃদ্ধাদের মা বলত, মাসের শেষে লুকিয়ে টাকা দিত, সিকরোলের বড় বাবুদের কাছে থেকে ছিনিয়ে এনে, আশ্রিতদের বিপদ থেকে উদ্ধার করত, ছাতের ওপর দিয়ে সারা পাড়া ঘুরত, হাতে থাকত ছোট লাঠি আর বাঁশি, কোমরে পিস্তল আর ছোরা···এই রোসনলাল শেষে বিখ্যাত ডিটেকটিভ অমরেন্দ্রপ্রসাদের হাতে ধরা পড়ল—তখন রমণীদের কি করুণ বিলাপ ..একজন এসে অমরেন্দ্রপ্রসাদের কাছে আত্মবলি দিতে চাইলে, কিন্তু সচ্চরিত্র ডিটেকটিভ, এবং বাঙ্গালী, তাই চোখের জল মুছতে মুছতে রোসনলালকে শ্রীঘরে পাঠালেন···কিন্তু রোসনলাল যে বৃদ্ধাকে মা বলত তাকে বরাবরই অমরেন্দ্রপ্রসাদ সাহায্য করতেন। সে বৃদ্ধা থাকতেন এই গলিতে।

বাঙ্গালী টোলার গলিতে সুজন রমলাদেবীর বাড়ি খুঁজতে যায়, সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ, সুজন দেখলে একটি ছেলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে, একটি মেয়ে প্রদীপ হাতে আধ ভেজান দরজার পাশে, আলো পড়েছে শ্যামবর্ণ মেয়েটির মুখে···বিধবা,

অল্প বয়সী, চোখে যা রয়েছে সে সম্বন্ধে ভুল ধারণার সুযোগ নেই···সর্ব্বনাশী। সুজন চলে এল লজ্জায়, আতঙ্কে, আশঙ্কায়।

সেই ফিরে আসে। অন্য সকলে নিজের কাজ করে, এগিয়ে, চলে, না-ভেবে। সেই রইল পুলের মতন স্থানু হয়ে। নীচে তার জল থই থই, ভরা গাঙ্গে ঢেউ লেগেছে, তরী স্রোতের টানে হাওয়ার জোরে পাল ফুলিয়ে এগিয়ে চলে। দুজনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপনা নিতান্ত নঙর্থক। জোড়া লাগাতে সকলেই পারে। কিন্তু তাকে বৃত্তি করার অর্থ জীবনকে সঙ্কুচিত ও ব্যর্থ করা। ছুতার মিস্ত্রীরও ঘর-বাড়ি আছে, সংসার আছে, সন্ধ্যায় সে কর্ত্তাভজার আড্ডায় যায়। তারও বৃত্তি তার জীবন থেকে পৃথক। বিজনের মতামতে, তার কর্ম্মে এই সত্যটুকু কি ধরা পড়েছে? নদীর স্রোত, পুলের কুলী, নৌকার মাঝি, সব পৃথক, না একই বহতায় বাঁধা।

সেনহাটিতে একবার বিজয়ার ভাসান সে দেখেছিল। ভৈরবের বুকে একশ' প্রতিমা ভাসছে। প্রত্যেকটি দুটি নৌকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কত ঘোরাঘুরির পর বিসর্জ্জনের শুভলগ্নে নৌকা দুটি সরে গেল—প্রতিমা ডুবল, রাংতা কুড়োতে, মুকুট তুলতে ছেলেরা লাফাল জলে···। আশেপাশের অসংখ্য নৌকার বাচ্ খেলা সুরু হল···প্রতিযোগিতার, দাঁড়টানার, বোটে বাওয়ার আবেগময় আনন্দ। অনেক রাত্রে সেই ছেলেরা বাড়ি ফেরে, সিদ্ধি খায়, তখনও কি ফুর্ত্তি! কিন্তু সে-রাতে সমগ্র গ্রামে বিষাদ নামে···মাঝিদেরও মনে। সুজন মনে মনে প্রতিমা তৈরী করেছিল, তার প্রতিমা ডুবেছে, বিজন নেই যে কোলাকুলি করবে···একলা, নেগেটিভ্, ক্যাটালিটিক এজেন্ট। খগেনবাবু রমলা দেবী বাড়ি ফিরবেন, কোলাকুলির আনন্দে, সিদ্ধির নেশায় সব ভুলবেন···।

সে-রাতের অবস্থায় অক্ষয়ের আদিমতা উঠতো জেগে। খগেনবাবু কি করতেন? বুঝতে পারে না। হয়ত মিলন হত, কিন্তু নাইট্রোগ্লিসারিণের অস্থায়ী সংযোগের মত, দম্ করে ফাটত, পালক ঠেকত পরীক্ষাগারের ছাতে। হাওয়ার মুখের পালক, আর পাখীর গায়ের পালক, কত তফাৎ! সুজন যেন ভাসতে থাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে।

বাদ পড়ে গেল, বাদ পড়ে গেল, পরাশ্রিতের মতন, রমলা দেবী ও খগেন বাবুর সম্বন্ধ থেকে, বিজনের শোভাযাত্রা থেকে। কোথায় যেন সম্পত্তির প্রয়োজন রয়েছে। তার বোজা চোখে জল আসে। বৃষ্টি নামে, বার্ত্তা পৌছায় না।

বাদই যদি পড়ল তবে কাশী থাকার প্রয়োজন? সে বিজনের কাছে কোলকাতাতেই যাবে। কি শক্ত বিছানা! গাল শিউরে উঠে—এখানেই রমাদি শুয়ে ছিল, উঠলেন রমলা দেবী হয়ে···চেয়ারে বসেও রাত কাটানও যায়···'বোকা ছেলে।' সত্যই বোকা। যার নিজের জীবন নেই তার মতন নির্ব্বোধ আর কে? রমলা দেবীর কাছে খগেন বাবুই বুদ্ধিমান। বেশ—তাই হওয়াই ভাল। কিন্তু বুদ্ধিমানেরা শান্তি সহ্য করতে পারে না। তার চেয়ে মাসীমার মতন লোকেরাই শান্তিভোগ করতে জানে। শান্তির কল্পনায় সুজন ভোর বেলা ঘুমিয়ে পড়ে।

চোখ চেয়ে দেখে দীপা পুতুল কোলে নিয়ে মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে দেখছে। 'দীপা, ওগো দীপা, মা আমার···'

সুজন দীপাকে তুলে নিয়ে চুমু খায়, তার কোলে শোয়, বলে, 'মাগো···খিদে পেয়েছে, দুধ খাব।' দীপা ফ্রক বুক পর্য্যন্ত তুলে দুধ খাওয়ায়।

(ক্রমশঃ)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ডাচ্ ছবি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(৩)

ডাচ্ অভিব্যক্তির অ-আ ছিল কাঁচা হাতের প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্র। মাঝখানে হাল্স ও রেম্‌ব্রাণ্টের অভ্যুদয়ে চরিত্রচিত্রণ একটি গৌরবময় পরিণতি লাভ করে এবং প্রকৃতি-চিত্রণের বিভাগটি একেবারে গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু কাইপ্ (১৬২০-১৬৯১) ও ভারমিয়ার প্রভৃতির হাতে ডাচ্ প্রকৃতি নবরূপ লাভ করতে থাকে।

রেম্‌ব্রাণ্ট অতিপ্রথম পারিবারিক জীবনের দৃশ্য আঁকতেন। কিন্তু পরে তিনি সে-পথ ছাড়েন। রেম্‌ব্রাণ্টের এ কাজটি জ্যান্ ষ্টীন্ (১৬২৬-১৬৭৯) কুড়িয়ে নেন। আর মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে আর যে একটি জীবন নিরন্তর বয়ে চলেছে—তার নীরব গান ও অশ্রুত বেদনা উলিয়াম্ কাফের চিত্রমানস আকুল করে তুলল। টেবিলের উপর সজ্জিত কাঁটা, চামচ, প্লেট্, গ্লাস; ঘরের কোণে ফলের ঝুড়ি; তাকের উপর কাঁচি, ছুরি, বাতিদান, বোতল-শিশি যে অদৃশ্য ঐকতানে একটি নিভৃত মিলন সৃষ্টি করেছে—কাফ্ তাঁকে ভাষা ও রূপ দিলেন। কাফ্ তাঁর চিত্রবস্তুর মতই প্রত্যহের ব্যবহারে থেকেও একটু অজ্ঞাত। ইংরাজের জাতীয় চিত্রশালায় তাঁর অনেক ছবি আছে। এ সময়ে টার বর্ক (১৬১৭-১৬৮১) হল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায়ের চিত্র-নটরূপে সবার বড় ছিলেন। জ্যান্ ষ্টীন্ তাঁর মা, বাপ, ভাই, বোন, বান্ধবী ও স্ত্রীর চিত্র আঁকতেন। কিন্তু বর্ক আঁকতেন রাজা, রাণী, ডিউক-ডাচেস; যেমন থ্যাকারে তাঁর সমসাময়িক অভিজাত ইংরেজ চরিত্রের সাহিত্য-চিত্র সৃষ্টি করে গেছেন। এই হিসাবে ষ্টীনের তুলনা ডিকেন্সের সঙ্গে। বর্কের অনুরূপ ক্ষমতা মেট্‌স্যু (১৬৩০-১৬৬৭) এবং ভারমিয়ারে-ও * (১৬৩২-১৬৭৫) যথেষ্ট ছিল। ক্রুয়ারের মত মেট্‌স্যু-ও খুব অল্প বয়সে মারা যান।

এ সময়েই পটার (১৬২৫-১৬৫৪), কাইপ্, হবেমা (১৬৩৮-১৭০৯) প্রভৃতির

---

* ভারমিয়ার কিন্তু দু'জন ছিলেন। হার্লেমে এক ভারমিয়ার (ছোট) ছিলেন। তিনি ১৬৯১ খৃঃ মারা যান। মৃত্যুর আগে নৈসর্গিক দৃশ্য চিত্রণে যশঃ অর্জ্জন করেছিলেন।

প্রশংসাজনক প্রচেষ্টার ফলে ডাচ্ আর্টের সঙ্গে একটি নূতন জগতের পরিচয় ঘটে। এদের চেষ্টায় ডাচ্ আর্ট গৃহের অচলায়তন, যদিও তা' তুচ্ছ ছিল না, ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তা বলে ঘরের দীপশিখা তা'দের জন্য নিভে গেল না। গো-চারণ ক্ষেত্রের মায়াভরা সন্ধ্যা, নীরবনিরালা পথঘাট, রহস্যময় বায়ুযন্ত্র, জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর, সাগর, শান্ত-সুষমান্বিত প্রকৃতি, কচি ঘাসে ছাওয়া গ্রামের বুক এদের চিত্রসাধনার বিষয়ীভূত হ'ল। তা'রা ধন্য হ'ল, শিল্পীর মানস সার্থক হ'ল।

কিন্তু কাইপের সাধনার উৎস ছিল একটু দূরে। এভারকাম্প, ভেল্ডি, গয়েন্, রুজডেল প্রভৃতির সাধনপুণ্যেই পরবর্ত্তীকালে কাইপ্, পটার, অষ্টেড্ ও ও হবেমার জন্ম। এ' সময়ে ডাচ্ ছবির জগতে সর্ব্বাঙ্গীণ জাগরণের সাড়া পড়েছিল। বর্ষার অজস্র জলস্রোতের মত চিত্রপ্রগতি বিভিন্ন দিকে ছুটল। সে-যুগের ডাচ্ সৈন্যদের সব চাইতে ভাল এঁকেছেন ঔভারম্যান্। কীপলিংয়ের "ব্যারাক্-রুম্ ব্যালাডস্" পড়ার সময় ঔভারম্যানের একখানি এ্যাল্বাম্ পাশে রাখলে বেশ আনন্দ পাওয়া যায়।

—আমরা তা'ই দেখছি যে রেম্ব্রান্টের মৃত্যুর পরেই হল্যাণ্ডের চিত্রাকাশ অন্ধকার হয়ে গেল না। অনেকগুলি বড় বড় আলোকপুঞ্জ সূর্য্য-চন্দ্রের আলোক-বিকীরণের কাজটি গ্রহণ করল।

ডেলফ্টের ভারমিয়ার (১৬৩২-৭৫) এবং রুজডেল্ (১৬২৮-৮২) এদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রুজডেল্ খুব শক্তিশালী চিত্রকর এবং তৎকালীন শান্ত প্রকৃতি চিত্রণের দিনে রুজডেল্ তাঁর রুচি ও মানস আলাদা করে নিয়েছিলেন। তাঁর ছবিতে আমরা পাই গতি, ঐক্য এবং বর্ণচাতুর্য্য। মূল কথা—বর্ণচাতুর্য্যের গুণেই রুজডেল্ গতিবেদনী চিত্রের সৃষ্টি করতেন। তদঙ্কিত "শেভেনিঙ্গেন সৈকত" অতি বিখ্যাত—মনে হয় যেন কন্ষ্টেবলের আঁকা কোন ছবি। অষ্টেড্ এবং রুজডেল্কে টার্ণার ও কন্ষ্টেবলের ডাচ্ অগ্রদূত বলে মনে করা চলে।

রুজডেলের পরে এবং সমসময়ে হবেমা ও ডি-ভেল্ডি নামক প্রকৃতি চিত্রকরদ্বয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। হবেমা "still life"-এর ওস্তাদ চিত্রকার—তাঁর "পথ" ছবিখানি আমাদের দেশে-ও নানা স্থানে দেখা যায়। ডি-ভেল্ডি যেন রুজডেলের "পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ।" তিনি অতি শক্তিময় বায়ুবেগ, স্রোতোগতি বা ঝড়ো সমুদ্র খুবই নৈপুণ্যের সহিত চিত্রফলকে রূপান্তরিত করেছেন।

ডি-ভেল্‌ডির কোন-কোন ছবি টার্ণারের বলে ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু টার্ণারের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে বৃহত্তর শক্তি এবং উৎকৃষ্টতর রঙে—যা' আমরা ইংরাজি ছবির প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

হল্যাণ্ডের প্রকৃতিচিত্রে শান্ত-রসই প্রধান। খুব একটা ঝড়-দুর্য্যোগ বা উদ্দামতা এখানে নেই। তা'ই রুজডেল্‌ এবং ভেল্‌ডিকে ডাচ্‌ চিত্রশিল্পে একটু বিশেষিত করতে হয়।

কিন্তু চিত্রকর হিসাবে ভারমিয়ার এদের সবাইকে অতিক্রম করেছিলেন। ভারমিয়ার পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ চিত্রকর—"the greatest Little Master"—এবং ডাচ্‌দের মধ্যে হালস্‌ এবং রেম্‌ব্রাণ্টের পরেই তাঁর আসন। তাঁর রসানুভূতির বিচিত্র বিপুলতা, তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য্য, বর্ণবিন্যাসের ওস্তাদি—সব-কিছুই অসাধারণ। তবু তিনি এ-যুগের আবিষ্কৃত চিত্রকর। তাঁর মৃত্যুর পর হল্যাণ্ড তাঁকে মনে রাখেনি। প্রায় দেড়শত বছর পর একজন ফরাসী ভদ্রলোক এবং তারপর ই, ভি, লুকাস প্রভৃতি কয়েকজন ইংরেজ শিল্পোৎসাহী ভারমিয়ারকে বিস্মৃতির গর্ভ হ'তে উঠিয়ে আনেন নব্য যুগের সমুখে। ভারমিয়ার তা'ই দ্বিজ।

ভারমিয়ার তাঁর নিজ নগর ডেলফ্‌টের যে "দৃশ্য" এঁকেছেন—তা' থেকে তাঁর অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য ও রসবোধের চিরন্তন সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তিনি যে প্রকৃতি-চিত্রই খুব ভাল আঁকতেন, তা নয়। তাঁর মানব-মানবীর চিত্র-ও আজকাল সমাদর লাভ করছে। আর যা'ই হোক্‌ শুধু বর্ণবিন্যাসের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বল করেই ভারমিয়ার চিরযুগ অমরদের পাশে তাঁর স্থানটি রক্ষা করবেন।

কাইপ্‌ ও মেট্‌সু দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকর। কিন্তু কাইপ্‌ হল্যাণ্ডের প্রকৃতি-চিত্রে একটি সম্পূর্ণত্ব দান করেন। পল্‌ পটারের "এ্যামোরাস্‌ বুল্‌" তাঁর শক্তির চমৎকার নিদর্শন। হুচ্‌ (১৬২৯-৭৭) ডাচ্‌ ছবিতে বর্ণদীপকের (illumination) সৃষ্টি করেন। নীয়ার-ও এ গুণটি আয়ত্ত করেছিলেন। বরফের স্বচ্ছ, কাচসদৃশ রূপসৃষ্টি করতে তাঁর মত আজ-ও কেউ পারে নি। রঙের বিশেষত্ব দিয়ে বিচার করলে কোরো এবং ভ্যান্‌ ডাইকের সঙ্গে এঁদের তুলনা করা যায়।

নানা ভাবে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে এ-সব "Little Master"-দের দল প্রকৃতির নানা দিক চিত্রফলিত করতে থাকেন। এঁদের খুব অসামান্য প্রতিভা ছিল না। তাঁদের মত ক্ষমতা বাংলাদেশের কয়েকজনের নিঃসন্দেহে আছে। কিন্তু

যে নূতনের পিপাসা এবং স্বাধীনতার গর্ব্ব ডাচ্ চিত্রকরকে নিত্য নব জয়ের স্বপ্নে বিভোর করে রাখত, তা'র অভাব ঘটেছে আমাদের দেশে। বাংলা দেশ যে এমন স্বপ্নবিরহিত হয়ে যেতে পারে, বাংলার তরুণ শিল্পী যে শুধু পিছনের দিকে চেয়ে থাকবে—সম্মুখ, বর্ত্তমান বা নিজের দিকে একবার চাইবে না, এ-কথা ভাবতে দুঃখ হয়। দুঃখ বাংলার চিত্রকলার জন্য নয়—আত্মবঞ্চনাকারী চিত্রকরদের জন্য। আমাদের যা খাঁটি নিজস্ব, বাংলার যা বিশিষ্ট বাণী—তা'র প্রকাশ একদিন হ'বেই। কিন্তু যাঁরা আজই সে গুমোট-বাঁধা প্রকাশ শক্তির উৎসমোচন করতে পারেন, তাঁরা পিছিয়ে আছেন একটা মৃত আদর্শের মাটিতে নোঙর ফেলে।

(৪)

মনে হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যাঙ্কনে তিনটি ক্রম আছে। প্রথমতঃ কোন নর-নারীর ভাব ফুটানোর জন্য, অনুকূল আবহাওয়া বা পরিস্থিতি সৃজনের জন্য নদী, পাহাড়, বন প্রভৃতির বিশেষ রূপ দেওয়া হ'ত। তারপর শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য—নিজের কাব্যসম্পদে নিজে সম্পূর্ণ। হয়ত বা সামান্য একটা গরু বা ভেড়া বা পক্ষী ব্যতীত আর কোন সচল-সক্রিয় প্রাণী নেই। এখানে প্রকৃতি মুখ্য এবং প্রথমটাতে প্রকৃতি গৌণ। তৃতীয়তঃ সমুদ্র তা'র অনন্ত বিস্তার, অতল রহস্য, তা'র ভয়ঙ্কর ও অতি সুন্দর আত্মপ্রকাশ, তা'র বিপুল-অতল ব্যক্তিত্ব দিয়ে শিল্পীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রথম ক্রমে দু-একজন ইটালীয়ান এবং অনেক ইংরেজ চিত্রকর প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। দ্বিতীয়তে আন্তন মভের সৃষ্টি টিপিক্যাল্। শেষ ধাপে টার্ণার প্রভৃতিরা আছেন। কোন কোন চিত্রালোকে আমরা jungle-life বলতে যা' বুঝি তা' প্রকৃতি-চিত্রের মধ্যে রাখতে চান। কিন্তু বাঘ-সিংহ-কুকুর-ঘোড়ার চিত্র নিয়ে একটি আলাদা এবং বিশিষ্ট বিভাগ আজকাল গড়ে উঠ্‌ছে—যেমন উঠ্‌ছে পর্ব্বতের চিত্র, বিশেষ করে সেগান্তিনির পর থেকে। কিন্তু যাক্-এ-নিয়ে সম্পূর্ণাঙ্গ আলোচনা যথাস্থানে করা যাবে।

উপরি-উক্ত তিনটি অধ্যায় ডাচ্ চিত্রশিল্পের একশ' বছরের জীবনেই পেতে পারি। বিশদ আলোচনা করবার স্থান এ নয়। শুধু এ-কথা বললেই যথেষ্ট যে ডাচ্ আর্টের মাঝে যেমন পূর্ণত্ব ও স্বাধীনতার সম্পদ আছে, তেমন আর কোন দেশের ছবিতে নেই—বিশেষ করে মাত্র এক শতাব্দীর কাজের ভিতর।

সাগরচিত্রের পরিণতি হল্যাণ্ড সপ্তদশ শতকে দিতে পারেনি। টার্ণার সাগরের উত্তাল রূপ আমাদের দিলেন। কিন্তু তা'র বিপুলতা, তা'র রহস্যময় অসীম বিস্তার রয়ে গেল। প্রবল বাত্যা নিস্তেজ হয়ে গেছে, আকাশে তুলার স্তূপের মত পাকানো-জড়ানো মেঘদল ধীরে ধীরে দৃষ্টিসীমা পার হয়ে যাচ্ছে, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে পড়ন্ত বেলার সূর্য্যাভা, ফুরফুরে হাওয়া ছোট ছোট উর্ম্মিমালার শীর্ষদেশ থেকে শাদা ফেনা উড়িয়ে নিয়ে আসছে তটের দিকে—এর রূপ-ও দিলেন কন্‌ষ্টেবল। কিন্তু আরও অনেক রইল বাকী। জলভারাক্রান্ত বায়ুমণ্ডল, ঝড়বেগ দূরের একখণ্ড মেঘের আড়ালে রুদ্ধরোষে চেপে বসেছে। আরও রইল, ঝড় প্রশমনের পর পরাজিত বায়ুবাত্যার নিস্ফল গর্জ্জন, ক্রমবিলীয়মান রুদ্রলীলা। এর চিত্ররূপ আমাদের জন্য, পরবর্ত্তী কালের জন্য রয়ে গেছে।

জাগতিক পরিশীলনের একটি সাধারণ নিয়মানুসারে হল্যাণ্ড ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ-কাজটি সুরু করে দিলে—নূতন উত্তেজনার আনন্দে। ১৭২৫ থেকে ১৮২৫ এ একশ' বছরের ছবির কথায় হল্যাণ্ডের অংশ অতি সামান্য। এ সময়টা প্রধানতঃ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের গৌরব-যুগ। এই একশ' বছর হল্যাণ্ডের কর্ম্মক্লান্ত শিল্পী-প্রতিভা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নূতন কার্য্যক্রমের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছিল। জেগে উঠতেই ফ্রান্সের আলোকোদ্ভাষিত রূপে তা'র চোখ ঝল্‌সে গেল। চোখ রগড়াতে-রগড়াতে একশ' হোঁচট খেয়ে সে পৌঁছল প্যারিসে। সেখানে তখন অনেক পরি-বর্ত্তন এসে গেছে। ফরাসী বিপ্লব, বুরবঁ রাজত্ব-সমাপ্তি, নেপলিয়নের অভ্যুদয় ও পতন, ভেনিস ও ইটালীর শিল্পসম্ভার লুঠতরাজ— এত সব ঘটে গেছে। মাথা গুঁজে প্যারিসের গরম আবহাওয়াটা বরদাস্ত করে নিল হল্যাণ্ড—তারপর এটা-ওটা দেখা-শুনা করে ফিরল দেশে।

রোল্‌ফস্ ও অন্যান্যেরা একটা আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন সত্যি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইজ্‌রেলস্ (১৮২৪-১৯১১) এসে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা এ-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না করলেন, তদ্দিন বিশেষ জোর ধরল না। ইজ্‌রেলসের (শিল্পীর নাম থেকে বুঝা যায় যে তিনি হিব্রু জাতীয় ছিলেন!) বিখ্যাত ছবির নাম-"মিতাহার"।

ইজ্‌রেলস্ হল্যাণ্ডের চিত্রশিল্পকে নব্য বেশভূষায় অলঙ্কৃত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক ছবি নিছক আলোকচিত্র বা ঢঙে পরিণত হয় এবং ইজ্‌রেলস্ দেখেছিলেন যে ফ্রান্সে রিয়ালিজম্ নিয়ে রীতিমত ঢলাঢলি চল্‌ছে—তিনি সাম্‌লে

গেলেন। তাঁর শিল্পীসুলভ সচেতন ও অবচেতন রসবোধ তাঁকে ফ্যাসানের দুরন্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করল। তারপর হ'ল মিলের সাধনা ও ভাবধারার সাথে পরিচয়। ইজ্রেলস্ প্রথমজীবনে রেম্ব্রাণ্ট copy করতেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে-ও তিনি একটি নূতন প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেছেন। কোন একটি চিত্রের সবটা মক্স না করে দু-একটি ভাল মূর্ত্তি, বস্তু, গতি বা স্তব্ধ ভঙ্গিমা উপসৃষ্টি করতে লাগলেন। রেম্ব্রাণ্টকে মক্স করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে রেম্ব্রাণ্ট তাঁর ছবিতে কেবল নিজের যুগটি এঁকেছেন—এমন নয়। কালস্রোত অতীতের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেল্ছে, অনাগত অতীত ও বর্ত্তমানের এলাকার দিকে অনিবার্য্য আকর্ষণে চলে আসছে, অসংখ্য পরিবর্ত্তন পৃথিবীর রঙ্গপীঠে অভিনীত হচ্ছে। কিন্তু আজও হল্যাণ্ডের পথ চেয়ে চলেছে সে-ই নরনারীর স্রোত, অভিনীত হচ্ছে সে-ই হাস্য-বিষাদ সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা তা'দের অন্তরে-বাইরে—রেম্ব্রাণ্ট যা' এঁকেছেন! ইজ্রেলস্ মুগ্ধ হ'লেন। "রাতের পাহারা" পরীক্ষা করে তিনি বলেছেন: Cut me a piece out of a picture and I will tell you if it is by an artist...this dictum can be applied to this painting alone! মিল ও রেম্ব্রাণ্টের শিক্ষা ইজ্রেলস্কে করে তুলল সত্যিকার দরদী।

ইজ্রেলসের আর একটি সুবিখ্যাত ছবি—"নিঃস্ব।" এ-ছবিটির প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত হেমেন মজুমদার অঙ্কিত প্রসিদ্ধ ও পুরস্কৃত ছবি "নিয়তি"কে মনে পড়ে। আপনারা এ ছবি দু'টি পাশাপাশি রেখে আমোদ পাবেন এবং অনেক-কিছু ভাববার কারণ উপস্থিত হ'বে। অবশ্য আর্টের উদ্দেশ্য শুধু আমোদ দেওয়া নয় এবং ইজ্রেলস্ যে দুঃখের প্রকাশ তাঁর ছবিতে করেছেন—সে দুঃখ হল্যাণ্ডের কোন একটি বিশেষ নারীর নয়, কোন বাঙ্গালী মেয়েরও তা' হ'তে পারে। কিন্তু হেমেন বাবু কোন রকম ঋণ-স্বীকার করেছেন কিনা জানা নেই। কিন্তু এ দু'টির তুলনা থেকে এ কথা বেশ প্রমাণ হয় যে আমাদের চিত্রশিল্প নিয়ে চিন্তা করবার সময় এসেছে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে নিশ্চিন্ত। যুগে যুগে প্রত্যেক দেশে যে-সত্য অনিবার্য্যরূপে এবং প্রয়োজনে আপনাকে বিকাশ ও প্রকাশ করেছে বাংলাতেও সে-সত্য প্রকট হ'তে বাধ্য। কতকগুলি শক্তিহীন, বুদ্ধিহীন তথাকথিত "Indian Artist"-এর জন্যই বর্ত্তমানে তা' হ'তে পারছে না। ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীকে "Indian Artist" রূপে দেখ্তে চাইনে, কারণ তা'র চাইতে বড় মিথ্যা আর কিছু

হ'তে পারে না। তা'কে চাই বাংলার বাঙ্গালী চিত্রকররূপে, বাংলার ছোট মানুষ, ছোট কবি রূপে। বিহারের নয়, বোম্বায়ের নয়—শুধু বাংলার, শুধু তা'র ঘরের, তা'র গ্রামের, শহরের যে গলির যত নম্বর বাসাটিতে সে থাকে, তত নম্বর বাড়িটির শিল্পী ও কবি রূপে।

ইজ্‌রেল্‌সের পর আন্তন মভ্ (১৮৩৮-৮৮), মেস্‌ডাগ্ (১৮৩১-১৯১৫) ও ম্যরিস ভ্রাতৃত্রয় হল্যাণ্ডে একটি বিশিষ্ট চিত্রধারার প্রবর্ত্তন করেছেন। সত্যকার সৃষ্টি-প্রেরণা জাতির অন্তরে সদা-প্রবাহিত। যুগেযুগে নানা ভাবে তা'র প্রকাশ। এ শক্তি অমর। একবার ঐতিহ্য গড়ে উঠ্‌লে এ প্রকাশনা হ'য়ে উঠে সহজ, সরল।

সাগরের অন্তহীন বিস্তৃতি, বাষ্পভারাবনত আকাশের অভাব পূরণ করলেন, মেস্‌ডাগ্, মভ্ দিলেন চিত্রে-চিত্রে গীতি-কবিতার চরম। ম্যাথু, জেমস্ এবং উইলিয়াম ম্যরিস—এই তিন ভাইয়ের ছবিগুলির সমালোচনা করতে রাজী নই। এ-কাজটি আরও কিছুদিন পরে হ'তে পারবে।

শ্রীঅপরূপ মুখোপাধ্যায়

সুটকেস্‌

তিনি চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন তাঁহার পত্নী ক্রমেই প্লাটফর্ম্ম বহিয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে। চলার ভঙ্গীতে তাহার এখনও যৌবন-সুলভ স্বাচ্ছন্দ্য, পদক্ষেপও দৃঢ়, কিন্তু তাহাতে আর পূর্ব্বের মত লালিত্য নাই ; বরং এখন তাহাকে দেখিতে অতি সাধারণ বলিয়াই মনে হয়। এইবার সে আবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল, ও এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া হাসিমুখে হাত দোলাইল, পরক্ষণেই বেষ্টনীর ও ধারে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিনি আপনার বসিবার স্থানটি ঠিক করিয়া, সামনের টেবিলে কাগজপত্র সাজাইয়া লইলেন ও ট্রেন ষ্টেসন ছাড়িবার পূর্ব্বেই আপন কাজে মগ্ন হইলেন। সে গাড়ীতে অপর কেহই ছিল না। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে মুখ তুলিলে, বাহিরে নভেম্বর সন্ধ্যার ধূসর আলোকে রুক্ষ প্রুসীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যপট তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। অস্তসূর্য্যের ম্লান রক্তিম আভা একসারি অনুচ্চ পর্ব্বতের আড়ালে দ্রুত বিলীন হইয়া অন্ধকারের আগমন সূচনা করিতেছে। একটা গুম্‌টির নিকট ট্রেনের গতিবেগ কমিয়া আসায় তাঁহার চোখে পড়িল একখানা ভাঙা, পুরাতন, ছোট মোটরগাড়ী গেটের পাশে অপেক্ষা করিতেছে, অদ্ভুত ধরণের লোহার টুকরার সমষ্টি সে গাড়ীখানা ; দেখিলেই হাসি পায়। এখানাকে দেখিয়া তাঁহার মনে পড়িল বাড়ীতে তাঁহার নিজের গাড়িটার কথা। সেখানাকেও এইবার বেচিয়া একখানা নূতন কিনিবার সময় হইয়াছে। অন্ততঃ শো রুম গুলায় ঘুরিয়া নূতন মডেলগুলি দেখিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল তাঁহার গোছালো, বলিতে গেলে অতিমাত্রায় হিসাবী গৃহিণী এখনও সেটা বেচিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। তিনি আবার কাগজ পত্রে মন দিলেন।

অন্ধকার যখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে এমন সময় তিনি গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলেন। পোর্টারও ষ্টেসনে বেশী নাই, তাই ব্রীফকেসটি বগলে তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল যতক্ষণ না তাঁহার তোরঙ্গ ও ছোট সুটকেস্‌টি ঠেলাগাড়ীতে বোঝাই হইয়া বাহিরে যায়। হোটেলও ষ্টেসন হইতে অনেকটা দূরে। এখন থিয়েটারে যাইবার সময়, পথের দিকে চাহিলে মনে হয় বার্লিনের

লক্ষ লক্ষ লোক সান্ধ্য আমোদপ্রমোদে যোগ দিতে চলিয়াছে। রাস্তার যান বাহনাদির গতি অতি মন্থর, এবং পথে একখানিও খালি ভাড়াগাড়ী দেখা যায় না। সেলুনকারের কাচের জানালার ভিতর হইতে অস্পষ্ট আলোয় পালক ও জড়োয়া মণ্ডিত প্রত্যেক রমণীকেই সুন্দরী মনে হইতেছে, তাহাদের সাজ পোষাকের ঝলমলানিতে।

প্রতি দুইমাস অন্তর তিনি সন্ধ্যায় এই পথ অতিক্রম করিয়া ষ্টেসন হইতে হোটেলে যাইতে অভ্যস্ত। এই যাত্রার প্রত্যেকটি বিবরণ তাঁহার স্মৃতিতে মুদ্রিত থাকে এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও যে কি হইবে তাহাও তিনি পূর্ব্ব হইতে জানেন। শুধু এবার কেন, প্রত্যেকবারই স্বগত এই প্রশ্ন তাঁহার মনে উদিত হয়, "ইহাই কি ঠিক যে এখানে জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক উৎসব এমনই রঙ্গীন আলোয়, অপরূপ শোভায়, উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে; আর তিনি কোন অন্ধকারে দূরে মফঃস্বলের সহরটিতে বৈচিত্র্যবিহীন জীবনের অবশিষ্ট অংশ কাটাইবেন ?" ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া, কাহারো সহিত বিরোধ না রাখিয়া তিনি একপ্রকার মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া জীবন কাটাইতেছেন; নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নির্ব্বিবাদে চলিয়া যাওয়াই যেন এখন একমাত্র পন্থা, তাহা ছাড়া আব কিছু করিবার নাই। আপনার এই অবস্থা মনশ্চক্ষে দেখিয়া তাঁহার এ কথা মনে না হইয়া পারিল না যে পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেই এভাবে ওই গহ্বরে স্থির হইয়া বাস করিয়া সন্তুষ্ট থাকা তাঁহার উচিত হয় নাই।

এইবার তিনি হোটেলে আসিয়া পৌঁছাইলেন। সেখানে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত ঘরটিই তাঁহার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। কক্ষটি প্রশস্ত ও নিরালা, তাহাতে দুইজন শয়ন করিতে পারে। একটা ভারি পর্দ্দা টানিয়া শয্যা দুইটিকে আড়াল করিয়া দিলে একটি অংশকে বসিবার ঘর রূপেও ব্যবহার করা যায়, যেখানে বসিয়া তিনি আপন কাজ করিতে পারেন কিম্বা কর্ম্মোপলক্ষ্যে বন্ধুরা আসিলে বসাইতে পারেন।

রেজিষ্টারে নাম সহি করা হইয়া গেল, মালপত্রও ঘরে আসিয়া পৌঁছিল। এতক্ষণে ঘর নির্জ্জন হইল। কাল সকাল সকাল বাহির হইতে হইবে সেজন্য শীঘ্রই শুইয়া পড়ার আয়োজন করা ভাল। তাঁহার সুটকেস্‌টা খুলিতে হইবে।

সুটকেস্‌টি খুলিয়া তিনি হতভম্ব হইয়া গেলেন। খুলিবামাত্র দেখা গেল

উপরে রহিয়াছে একটি গাঢ় সবুজবর্ণের সিল্কের গাউন। এ স্যুটকেস্ তো তাঁহার নয়। কাহার সহিত এটা বদল হইয়া গিয়াছে। মনটা বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। বয়স যখন বাড়ে, মানুষ তখন টুকিটাকি নিজস্ব জিনিস ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া যায়, সেগুলির অভাবে অসুবিধা বোধ করে। তবু মনে মনে অবস্থাটা আলোচনা করিয়া লইয়া কি করা উচিত শীঘ্রই তিনি ঠিক করিয়া লইলেন। নাঃ এমন কছু গুরুতর ঘটনা ঘটে নাই। কিছু টাকাও অবশ্য কেসটার খোপে ছিল, কিন্তু তাহা হারাইয়া গেলেও মারাত্মক গোছের ক্ষতি হইবে না।

দরকারী কাগজ-পত্র সবই ব্রীফ-কেসে রহিয়াছে, যদিও মনে মনে তিনি স্বীকার করিলেন যে তাঁহার পক্ষে বলিতে গেলে এগুলি হারানো বরং ভাল ছিল —তাঁহার ব্রাশ, দাড়ি কামাইবার সরঞ্জাম, শ্লিপার হারানোর চেয়ে। তাঁহার নিজস্ব ব্যবহারের জিনিসগুলি হয়তো এখন অপরের চোখে পড়িতেছে একথা ভাবিয়া তিনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। সে দৃষ্টি আবার অপরিচিতা নারীর, কারণ এ স্যুটকেস্‌টি দেখা যাইতেছে কোন মহিলার। একটি দামী বাছাই-করা এসেন্সের মৃদু সৌরভ গাঢ় সবুজবর্ণের পরিচ্ছদটি হইতে বাহির হইতেছে।

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি স্যুটকেস্‌টির ডালা বন্ধ করিলেন। হাঁ, বাহির হইতে সত্যই এটা অবিকল তাঁহার স্যুটকেস্‌টির মত দেখিতে বটে। সেই একই রকমের বাদামী রঙের চামড়া, আকারেও তফাৎ নাই, এমন কি রৌপ্যনির্ম্মিত চাবি লাগাইবার কলটি অবধি একই রকম। পোর্টার বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় না। যাহা হউক ষ্টেশনের লোকেরা এ ভুলের প্রতিকার করিতে পারিবে, এখনই এ স্যুটকেস্‌টি ষ্টেশনে ফেরৎ পাঠানো যাক। সে ভদ্রমহিলাও নিশ্চয় তাহাই করিবেন, সব গোল মিটিয়া যাইবে।

একজন পোর্টারকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টা বাজাইতে হাত বাড়াইয়া তিনি কিন্তু হাত আবার নামাইয়া লইলেন। অন্য উপায়ও তো আছে। মহিলাটির ঠিকানা হয়তো এই স্যুটকেসে কোথাও না কোথাও আছে ; তাঁহার নামের কার্ড বা পুরানো চিঠির খামে তাঁর ঠিকানা লেখা, কিছু তো থাকা খুবই সম্ভব। তাঁহার সৌখীন সুগন্ধির মৃদু আভাস এখনও যেন হাওয়ায় রহিয়াছে। স্যুটকেস্‌টা তিনি আবার খুলিলেন ও সেই সৌরভ তাঁহাকে যেন চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ধরিল।

অতি সন্তর্পণে তিনি সব উপরের গাঢ় সবুজ বর্ণের রেশমী ড্রেসিং গাউনটি তুলিয়া ধরিলেন, যাহাতে তাহার ভাঁজ একটুও নষ্ট না হয়। প্রসারিত দুই বাহুর উপর সেই হালকা পরিচ্ছদটি রাখিয়া তিনি দাঁড়াইলেন, তাহার নীচেই যে সুন্দর, সৌখীন, ভ্রমনকালে ব্যবহার্য্য প্রসাধন সামগ্রীগুলি সাজানো ছিল, সেগুলিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল।

মুগ্ধ চোখে সেগুলির দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিলেন, সত্যই মেয়েরা পুরুষ অপেক্ষা কত সুকুমার এবং সেই ভাবেই লালিত হইয়া কত যত্নে আপন কমনীয়তা রক্ষা করে। ইহার তুলনায় আপন সুটকেসে রক্ষিত বস্তুগুলির কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জা বোধ করিলেন। এই মুহূর্ত্তে সেটাও হয় তো অপর কোন হোটেলের কক্ষে খোলা হইয়াছে। মহিলাটি নিশ্চয় খুলিয়া চমকিত হইবেন, ও বিরক্ত হইয়া হয়তো বিতৃষ্ণাভরে পিছাইয়া যাইবেন। সে দৃশ্যও যেন তিনি কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার জিনিসগুলির মধ্যে অবশ্য নিন্দনীয় কিছুই নাই, কাজের জিনিস হিসাবে সে গুলি ভালই বলিতে হইবে কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই ব্যবহৃত ও পুরাতন। এ কথা ভাবিতেও তাঁহার ক্ষোভ হইতেছিল যে তাঁহার সুটকেসেতে সকলের উপরে আছে তাঁহার কালো চামড়ার শ্লিপার জোড়া, বহু ব্যবহারে তাহার আকৃতি বাঁকিয়া গিয়াছে ও ভিতরের চামড়া খসিয়া গিয়াছে। তাহার পাশেই আছে তাঁহার কামাইবার ব্রাশটা, তাহার অবস্থাও বিরল-কেশ, কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেটাকে ফেলিয়া দিতে তাঁহার মন সরে নাই। আর আছে সেই কাঠের তৈয়ারী নখের ব্রাসটা,—এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও যেটাকে ব্রীফ-কেসের অনেক কাগজ-পত্রের চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছিল—সেটিও বহুদিনের ব্যবহৃত। এ সকলের চেয়ে আরও আপত্তিকর তাঁহার সেই "রাত কামিজ"টি, সদ্য ধোপ দেওয়া, নিখুঁত ভাবে ইস্ত্রী করা, কিন্তু তাহা হইলে কি হয় রাত কামিজ তো বটে। সেটি যে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত সমাজের বিশেষত্বজ্ঞাপক, আদৌ সুসভ্য নয়, যে বিশেষত্বের বিরূদ্ধে তিনি বহুদিন যুঝিতেছেন। তাঁহার ধোপাও বলে "মশায়, আমার সৌখীন খদ্দেরদের মধ্যে কেবল আপনিই এখনও "পায়জামা" ব্যবহার না করে 'রাত কামিজ' ব্যবহার করেন।" সে অবশ্য বলে তাঁহাকে খুসী করিতে, বাস্তবিক তিনি এমন কিছু সৌখীন নন, কিন্তু আজ এই সৌখীন মনোমুগ্ধকর জিনিসগুলি চোখের সামনে রাখিয়া তিনি বেশ বুঝিতেছিলেন যে সেই ভদ্র মহিলার কাছে তাঁহার

অসৌখীনত্ব প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে তাঁহার ওই "রাত কামিজের" ফলে। এ চিন্তায় তিনি বিশেষ দুঃখ বোধ করিতেছিলেন।

সেই অপরিচিতার প্রিয় এসেন্সের সৌরভে ঘর ভরিয়া গিয়াছে। সেণ্টটা দামী, তাহার তাজা ও ঈষৎ তীব্র গন্ধ তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল কোন তরুণীর কথা; এ যেন তাহার মুখের দ্রুত ও উষ্ণ নিশ্বাসের সৌরভ। মনে আসে একখানি ছবি, ঋজুদেহা তরুণী, দীর্ঘ দৃঢ় হাত দুখানি, সুডৌল আত্মনির্ভরতাব্যঞ্জক চিবুক, হালকা নীল রঙের চক্ষুর দৃষ্টিতে বিদ্রূপের আভাস, সোনালী চুলের রাশ বাঁধন 'না মানিয়া উন্নত ললাটের এখানে ওখানে লুটাইয়া পড়িয়াছে। আচ্ছা, কল্পনায় এ ছবি তো দেখিতে বেশ, কিন্তু বাস্তব তো তাহার বিপরীতও হইতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় স্যুটকেস্‌টা কোন বিপুলকায়া বৃদ্ধার কিম্বা কোন বক্রনাসিকা শুষ্ক আকৃতি চিরকুমারীর সম্পত্তি? নাঃ তা কখনও হওয়া সম্ভব নয়। তিনি যেন নিশ্চিত জানেন তাহা হইতেই পারে না।

তিনি যেন তখন মন্ত্রমুগ্ধ। কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব উত্তেজনায় তাঁহার সমস্ত হৃদয়াবেগ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। মাথাও অল্প অল্প ঘুরিতেছে। যাহা তিনি এখন করিতে যাইতেছেন তাহা ঠিক উচিত কাজ নহে, সত্যই নিজেকে অপরাধী বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছিল। তবু অদম্য ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহাতে চাবি দিলেন; মনে হইল যেন সেই অপরিচিতা নারীকেই গৃহ মধ্যে রাখিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিলেন। এইবার তিনি স্যুটকেসের ভিতর তাহার জিনিসগুলি একে একে বিনা বাধায় ভাল করিয়া দেখিবেন।

গাঢ় সবুজ মনে হয় সে মহিলাটির প্রিয় রং। তাঁহার মন ইহাতে তৎক্ষণাৎ সায় দিল। এই রঙের সহিত তাহার কচ্ছপের খোলার ব্রাস ও চিরুণীগুলি, পাউডারের কৌটা ও ডিম্বাকৃতি হাত-আয়নাখানির গাঢ় রং বেশ মানাইয়াছে। এই সব ঝকঝকে জিনিষগুলিতে ও কাচনির্ম্মিত সেণ্টের আধার ইত্যাদিতে সোনালী অক্ষরে 'ম' চিহ্ন করা রহিয়াছে। 'ম' কোন্ নামের আদ্যাক্ষর কে জানে? ম্যাজ, মার্গারেট, মোনা, এই সব ইংরেজী নামই যেন তাহার সুস্থ, সতেজ তারুণ্যের সহিত মানায়। একখানা সাদা মলাট দেওয়া নভেলও রহিয়াছে, সেখানি হয়তো সে ট্রেনে পড়িতেছিল; কিন্তু তাহাতে কোন নাম নাই, কোনরূপ পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

তাহার ছোট ম্যানিকিওর কেসটিরও রং গাঢ় সবুজ। তাহার পাতলা শ্লিপার জোড়াটিও নরম সবুজ চামড়ার তৈয়ারী, ধারে তাহাতে নরম পালক দেওয়া। সে জোড়াটি হাতে লইয়া তাঁহার মনে কিছু সান্ত্বনা আসিল, এ ছুটিও একেবারে নূতন নয়। চলিবার সময় ব্যবহারের ফলে ভিতরের চামড়া যেন কিছু ক্ষয় হইয়াছে, তাহার খালি পায়ের সংস্পর্শে আসিয়া অস্তরও কিছু খসিয়া গিয়াছে।

তাহার রাতের পোষাকটি অপেক্ষাকৃত হালকা সবুজ রঙের। সেটি তাঁহার সামনে, স্যুটকেসের বাম কোণে ভাঁজ করা রহিয়াছে। তাঁহার ধোপাও এ মনোরম পরিচ্ছদটির কোন খুঁত ধরিতে পারিত না। পোষাকটির অল্প পাট ভাঙ্গা দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে সেটি ব্যবহার করা হইয়াছিল। তাহার নীচে রক্ষিত একটি সবুজ রঙের ছোট চামড়ার বাক্স তাঁহার চোখে পড়িল, সেটিকে দেখিলে জুয়েল কেস বলিয়া মনে হয়। ইহা দেখিয়া আবার তাঁহার মনে পড়িল তাঁহার কার্য্যটি কত দূর অযৌক্তিক। তাঁহার রগের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল, কিন্তু এই নিষিদ্ধ কর্ম্মের উত্তেজনা তিনি বেশ উপভোগ করিতেছিলেন।

ছোট চামড়ার বাক্সটি খুলিতে গিয়া তাঁহার ভয় হইতেছিল এবং আশাও হইতেছিল যে হয়তো কতকগুলি উজ্জ্বল রত্নালঙ্কার তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িবে। এও কি তাঁহার সাধুতার এক পরীক্ষা নয়? রিপোর্ট না করিয়া কোন মূল্যবান বস্তু এক ঘণ্টার বেশী নিজের কাছে রাখিবার তো তাঁহার কোন অধিকার নাই, কিন্তু এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জানাইতে তাঁহার দারুণ অনিচ্ছা। এ চিন্তাও যেন তাঁহার অসহ্য যে কোথায় কোন হারাণো-সম্পত্তি-অফিসের তাকে এটি আর পাঁচটা বাজে জিনিসের সহিত অবহেলায় পড়িয়া থাকিবে।

বাক্সটি খুলিয়া কিন্তু তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন—বাঁচা গেল, ইহাতে আছে কেবল হাল ফ্যাসানের নকল পাথর বসানো নেকলেস ব্রুচ ইত্যাদি, যাহার আজকাল খুবই চলন। পশ্চিম আফ্রিকার চলতি ফ্যাশান দেখছি—বলিতে গিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। এ সমালোচনা অর্থহীন হইবে মনে হইল কারণ এ ফ্যাশান তো বেশ চিত্তাকর্ষক; সাহসী ও ফুর্ত্তিবাজ মেয়েকে মানায় ভাল। তবে ঠিক সেই ধরণের মেয়ে হওয়া চাই, যৌবনের মাধুর্য্য ও আত্মপ্রত্যয়ের সমন্বয় যাহাকে এ ছদ্ম-বেশেও মোহিনী করিয়া তুলিবে। এই ছেলেমানুষি সজ্জার সম্বন্ধে তিনি যাহাই ভাবুন না কেন, তিনি এই ভাবিয়া শান্তি পাইতেছিলেন যে তাঁহার মত পদস্থ

লোককে ইহার জন্য রিপোর্ট না করিয়া চোরের মত অপরাধী বোধ করিতে হইবে না।

শুইতে তাঁহার অনেক দেরী হইয়া গেল। শয্যার আশ্রয় লইয়াও নিদ্রা-কর্ষণ হইতেছিল না, যখন হইল সে ঘুমও ভাল হইল না।

পরদিন প্রাতে হোটেলের পোর্টারকে দিয়া তিনি গোটা কতক অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রসাধন বস্তু কিনিয়া আনাইলেন। নয়টার সময় ঘরটির দুয়ারে ভাল-রূপে চাবি লাগাইয়া তিনি বাহির হইলেন। তাঁহার কর্ম্মস্থলের বন্ধুরা অনেকেই লক্ষ্য করিলেন তিনি কন্‌ফারেন্সের সময় কিরূপ অন্যমনস্ক হইয়া রহিয়াছেন। একবার তাঁহার রুমাল নিঃসৃত সুগন্ধে তাঁহার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোক কিছু বিস্মিত হইলেন, সে ক্ষুদ্র 'লন'-রুমালখানি তিনি পকেটস্থ একটি ছোট চামড়ার কেস হইতে বাহির করিয়াছিলেন।

হোটেলের লিফ্‌টে উঠিবার সময় তাঁহার বক্ষ দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল, যেন তিনি চলিয়াছেন আপন প্রণয়িনীর অভিসারে ; সে তাঁহার জন্য উপরে অপেক্ষা করিতেছে। দুয়ারের চাবি খুলিয়া, সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিবামাত্র কক্ষের ভিতর যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল, তাহাতে তিনি অবাক হইয়া গেলেন। হোটেলের দাসী ঘর ঝাড়িয়া রাত্রের জন্য শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে কেবল তাঁহার একেলার শয্যাই বিছাইয়া রাখে নাই, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সুটকেসটি খুলিয়া তাহার সমস্ত দ্রব্যাদি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিয়াছে। প্রসাধন সামগ্রীগুলি ড্রেসিংটেবলের উপর পরিপাটি করিয়া সাজানো, ড্রেসিং গাউনটি একটি আরামকেদারার হাতলের উপর ভাঁজ করিয়া রাখা, দুই বিছানার মধ্য হইতে অন্তরালরূপ পর্দ্দাটি সরাইয়া দুইটি শয্যাই ঝাড়িয়া শয়নোপযোগী করিয়া রাখা হইয়াছে। যে অব্যবহৃত শয্যাটি দ্বারের কাছে ছিল, তাহার সম্মুখে শ্লিপার জোড়া সাজানো ও বালিশের উপর সী-গ্রীন্ রংয়ের স্বচ্ছ, সুন্দর, রাতের পরিচ্ছদটি রহিয়াছে। সকল জিনিসই সাজানো রহিয়াছে তাহাদের অধিকারিণীর প্রতীক্ষায়, আর সে যেন তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

(২)

যে মুহূর্ত্তে তিনি সুটকেসটি ফেরৎ দিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন সেই হইল তাঁহার বিবাহিত জীবনে বিশ্বাসভঙ্গের প্রথম ক্ষণ। তাঁহার কর্ম্ম জীবনের সহচর

বন্ধুরা সিগার মুখে দিয়া, পরম ঔদাসীন্যের সহিত, তাহাদের বার্লিন বাস কালীন সহজ প্রেমলীলার বর্ণনা কেমন নিঃসঙ্কোচে করিয়া যায়, তাহা তিনি বহুবার শুনিয়াছেন। তাহাদের সেই সব "সস্তায় ফুর্ত্তি করার" গল্প শুনিলে ধারণা হয় বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকল পুরুষই ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু এমনই কোন একটা ঘটনার পর সোজা গৃহে ফেরা, এবং ট্রেন হইতে নামিয়াই স্ত্রীকে খুসীর সহিত চুম্বন করা, যেন কিছুই হয় নাই, এ কল্পনাও তাঁহার কাছে বিসদৃশ বোধ হইত। তাঁহার বন্ধুদের ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না বলিয়া ভুলিবার মতো কোন কিছুও তাহাদের থাকে না; কিন্তু তিনি এত সহজে এরূপ কোন কাজ করিতে পারিতেন না। সংযমী বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি আছে, তাঁহার মত মান্যগণ্য ব্যক্তির যদি এরূপ কোন কিছু ঘটে, সকলের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে যে।

বিবাহিত জীবনে তাঁহার চেয়ে সুখী কে? তাঁহার পত্নী এককালে সুন্দরী ছিলেন, এখনও আছেন; তিনটি সন্তানের জননী হইয়াও তাঁহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের মহিমা লোপ পায় নাই, পরিণত বয়সের গাম্ভীর্য্যে ও পূর্ণতায় এখনও চিত্ত বিমোহিত করে। সংসার পরিচালনে তাহার পটুতা অতুলনীয়। সুগৃহিনী হইলেও বাড়ীর কাজের গল্প সে কখনও করে না, কোন্ সময় কোন্ কথা বলিতে হয়, কখন চুপ করিয়া থাকিতে হয় সে সম্বন্ধে তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান বেশ আছে, অথচ স্বামীর কাজে, কারবার ঘটিত সকল ব্যাপারে তাহার বেশ আগ্রহ আছে; আবশ্যক মত সুচিন্তিত পরামর্শ দিয়া সাহায্য করে। তাহার মতামতও বেশ উদার, চমৎকার কৌতুক বোধের সহিত রসোপলব্ধির শক্তিও আছে এবং নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় কখনও দেয় না। সহানুভূতিও তাহার নিকট সহজেই পাওয়া যায় কিন্তু ভাবপ্রবণতা তাহার সুস্থ শরীর ও মনে স্থান পায় না, সহজ ও অকপট তাহার আচরণ। স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যপ্রিয় হইলেও বাস্তবের সম্মুখীন হইতে সে দ্বিধা বোধ করে না। সকলেরই সে প্রিয়পাত্রী এবং পরিচিত সকলেই তাহার গুণে মুগ্ধ।

কিন্তু পুরুষ যখন জীবনের কোন এক সন্ধিক্ষণে এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার প্রতি সহসা বিতৃষ্ণা বোধ করে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রমণীও সে বিমুখতা দূর করিতে সক্ষম হন না। এতকাল অবধি যে ভাবে চলিয়া আসিয়াছেন, যে ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী পথে তাঁহার পদচারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে, যে পথের আর দক্ষিণে, বামে, বা ভিন্নমুখে যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই, কেবল দূরে কোন্ অন্ধকার ভবিষ্যতের

অনিশ্চয়ে যাহার অবসান হইবে, সেই জীবনযাত্রার অতি পরিচিত ধারার চিন্তাও তাঁহার অসহ্য বোধ হইতেছিল।

অতীত জীবনেও তাঁহার এমন সন্ধিক্ষণ কয়েকবার আসিয়াছে যাহার সংবাদ তিনি ভিন্ন আর কেহই অবগত নহে। তাঁহার চল্লিশ বৎসর বয়সের জন্মদিনের উৎসব-দিবস তাহার মধ্যে একটি। গ্লাস হাতে লইয়া সমাগত বন্ধুদের শুভ ইচ্ছার জন্য ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া, তিনি এক সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত বক্তৃতা দিতে যাইতেছিলেন। সেই মুহূর্ত্তে এতদিনের যে জীবন তাঁহার প্রিয় ছিল তাহার সকল যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিতে গিয়া, তিনি কিন্তু যাহা বলিতে যাইতেছিলেন তাহা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। তাহার পরিবর্ত্তে সময়োচিত কথাই তাঁহার মুখে আসিল, যাহা তিনি বলিবেন সকলে আশা করিয়াছিল। এমনই আর একটি মুহূর্ত্তের কথা তাঁহার স্মৃতিতে এখনও উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। বৎসর খানেক পূর্ব্বেকার কথা, শীতের অবকাশ যাপন করিতে তাঁহারা কায়রো গিয়াছিলেন। একদিন দেশীয় পল্লীর অতিরিক্ত আড়ম্বরপূর্ণ অথচ অপরিষ্কার পোষাক পরা লোকের ভিড়ের ভিতর দিয়া যাইবার সময়, তাঁহারা যখন বড় রাস্তা হইতে একটা আঁকাবাঁকা গলির মুখে আসিয়া পৌঁছিলেন, তাঁহার চোখে পড়িল সেখানে গভীর ছায়ার ভিতর সর্ব্বাঙ্গ পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া ছায়ামূর্ত্তির মত কাহারা চলা ফেরা করিতেছে। অকস্মাৎ তাঁহার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হইল ভ্রমণের বেশে সজ্জিতা বাহুলগ্না পত্নীর নিকট হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া, একটিও বিদায় বাণী উচ্চারণ না করিয়া সবেগে ছুটিয়া ওই বালির মধ্যে প্রবেশ করিতে, আরও পাঁচটা গলির মত এই গলিটারও অন্য কোন দিকে বাহির হইবার পথ কোথায় খুঁজিয়া দেখিতে। এইখান হইতে প্রবাহিত প্রাচ্যের ওই নামহীন জনস্রোতে ভাসিয়া মধ্য আফ্রিকার বা আরও দূরে যে কোন স্থানে গিয়া পৌঁছিতে, এসিয়ার অসংখ্য নরনারীর মধ্যে মিশিয়া যাইতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, যতক্ষণ তাহা তাঁহাকে এই সাফল্যময় সুসভ্য ভদ্র জীবন হইতে দূরে দূরান্তরে চিরকালের মত লইয়া যাইবে। তিনি কেবল ইহাই চাহেন।

এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার তীব্র আবেগ আমাদের মধ্যে কয়জন অনুভব করিয়াছে? মৃত্যু সম্বন্ধে সচেতন, জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকামী প্রত্যেক কল্পনাপ্রবণ আত্মাতেই ইহা মুকুলিত হয়; বিশেষ করিয়া পুরুষের জীবনের কোন এক ক্ষণে ইহা অদম্য হইয়া উঠে। বলিতে গেলে এই অতৃপ্তি আপন পরিবেষ্টনের

জন্য ততটা নয় যতটা নিজেকে লইয়া আপন ব্যক্তিত্বের কারাগার হইতে মুক্তিলাভের প্রয়াস—আজীবন, শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, একইরূপে বাঁচিয়া থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বাঁচিবার যে আরও অসংখ্য পন্থা রহিয়াছে।

কিন্তু বংশের ধারা ও রক্তের সম্পর্ককে তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই, পরিবর্ত্তন করাও সম্ভব নয়। তাই একমাত্র মুক্তিলাভের পন্থা হইতেছে নূতনের উদ্দেশে অভিযান। এ মুক্তির আস্বাদ মিলে অজ্ঞাত দেশের আবিষ্কারে ঘুরিবার আগ্রহে, দুস্তর সমুদ্র পার হইবার উন্মাদনায়, অপরের প্রতিকৃতিচিত্রণে প্রাণের সাড়া জাগাইতে পারিলে শিল্পী যে নিবিড় আনন্দবেদনা অনুভব করে তাহাতে, সংসার-বিরাগীর নীরব নিস্তব্ধ আশ্রমের অন্তরালে স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত নির্ব্বাসনে। এই অসন্তোষ, এই অপূর্ণতার ক্ষোভই মানুষকে প্রেমের সহজ পথ হইতে আশে পাশে প্রবঞ্চনার কুটিল পথে নামিতে প্ররোচিত করে, অবৈধ আনন্দের সন্ধানে।

এই অপরিচিতা নারী, যাহার সান্নিধ্য কেবল মাত্র তাহার প্রসাধন-সামগ্রীর সৌন্দর্য্য ও সৌরভের দ্বারাই অনুমেয়, তাঁহার নিকট সে এই নগরীর পথে যাহারা আত্মদান করে, এরূপ সহস্র সহস্র নারী অপেক্ষা শতগুণে লোভনীয়া। এ কামনার কথা কাহাকেও বলিবার নয়, কারণ এ কামজ আকর্ষণ যে কিরূপ অলীক কল্পনা তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। কর্ম্মব্যস্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মান্যগণ্য ব্যবসায়ী, পরিবারের কর্ত্তা ও সন্তানের পিতার পক্ষে এই কল্পনা-বিলাস লজ্জাকর বই কি। এরূপ লজ্জাবোধ তাঁহার বাল্যকালের পর আর কখনও হয় নাই, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার এই অস্বাভাবিক উত্তেজনা যেন আরও বাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে মোহপাশে সম্পূর্ণরূপে জড়াইয়া ফেলিতেছিল।

যে দাসী প্রত্যহ তাঁহার ঘর পরিস্কার করে সে নিশ্চয় খুব কৌতুহল বোধ করে যে, কে এই রমণী যাহার শয্যা সে নিত্য রাত্রে বিছাইয়া রাখে, অথচ কখনও যাহাকে দেখিতে পায় না। বারান্দায় সেই দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি তাহার হাতে একখানা ব্যাঙ্কনোট গুঁজিয়া দিলেন। তাঁহার হস্তমর্দ্দনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ তাহার মুখও চটুল হাসিতে ভরিয়া গেল, সে হাসি সহযোগিতার হাসি। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার কর্ণমূল অবধি লাল হইয়া উঠিয়াছে দ্রুত রক্ত সঞ্চারের ফলে, যেন তিনি কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন কিন্তু এই শেষ অবনতিও

তাঁহার মধুর বোধ হইল। দরজাটিতে ভালরূপে চাবি লাগাইয়া চাবিটি সর্ব্বদা পকেটে রাখিয়া বেড়াইতেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় স্নানের সময় তিনি অপরিচিতার সাবানখানিই ব্যবহার করিলেন। এই সাবান সেও ব্যবহার করিয়াছে—ইহাতে যেন তাহার সহিত তাঁহার প্রথম শারীরিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইল এমনই অনুভূতি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ব্যবহৃত হইলেও সাবানটিতে ইংরেজ কোম্পানীর ছাপ এখনও বুঝিতে পারা যায়। তাহার ফেনাও যেন তাহার পরিচিত সকল সাবান অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র এবং তাহার তাজা, ঈষৎতীব্র, তারুণ্যসুলভ সুগন্ধে তাঁহার স্নানের কক্ষ ভরিয়া গিয়াছে। তাঁহার আপন দেহ হইতেও সেই সৌরভ পাওয়া যাইতেছে, যাহার ফলে শয্যায় শুইয়া তাঁহার মনে হইতেছিল যেন সেই অপরিচিতার কমনীয় দেহখানি তাঁহাকে আল্‌গোছে আলিঙ্গন করিয়া শায়িত রহিয়াছে। তাহার সহিত এই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিবিড় মিলন।

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর তিনি বুঝিলেন এইবার এক অতীব প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় হইয়াছে। গত রাত্রির ঘটনা তাঁহার জীবনে এক সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। স্থির হইয়া মাথার নীচে দুই হাত রাখিয়া তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার চিন্তা তখন পত্নীকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিতেছিল, বহুদূরে যে তাঁহার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। তাহার জন্য তিনি দুঃখ বোধ করিতেছিলেন, কিন্তু এখন আর কি করিয়া কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন তাহাও তিনি ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা এবারে তিনি বেশী দিন এখানে রহিয়াছেন এবং এখন সহসা তিনি স্থির বুঝিলেন যে তিনি চিরকালই রহিয়া যাইবেন, আর ফিরিবেন না। কোন অলৌকিক ঘটনা বা দৈববল ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিবে না; কিন্তু তাহারই বা সম্ভাবনা কোথায়?

অন্যমনস্ক ভাবে তিনি পোষাক পরিলেন ও ড্রেসিং টেব্‌লের সম্মুখে বসিয়া বর্ত্তমান অবস্থার প্রকৃতি বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষেত্রে যাহা সমীচীন তিনি তাহাই করিতে চান। যাহারা ছাড়াছাড়ির সময় স্বার্থপর ও নীচের মত ব্যবহার করে তাঁহাদের তিনি ঘৃণা করেন। তাঁহার পরিবারবর্গকে তিনি স্বাধীন ও স্বচ্ছল অবস্থায় রাখিয়া যাইবেন। ইহা ঠিক হইবে যেন তিনি মরিয়া গিয়াছেন, তাহাদের কাছে তিনি মৃত। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে লোকে মরে নাকি? প্রত্যহই ত কত লোক মরিতেছে। তাঁহার এমন সব বিশ্বস্ত বন্ধু আছেন যাঁহারা অনেক

বৎসর ধরিয়া তাঁহার কারবারের কাজ চালাইয়া দিতে পারিবেন। আর অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার বড় ছেলেটিও ত মানুষ হইয়া যাইবে, এখনই তাহার সম্বন্ধে যাহা দেখা যায় তাহাতে আশা হয় তাঁহার কারবার বেশ চালাইতে পারিবে।

আচ্ছা তাহা যেন হইল, তাঁহার নিজের অবস্থা কি হইবে? চিরজীবনের অধ্যবসায়ের ফলে যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন সে কাজ ছাড়িতে কি তাঁহার কষ্ট হইবে না? বার্লিনে আসিয়া যে এত সময় কাটান সে ত সেই কারবারের জন্যই, কেবল দরদস্তুর ঠিক করিয়া, প্ল্যান করিয়া, কিরূপে তাঁহার ফার্ম্মের নূতন নূতন লাভের উপায় করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টায় ত? দীর্ঘ দিনের পরিচিত এই সুর মনের তারে বাজাইতে গিয়া তিনি দেখিলেন তাহাতে আর কোন ঝঙ্কার জাগে না।

এতক্ষণ তিনি আপনার অজ্ঞাতে সেই অপরিচিতার হাত-আয়নাখানি হাতে লইয়া ঘুরাইতেছিলেন। একবার তাহাতে তাঁহার আপন প্রতিবিম্বেও দৃষ্টি পড়িয়াছিল,—শীর্ণ, পুরুষোচিত মুখশ্রী, অধরোষ্ঠের ভঙ্গী উদারতাজ্ঞাপক। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাওয়াতে তিনি হস্তস্থিত বস্তুটি সম্বন্ধে সচেতন হইলেন, ও সঙ্গে সঙ্গেই এ কথা বুঝিতে পারিয়া বিস্মিত হইলেন যে এই সুন্দর জিনিষগুলি তাঁহার মনের উপর আধিপত্য হারাইয়াছে। ওই উজ্জ্বল, সৌখীন সবুজ বর্ণের রমণীয় পরিচ্ছদগুলি সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে, তাহাদের অস্তিত্বও আর তাঁহাকে বিচলিত করিতেছে না। উহারা কেবল প্রতীক বা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি কল্পনা করিয়াছিলেন এই অপরিচিতা রমণীর সঙ্গই তাঁহার কাম্য, কিন্তু এতক্ষণ সেই অজ্ঞাত, অপরিচিত বিরাট জগৎকে জানিবার বাসনাই তাঁহাকে অদম্য আবেগে আকর্ষণ করিতেছিল। এ কামনা তাঁহার আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইবার কামনা, মুক্ত, বন্ধনহীন হইয়া নূতন পন্থা নির্ব্বাচনের, জীবনযাত্রা পুনরায় নূতন করিয়া আরম্ভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

বাল্যকালের কথা তাঁহার ক্বচিৎ কখনও স্মরণ হয়, কিন্তু আজ বাল্যজীবনে পঠিত একটি পুস্তকের এক পৃষ্ঠা যেন তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে স্পষ্টাক্ষরে ভাসিয়া উঠিল। এমন কি বাল্যাবস্থায় পাঠকালে তাহাতে যেখানে নীল পেন্সিলের দাগ দিয়াছিলেন সেই দু ছত্র কবিতা—যাহা আজ ত্রিশ বৎসরের ভিতর তাঁহার মনে পড়ে নাই—যেন তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন—

সেই ত স্বাধীন, যে পারে বাছিতে
আপন চলার পথ।

(৩)

তাঁহার ব্যবসায় সংক্রান্ত সকল কাজই সারা হইয়া গেলেও তিনি ফিরিবার উদ্যোগ করিলেন্ না। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেও তাঁহার অভিরুচি হইল না, একাকী আপন চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলেন। দুইখানি সংক্ষিপ্ত পোষ্টকার্ড ভিন্ন বাড়ীতেও তিনি আর কোন সংবাদ দিলেন না।

সারা বিকাল তিনি বরফে ঢাকা সরকারী বাগানে এধার হইতে ওধার দ্রুত পদচারণ করিয়া কাটাইলেন। সন্ধ্যার আলোক যখন মিলাইয়া আসিল, তখন হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার কক্ষের দ্বারে সংলগ্ন চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গেলেন। ইদানীং তিনি আর বাহির হইবার সময় চাবি সঙ্গে লইবার প্রয়োজন বোধ করিতেন না। দরজা খুলিয়াই তাঁহার বোধ হইল ভিতরে অপর কেহ রহিয়াছে, নিশ্বাস রূদ্ধ করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন কোন নারীর রোদন-ধ্বনি ; মৃদু শব্দ, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যাইতেছে। আলোটী জ্বালিয়া দেখিতে পাইলেন তাঁহার পত্নী ড্রেসিং টেব্‌লের কাচনির্ম্মিত উপরিভাগে সজ্জিত প্রসাধন সামগ্রীর ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়া আছেন ; রুদ্ধ রোদনের আবেগে তাঁহার শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে ঘরের সর্ব্বত্র তিনি একবার দৃষ্টি বুলাইয়া লইলেন। রাত্রি যাপনের উপযুক্ত করিয়া ঘরখানি সাজানো, সবুজ রেশমের ড্রেসিং গাউনটি তেমনই ভাবে আর্ম্মচেয়ারের হাতলের উপর ভাঁজ করিয়া রাখা, স্বচ্ছ, সুন্দর রাতের পরিচ্ছদটি বিস্তৃত শয্যায় তেমনি বালিশের ধারে রহিয়াছে, স্লিপার জোড়াও যথাস্থানে অপরিচিতার খালি পা দুখানি বুকে লইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

দুইজনের কেহই নড়িল না বা কোন কথা কহিল না। তাঁহার স্ত্রী তাহা হইলে আসিয়াছে তাঁহাকে লইয়া যাইতে। এমন ত আরও কয়েকবার সে আসিয়াছে। এ আসায় কোন সন্দেহের পরিচয় নাই, কেবল তাঁহাকে অবাক করিয়া দিয়া আনন্দ দিবার জন্যই এ অতর্কিত আগমন। হোটেলে পৌছিয়া তাঁহার ঘর খুঁজিয়া লইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে ; এবং যে দৃশ্য তাহার চোখে পড়িয়াছে তাহাতে চমকিত ও মর্ম্মাহত হইয়া সে অমন ভাবে লুটাইয়া পড়িয়াছে। কতক্ষণ এই অসহনীয় দুঃখ সে ভোগ করিতেছে কে জানে। এ যে কি অবস্থা তাহা কি করিয়া তিনি তাহাকে বুঝাইয়া বলিবেন, যাহা বলিবার আছে সে-সত্য যে ইহা অপেক্ষা আরও কঠিন আরও দুঃখদায়ক। যাহা কল্পনা করিয়া তাহার এই অশ্রুবর্ষণ তাহা তো অলীক, কিছুই ঘটে নাই কিন্তু কোন্ উপায়ে তিনি তাহার

মন হইতে এ চিত্র মুছিয়া ফেলিবেন ভাবিয়া পাইতেছিলেন না। মিথ্যা বলিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই, ঘটনাচক্রে জড়াইয়া পড়িয়াছেন বলিয়া তাহাকে আঘাত দিতে তাঁহার দ্বিধাবোধ হইতেছে, কিন্তু এই সুযোগ হারাইলে ত চলিবে না। এখনই এই মুহূর্তে তাঁহাকে জানাইতে হইবে সে কথা, যাহা অতি দুঃখেও সে কল্পনা করিতে পারে নাই। বালকের আপন দোষ স্বীকারের মত তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে তাঁহার মনের গোপন চিন্তা, তাঁহার অতৃপ্তি, তাঁহার মানসিক যন্ত্রণা, তাঁহার মুক্তি-লাভের ব্যাকুলতা। এই সব প্রসাধন দ্রব্য ও রেশমী পরিচ্ছদের সৃষ্ট ভ্রান্তি কাটাইতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে এক বিরাট আতঙ্ক, এক জীবন মরণের সমস্যা, তাঁহার এই পরিণত বয়সে তাঁহাকে আবার লাঠি হাতে লইয়া পরিব্রাজকরূপে পথে বাহির হইতে বাধ্য করিতেছে। কিন্তু সত্যই কি তাহা সম্ভব হইবে? আপন আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া, আপন সন্তান—যাহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত আশা পোষণ করিতেছেন—তাহাদের ছাড়িয়া, পতিব্রতা, নির্দ্দোষ, এতদিনের সুখদুঃখের সহভাগিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে কি কেহ পারে? পারুক বা না পারুক, উচিত বা অনুচিত যাহাই হউক, লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয় হউক, তাঁহাকে যাইতেই হইবে। এক দৈববল ব্যতীত আর কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না।

এমন সময় তাঁহার স্ত্রী মাথা তুলিতে তিনি তাহার দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া রোদনরতা রমণীকে দেখিতে সুন্দর মনে হয় না, হতাশা ও ভীতির সংমিশ্রনে তাহার মুখ আরও হতশ্রী দেখাইতেছে। মাথার চুল আলুথালু হইয়া একগুচ্ছ তাহার রোদনস্ফীত চোখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, হাত দিয়া তাহা সরাইয়া সে তাঁহার দিকে চাহিল। প্রথমে তাহার কম্পিত অধরোষ্ঠ হইতে নিঃসৃত কোন কথা শ্রুতিগোচর হইতেছিল না, ক্রমে ভাঙ্গা গলায় সে মৃদুস্বরে বলিল—এইখানে তোমার হোটেলে—সে বাস করছে রীতিমত তোমার সঙ্গে—কি ভয়ানক কথা, –

এই ত তাহাকে সকল কথা জানাইবার পরম সুযোগ। এই মুহূর্ত্তে দুই ছত্র কথায় সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইতে পারিত। শত চেষ্টাতেও কিন্তু তিনি সে কথা উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। মমতায় তাঁহার মন পূর্ণ হইয়া গেল ও এ অবস্থায় পড়িলে সকলেই যাহা বলিয়া থাকে তিনিও তাহাই বলিলেন। —এখানে কোন স্ত্রীলোক ছিল না।

সে উঠিয়া দাঁড়াইল ও সেই রাত্রির প্রেমাভিসারের সুস্পষ্ট পরিচয়-মুখর ঘরখানি হইতে দৃষ্টি তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, এখনই তাহার অবিশ্বাসের ব্যঙ্গপূর্ণ হাসির ধ্বনি তাঁহার কাণে আসিবে। তাহার পরিবর্ত্তে দেখিতে পাইলেন তাহার মুখ হইতে বেদনার চিহ্ন ক্রমে অপসৃত হইয়া, বর্ষণক্ষান্ত আকাশে রৌদ্রালোকের মত অশ্রুসজল হাসির আভাস দেখা যাইতেছে। —সত্যি বলছ? কেউ ছিল না? তাহার সাগ্রহ প্রশ্ন কাণে আসিল।

—না। শপথ করছি।

—তাহলে মিছামিছিই আমি এতক্ষণ কেঁদে ভাসালাম? আঃ ভগবানকে ধন্যবাদ। সে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার দুই হাত ধরিল। কণ্ঠস্বরে যেন তাহার আহ্লাদে উচ্ছ্বসিত। তাঁহার সমস্ত মন দুলিয়া উঠিল, এক বেদনাময়, অসহনীয় আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইল।

এই তো সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত দৈববর, তাঁহার প্রতি তাহার এই অপরিসীম বিশ্বাস। আলোকোজ্জ্বল এই কক্ষের এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহার কথার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়, এমনই অলৌকিক দৃঢ় সে বিশ্বাস। সুটকেসের জিনিষগুলি, অপরিচিতা রমণীর পরিচ্ছদ ও প্রসাধন সামগ্রী, কিছুই আর তাহার চোখে পড়িতেছে না; তাঁহার আশ্বাস বাণীর ফলে তাহাদের অস্তিত্ব অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। সে আর কোন কৈফিয়ৎ কি প্রমাণ প্রয়োজন মনে করে না।

এই যে বিশ্বাসের চরম পরিচয়, এই সম্পূর্ণ একাত্মবোধের পরম আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা, ইহার চেয়ে অধিক আর জগৎ তাঁহাকে কি দিতে পারে? অলৌকিক দৈববল কি ইহাই নহে? জীবনের শেষ সময় অবধি সবল ও সুস্থ থাকিয়া, লাঠি হাতে লইয়া, তিনি যদি পৃথিবীর পরম বিস্ময়াবহ অভিজ্ঞতার সন্ধানে পর্য্যটনে বাহির হইয়া বসুন্ধরার এ প্রান্ত হইতে ওপ্রান্ত অবধি প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান, ইহার চেয়ে শ্রেয় আর কোন প্রার্থিত বরের সন্ধান মিলিতে পারে? জীবনের যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান সে বরলাভ তো তাঁহার এইখানেই হইয়া গিয়াছে।*

অমলা দেবী

* ব্রুণো ফ্রাঙ্কের "সুটকেস্" গল্পের অনুবাদ।

পুরানো কথা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ক্রমাগত কাজী কোটালের গল্প শুনে পাঠক মণ্ডলী নিশ্চয় বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। হয়ত বা ভাবছেন, এ লোকটা কি হাকীম বড় সাহেব ছাড়া আর কোন মানুষ কখন চোখে দেখে নেই। এ রকম বদনাম মিছে মিছি ঘাড় পেতে নেব কেন! তাই পাঠককে এবার সম্পূর্ণ নূতন আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে যাব, ও একেবারে নূতন রকমের মানুষের সঙ্গে পরিচয় করে দেব। নূতন বলছি বটে, কিন্তু সত্যি পুরাতন, অতি পুরাতন। ইংরেজী ১৮৬১ সাল। বছর চারেক আগে বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। আমার পিতা ঠাকুর নূতন বি-এ ও বি-এল পরীক্ষা পাস করেছেন। বড় সাধ, উকীল হবেন। কিন্তু সেজন্য বেশ কিঞ্চিৎ টাকার প্রয়োজন, কেন না পাঁচশো টাকা জমা না দিতে পারলে হাইকোর্টে নাম লেখান যায় না। উত্তর-পাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাবাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি টাকাটা কর্জ্জ দিতে চাইলেন। কিন্তু বাবা পরের টাকাতে উকীল হতে একেবারে নারাজ। বাড়ীর থেকে টাকাটা পাওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই, তা বাবা জানতেন। অতএব কিছুদিনের জন্য একটা চাকরী নিয়ে দরকারী টাকা জমান ছাড়া উপায় ছিল না। বাবার এক মুরুব্বী ছিলেন খ্যাতনামা পণ্ডিত ই বি কাউএল সাহেব। তিনি বাবাকে সংস্কৃত কলেজে অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করে নিলেন। ব্যাপারটা হল একেবারে কারসাজী, যাকে ইংরেজীতে বলে Jobbery। কেন না নবীন অধ্যাপক এক অক্ষরও সংস্কৃত জানতেন না। তা, এ রকম ব্যাপার ত আগে ঢের হত। আজকালই হয় না!

চাকরী পেয়ে বাবা দেশে গেলেন, পিতামহ মহাশয়কে প্রণাম করতে। গ্রামের লোক তাঁকে খুব আদর যত্নপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করলে। সহজ কথা কি, বি-এ, বি-এল পাস! তখনকার দিনে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যাতে জনদশেকের বেশী ছিল না। পরদিন সকাল বেলায় ঠাকুরদা মশায় ছেলেকে নিয়ে বৈঠকখানাতে আসর জমকে বসলেন। চারিদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভদ্রমণ্ডলী সমাসীন। চাষাভুসো, চৌকীদার পাইকেরাও এসেছে। আপন আপন পদমর্য্যাদা অনুসারে কেউ দাওয়াতে,

কেউ উঠানে, বসেছে। সবাইকার মুখে হাসি। সবাইকার বুক ফুলে দশ হাত হয়েছে। ইংরেজীতে চারচারটে পাস করে ছেলে ঘরে এসেছে। আশপাশের গাঁয়ের লোক হিংসাতে ফেটে মরবে। আর মেড়ালকে কেউ গণ্ডগ্রাম বলতে সাহস পাবে না!

পিতামহের সামনে একটা সুতো বাঁধা বড় গোছের কাগজের মোড়ক পড়ে রয়েছে। তিনি হেসে বললেন, "ভট্টাচার্য্য মশায়, ছেলে আমার জন্য কি এক জোড়া বিলেতী জুতো এনেছে। বেটা বাপকে বুড়ো বয়সে সাহেব সাজাতে চায় আর কি!" সকলে "কই, দেখি দেখি" করে উঠলেন। কাছে গ্রামের সরকারদের বাড়ীর এক ছোকরা বসেছিল, কর্ত্তা তাকে হুকুম দিলেন, "খোল্ ত বেহারী! দেখি, কি জুতো।" মোড়ক খোলা হল। ভিতর থেকে বেরোল এক জোড়া কালো হুড বার্নিশের ইংরেজী শূ জুতো, দিব্যি ছুঁচোল মুখ, দুপাশে রবারের ইস্প্রিং। সে রকম ব্যাপার, পরা দূরে থাক, গাঁয়ের কেউ কখন চোখেও দেখে নেই। কর্ত্তা এক পাটি জুতো হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, "দেখতে ভারী সুন্দর ত হে! কিন্তু ওর ভিতর পা ঢুকবে কেমন করে? আচ্ছা, ধর ত বেহারী।" তার পর খানিকক্ষণ খুব ধস্তাধস্তি চলল, কিন্তু পিতামহের অনভ্যস্ত পা কিছুতেই ঢুকল না সেই সংকীর্ণ সাহেবী জুতোর মধ্যে। একজন বয়স্থ ঠাট্টা করে বললেন, "কর্ত্তামশায়, পা দুটো বাটালী দিয়ে একটু চেঁচে ছুলে না নিলে ওতে ঢুকবে না।" কর্ত্তা নাছোড় বান্দা। হেসে জবাব দিলেন, "ছেলে অত সাধ করে জুতো এনেছে, ও আমাকে পরতেই হবে। রোসো, একটা ফিকির ঠাউরেছি। বেহারী, গোটা দুই পেরেক আর একটা হাতুড়ী নিয়ে আয় ত! দেখিয়ে দিচ্ছি কি করতে হবে।" পেরেক হাতুড়ী এলে পর, গোড়ালীর দিকটা হাতুড়ী পিটে, পেরেক ঠুকে, শূ জোড়াকে রীতিমত চটি বানিয়ে ফেলা হল, তখন কর্ত্তা দাঁড়িয়ে উঠে সেই রূপান্তরিত বিনামা পরে উঠানে গটগট মসমস করে খানিকটা খুব পায়চারি করলেন। সবাই সসম্ভ্রমে চেয়ে দেখতে লাগল।

এ পর্য্যন্ত ত হল comedy। এর পরে যা ঘটল সেটাকে tragedy-ও বলা যেতে পারে। নূতন জুতো পরার সাধ মিটলে কর্ত্তা এসে আবার আসরে বসলেন। এ কথা সে কথার পর ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার পর বাবাজী এখন কি করবে, কিছু মতলব ঠাউরেছ?" বাবা বললেন, "আজ্ঞে, সদর আদালতে

ওকালতী করব ঠিক করেছি। আপাততঃ মাস কয়েকের জন্য একটা চাকরী নিয়েছি।" কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করলেন, "চাকরী নিয়েছিস! কই, আমাকে কিছু লিখিস নেই ত! কি চাকরী?" বাবা একটু আমতা আমতা করে উত্তর দিলেন, "প্রফেসর হয়েছি"। কর্ত্তা বললেন, "পেফেসর! সে আবার কি? বাঙ্গলায় বুঝিয়ে বল্।" "আজ্ঞে, কলেজে ছেলেদিকে পড়াতে হয়।" পিতামহের চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, "ছেলে পড়াতে হয়, গুরুমশায়গিরি! ভদ্রবংশের ছেলে হয়ে গুরুমশায়-গিরি নিতে লজ্জা হল না! হতভাগা, এর নাম ইংরেজী শিখেছিস, চারটে পাস করেছিস! যা, এক্ষণই কলকাতায় ফিরে গিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আয়। নইলে আর আমাকে মুখ দেখাস না।" বাবা মাথা হেট করে বসেছিলেন ধীরে ধীরে বললেন, "সে কি করে হবে, বাবা! উকীল হতে হলে আমাকে পাঁচশো টাকা জমা—" কর্ত্তা লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বললেন "তবে রে, আমার মুখের উপর কথা কইতে আসিস দু পাতা ইংরেজী পড়েছিস বলে! এখনই—" বলে নূতন জুতো এক পাটি তুলে বাবার দিকে সজোরে ছুড়লেন। একটু পরে দেখা গেল, গাঁয়ের সদর রাস্তা দিয়ে বাবা ছুটে পালাচ্ছেন, আর বৃদ্ধ ঠাকুরদা মশায় হাতে দ্বিতীয় পাটি জুতো নিয়ে তাঁকে খেদিয়ে চলেছেন। যাক, শেষ পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও অন্য কর্ত্তারা ঠাকুরদাকে ধরে বাড়ী ফিরে নিয়ে গেলেন। কিন্তু বাবাকে ফেরান গেল না। তিনি এক ছুটে তাঁর মামার বাড়ী বল্লা গ্রামে গিয়ে উঠলেন। এক বেহারী সরকার শুধু তাঁর সঙ্গ ছাড়লে না।

এই Serio-comic ঘটনার ফলে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাবাকে প্রফেসারী ছেড়ে দিতে হল। ওকালতী করার সাধও মিটল না। কাউএল সাহেবই চেষ্টা চরিত্র করে বাবাকে একটা হাকীমগিরি জুটিয়ে দিলেন। কর্ত্তার আর তখন ছেলের উপর রাগ অভিমানের কোন কারণ রইল না। কিছুদিন বাদে যখন ছেলে সপরিবারে পূর্ব্ববঙ্গে হাকীমী করতে বেরোলেন, তখন কর্ত্তা আদর করে তাঁদের সঙ্গে পাঠালেন সরকারদের বাড়ীর বেহারী বলে সেই চালাক চতুর ছেলেটীকে।

আজ এই বেহারী সরকার মশায়েরই দুচারটে গল্প বলব বলে এত বড় ভূমিকার পত্তন করলাম। আমাদের কাছে ইনি চিরদিন সরকারদাদা নামে পরিচিত ছিলেন। শুধু যে নামেই দাদা ছিলেন, তা নয়। ছেলেবেলায় মানুষ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যে সব জিনিস পায়, যা কিছু শেখে, আমরা তা এঁরই কাছ থেকে পেয়েছিলাম। এঁর

স্নেহের ঋণ কোন দিন শোধ করতে পারি নেই, পারবও না। উপরে যে গল্পটা করলাম তার চৌদ্দ পনের বছর পরে আমার সঙ্গে মর্ত্ত্যলোকের পরিচয় আরম্ভ হল। সরকার দাদা তখন কুচবেহারে আপন আসনে পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত। শুধু যে দেওয়ানখানাতে সর্ব্বেসর্ব্বা, তা নয়। তাঁর পরামর্শ, তাঁর সহায়তা, নইলে সে কালে কারও বাড়ীতে কোন ক্রিয়া-কর্ম্ম পাল-পার্ব্বন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হত না। আর তিনিও নীরবে অকাতরে সকলের কাজ করে বেড়াতেন। তাই বলে মানুষটী মোটেই নীরব ছিলেন না। বরং, সেকেলে মানুষ, হাঁক ডাক যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কখনও নিজের ঢাক পিটতেন না। মুনিব সুখ্যাতি করলে ছোট ছেলের মতন লজ্জায় মাথা হেট করতেন। শুধু প্রভুভক্ত বা নিমকহালাল বললে সরকারদার বর্ণনা করা হয় না। কম বেশী ষাঠ বছর আমাদের বাড়ীতে ছিলেন বটে, কিন্তু মনিব পরিবারের মন জোগাবার জন্য মিষ্টি কথা বলার অভ্যাস কখন করেন নেই। বাবার সুমুখে পর্য্যন্ত তাঁকে অপ্রিয় সত্য কথা খুব সোজা ভাবে বলতে শুনেছি। আর এক মস্ত গুণ তাঁর ছিল, যেটা সাধারণতঃ ও রকম লোকের দেখা যায় না। অন্য চাকর বাকরদের উপর কখন জুলুম করতেন না, তাদের সুখদুঃখ সর্ব্বদা দেখতেন। সুবিধা পেলেই তাদের হয়ে দুটো ভাল কথা কর্ত্তার কাছে বলতেন। তারা দোষ করলে নিজেই তার প্রতিবিধান করতেন, পারত পক্ষে কর্ত্তাকে কিছু জানাতেন না। শুধু চাকরদের কথা কি বলছি, আমাদেরও অভাব, অভিযোগ, ন্যায় অন্যায় আব্দার সরকারদাকেই প্রথমে জানাতাম। তিনিই মা বাবাকে বলতেন। অবশ্য এ সব কথা যে বলছি, এ সরকারদার জীবনের মধ্যাহ্নের কথা। শেষ কয়েক বছর অন্ধ ভগ্নশরীর হয়ে যখন আমার ভাইয়ের কাছে পড়ে থাকতেন, তখন ত তিনি অর্দ্ধেক মানুষ! তবু তখনও এতটুকু মিথ্যাচারের ধার ধারতেন না, মিথ্যা কথা একটা বলতেন না।

কুচবেহারে থাকতে চিরদিন আমাদিকে এটা ওটা সুন্দর কিন্তু অদরকারী জিনিস বাজার থেকে কিনে এনে দিতেন। পূজার সময়, জন্মতিথিতে, শান্তিপুরে কি ঢাকাই কাপড় দিতেন। বাবা একবার এজন্য তাঁকে বকেছিলেন, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে উত্তর দিয়েছিলেন, "আমি আর টাকা পয়সা কোথায় পাব! আপনার বাজার খরচ থেকে যা চুরী করি, তাই থেকে এনে দিই বই ত নয়।" এর উপর কি আর কোন কথা চলে! আমি বিলেত যাবার সময় যে সব বিদায়ী উপহার পেয়েছিলাম, তার মধ্যে সরকারদার জিনিসই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট হয়েছিল। নিজে ঘুরে

ঘুরে পছন্দ করে সাহেব বাড়ী হতে পনের টাকা দিয়ে এক মরক্কো চামড়ার পকেট বই এনে দিয়েছিলেন। যখন ফিরে এসে সেই পকেট বই তাঁকে দেখালাম, তখন বৃদ্ধের কি আনন্দ! কিন্তু সরকারদার উপহার জীবদ্দশাতেই শেষ হয় নেই। মৃত্যুকালেও আমার বড় ভাইপোকে স্নেহ উপহার স্বরূপ একহাজার টাকা দিয়ে গেলেন।

সরকারদা বাড়ীর Steward হিসাবে অসাধারণ কাজের লোক ছিলেন, এ বলাই বাহুল্য। নইলে আমাদের কুচবেহারের ঘরকন্না এত কাল চালাতেই পারতেন না। কিন্তু তিনি ত শুধু হুকুম চালিয়ে তুষ্ট থাকতেন না। সব কাজই নিজে করতে পারতেন, ও করতেন। Chef বা সৌখীন পাচকের কাজে তাঁর সমকক্ষ আমি কমই দেখেছি। বাঙ্গলা, ইংরেজী, মোগলাই, সকল রকম রান্নাতেই তিনি সমান ওস্তাদ ছিলেন। কুচবেহারে বসে আমাদিকে ভীম নাগের সন্দেশ, বর্দ্ধমানের মিহিদানা ও বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াতেন। সেকালে বৎসরে একবার মহারাজ আমাদের বাড়ীতে ঘটা করে খেতে আসতেন। সে ভোজের আয়োজন বিশাল রকমের হত। আহার্য্য দ্রব্যের রকমারি অন্যূন তিন শো থাকত। তার মধ্যে বাছা বাছা সৌখীন পদার্থ অনেকগুলোর ভার নিতেন সরকারদা নিজে। মহারাজ সমজদার খাইয়ে লোক ছিলেন, তিন শো রকমের জিনিস সবই একটু একটু চাখতেন। একবার হল কি, খেতে খেতে মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, "দেওয়ানজী, আমি ত জানতাম না যে আপনার কাশ্মীরী পাচক আছে।" বাবা উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে না, আমার ত কাশ্মীরী বামুন নেই।" নৃপবর বললেন, "সে কি কথা, মহাশয়! এই দেখুন, এই রেকাবীতে যা দেওয়া হয়েছে, সব উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী খাদ্য।" সরকার মহাশয়ের ডাক পড়ল। মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "বেহারী, এগুলো কে রেঁধেছে হে?" বেহারী জোড় হাত করে উত্তর দিলেন, "হুজুর ধর্ম্মাবতার! এই গোলামেরই রান্না।" "তুমি এ সব রান্না কোথায় শিখলে?" "ধর্ম্মাবতার! গেল বছর কলকাতার এক বাবু এসেছিলেন কাশ্মীরী বামুন সঙ্গে নিয়ে। কদিন পাকঘরে বসে বসে তার রান্না দেখে নিয়েছিলাম।" সে বছর সরকারদা মহারাজের কাছে পাঁচ থান মোহর বকশীশ পেলেন।

এ ত গেল রান্না-বাড়ার ব্যাপার! চাষ বাস, গরুর সেবা, মাছ ধরা, এ সবেও ভদ্রলোকের রোজ কম সময় কাটত না! তার উপর খুচরো কাজ কত রকমের

ছিল। বাবার জন্য হুঁকোর তামাক সরকারদা নিজে হাতে তৈরী করতেন। এত সুন্দর হত সে তামাক, যে বাবা বাহিরে গেলে সেই তামাকই সঙ্গে নিয়ে যেতেন। মাছ ধরাটা ছিল সরকারদার একটা মস্ত ব্যসন। বড় জাল, খেপনী জাল, ছিপ, এমন কি হাত সুতোর সাহায্যে লুকিয়ে সরকারী পুকুরের মাছ মারা তাঁর নিত্যকর্ম্ম ছিল। কখন কালেভদ্রে একখানা ছিপের পাস নিতেন বটে, নইলে সবটাই চলত বিনা পাসে। এই নিয়ে পুলিসের সঙ্গে খিটির মিটির লেগেই ছিল। তবে তারা মহা-পরাক্রান্ত সরকার মশায়কে এঁটে উঠতে পারত না। পুলিস সাহেবের কাছে নালিশ পৌঁছলে তিনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। একবার কিন্তু পুলিস খুব সুযোগ পেয়েছিল ওঁকে জব্দ করার। আমাদের একটা বেশ বড় সবজী বাগান ছিল। সেটা সম্পূর্ণ সরকারদার তাবে থাকত। তিনি সেখানে নানা রকমের ভাল ভাল বীজ আনিয়ে তরী-তরকারীর চাষ করাতেন। একবার কি সখ হল, আফিমের চাষ করলেন। আমাদিকে বললেন, এইবার বাবুকে বাগানের তাজা পোস্তদানা খাওয়াব। ক্ষেতে যেই সুন্দর লাল লাল ফুল ফুটে উঠল, পুলিসের লোক একেবারে এসে বাবার কাছে এত্তেলা দিলে, হুজুরের বাগানে সরকার মশায় আফিমের আবাদ করেছেন। বাবা চটে অস্থির হয়ে বললেন, "ধরে নিয়ে যাও ওকে। আর পারি না, কোন আইন মানবে না! জ্বালাতন করলে!" সরকারদাকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস সাহেবের সামনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বেহারী বাবু, তুমি এ রকম কাজ কেন করলে? এতে দেওয়ানজীর ইজ্জতের হানি হয় জান না!" সরকারদা ন্যাকা সেজে উত্তর দিলেন, "সাহেব ওতে কোন কসুর হয়, আমি তা জানতাম না। হুজুরের নিজের ফুল বাগানেও ত ঐ গাছ কত লাগান হয়েছে! আমি গরীব বলে···।" তারপর সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বাবার নিজের সখের ফুল বাগানের poppy ফুলের গাছ সব দেখিয়ে দিলেন। বাবাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ও পুলিস সাহেব দুজনেই হেসে উঠলেন। বাবা বললেন, "সরকার, ও ত বিলেতী ফুলের গাছ। ওতে আফিম হয় না।" সরকারদা অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "আমিও ত ফুলের শোভার জন্য গাছ লাগিয়েছি, হুজুর। আফিম আমি করব কেন বলুন! আমার কিসের অভাব!" পুলিস সাহেব সরকারদাকে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে ভদ্র-লোক থানায় গিয়ে দারোগাকে জানিয়ে এলেন, "পারলেন কিছু করতে আমার? ফের গোলযোগ করেন ত খোদ মহারাজাকে বলে দেব। বুঝলেন?"

আমাদের ছোট বেলার লেখাপড়াও চলত সরকারদার তত্ত্বাবধানে। খাগের কলম ও ঝিয়ানী কালী দিয়ে বাঙ্গলা মক্স করতে হত ইংরেজী ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পরেও। যখন ইস্কুলে ইংরেজীতে G. C. M. কষছি, তখনও তাঁর কাছে শনি রবিবারে শুভঙ্করী চর্চ্চা নিয়মিত চলছে। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার চেয়েও অনেক বড় জিনিস সরকারদার কাছে শিখেছিলাম। দুটী উপদেশ তিনি সদা সর্ব্বদা দিতেন। একটা এই যে, কখন ভুলবে না কোন ঘরে তোমাদের জন্ম, মনটা সর্ব্বদা বড় রাখবে। আর দ্বিতীয় এই যে, দেওয়ানের ছেলে বলে গাড়ী ছাড়া নড়তে পারবে না, এ যেন কখন না হয়।

সরকারদার ভাই বোন কেউ ছিল না। আমার মা জোর করে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন, বৌকে গ্রামে নূতন বাড়ী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে বৌয়ের সঙ্গে ঘর করাতে কেউ কখন পারলে না। কেবল বলতেন, ও সব আমাকে তাড়াবার ফন্দী, কিন্তু আমি গেলে ত ! বাবা একবার জোর করে বললেন, "সরকার, তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ, তোমাকে দিয়ে আর কাজ চলছে না। তুমি গ্রামে গিয়ে বাস কর।" সরকারদা মুখের উপর জবাব দিলেন, "বেশ, আপনার দরকার না থাকে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু গাঁয়ে কক্ষণ যাব না। হোসেঙ্গাবাদে, গয়াতে, দিদিরা আছে, বোম্বাইয়ে বড় বাবু আছে, আমার যেখানে খুশী থাকতে পারি ! নাই বা আপনি রাখলেন !" বৃদ্ধ পরদিন মান করে চলে গেলেন গয়াতে আমার দিদির কাছে, সেইখানেই রইলেন। এক বৎসর পরে আমি যখন ছুটীতে কুচবেহারে গেলাম, তখন অনেক সাধ্যসাধনা করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। আর কেউ কখন তাঁকে বৌয়ের ঘর করতে পাঠাতে চেষ্টা করে নেই। প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে গেল, কিন্তু আশা করি আমার এই দরিদ্র বন্ধুর গল্প পাঠকের মন্দ লাগল না।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত

ইউরোপে সমর-সঙ্কট

১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনে ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া ইথিওপীয় সম্রাট হেল সালিশী বলিয়াছিলেন, "God and history will remember your judgment"। যাহাদের বিচার ও বিবেকের উদ্দেশে এই উক্তি তাহাদের কার্য্যকলাপ ও আচরণ দেখিয়া মনে হয় না যে একথা তাঁহারা শুনিতে পাইয়াছিল। ফাশিজ্‌মের সুরায় উন্মত্ত সেই প্রাচীন রোম সামরিক সজ্জার শৈল-শিখরে আরোহণে শশব্যস্ত—আবিসিনীয়দের ক্রন্দনে তাহার মন চঞ্চল হয় নাই বা অশ্রুতে তাহার পথ পিচ্ছিল হয় নাই। ভের্সাই সন্ধির বন্ধন ছিন্ন করিয়া হিটলারীয় জার্ম্মানী সামরিক প্রাধান্যের দিকে মরণোল্লাসে ছুটিয়াছে। প্রাচীন স্পেন বৈদেশিকের প্ররোচনায় নিষ্ঠুর অন্তর্বিপ্লবে মশগুল হইয়া রহিয়াছে। চীন অশান্ত, রুশিয়া শক্তিমান হইবার আপ্রাণ চেষ্টায় নিরত, জাপান এসিয়ার প্রাঙ্গণে শ্রেষ্ঠ সমর সজ্জায় দণ্ডায়মান। ফ্রান্স প্রতিকূল প্রতিবেশীর মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের সামরিক অস্তিত্ব বজায় রাখিতে তৎপর। গ্রেটব্রিটেন শান্তিবার্ত্তা প্রেরণ করিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছে ও ইতিমধ্যে নিজের সামরিক আয়োজন ষোল-কলায় পূর্ণ করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের সামরিক অবস্থার হিসাব-নিকাশে নিযুক্ত।

ইহা সত্ত্বেও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন ও অস্তিত্ব বজায় রাখা হইয়াছে। মাঞ্চু-রিয়া ও আবিসিনীয়ার সমস্যায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ জর্জ্জরিত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষীণকণ্ঠে শান্তির বাণী উচ্চারণ করিতেছে। দেখিয়া মনে হয় যে ইউরোপের শক্তিবর্গ রাষ্ট্রসঙ্ঘের নাভিশ্বাসে বিলাপ করিতে বসিয়াছে।

১৯২৫ সালে লোকার্ণো চুক্তির সময় (Locarno Pact), ব্রিঁয়া (M. Briand), ষ্ট্রেসম্যান (Herr Stresemann) ও হেণ্ডারসনের (Arthur Henderson) শান্তি স্থাপনের লম্বা "বুলি" সত্ত্বেও শক্তিবর্গ সামরিক সজ্জায় তিন হাজার পাঁচশত মিলিয়ন স্বর্ণ ডলার খরচ করিয়াছিল। ১৯৩০ সালে অর্থ ও শিল্প সঙ্কটের দিনেও এই ব্যয়ের পরিমান ছিল চারহাজার তিনশত মিলিয়ন ডলার। ১৯৩৩ সালে হিটলারের ক্ষমতা পাওয়ার সঙ্গে ইহার পরিমাণ চার হাজার নয়শত

মিলিয়ন ডলার। ১৯৩৫ সালে এই সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ পাঁচ হাজার চারিশত মিলিয়ন ডলার। ১৯৩৬ সালের হিসাবে দেখা যায় যে এই ব্যয় ১৯২৫ সাল অপেক্ষা দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া সাত হাজার পাঁচশত মিলিয়ন স্বর্ণ ডলারে দাঁড়াইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৩ সালের সামরিক ব্যয় অপেক্ষা ইহা সার্দ্ধ তিনগুণ অধিক।

১৯২৮ সালে সংগ্রাম বর্জ্জন করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া প্যারিস চুক্তি (Paris Pact) হয়—ইহাতে সমরসজ্জাও নিন্দনীয় বলিয়া মত প্রকাশ করা হয়। ১৯২৯ সালে কেলগ্ চুক্তিতে (Kellog Pact) বৈদেশিক রাষ্ট্রে হস্তক্ষেপ করাও নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য করা হয়। ইহা সত্ত্বেও Quaterly Review হইতে জানা যায় যে জাপান সামরিক সজ্জায় ১৯২৮ সাল অপেক্ষা বর্ত্তমানে দ্বিগুণ ব্যয় করিতেছে। আমেরিকার শতকরা আটত্রিশ গুণ সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ও আমেরিকার আইনসভা (Congress) এই বৎসরে গত আঠারো বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সামরিক ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। তবুও প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বলেন, 'I hate war' (Speech at Chantauqua)! ফ্রান্সের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা আটান্ন গুণ, সেই জন্যই প্রধান মন্ত্রী মঁসিয়ে ব্লুম ((M. Blum) বলেন, "I say that France is materially stronger. She still possesses...the most powerful military force in continental Europe except for Russia"। ১৯২৮ সাল অপেক্ষা গ্রেট ব্রিটেনের সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ঊনচল্লিশ গুণ। মিঃ এন্থনি ইডেন শান্তিবার্ত্তার অগ্রদূত বলিয়া জেনিভায় গণ্য হইলেও, London "Times" বলেন যে, "England's final contribution to organised peace is the speediest possible completion of our defence arrangements."। Quarterly Review-র মতে সোভিয়েট রুশিয়া ১৯২৮ সাল অপেক্ষা ষোলগুণ অধিক সামরিক ব্যয় করিতেছে। জার্ম্মানী ভের্সাই সন্ধির নির্দ্দেশ অনুসারে নিরস্ত্র থাকিবার পর সম্প্রতি পূর্ণোদ্যমে সমরসজ্জা গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ জার্ম্মানীর সামরিক শক্তি গত মহাযুদ্ধের সময় অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে। সেই জন্যই হের হিটলার উপনিবেশ অধিকারের দাবী পেশ করিয়াছেন। প্রচার মন্ত্রী ডাঃ গোয়েবেলস (Dr. Goebbels) ঘোষণা করিয়াছেন, "We took precau-

tions on the principle that the League of Nations is good, but air squadrons and army corps are still better."। এই রূপ সমরসজ্জা সত্ত্বেও নাৎসী রাজনৈতিকগণ শান্তির বাণী শুনাইতে কার্পণ্য করেন না। জেনারেল গোয়েরিং (General Goering) বলিয়াছেন, "Those who rattle the sabre most loudly never carried one. Only those who never experienced the horrors of war can talk about another war." (Speech at International Congress of Exservicemen on Feb. 15, 1931)। আবিসিনীয়া অধিকারের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইটালীর সামরিক সজ্জা সুরু হইয়াছিল, অধিকারের পরও তাহা শেষ হয় নাই। এই সামরিক সজ্জাই নাকি শান্তি প্রতিষ্ঠার ভূমিকাস্বরূপ। ইটালীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রা সিনর মুসোলিনী বলেন, "I hold out a great olive branch to the world. This olive branch springs from an immense forest of eight million bayonets, well-sharpened and thrust from intrepid young hearts." (Bologna speech on October 24, 1936)।

সমরের জন্য এত আয়োজন, এত অর্থব্যয়, কিন্তু শান্তি স্থাপনে সেরূপ প্রচেষ্টা নাই। শান্তির জন্য অর্থব্যয়ে শক্তিবর্গ কুণ্ঠিত। রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তিস্থাপনে অক্ষম হইলেও, শান্তির প্রতীক বলা যাইতে পারে। এই রাষ্ট্রসঙ্ঘের ১৯৩৫ সালে ব্যয়ের হিসাবের পরিমাণ মাত্র ছাব্বিশ মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক। ইউরোপের প্রত্যেক রাষ্ট্রই বিশ্বাস করে যে তাহার নিজের অস্ত্রশস্ত্র একমাত্র দেশরক্ষার জন্য, কিন্তু অন্যের সমরসজ্জা সাম্রাজ্যবাদের অভিপ্রায়ের নিমিত্ত। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই শক্তিবর্গ অস্ত্রবৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। ইউরোপীয় ডিক্টেটরগণ বাক্যে শান্তিকামী হইলেও, কার্যতঃ তাঁহাদের ঈপ্সিত বস্তুগুলি যুদ্ধ ব্যতীত পাওয়া সম্ভব নয়। ইহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের জনৈক প্রধান সামরিক নেতা জেনারেল মোলা (General Mola) ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা অবতারণ করিয়াও বলেন, "I dont like war, but that does not prevent me from realising that it is in war that a people's soul is forged."

১৯৩৫ সালে পোলাণ্ড, রাশিয়া, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, বাল্টিক্ রাজ্যসমূহ ও ফিন্ল্যাণ্ডের মধ্যে যে ইষ্টার্ণ প্যাক্টের (Eastern Pact) আলোচনা

হইয়াছিল তাহার সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া Lord Cranborne বলেন, "It is still the view of His Majesty's Government that the elimination of friction and suspicion between the various countries of Eastern Europe is one of the cardinal factors in the field of European progress."। এ সম্বন্ধে সকলের মতামতই এক, কিন্তু কার্য্যতঃ এই মত অনুয়ায়ী ইউরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে চলাফেরা করা কতদূর সম্ভব সে সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। ইটালী ও জার্ম্মানীর বর্ত্তমান সখ্যতা সর্ব্বজনবিদিত কিন্তু এই সখ্যতার মধ্যেও স্বার্থ-সংঘাত রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে পরলোকগত অষ্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার ডাঃ ডল্‌ফাস (Dr. Dollfuss) অষ্ট্রিয়াকে ইটালীর রক্ষণাবেক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, ইটালীও অষ্ট্রিয়াতে হ্যাপ্‌সবার্গ রাজবংশের পুনরধিষ্ঠানে উৎসাহিত করিতেছিল। জার্ম্মানী এই কার্য্যের সম্পূর্ণ বিপক্ষে কারণ ইহা জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার মিলনের অন্তরায়। অষ্ট্রিয়ার বর্ত্তমান চান্সেলার ডাঃ সুস্‌নিগ (Dr. Schuschnigg) বলেন যে এসম্বন্ধে একমাত্র অষ্ট্রিয়ানরাই সিদ্ধান্ত করিবেন—বৈদেশিক রাষ্ট্রের কোন মতামতই গ্রাহ্য হইবে না। ইটালী ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেও জার্ম্মানীকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য নিজের বাসনা দমন করিয়াছে। সম্প্রতি জাপ-জার্ম্মান্ চুক্তিতে জাপান এসিয়ার মধ্যে শক্তিশালী হইয়া উঠায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন ও ভাবিতেছেন যে কোন ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকার পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা দুরূহ। আবিসিনীয়া জয়ের পর ইটালীকে সংযত রাখিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেন ভূমধ্য সাগরে সমরসজ্জা অটুট ও শক্তিশালী করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে ইটালীয় সৈন্যগণের দুর্গতি ইটালীকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতেছে। সম্প্রতি স্পেনে জার্ম্মান রণতরীর উপর বিমান আক্রমণের প্রতিশোধকল্পে জার্ম্মান নৌ-বহর পূর্ব্বে সতর্ক না করিয়াই স্পেনীয় বন্দর আলমেরিয়ার উপর গোলাবর্ষণ করিয়াছে। খোলাখুলিভাবে স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে এই প্রথম হস্তক্ষেপ—ইহার পরিণতি শান্তিস্থাপনের প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ানই সম্ভব। এই অন্তর্বিপ্লবের ফলাফলে ফ্রান্সের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে, এই জন্যই ফ্রান্স প্রথম নিরপেক্ষ-নীতির প্রস্তাব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সম্মুখে উত্থাপিত করেন। হাঙ্গেরী ও যুগোশ্লেভিয়ার মনোমালিন্য সত্ত্বেও ইটালী যুগোশ্লেভিয়ার সহিত সখ্যতা স্থাপনে তৎপর ; অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরীকে স্বপক্ষে রাখিতেছে ;

জার্ম্মান সাম্রাজ্যবাদে সন্ত্রস্ত চেকোশ্লোভাকিয়া অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর সহিত মৈত্রীর পক্ষপাতী। ইউরোপের এই বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শান্তির ভরসা নিতান্তই অল্প। রাষ্ট্রসমূহ এই অবস্থার পরিণতি দেখিতে আগ্রহান্বিত।

যে শান্তির একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা সমরসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্র, সে শান্তি জীবিতের নয় —তাহা মৃতের। শান্তির পশ্চাতে যদি সভ্যতা ও কৃষ্টির ঐক্য না থাকে বা মৈত্রীর সমর্থন না থাকে, সে শান্তি বাঁচিতে পারে না। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান সভ্যতায় সৌন্দর্য্য ও বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চলিয়াছে; যান্ত্রিক জীবনের সহিত সৌন্দর্য্যময় জীবনের কোন সাদৃশ্য নাই—বিজ্ঞান আজ সংগ্রামের দোসর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিজ্ঞান অতি সংকীর্ণ, ইহা উদ্দেশ্যহীন, সেইজন্য বিরাট মানবধর্ম্মের সহিত ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই যন্ত্রসভ্যতার আসর ইউরোপের প্রাঙ্গণে ও এই আসরের শিল্পীগণ জার্ম্মানী প্রমুখ ইউরোপের শক্তিবর্গ।

সমর ও সমরশঙ্কার কবল হইতে ইউরোপ রক্ষা পাইতেছে না, ইহার কারণ ইউরোপে প্রকৃতপক্ষে অকৃত্রিম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র খুবই বিরল। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে মতভেদ স্বাভাবিক—যথার্থ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সংখ্যা বহু থাকিলে এই মতভেদ সংগ্রামে পরিণত হইতে পারে না। ইউরোপের প্রত্যেক ঘটনায় প্রত্যেক রাষ্ট্রের অল্পবিস্তর স্বার্থ জড়িত থাকে। সেইজন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীরা আজ নিরপেক্ষদের মতের যথার্থ মূল্যদান করে না। রাষ্ট্র রাষ্ট্রকে সম্ভ্রম করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সারা পৃথিবীর জনসাধারণও আজ নিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে শ্রদ্ধা করে না, বিশ্বাস করে না। কারণ বোধ হয় অকৃত্রিম নিরপেক্ষতা ইউরোপে নাই। এই জন্য নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। হ্যারল্ড ল্যাস্কি বলেন "We pay lip service to the ideal of disarmament, but we donot seriously disarm"।

আফ্রিকা ও এসিয়ার পরাধীন ও দুর্ব্বল জাতিগুলির উপর ইউরোপীয় শক্তি-বর্গের লোলুপ দৃষ্টি বিদ্যমান। বর্ত্তমান সমরসঙ্কটের ইহা একটি অন্যতম কারণ। ভের্সাই চুক্তিতে বঞ্চিত জার্ম্মানী আজ উপনিবেশের দাবী পেশ করিয়াছে—সে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সমকক্ষ অধিকার চায়। জার্ম্মানীর সাম্রাজ্য চাই কারণ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আছে, ও ইটালী সম্প্রতি পাইয়াছে। জার্ম্মানী ইহা পাইলেই শান্তি স্থাপনায় সহযোগিতা করিতে পারে কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কাঁচামাল (raw mate-

rials) সরবরাহ, ও পণ্যবিক্রয় সমস্যার সমাধান একান্ত প্রয়োজন। সমরসঙ্কটের অবসান কোথায়?

মানবপ্রকৃতির দোহাই দিয়া যুদ্ধবিগ্রহ সমর্থন করার একটি নীতি প্রচলিত আছে। ইহার আলোচনায় Norman Angell-এর কথাই মনে পড়ে, "Human nature may not be changed but certainly human behavior can be changed"। পাশ্চাত্যের দাসত্ব প্রথারোধ প্রভৃতি বহু ঘটনাতেই ইহার সত্যতা প্রমানিত হয়। খাদ্যাভাব ইত্যাদির জন্য সাম্রাজ্যের প্রয়োজন, অতিরিক্ত লোক-সংখ্যার জীবনরক্ষার নিমিত্তও যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্যা তাহা নয়। আজ খাদ্যাভাবের পরিবর্ত্তে খাদ্যের উপযুক্ত বণ্টনাভাবই দেখা যায়; বর্ত্তমান সমরসঙ্কট, ও উচ্চহারের শুল্কদ্বারা বানিজ্য অবরোধ ইহার কারণ। "The truth is not 'fight or starve' but 'stop fighting or starve"। কোন কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য যুদ্ধ করিতে হয় না, বিনাযুদ্ধেই বহু পরি-বর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে কারণ "'unchanging human nature' behaves very differently at different times."। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইউরোপের Delphic oracle হওয়া দূরের কথা কূটনীতিতে পরস্পরকে পরাজয় করিবার একটি স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দুর্ব্বল জাতির উপর অমানুষিক শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কোন শক্তি স্বাভাবিক লজ্জা পায় না; ইউরোপের সমাজে "ধোপানাপিত বন্ধ হওয়া" ত দূরের কথা। রাজনৈতিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন ব্যতীত সমর বা সমরসজ্জার বিরাম কল্পনাতীত।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য।

. আবেল বেরগেঙ্গ ও বেদানুশীলন

কিছুকাল পূর্ব্বে ফরাসী অধ্যাপক সিলভঁ্যা লেভির নানা কাজের পরিচয় দিতে গিয়ে আমি আবেল বেরগেঙ্গের (Abel Bergaigne) নাম উল্লেখ করেছি। সেই সম্পর্কে একথাও আমি বলেছি যে বুর্ণুফের পর ফ্রান্সে বেরগেঙ্গ সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয় কৃষ্টির আলোচনায় পথ প্রদর্শক হ'ন। ইউরোপে তাঁর পূর্ব্বে যাঁরা বেদ বা বৈদিক সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা কেহই ঠিক পথ খুঁজে পান নি। বেদানুশীলনে তাঁরা অনেকেই হয় সায়ণভাষ্যের ন্যায় অর্ব্বাচীন গ্রন্থের না হয় কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন—সেই জন্য তাঁরা প্রায়ই একই শব্দের নানা অর্থ নির্দ্ধারণ করে অসামঞ্জস্যের সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু বেরগেঙ্গ প্রথম দেখাতে চেষ্টা করেন যে বৈদিক ভাষার সাহায্যেই বেদের অর্থ নির্ণয় না করলে তার কদর্থ করা করা হবে কারণ পরবর্ত্তীকালে শাস্ত্রকারেরা বেদের সঠিক অর্থ ভুলে গেছেন। বেদানুশীলনে বেরগেঙ্গের স্থান ঠিক কোথায় তা আমি এ প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করব।

বেরগেঙ্গ ১৮৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৮৮ সালে আল্পসে পর্ব্বতারোহণ করবার সময়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর ও তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের চেষ্টায় ১৮৬৮ সালে পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য L' Ecole des Hauts Etudes স্থাপিত হয় এবং বেরগেঙ্গ এই শিক্ষায়তনে সংস্কৃতভাষার অধ্যাপনা গ্রহণ করেন।

বেরগেঙ্গ সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন বলে সংস্কৃতভাষা শিক্ষার সৌকর্য্যের জন্য তাঁকে নানা কাজ করতে হয়েছিল। সেই কারণে তিনি 'ভামিনীবিলাস' নামক সংস্কৃত ব্যকরণগ্রন্থ সম্পাদন করেন ও পরে বৈদিক ভাষা শিক্ষার জন্য একখানি গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্র আঁরি (Henry) Manuel pour etudier le Sanscrit vedique নাম দিয়া প্রকাশ করেন। অপরপক্ষে ভারতবর্ষের প্রাচীন উপনিবেশ চম্পায় যে সব সংস্কৃত শিলালিপি আবিস্কৃত হয় বেরগেঙ্গের উপর সে গুলির সম্পাদনের ভার অর্পণ করা হয়; এ-কাজও বেরগেঙ্গ অতি দক্ষতার সঙ্গে করেন। কিন্তু সে গ্রন্থও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্যতম

শিষ্য সিলভ্যাঁ লেভির যত্নে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের নাম Inscripritions sanscrites de Campa et du Cambodge.

কিন্তু বেরগেঙ্গের স্মরণীয় কীর্ত্তি হচ্ছে বেদানুশীলন। ভারতবর্ষ হতে বেদানুশীলন বহুদিন লোপ পেয়েছিল। বিগত শতকের মধ্যভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের হাতে এ অনুশীলন পুনর্জ্জীবিত হয়েছে। এ অনুশীলনে পথ প্রদর্শক হচ্ছেন জার্ম্মান পণ্ডিত Roth এবং তাঁর পরে জার্ম্মানীতে Ludwig, Grassmann প্রভৃতি পণ্ডিতদের হাতে এ অনুশীলন পরিপুষ্টিলাভ করতে থাকে। এই সময়ে বেরগেঙ্গের আবির্ভাব।

বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে বেরগেঙ্গের বিস্তৃত আলোচনা যে বইয়ে প্রকাশিত হয় সে বই হচ্ছে La Religion Vedique d'apres les hymnes de Rgveda ; এই বই তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ, প্রথম খণ্ড ১৮৭৬ সালে এবং তৃতীয় খণ্ড ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হয়। বৈদিক ধর্ম্মের আলোচনায় বেরগেঙ্গ যে পথ অবলম্বন করেন তা' অভিনব। তাঁর মতে এ ধর্ম্ম বুঝতে পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্য বা ইরাণীয় ধর্ম্মপুস্তক আবেস্তার কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় না। কারণ পরবর্ত্তী বৈদিক টীকা-টিপ্পনী ও সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থে বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা অসম্পূর্ণ, বৈদিক শব্দের ধাতুগত অর্থ নির্ণয়ে আবেস্তার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু সে সব শব্দের প্রয়োগ-বিজ্ঞান বুঝতে আবেস্তা হতে কোন সাহায্যই পাওয়া যায় না। সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের চিত্রাঙ্কন হতে পারে শুধু বেদের সাহায্যে, এবং চতুর্ব্বেদের মধ্যে যখন ঋগ্বেদসংহিতায়ই হচ্ছে প্রধান তখন সেই ঋগ্বেদের সঠিক অর্থ নির্ণয় করাই হচ্ছে প্রথম কর্ত্তব্য।

ঋগ্বেদের অর্থ নির্ণয়ের জন্য যে সেই বেদের নানা সূক্তের তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন সে কথা বেরগেঙ্গ বহুবার বলেছেন এবং সেই কারণে তাঁর গ্রন্থে ঋগ্বেদ হতে অন্ততঃ ১৬০০০ পদ উদ্ধৃত হয়েছে। এই সব পদ উদ্ধার করে, তিনি বৈদিক শব্দের সঠিক অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এই তুলনামূলক বিচার হতে একথা স্পষ্ট ধরা পড়ে যে বৈদিক ঋষিগণ বহুপরিমাণে উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করেছেন। বেরগেঙ্গের এ-কথা উদাহরণে স্পষ্ট বোঝা যাবে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে একটি সূক্ত আছে—

পৃথূ রথো দক্ষিণায়া অযোজ্যৈনং দেবাসো অমৃতাসো অস্থুঃ।

এ পদের সাধারণ অর্থ হচ্ছে—'দক্ষিণা'র বৃহৎ রথ প্রস্তুত হয়েছে ; এ রথের উপরে অমর দেবগণ অধিষ্ঠিত হয়েছেন'।

এ সুক্তে 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ নির্ণয় না করতে পারলে সত্যকার কোন অর্থবোধ হয় না। বেরগেন্ঙের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতেরা এ স্থলে দক্ষিণার অর্থ করেছিলেন উষা। কিন্তু ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থলে যেখানে এই দক্ষিণা শব্দের প্রয়োগ আছে—সেখানে দক্ষিণা শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করলে অর্থসঙ্গতি থাকে না ; যথা—জয়েম তং দক্ষিণয়া রথেন (১।১২৩।৫)—'দক্ষিণাকে রথ করে আমরা তাকে জয় করব' ; 'ইয়ম্ দক্ষিণা পিম্বতে. সদা' (১।১২৫।৫) ; তে দক্ষিণাং দুহতে সপ্তমাতরম্ (১০।১০৭।৪) ; অ দক্ষিণা সৃজ্যতে শুষ্ম্যা (৯।৭১।১)। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণ 'দক্ষিণা' শব্দের অর্থ কোথাও 'উষা', কোথাও 'যজ্ঞের দক্ষিণা', কোথাও 'দুগ্ধবতী গাভী' এবং কোথাও বা 'দুগ্ধ' করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কিন্তু বেরগেন্ঙ বলেন যে 'দক্ষিণা' শব্দ সর্ব্বত্রই এক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। বৈদিক ভাষায় দক্ষিণা হচ্ছে মূলতঃ দেবতাগণের প্রদত্ত দক্ষিণা এবং তাঁদের যজ্ঞের অনুকরণে পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞ সম্পাদন করেন সে যজ্ঞেও পুরোহিতকে যা দান .করা হয় তা সেই দক্ষিণার অনুরূপ দক্ষিণা। ঋগ্বেদের যে সব স্থানে দেবতাদের প্রদত্ত দক্ষিণার উল্লেখ রয়েছে বেরগেন্ঙ সে সব পদের তুলনামূলক বিচার করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে দক্ষিণা শব্দের এ অর্থ যদি ঠিক হয় তা হলে সে শব্দ উষার বিশেষণ হয়েছে কোন্ হিসাবে এবং দক্ষিণাকে রথ, গাভী ইত্যাদিই বা বলা হয়েছে কোন অর্থে। এখানে বেরগেন্ঙ বলেন যে বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে উষা হচ্ছে দেবতাদের দক্ষিণার প্রতীক ; তাকে রথ বলা হয়েছে তার কারণ তাকে অবলম্বন করেই যজ্ঞের অভিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছা যায়, এবং 'দক্ষিণা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ বলে উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে তাকে গাভী বলা হয়েছে। বেদানুশীলনে বেরগেন্ঙের দৃষ্টিভঙ্গি অভিনব। তাঁর এ দৃষ্টি বিকৃত কিনা তা বলা সম্ভব নয়, তবে এ প্রণালীতে বৈদিক শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণে তিনি যে কল্পনার বশবর্ত্তী হন নি একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে ; শোনা যায় সমস্ত ঋগ্বেদ তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল এবং হয়ত সেই কারণে শব্দের নানা প্রয়োগ তুলনা করা তাঁর পক্ষে ছিল সহজসাধ্য। এই তুলনামূলক বিচারের দ্বারা তিনি শব্দের সেই অর্থ নির্ণয় করতে চেয়েছিলেন যা সুসঙ্গতভাবে সর্ব্বত্র প্রযোজ্য।

এই পদ্ধতিতে বেদব্যাখ্যা করে বেরগেঙ্গ বৈদিক ধর্ম্মের যে রূপ নির্ণয় করলেন তা সম্পূর্ণ নূতন। যজ্ঞ হচ্ছে বৈদিক ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ এবং সে কথা বেরগেঙ্গও স্বীকার করেন। কিন্তু সেই কারণে যে বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন ইরাণীয়দের বা পরবর্ত্তী হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি হতে পৃথক্ ছিল সে সম্বন্ধে বেরগেঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন পণ্ডিত তাঁর মত সাবধান নন। বেরগেঙ্গের মতে যজ্ঞ যে শুধু বৈদিকধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তা নয়, সমস্ত বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক দৃষ্টি সেই যজ্ঞের সঙ্গে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আর সে যজ্ঞ ও ধর্ম্ম বৈদিক ঋষিদের নিজস্ব বস্তু। সে হিসাবে তাঁরা ছিলেন একদল বিশেষজ্ঞ বা specialists যাঁদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল অ-সাধারণ। বেদ হচ্ছে সম্পূর্ণভাবে সেই বৈদিক ঋষির সম্পত্তি যার ভিতর সাধারণ ইতিহাসের তথ্য খোঁজা নিরর্থক।

এই বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে যজ্ঞ হচ্ছে স্বর্গীয় ব্যাপারের পুনরনুশীলন মাত্র। স্বর্গীয় ব্যাপার দুই প্রকার—সূর্য্য-কেন্দ্রীয় ও অন্তরীক্ষ-কেন্দ্রীয়। সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতে সূর্য্য হচ্ছেন দেব, ও উষা হচ্ছেন দেবী; অন্তরীক্ষে সূর্য্যের প্রতীক দেব হচ্ছেন অগ্নি ও দেবী হচ্ছেন নভস্ বা মেঘসমূহ। সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অন্তরীক্ষের সমস্ত দেবতারাই পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর সকল দেবতাই হচ্ছেন অগ্নির বিভিন্নরূপ; স্বর্গে সে অগ্নি হচ্ছেন সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ।

উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে এই দেব-দেবীদের কখনো মানুষ কখনো বা পশুজাতির কোটায় ফেলা হয়েছে। সেই জন্য দেবগণকে নানা স্থানে বলা হয়েছে পুরুষ, অথবা পুংজাতীয় পক্ষী, অশ্ব, বৎসতরী, বলীবর্দ্ধ এবং দেবীগণ ঘোটকী গাভী প্রভৃতি আখ্যা পেয়েছেন। এই দুই জাতির মধ্যে মনুষ্যজগৎ বা পশুজগতে যে যে সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করা হয় দেবতাদের ব্যাপারেও সেই সেই সম্বন্ধ আরোপ করা হয়েছে। সুতরাং যখন দেবদেবীদের যৌন সম্বন্ধের কথা বলা হয় তখন বুঝতে হবে সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতে বা অন্তরীক্ষে হয়ত দু'টী ব্যাপার একসঙ্গে ঘটছে। সেই দুটি ব্যাপারের পৌর্ব্বাপর্য্য অনুসারে দেবদেবীর সম্বন্ধ পিতামাতা ও পুত্রের এবং পুত্র ও পিতামাতার সম্বন্ধ হিসাবে গণ্য হতে পারে। এই কারণে সূর্য্যকে কখনো উষার অপত্য এবং কখনো উষার পিতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কারণেই কখনো কখনো ঋগ্বেদে ভ্রাতাভগ্নী এবং পিতা ও কন্যার যৌন সম্বন্ধের উল্লেখ পাই এবং এমন কথাও শুনতে

পাই যে 'কন্যা পিতাকে প্রসব করেছে' বা 'পুত্র মাতাকে জন্ম দিয়েছে'। স্বর্গীয় বা অন্তরীক্ষের ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্যই এ সব উক্তিতে উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে সূচিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক্ স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষের ব্যাপারের সঙ্গে পৃথিবীর ঘটনাবলীর যোগাযোগ সম্বন্ধে বেরগেঙ্গ কি বলেছেন। তাঁর হিসাবে পৃথিবীর দেবতাগণও পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রথম শ্রেণীর সমস্ত দেবতাই হচ্ছেন অগ্নিস্বরূপ; স্বর্গীয় অগ্নি সূর্য্যের প্রতীক এবং দেবীগণ হচ্ছেন উষার প্রতীক। বৈদিক যজ্ঞের দুটী প্রধান অঙ্গ আছে। একটী হচ্ছে সোম বা যজ্ঞের অন্যান্য আহুতি সংগ্রহ ও প্রস্তুত-করণ, এবং অন্যটী হচ্ছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে সে আহুতি প্রদান। দ্বিতীয় অঙ্গে অগ্নি হচ্ছে দেব এবং আহুতি হচ্ছে দেবী, সে আহুতি সোম, হবিঃ, দুগ্ধ যাই যোক্। সেই কারণে অগ্নি ও আহুতি পুরুষ ও স্ত্রী হিসাবে কল্পিত হয়েছে, এবং তাদের ব্যাপারে স্বর্গীয় ঘটনাবলীর নানা সম্বন্ধও উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে আরোপিত হয়েছে। যজ্ঞের প্রথম অঙ্গ বা আহুতি প্রস্তুতকরণের ব্যাপারেও বৈদিক ঋষির চোখে সমজাতীয় ঘটনাই ঘটছে। এ অঙ্গে সোম হচ্ছে পুরুষ, দেব এবং তার সঙ্গে যা মিশ্রিত হচ্ছে, জল, দুগ্ধ প্রভৃতি তা হচ্ছে স্ত্রী, দেবী। সুতরাং তাদের মিশ্রীকরণের ব্যাপারও নানা সম্বন্ধের দ্বারা সূচিত হয়েছে, যে সম্বন্ধ পরিকল্পিত হয়েছে স্বর্গে সূর্য্য ও উষার বা অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ ও মেঘের মিলন বা পৌর্ব্বপর্য্যের ব্যাপারে। এই কারণে যজ্ঞের প্রথম অঙ্গে যদি সোম পুরুষ ও দ্বিতীয় অঙ্গে স্ত্রী হিসাবে পরিকল্পিত হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য্যা-ন্বিত হবার কিছুই নাই।

পূর্ব্বে যা বলা হয়েছে তা থেকে বোঝা যাবে যে বেরগেঙ্গের মতে বৈদিক ঋষি পৃথিবীতে যে যজ্ঞের সংঘটন করছেন তা সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের এবং অন্তরীক্ষের ব্যাপারের অনুকরণ বা পুনরানুশীলন (reproduction) মাত্র। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্তরীক্ষের এবং সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের অগ্নি একই অগ্নি। সুতরাং পৃথিবীর অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করতে পারলে এবং সে অগ্নির সঙ্গে আহুতির মিলন সংঘটন করাতে পারলে স্বর্গ ও অন্তরীক্ষের যজ্ঞই সম্পাদিত হবে ও তাঁদের নিজেদের অভীষ্ট সাধিত হবে এবং স্বর্গীয় ব্যাপারের গতি তাঁদের ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত হবে। এ সম্পর্কে বেরগেঙ্গের নীজের কথার অনুবাদ দেওয়া সঙ্গত—

"The Vedic seers thought that the celestial, atmos-

pheric, and the terrestrial fires (the last kindled by the sacrificer) were identical. The celestial and terrestrial-waters were also the same. The Vedic seers, by reproducing the natural process by corresponding modes of representations, believed they were able to assure the stability of these processes and by a sort of *envoutement* (sympathetic magic) influence the march of celestical phenomena"

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে অন্যান্য লোকে যে যজ্ঞ সংঘটিত হচ্ছে সে যজ্ঞের পুরোহিত কে? বেরগেঙ্গ বলেন যে সে পুরোহিত হচ্ছেন পিতৃগণ; বৈদিক ঋষিদের দৃষ্টিতে এঁরা হচ্ছেন তাঁদের নিজেদের পিতৃগণ। অন্য প্রশ্ন উঠতে পারে যে ত্রিলোকের দেবদেবীগণ যদি মূলতঃ অগ্নিষোম হন তাহলে ইন্দ্র, রুদ্র, প্রভৃতি দেবতাদের স্বরূপ কি? এ সব দেবতাদের বর্ণনা থেকে তাঁদের স্বরূপ স্পষ্টভাবে ধরা যায় না। এ কথা বেরগেঙ্গ স্বীকার করেছেন যে ইন্দ্রের সঙ্গে হয়ত যজ্ঞের কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু ইন্দ্র সম্বন্ধীয় সমস্ত বৈদিক উক্তির তুলনা করে তিনি স্পষ্ট দেখিয়েছেন যে ইন্দ্রও অগ্নিস্বরূপ। অবশ্য অনেকস্থলে ইন্দ্রের এ রূপ পরিবর্ত্তিত হয়েছে এবং "he is an intermediary between the sacrificer and the divinity. This is probably a new and late aspect of the cult according to which the sacrifice did not act directly but through the intermediary of a divinity."

রুদ্র হচ্ছেন বৈদিক দেবতাদের মধ্যে একজন প্রধান দেবতা। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হলেও তিনি হচ্ছেন মূলতঃ মরুৎগণের পিতা এবং এই মরুৎগণ হচ্ছেন অন্য হিসাবে সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতে হোতা ও দ্যৌসের সন্ততি। সুতরাং একদিকে রুদ্র হচ্ছেন হোতাস্বরূপ অন্যদিকে অগ্নিস্বরূপ। মরুৎগণ অন্যত্র বায়ুর সন্ততি হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। সুতরাং রুদ্র বায়ুও বটে। রুদ্র ও পর্জ্জন্য অন্যত্র অভিন্নভাবে পরিকল্পিত হয়েছেন। সেই কারণে বেরগেঙ্গের মতে রুদ্র = বায়ু, পর্জ্জন্য, স্বর্গীয় হোতা, দ্যৌস্ এবং মূলতঃ অগ্নি।

বেরগেঙ্গের মতে বৈদিক ঋষিগণ প্রাথমিক সভ্যতার যুগের কবি নন, এবং বৈদিক মন্ত্রও নৈসর্গিক শোভার বর্ণনা নয়। বৈদিক ঋষির দৃষ্টিতে তাঁদের যজ্ঞ ও

সূর্য্যকেন্দ্রীয় জগতের ঘটনাবলীর যোগসূত্র অতি দৃঢ় এবং এই তুইয়ের সম্বন্ধ বৈদিক ঋষি একটি বিশিষ্ট রচনাপদ্ধতির দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এ রচনা পদ্ধতি আমাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে না বটে তবে বৈদিক ঋষির নিকট তা' ছিল অতি সহজ এবং স্বর্গীয় ও পৃথিবীর নানা ঘটনাবলীর সম্বন্ধ উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে উল্লেখ করাই ছিল তাঁদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক।

বেরগেঙ্গের মতামত অনেকে গ্রহণ করতে সাহসী হন নি তার কারণ এমন কোন পণ্ডিত জন্মান নি যিনি সমস্ত ঋগ্বেদের একটা সুসঙ্গত অর্থ নির্ণয় করবার তুরাশা পোষণ করতে পারেন। সেই জাতীয় কোন পণ্ডিত অবতীর্ণ হলে হয়ত বেরগেঙ্গের গবেষণা পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুত ধরা পড়বে।

কিন্তু বেরগেঙ্গ বৈদিক ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে যে কাজ করেছেন তা ইউ-রোপে বেদানুশীলনকে যে যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে দিয়েছেন একথা সকলেই মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বৈদিক শব্দের একটী অভিধান তৈরী করাও ছিল বেরগেঙ্গের উদ্দেশ্য, কিন্তু একাজ তিনি আরম্ভ করেছিলেন মাত্র, শেষ করতে পারেন নি। তাঁর নানা কল্পনা কার্য্যে পরিণত না করতে পারলেও বেরগেঙ্গ যে কাজ সম্পন্ন করেছিলেন তার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

কবিতাগুচ্ছ

দেবদারু

ঐ যে বিরহী দেওদার
দাঁড়িয়ে আছে ওপারে—
তার দীর্ঘ পত্রের ওপর পড়েছে
রজত-শুভ্র জমাট আলো।
ঠিক যেন ওরই নিরুদ্ধ অশ্রুর
সজল সমারোহ।

মাথার ওপর
মেঘের ম্লান আবরণ থেকে
উঁকি দিচ্চে পাণ্ডুর চাঁদ—
ওর বিক্ষুব্ধ আত্মার মতই,
শ্রান্ত আপনার মাধুর্য্য পরিবেষণে।

পায়ের কাছে অযাচিত,
শ্যাম ধরণীর অন্ধকার
অসহায় আকর্ষণ,
ছোটো ছোটো তৃণফুলের
অকৃপণ অনুরাগ—
কিছুই দিতে পারেনা
ওই নিঃসঙ্গ বনস্পতিকে।

দাঁড়িয়ে থাকে সে
নিঃস্পন্দ নিথর দেহ নিয়ে—
ব্যথিত নিরাসক্তির প্রতিমূর্ত্তি।
রাত্রির নৈঃশব্দ রূপ নিয়েছে কার?

শ্রীছায়া দেবী

সনেট

বুকের অনল-কুণ্ডে রক্তধারা জোগায় ইন্ধন,
দুর্নিবার রুধিরের শ্রান্তিহীন অবিশ্রাম দোল,
দেহের সমস্ত তন্ত্রী তীব্র বেগে হয় উতরোল,
প্রচণ্ড জীবনীশক্তি ছুটে চলে ভাঙিয়া বন্ধন।
কালের বিপুল তালে তাল দেয় হৃদয়-স্পন্দন,—
দুঃসহ তরঙ্গ তুলি সারা প্রাণে এসেছে কল্লোল;
প্রান্তবন্ত উচ্ছ্বসিত জয়োল্লাসে হৃদয় বিহ্বল,
আকাশে বাতাসে জলে জাগিয়াছে জীবন্ত যৌবন!

আজ কেন ম্লান মুখে ঝিমাইছ বসি অকারণ?
তোমার বুকের তলে গুমরায় কেন হা-হুতাশ,
বাহিরে চাহিয়া দেখ আজ সারা পৃথিবী আকাশ,
উঠেছে মুখর হ'য়ে স্পন্দমান সজীব চেতন—
বাহিরে যাইতে ডাকে ঐ শোন দুরন্ত বাতাস,
আজিকে থেকো না বসি প্রাণহীন অসাড় উন্মন!

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত

জোয়ার

তটিনীর নীরে ছিল না ঢেউ,
দুই কূলের মাঝে বইছিল সে শান্ত স্রোতে
যেন পিতামাতার কোল!
তা'র বাল্যের লীলানিকেতনে ছিল আনন্দ-শ্রী,
জীবনে ছিল নব নব স্ফূর্ত্তি,
অচপল আঁখি-উৎপলে তা'র উৎসুক কৈশোর—
অনাবিল স্বচ্ছ তা'র চোখে আপনার মুখ দেখা যেত!

এম্‌নি কালে আকাশের চাঁদ তা'কে দিল হাতছানি।
এল জোয়ার—
ছেপে গেল কূলের কড়া শাসন!
আপনার সহজ যৌবন-গর্ব্বে বুক উঠল ফুলে',
সাদা জল হ'ল কলুষে ভরা,
মন হ'ল উন্মন, কটাক্ষ হ'ল কুটিল,
দর্প উঠল মাথা খাড়া করে'
—এল যেন কাদা-ঘোলা জল!

তটপ্রান্তের অশোক বকুল
শাখার হাত বাড়িয়ে উপহার দিলে—
অশোক ফেল্‌লে আশার ফুল,
বকুল হ'ল ব্যাকুল, কদম দিল কেশর—
দেখতে চাইল নদীর মনোমুকুরে
নিজেদের প্রতিবিম্ব!
কিন্তু ফুল গেল স্রোতের সাথে ভেসে,
ছায়া গেল ঢেউয়ের মুখে শতধা হ'য়ে।
ভাব্‌লে মনে নদী—
জোয়ারের যৌবন তো বাঁধা পড়্‌তে আসে নি:
এসেছে সে প্রতি মুহূর্ত্তে, পাওয়াকে পিছে ফেলে
না পাওয়ার সন্ধানে অভিযান কর্‌তে।
উপেক্ষা করে' চল্‌ল সে সব পার্থিব ভালবাসা—
চাঁদ যে তা'কে ডেকেছে!
অধঃপাতের গ্লানি সহ্য করে' যে সিঁড়ি
সাধারণের থেকে এসেছিল নীচে নেমে—
যে-সব সোপান এসেছিল পান কর্‌তে তা'র রূপ,
সেই সোপানের স্তরকে
করে' দিল আঘাতের ব্যথায় প্রস্তর!

গূঢ় গহন ভেদ করে যে পথ এল গাহন করতে
তা'র মুখে দিল উপেক্ষার কাদা ছিটিয়ে !
দিয়ে বিদ্রোহী বিরহিনী চলল এগিয়ে।
সে যে বিদ্রোহিনী—
হাতে তার বালুতটে শান-দেওয়া
আলো ঝলমল স্রোতের খর তরবাল।

চল্‌তে চল্‌তে ফুরোল না পথ, পাথেয় কিন্তু ফুরোল',
থম্‌থমে হ'ল তা'র যৌবনের বেগ—
যেন পরাহ্ণের ক্লান্তসুর সোহিনীর আলাপ !
তরবারে নেই ধার, মুখ গেছে ভোঁতা হয়ে',
অগ্রগতির পথ কেটে তৈরী কে করবে ?
বিদ্রোহিনী তখন ধরেছে পরাজয়ের ভাটিয়ালী।

এইবার রিক্তার প্রত্যাবর্ত্তনের পালা—
নিজস্ব খুইয়ে এখন নিঃস্ব সে।
মাঝনদীতে শীর্ণস্রোতে যখন সে ফিরে যায়,
চায় যখন অশোক বকুলের দিকে করুণ চোখে—
তখন কিন্তু অশোকের শাখা নাগালের বাইরে,
বকুলের ফুলের কুল তখন নিয়েছে বিদায়।
এবার তাই, ভালবেসে ফুলও ঝরে না তা'র মুখে !
তবুও মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দেখা যায়—
বালুচরে তার যৌবনের কবরে
আলো করে' রেখেছে হয়তো
জোয়ারে ভেসে আসা অশোক বকুলের ছিন্ন দল,
কাদায় ম্লান, হতাশায় হত শ্রী,
হয়তো রিক্তার বেদনায় সহানুভূত !

সুশীলকুমার ঘোষ

উটপাখী

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি ?
কেন মুখ গুঁজে আছো তবে মিছে ছলে ?
কোথায় লুকাবে ? ধূ ধূ করে মরুভূমি ;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই,
নির্ব্বাক, নীল, নির্ম্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই ;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্ব্বনাশ।
কোথায় পলাবে ? ছুটবে বা আর কত ?
উদাসীন বালি ঢাকবেনা পদরেখা।
প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত,
বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা ॥

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কি ফল পাবে ?
মনস্তাপেও লাগবেনা ওতে জোড়া।
অখিল ক্ষুধায় শেষে কি নিজেকে খাবে ?
কেবল শূন্যে চলবেনা আগাগোড়া।
তার চেয়ে আজ আমার যুক্তি মানো,
সিকতাসাগরে সাধের তরণী হও।
মরুদ্বীপের খবর তুমিই জানো,
তুমি তো কখনো বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতি গে আবার চলো
যে-কোনো নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অন্তত নোনা জলও,
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে ॥

কল্পলতার বেড়ার আড়ালে সেথা
গ'ড়ে তুলবোনা লোহার চিড়িয়াখানা ;

ডেকে আনবোনা হাজার হাজার ক্রেতা
ছাঁটতে তোমার অনাবশ্যক ডানা।
ভূমিতে ছড়ালে অকারী পালকগুলি
শ্রমণশোভন বীজন বানাবো তাতে ;
উধাও তারার উড্ডীন পদধূলি
পুঙ্খে পুঙ্খে খুঁজবোনা অমারাতে।
তোমার নিবিদে বাজাবোনা ঝুম্‌ঝুমি,
নির্ব্বোধ লোভে যাবেনা ভাবনা মিশে ;
সে-পাড়াজুড়নো বুল্‌বুলি নও তুমি
বর্গীর ধান খায় যে উন্‌তিরিশে ॥

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।
তাই অসহ্য লাগে ও-আত্মরতি।
অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে ?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরি ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজেনা দুর্ব্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি ক'রে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি :
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে,
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি ॥

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত

পুস্তকপরিচয়

Autobiography—By G. K. Chesterton—(Hutchinson & Co.).

শেষের পরিচ্ছেদে এসে চেষ্টারটন্ বলেছেন, 'কথা ছন্নছাড়া ভাবে ফুরলো ; তাহোক তত্ত্ব-কথা বোলতে বসিনি। আমার কাছে এ জীবন একটি অফুরন্ত অজ্ঞেয় রহস্য। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রশ্নের উদয় হয়েছে শেষ পর্য্যন্ত তারই উত্তর দিয়েছি। পথ ঘাট থেকে নূতন নূতন প্রশ্নের বোঝা কুড়িয়ে বেড়াবার প্রলোভন হয় নি। হয়ত অনেক কিছুতে বঞ্চিত হয়েছি। বয়সের অঙ্কও অবাধে গড়ায়নি। কষ্ট এসেছে। কিন্তু, কোন কিছুতে বিস্বাদ আসেনি। শৈশবের গ্রহণশীলতা দিন ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ আড়ষ্ট হয়ে যায় নি বলে বেঁচে থাকা পুরাতন হয় নি। প্রতিদিনের জীবনকে অভ্যাগত অচেনা অতিথির মত সানন্দ বিস্ময়ে বরণ করে নিয়েছি।'

সহস্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ ও অজস্র লিপি-সমরে বিধ্বস্ত কর্ম্মবীরের কাছ থেকে এত-সহজ সরল কথা আচম্‌কা শুনলে ভণ্ডামী বা কথার কারচুপি বলে মনে হতো—কিন্তু আমি ততক্ষণে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা অতিক্রম করে এসেছি। পড়বার সময় স্বতঃই মনে হয়েছে, এ জীবন আগা গোড়া শতদলের মত আপন মাধুর্য্যে আপনি পরিবেষ্টিত। মামুলী প্রথামত প্রসারণ আছে, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু অন্তরের দীপশিখাটি একই ভাবে আলোক বিকীর্ণ করে এসেছে। তুচ্ছাদপিতুচ্ছ ঘটনাও সে আলোকে প্রভান্বিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে।

বন্ধুবর বেলক্-এর প্রশস্তিকালে চেষ্টারটন্ আপন লিপিপ্রচেষ্টাকে নিকৃষ্টগোত্র সংবাদপত্র-সাহিত্যের কোঠায় নিরুদ্ধ ক'রে কারণ নির্ণয় করেছেন যে তাঁর চিত্ত অস্থিরমতি বলে ভাবরাশি 'নগ্ন' অবস্থাতেই বিকিয়ে যায় দৈনন্দিন বাজার হাটে,—নায়ক নায়িকার মধ্যস্থতার প্রয়োজন হয় না—কিন্তু সে জন্যে তাঁর ক্ষোভ নেই কারণ ক্ষণস্থায়ী মসী-সংগ্রামেও তাঁর আনন্দ অপার।

এই মনোভাবটির মধ্যে চেষ্টারটন্-চরিত্রের একটি প্রধান গুণ ধরা পড়ে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ঠিক এমনি সানন্দ আত্মভোলা ভাবে রচিত হয়েছে। জীবনের শেষভাগে একটা কোন চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে যাওয়ার চেষ্টা যে কোন মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কীর্তি সার্থক হয়েছে বলে মনে হয় কিন্তু চেষ্টার কোন চিহ্ন নেই। এ সেই পরিচিত কলহপ্রবণ ভাবা—বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রবরদের প্রতি কটাক্ষ, অবজ্ঞা, ও পরিহাসের পরিপাকে বিচিত্র।

প্রথম প্রণিধানে বিস্ময় লাগে, এতখানি বহুমুখী সচেতন মন কেমন করে দানা বেঁধে উঠলো। আধ্যাত্মিক অন্তঃসলিলার অশ্রুত ছন্দ হৃদয়ঙ্গম হয় একাধিক বার পড়লে পরে—তখন বিচারবুদ্ধি বলে, যে-চেতনা এসেছে পরিণত বয়সে, আকস্মিক ভাবে, তার দ্বারা পূর্ব্বতন নবীন প্রবর্দ্ধমান সময়টি আচ্ছন্ন হওয়াতে সত্যের অপলাপ হয়েছে। হয়েছে সন্দেহ নাই

কিন্তু ভালই হয়েছে কারণ তা না হলে ঘটনার বিস্তৃতি অপর্য্যাপ্ত হয়ে পড়তো। অনাবশ্যক অসুন্দরের অবদমন এবং সুন্দরের পরিমিত সন্নিবেশ হচ্ছে শিল্পচর্চ্চার প্রাথমিক প্রকরণ এবং চেষ্টারটন্ যেটুকু গ্রহণীয় মনে করেছেন সেটুকুকে তাঁর হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধির ধারায় চালনা করেছেন।

যে ব্যক্তি চাবি ভ্রমে কর্ক স্ক্রু দিয়ে দ্বার খুলতে চেষ্টা করেন কিম্বা রেলের টিকিট কিনতে গিয়ে কফির তাগাদা দিয়ে বসেন, তাঁর কাছে থেকে সুসম্বদ্ধ ইতিবৃত্ত অবশ্য আশাও করা যেত না কিন্তু তিনি জন্মকালীন এবং শৈশব সময়ের যে পারিপার্শ্বিক সমাজের ছবি এঁকেছেন তা আর একটু বিশদ করা খুবই উচিত ছিল।

চেষ্টারটন্ বলেছেন—"ভব্য কথাটির মর্য্যাদা তখনও লঘু হয়ে হয়ে অর্থশূন্য হয়ে যায় নি—আমাদের পরিবারটি স্বাধীন ব্যবসা অবলম্বন করে অবলীলাক্রমে 'ভব্য' ভাবে কালক্ষেপ করে চলেছিল। ঐতিহ্যবোধ এত প্রখর ছিল যে দেশান্তরে শাখা স্থাপনার মত সাধু উদ্দেশ্যও বৃদ্ধদের মনঃপূত হতো না। ভোজনের টেবিলের ওপর দম্ভপূর্ণ সামরিক গীত, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন ইত্যাদি ভাবের প্রাবল্য যেমন প্রকাশ পেতো—ভৃত্যদের প্রতি ব্যবহার হয়ে উঠতো তেমনি আড়ষ্ট, অন্তরের স্নেহ ও করুণার প্রকাশ অসম্ভব হয়েছিল শুচিবায়ুর তাড়নায়; সামাজিক ব্যবধান স্পষ্টতর করবার উদ্দেশ্যে ভদ্র সমাজে শিষ্ট ভাষার চর্চ্চায় জোর দেওয়া হয়েছিল। বানান ও উচ্চারণ নির্ভুল করবার চেষ্টায় অর্থ গ্রহণের পূর্ব্বেই শব্দের সাধনা প্রচলন ছিল। ফলে, আমাদের শিক্ষার গোড়াপত্তন হল প্রকৃষ্টভাবে। তারপর উত্তরকালে 'স্নব্‌স' এবং 'প্রিগ্‌স' নামে দুইটি শাবক রেখে সে শ্রেণীটি কোথায় তিরোধান হয়ে গেলো"।

চেষ্টারটন্ 'স্নব্‌স' অর্থে বোলতে চেয়েছেন যারা ভুঁইফোড় ভাবে ধনী হয়ে সমাজে ঢুকতে চায় তাদের,—আর বলেছেন 'প্রিগস' হচ্ছে লক্ষীছাড়া, সমাজদ্রোহী, নিরামিষ-ভোজী এবং সোশালিষ্টদের দল। তুলনা কোরতে কোরতে আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন—

"আজকাল বাণিজ্যক্ষেত্র হতে অধ্যবসায়, সরলতা, সততা অন্তর্হিত হয়ে প্রবেশ করেছে দলবদ্ধ রাহাজানি—সেকেলে ভণ্ডদের ভণ্ডামী করবারও সৎসাহস ও আন্তরিকতা ছিল—একালের বাবুদের যখন গল্‌ফ খেলবার ইচ্ছা তখন তাও স্পষ্ট স্বীকার করবার মুরদ থাকে না—মুখে বলেন গীর্জ্জার কচকচি ভাল লাগে না।"

চেষ্টারটন্ অবশ্য ঠিক এভাবে ভাষার প্রয়োগ করেন নি, আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে তাঁর মুখে জুগিয়ে দিলাম। আমার প্রতিপাদ্য হচ্ছে যে তিনি ভিক্টোরীয় যুগটিকে যদি আরও বিস্তৃত করে ব্যাপক ভাবে ফুটিয়ে তুলতেন তাহলে এতখানি 'ডাউন্ রাইট্' শোনাত'না।

এরপর মহাসমরের আগমন পর্য্যন্ত আমার কিছু বলবার নেই। সংক্ষিপ্তসার দিয়ে যাব।

পিতার নির্ম্মিত সামান্য একটি পিচবোর্ডের খেলনা অবলম্বন করে আলেকজাণ্ডারের "সত্য সেলুকাশ কি বিচিত্র এ দেশ"-ভঙ্গীতে শৈশব স্মৃতিকথার উন্মেষ হলো। শিশুচিত্তের বিজ্ঞান-

সম্মত মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাগুলিকে একে একে খণ্ডন করে তিনি ঘোষণা করলেন যে, মানবমন প্রগতি-নিরপেক্ষ চিরন্তন সত্য—বয়ঃ বৃদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতার আবর্জ্জনা তাকে আচ্ছন্ন করে কিন্তু প্রভাবান্বিত কোরতে পারে না; পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডলের আবহাওয়া চিত্তের গঠন নির্দ্ধারিত করে না, সেই জন্যই হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিখণ্ডগুলি যখন হঠাৎ পাওয়া যায় তার রূপ এতখানি তাজা থাকে।

শিশু চেষ্টারটনের বিচিত্র জগতে দিবালোক ছিল উজ্জ্বলতর—গোধূলির তুলনায় যেমন মধ্যাহ্নের আলোক—তেমনি দীপ্যমান। দিবাস্বপ্ন ছিল নিছক স্বর্গীয়। কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে ধোঁয়াটে ভাব ছিল না। স্পষ্টাস্পষ্টি কল্পনাই ভাল বাসতেন। ভাবরাজ্যে দুর্জ্জয় দৈত্যের আমদানী করে অল্প আয়াসে বধ করে ফেলতেন। নৈতিক আদর্শপূর্ণ গল্প হতে নীতি-গ্রহণ কোরতেন গল্পের চেয়ে আগ্রহ সহকারে। কৈশোর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তিন প্রকার উপলক্ষণ দৃষ্ট হলো—তিন সঙ্গীর একত্রে ভ্রমণ; নির্দ্দেশ শূন্য অর্থহীন পাদচালনা; এবং, বন্ধু গ্রহণে ও ত্যাগে অদ্ভুত তৎপরতা।

চেষ্টারটনের বন্ধুদ্বয়ের উভয়েই যশস্বী হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে এডমাণ্ড ক্লেরিহিউ বেণ্টলী ছাত্রাবস্থাতে যে ছড়ার প্রচলন করেছিলেন সম্প্রতি বাংলা দেশেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে।

কয়েকজন ছাত্র মিলে ডিবেটিং ক্লাব এবং একটি স্কুল-পত্রিকা খুলে বসলেন। শিক্ষক ও সহপাঠীদের মানসিক উৎকেন্দ্রিকতার বর্ণনায় এই অধ্যায়টি পরিপ্লুত। ছাত্রদের আত্মপ্রকাশে বিরুদ্ধতা ছিল বিস্ময়কর। শিষ্যদের ধারণশক্তি অবধারণ কোরতে শিক্ষককুলকে নাকি হিম্‌সিম্ খেয়ে যেতে হতো।

অতঃপর চেষ্টারটন্ স্কুল পরিত্যাগ করে চিত্র-শিল্প অধ্যয়নে মনোনিবেশ কোরলেন। তখন দেশে প্রেততত্ত্বের ধুয়ো উঠেছে। তাঁকে প্ল্যানচেট রোগে পেয়ে বসলো। যথা সময় ক্লান্তি আসাতে দৃষ্টির গতি ঊর্দ্ধলোক হতে সরে এসে পার্থিব বস্তুপুঞ্জের ওপর প্রতিফলিত হতে আকস্মিক ভাবে উপলব্ধি হলো যে জগতের প্রত্যেক অনুপরমানুটি পর্য্যন্ত প্রাণবন্ত এবং আনন্দ প্রদায়ক। ছোট ছেলেদের কাব্য রচনা সুরু হয় তখন থেকে।

রচনার অজস্রতায় ছাড়া পেয়ে যখন দার্শনিকতার ভাবধারা তরল হয়ে এসেছে তখন রাজনৈতিক সমস্যা প্রবেশ করলো।

"সে সময় নিজেকে সোশালিষ্ট বলে পরিচয় দিতাম যেহেতু বিপরীত অর্থে বোঝাতো মাথা-ছোট নাক-তোলা 'স্নব'—স্বদেশের উন্নতিকল্পে উপনিবেশ প্রসারণে বিন্দু মাত্র আপত্তি ছিল না—কিন্তু 'জেমিসন্-এর আক্রমণ' ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলো। সাম্রাজ্যবাদের ওপর ঘৃণার সঞ্চার হওয়াতে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গের মতের বিরুদ্ধে বুয়োর-বন্ধু লিবারেলদের দলে ঢুকে পড়লাম"—দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধ সাঙ্গ হতে জন আলোড়নের নেশা আইরিশ-প্রীতিতে পর্য্যবসিত হলো, অভিজ্ঞতা বেড়ে

চল্লো। ভোট সংগ্রহের বিভ্রাট,—পূতচরিত্র, গড্ডালিকাকল্প নর-নারী-যূথের সংসর্গ, মুষ্টি যুদ্ধ ইত্যাদি বহুবিধ ঘটনা আচ্ছন্ন করে মহাযুদ্ধের বন্যা প্রবেশ কোরলে, শুদ্ধ হলো স্বাবলম্ব চিন্তাশক্তি।

বেলক্-এর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয় কিছুকাল পূর্ব্বে—তখন চিন্তানুশীলন পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করেছে—চিত্রাঙ্কন ছেড়ে দিলেও সৌন্দর্য্য বোধ তাঁকে ছাড়ে নি। দুই বন্ধুতে মিলে রেলিং, ল্যাম্প পোষ্ট, সমতল বক্ষ ঘর বাড়ী, পোষাক, আসবাব পত্র, বিজ্ঞাপন পত্র ইত্যাদি কদর্য্যতার বিরুদ্ধে প্রবল লিপিসংগ্রাম জুড়েছিলেন। ইয়েটসের সঙ্গেও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে সেই সময়, একই কারণে। কবির কথা বলার মাধুর্য্য তাঁকে মুগ্ধ করে। পরী-কাহিনীতে প্রতীতি, উপ-দেবতায় বিশ্বাস সুকুমার প্রবৃত্তি গুলিকে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তোলে।

ইয়েট্স বোলতেন "ভূত দেখে কারা—বিকৃত মস্তিষ্ক শিল্পিরা নয়—মাটির মানুষ চাষীরা, এরা হাজার হাজার বার দেখেছে। নিরক্ষর লোকেদের কথা বিশ্বাস হয় না অথচ তাদের সাক্ষ্যের জোরেই খুনীকে ফাঁসীতে লট্‌কানো হয়।"

চেষ্টারটন্-ইয়েট্সের বন্ধুতার মাঝে এসে গেলো থিয়সোফিষ্ট দল—

"আমি তাদের দেখতে পারতাম না মতবাদের জন্যে নয়—তাদের পাথরের মত চকচকে চোখ আর ক্ষমাশীল তিতিক্ষাপূর্ণ হাসি আমার অসহ্য মনে হতো"।

ইয়েট্স ব্লাভাট্‌স্কীর সম্মোহনে পড়েছিলেন বলে চেষ্টারটনের ক্ষোভ ছিল না কারণ তাঁর আন্তরিক টান ছিল প্রাচ্যের অনন্ত সৌম্যের মধ্যে দুঃখবাদের অনুসন্ধানে—ব্যক্তি বিশেষের প্রতারণায় ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল না—সুখবাদই গ্লানির উৎস সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন।

চেষ্টারটন্ তাঁর প্রেম এবং বিবাহের কথা সলজ্জ কৌতুকপূর্ণভাবে বলেছেন। দর্শন এবং রাজনীতির অতিরিক্ত আর একটি নিবিড়তর চেতনা আছে—উপলব্ধি কোরলেন ডিবেটিং ক্লাবের মহিলা সেক্রেটারীটির সমীপ-স্পর্শে। দেহ মন এতখানি প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলো যে একখানি দ্বি-চক্রযান যোগাড় করে কয়েক পাক ঘুরেই ফেল্লেন। তারপর নিছক বেডৌলভাবে স্বাভাবিক অনিপুণতার সঙ্গে ভাব কোরতে গিয়ে প্রেম প্রকাশ করে বোসলেন।

স্ত্রীর, ভ্রাতার এবং কনরাড নোয়েল নামক জনৈক ক্যাথলিক পাদ্রী—এই তিনটি প্রভাবে আধ্যাত্মিক জগতের সমস্যা সংক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের কথা বোধ করি সর্ব্বজন বিদিত।

সংবাদ পত্র জগতের অভিজ্ঞতাগুলি একটি পৃথক পরিচ্ছেদে সংগৃহীত হয়েছে—বার্ণাড শ' সম্বন্ধে শ্রদ্ধা এবং তাচ্ছিল্যজ্ঞাপক কয়েকটি কথা—প্রকাশ হয়েছে এত বিলম্বে কেন বুঝলাম না—হয়ত' নিরামিষ ভোজনে বীতরাগই এই অবজ্ঞার কারণ—কিন্তু তাতে কোন ক্ষতি হয় নি। গ্রন্থখানির শেষাঙ্গই অধিকতর সমৃদ্ধশালী। বয়োজ্যেষ্ঠ সাহিত্যিকদের সমন্বয়ে যে অধ্যায়টী গড়ে উঠেছে তার মতো হৃদয়গ্রাহী রচনা খুব কমই পড়েছি—টমাস্ হার্ডী, জর্জ্জ মেরেডিথ, সুইন-

বার্ণ, হেনলী, জেম্‌স্ বারী, হাউসম্যান, এলিস মেনেল ইত্যাদি শিল্পিদের ব্যক্তিগত চরিত্রের সম্বন্ধে কয়েকটি মাত্র রেখা স্বল্প কথায় অনেক বলেছে।

ভ্রাতা সেসিল, ভ্রাতৃজায়া এবং বন্ধু বেলক্ ব্যক্তিগত ভাবে আলেখ্যটির বর্ণাবিক্ষেপে অ-সামঞ্জস্য এনেছেন—সমালোচক পাঠক হয়তো এতখানি অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস বরদাস্ত কোরতে চাইবে না কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি চেষ্টারটনের আত্মনিবেদনে কোন নিখুঁত সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্কল্প ছিল না। তিনি নিজেকে অবারিত করেছেন একান্ত নির্ব্বিকল্প ভাবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি যে-রূপ নগ্ন চাপল্যে মুক্ত করেছেন, তর্কের দংষ্ট্রাঘাতে তার অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য্য কিন্তু কয়েকটি চিরন্তন প্রশ্ন উদ্‌গত হয়ে থাকবেই থাকবে। অনেক সমস্যা বিশ্বজনীন—এত প্রকট যে কোন প্রকার গোঁড়ামীর বাধা মানে না—কিন্তু তবু মতভেদে মাথা ফাটাফাটি লেগে যায় ব্যাখ্যানের তারতম্যে। ভাষা বোধকরি মানুষের প্রধান শত্রু। সেই জন্যেই প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁরই বা ভিন্নপন্থীদের নিঃসার বলবার কোন অধিকার আছে? তার উত্তরে বলা যায় যে আঘাত করবার এই আদিম প্রবৃত্তিটি আলোচ্য আলেখ্যে এত পরিমিত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে রসোপপত্তিতে ব্যাঘাত হয় না।

আমি স্তম্ভিত হয়েছি যখন মহাযুদ্ধের আগমনে সাম্রাজ্য-বিস্তার ইত্যাদি রাজনৈতিক কারসাজির ওপর ঘৃণা কর্পূরের দশা প্রাপ্ত হলো। প্রথম ঝোঁকে আত্মরক্ষার খাতিরে দেশ-প্রীতির প্রাবল্য অন্ধ হতে বাধ্য। কিন্তু পরে, শত্রু মিত্র যখন সকলেই অবসন্ন, কেমন করে নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি জার্ম্মান-বিদ্বেষের বহ্নি ছড়িয়ে বেড়িয়েছিলেন। মিথ্যা প্রচারের জন্যে অনুতপ্ত হওয়া দূরের কথা, শেষ পর্য্যন্ত নিজের বাহাদুরিতে নিজেই 'মাত' হয়েছিলেন। অন্তরের মধ্যে এই ধারণা পোষণ কোরে এসেছেন যে জার্ম্মান দর্প খর্ব্ব হয়ে ভালই হয়েছে---হয়েছিল নিশ্চয়, আমার ধারণা আরও একবার হলে আরও ভাল হয়—কিন্তু সেই সঙ্গে চেষ্টারটনের দোষগ্রাহী দৃষ্টিভঙ্গী আপন দেশমুখী হলে তৃপ্তি পেতাম আরও আরও বেশী।

শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

The Dangers of Being Human—By Edward Glover (Allen & Unwin).

"War, Sadism and Pacificism" নামক পুস্তকের লেখক হিসাবে ডাঃ এডওয়ার্ড গ্লোভার খ্যাতিলাভ করেছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনপদ্ধতির সাহায্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে কেমন করে যথার্থ বুদ্ধিসম্মত সভ্যতার বিস্তার সম্ভব করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল বক্তব্য এই যে মানুষের তথাকথিত

বুদ্ধিসম্মত জীবনযাত্রার পিছনে আছে আদিম ও বর্ব্বর প্রবৃত্তির অন্ধ প্রেরণা। মানুষ যতই প্রতিবাদ করুক না কেন, সামাজিক জীবন প্রধানতঃ এই আদিম প্রবৃত্তির অন্ধ আবেগের যুক্তিহীন নিয়ন্ত্রণের ফল। অপরাধপ্রবণতা, যুদ্ধ, শান্তিবাদ, রাজনীতি, শিক্ষা, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ, সাধারণ নির্ব্বাচন প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এই মূলনীতির দিক থেকে গ্রন্থকার বহু আয়াসে বুঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ভবিষ্যৎ সমাজ গড়ে তুলতে হলে মানুষের মনের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও তার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সমাজের নূতনতর নিয়ন্ত্রণের জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। ডীন ইং (Inge) বইখানার একটী সুন্দর ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। বইখানির প্রচ্ছদপটের চিত্রখানি এত সুপরিকল্পিত যে লেখকের বক্তব্য যেন তাতেই ফুটে উঠেছে।

গ্রন্থকার বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী উভয় দলের রাজনৈতিক মতবাদকেই আক্রমণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মানুষের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে দলগত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা যে নির্ব্বাচনী ইস্তাহার ও উত্তেজক বক্তৃতা সংবাদপত্রের মারফত প্রচার করেন, তার দ্বারা সমাজের কোন স্থায়ী মঙ্গল হতে পারে না। কিন্তু উভয় দলকে আক্রমণ করলেও রক্ষণশীলদের জন্য ওকালতী করবার প্রবৃত্তিকে চেষ্টা করেও তিনি চেপে রাখতে পারেন নাই। আর এটা খুবই স্বাভাবিক—কারণ, যাঁরা রাজনীতির ক্ষেত্রে বায়ুভূত নিরাশ্রয় অবস্থায় থাকতে চান, তাঁরা প্রকারান্তরে রক্ষণশীলতাকেই প্রশ্রয় দিতে বাধ্য হন। কারণ, রাজনীতি ব্যাপারটাই এরকম যে কোন না কোন দিকে যোগ না দিয়ে কারুরই উদ্ধার নাই। গ্রন্থকারের ধারণা যে বৈজ্ঞানিকদের সমবেত চেষ্টার ফলে এমন নূতন আবিষ্কার হয় যে রাজনীতির দলাদলির বাধা অতিক্রম করে সে আবিষ্কারের ব্যবহারিক ফল সমাজ ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। জড়বিজ্ঞানের বেলায় একথা খাটে সন্দেহ নাই, যদিও সঙ্গে সঙ্গে এটাও সত্য যে বিজ্ঞানের প্রসারের জন্যও অর্থব্যয় আবশ্যক, আর সে টাকার সংস্থানের জন্য আবার রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আজকাল গত্যন্তর নাই। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞানের বেলা একথা এখনো খাটে না। যেমন সমাজবিজ্ঞানে মার্কসের আবিষ্কার আপনা আপনিই সমাজের ধনতান্ত্রিক শোষণ অবসান করতে পারে না, যদি না সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সেই আবিষ্কারকে ধনতান্ত্রিক কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। এখানেই আবার রাজনীতির দলগত প্রশ্ন এসে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানের বেলাও একথা সম্পূর্ণ খাটে। গ্রন্থকার পৃথিবীর পররাষ্ট্রসচিবদের মনোবিজ্ঞানের ব্যবস্থা দিয়েছেন; কিন্তু তাঁর এ সদুপদেশের মর্ম্ম যে পররাষ্ট্রসচিবদের মাথায় ঢুকবে, আপাততঃ তার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আর তা হবার কথাও নয়, কারণ যুদ্ধ প্রভৃতির অন্যতম কারণ যদি বর্ব্বর ধ্বংসপ্রবৃত্তিও হয়, তবুও সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, কাঁচামালের সমস্যা, ঔপনিবেশিক শোষণের প্রসারের চেষ্টা প্রভৃতি যতদিন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত না হবে, ততদিন মানুষের এই প্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করে ধনিকদের কায়েমী স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার পরিণামফল থেকে কোন বৈজ্ঞানিক মোহমুদ্গরই জনসাধারণকে মুক্তি দিতে পারবে না। ফ্রয়েড

নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে মনোবিকলনের অবাধ প্রসারের সাহায্যে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বর্ত্তমান সমাজে সম্ভব নয়—এর জন্য সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। সে সামাজিক ব্যবস্থা কি করে প্রচলিত হবে সে সম্বন্ধে ফ্রয়েড ও তাঁর শিষ্য ডাঃ গ্লোভার উভয়েই নিরুত্তর। কোন একটা অনির্দ্দেশ্য ও ভিত্তিহীন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ চেয়ে তাঁরা বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী। তা যদি হয়, তবে আর মনোবিকলনের ব্যাপকতর প্রসারের সাহায্যে যুদ্ধ বিগ্রহ নিবারণ ও নূতন সমাজসৃষ্টির বিষয়ে এত উচ্চ আশা পোষণের ব্যবহারিক ভিত্তি কি? মনোবিকলন শম্বুকগতিতে এগিয়ে চলেছে—কিন্তু এর সাহায্যে জগতের সমস্ত কায়েমী স্বার্থের অবসান করে মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর ও সুখপ্রদ সমাজ সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। অথচ, সমাজের নূতনতর পরিবর্ত্তনের ফলে শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত মনোবিকলনের প্রসারের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

ডাঃ গ্লোভার রক্ষণশীলতার দিকে একটু ঝুঁকলেও ফ্রয়েড নিজে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বামপন্থীদের সমর্থক। এটাই যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়; কারণ, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনকামী কোন মতবাদই বামপন্থী ও রক্ষণশীলতার বিরোধী না হয়ে পারে না। কিন্তু ডাঃ গ্লোভার কতকগুলি কুতর্কের অবতারণা করে রক্ষণশীলদলকে সমর্থন করেছেন। তাঁর যুক্তিও অনেকাংশে অস্পষ্ট ও হেঁয়ালীর মত মনে হয়। তবে মোটের উপর বইখানিতে অনেক চিন্তার খোরাক আছে; যাঁরা ফ্রয়েডীয় মতবাদের আলোচনা করেন, তাঁরা ডাঃ গ্লোভারের বইখানির সঙ্গে স্বয়ং ফ্রয়েডের New Introductory Lectures on Psycho-analysis-এর শেষ অধ্যায় দুইটি মিলিয়ে দেখে ও আর অস্‌বর্ণের Freud and Marx এবং জন্ ষ্ট্রেচির Theory and Practice of Socialism এ উক্ত বিষয়ের মন্তব্যের সঙ্গে তুলনা করে অধিকতর উপকৃত হবেন আশা করা যায়।

সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

A Tribe in Transition. A Study in culture pattern— By Dr. Dhirendra Nath Majumdar—(Longmans.)

নৃতত্ত্ব আমাদের দেশে এক রকম নতুন বিজ্ঞান। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাঁচির শরৎবাবু, ৺ অনন্তকৃষ্ণ আয়ার, মধ্য-প্রদেশের দেওয়ান হীরালাল প্রভৃতি জনকয়েক দেশী পণ্ডিত আপন খেয়ালে সাঁওতাল পরগণা, কোচিন ও মধ্যপ্রদেশের আদিমজাতির আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে খানকয়েক উৎকৃষ্ট বই লেখেন। দূরদর্শী আশুতোষই বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব পাঠের প্রথম সুযোগ দিলেন। ধীরেন বাবু কোলকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, লক্ষ্ণৌ-

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এবং শরৎ বাবুর হাতে তৈরী ছাত্র। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত চাইবাশা অঞ্চলের হো-জাতির মধ্যে তিনি বসবাস করেন, তাদের ভাষা শেখেন, এবং বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তাদের আচার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। অবসর পেলেই তিনি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে আসছেন। এই বইখানি তাঁর হো-জাতির সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয়ের ফল।

হো-জাতি মুণ্ডাভাষীর একদল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ প্রভৃতির সগোত্র। অবশ্য হোরা মোটামুটি নিজস্বতা বজায় রেখেছে। নানা প্রকারের আধুনিকতা তাদের ওপর চাপ দেবার ফলে তাদের আচারের প্রাথমিক ছক্ টুকু সামান্য বদলালেও পূর্ব্বে যা ছিল তারা এখনও প্রায় তাই আছে, বিশেষতঃ সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্কে, তার প্রতি মনোভাবে। এই আদিমতা ও পরিবর্ত্তনের বিবরণ দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য। তাঁর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে। তাঁর বই-এ আমরা সর্ব্বপ্রথম হো-জাতির একটি সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গীণ রূপ পাই। তাদের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক অবস্থার, তাহাদের পূজাপার্ব্বণ, সঙ্গীত, পোষাক, বাসস্থান, বিবাহ, যৌতুক, শিক্ষা, ধর্ম্ম, রোগ ও তার প্রতীকার কিছুই বিবরণ থেকে বাদ পড়ে নি। এই বিবৃতিতে কোনো কল্পিত কিংবা আদর্শ সমাজের ছায়া নেই, চোখের সামনে যা ঘটছে তাই প্রতিফলিত ও সজ্জিত হয়েছে।

সাজাবার পদ্ধতির নতুনত্ব নিয়ে সুধী সমাজের আগ্রহ থাকতে পারে, তাই আমি ধীরেন বাবুর পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু লিখছি। ধরতে গেলে কেম্ব্রিজের রীভার্স সাহেবই নৃতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের গুরু। তাঁর পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাতির তথ্য সংগ্রহেই পণ্ডিতবর্গের শক্তি নিয়োজিত হত। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে মানসিক ইতিহাস এক রেখায় চলে এবং বর্ত্তমান সভ্য মানুষের আদিম অবস্থা জানাবার সুযোগ প্রদানই যেন অনুন্নত ও বর্ব্বর জাতির একমাত্র কাজ। ও-ধারে লেভী-ব্রুল প্রভৃতি নরতাত্ত্বিক এই রেখাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন যে আদিম মানবের চিন্তাধারাই ভিন্ন। কিন্তু লেভী-ব্রুলের সিদ্ধান্তের পিছনে কোনো আদিম জাতির ব্যবহার সম্বন্ধে চাক্ষুষ জ্ঞান ছিল না। এই সময় ডাক্তার রীভার্স মেলানেসীয় জাতির সমাজ-গঠনের বিবরণ প্রকাশ করে দেখালেন যে আদিম জাতি প্রকৃত আদিম ও অকৃত্রিম নয়, নানা উপায়ে পরিব্যাপ্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সংস্কার-গুণ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, এবং সেই আদান-প্রদানের ফলে একটি জাতির অখণ্ড বৈশিষ্ট্য লাভ হয়েছে। এই প্রকার পদ্ধতির সাহায্যে টাইলার, মর্গ্যান, ওয়েষ্টারমার্ক প্রভৃতির কল্পিত সত্য দূরীভূত হল, অনুমানের অপেক্ষা চাক্ষুষ প্রমাণ গৃহীত হল, বৈজ্ঞানিক পরিচয়ের প্রতিষ্ঠা হল। রীভার্স অল্প বয়সে মারা যান।

তারপর র‍্যাডক্লীফ-ব্রাউন ও ম্যালিনাউস্কীর যুগ। এঁরা আরো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য সংগ্রহ ও তার বিচার সুরু করলেন। রীভার্সের পর্য্যবেক্ষণে ভুল ধরা পড়ল, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি পরিত্যক্ত হল না, সূক্ষ্মতর হল মাত্র। এই দুজনের প্রধান দান জাতির অখণ্ড রূপ বর্ণনায়, ভিন্ন আচারের সম্পর্ক নিরূপণে, সমাজের জীবন্ত ও চলন্ত ব্যবহারের নিয়ম আবিষ্কারে। এঁদের হাতে পড়ে অসভ্য-সভ্যের পার্থক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক মানুষের আত্মপ্রসাদ

লোপ পেয়েছে। তথ্যের বোঝা হাল্‌কা হয়ে নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের রসদ যোগান দিচ্ছে। এক কথায়, আজকাল নৃতত্ত্বে ফাংসানালিজমের যুগ চলছে এঁদেরই কৃপায়।

ইতিমধ্যে ডাঃ রুথ বেনেডিক্‌ট Patterns of Culture নামে একখানা বই লিখলেন। তার একটি চমৎকার সমালোচনা "পরিচয়ে" ইতিপূর্ব্বে বেরিয়েছে। ভদ্রমহিলাকে গেস্‌টাল্‌ট অ্যান্‌থ্রপলজির প্রবর্ত্তক বলা যায়। তাঁর মতে এক একটি আদিম সভ্যতার একটি অবিভাজ্য ও প্রাকৃত ছক্‌ আছে। তাঁর বই পড়লে মনে হয় যে এই নক্সাটির কোনো পরিবর্ত্তন হয় না, সেটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ ও নিরালম্ব। সংস্কার-গুণের সঞ্চারণশীলতাকে তিনি যেন একটু অবহেলা করেছেন সন্দেহ হয়। তবু তাঁর কৃতিত্ব অবিসম্বাদী।

ধীরেন বাবুর পদ্ধতি ম্যালিনাউস্‌কী ও রুথ বেনেডিক্‌টের পদ্ধতির উত্তরাধিকারী। তাঁর মতে হো-জাতির একটা নক্সা আছে, তবে সেটি অপরিবর্ত্তনীয় নয়। অন্য জাতির গুণাবলী এই আদিম সমাজ-গঠন নির্ব্বাচন করে এবং গ্রহণ করে। এইখানে তাঁর সঙ্গে ডাক্তার বেনে-ডিক্‌টের তফাৎ। নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়াটি যে জীবন্ত এই দেখানতেই ধীরেন বাবুর কৃতিত্ব, এবং ম্যালিনাউস্‌কী-পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসার। সেই ১৮৩৯ সালে টিকেল সাহেবের ও প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে ডালটনের বর্ণনা লেখা হয়েছিল, তারপর ছোটখাট প্রবন্ধ ছাড়া হো-দের সংস্কার সম্বন্ধে ভাল লেখা আর বেরোয় নি। ধীরেন বাবুই প্রথম তাদের চলন্ত জীবনের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা লিখলেন। ভারতবর্ষে এই রকম কত অসভ্য জাতি রয়েছে—তাদের যথাযথ বিবরণ কবে আমরা পাব ?

যুধিষ্ঠির দাস

The Indian Sugar Industry 1936 Annual—
by M. P. Gandhi

The Indian Sugar Industry—Its Past, Present and Future—by M. P. Gandhi.

The Indian Sugar Industry —Its Present Problem—
by M. P. Gandhi (Published by the Author)

ভারতীয় শর্করা-শিল্প সম্বন্ধে তথ্য ও অভিমত প্রকাশে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে মিঃ এম, পি গান্ধী অগ্রণী। উপরোক্ত পুস্তকগুলি ব্যতীত আরও কয়েকখানি পুস্তিকা তিনি গত তিন বৎসরের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা শ্রমসাধ্য ও তথ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ।

ভারতবর্ষ চিনির জন্মস্থান হইলেও, এই শিল্পের ইতিহাস গত চারিবৎসরেই রচিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই শিল্পে আজ ২৫ কোটি টাকা ভারতীয় মূলধন খাটিতেছে

এবং দুইলক্ষ বার হাজার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি অন্নের সংস্থান করিয়াছে ; এতদ্ব্যতিরেকে প্রায় ২ কোটি চাষী আখের চাষে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই শিল্পোন্নতিতে একটি নিতান্ত প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ সম্বন্ধে ভারতবর্ষ বৈদেশিকদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

১৯১০ হইতে ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত আমরা প্রতি বৎসরে বিদেশ হইতে প্রায় ২০কোটি টাকার চিনি আমদানী করিতাম, ১৯২৯-৩০ সালেও আমরা ১৫ কোটি টাকা মূল্যের চিনি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছি (পরিমান ৯ লক্ষ টন)। প্রতিবৎসরে প্রায় ১০½ লক্ষ টন চিনি ভারতবাসীর প্রয়োজন হয়। আমরা প্রায় ১৪৫টি চিনির কারখানা হইতে এই প্রয়োজনীয় চিনির সবটুকুই পাইয়া থাকি। আজ আমরা যে বাৎসরিক ১৫ কোটি টাকা বিদেশীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া দেশেই রাখিতে পারিয়াছি তাহা এই শর্করা-শিল্পের উন্নতির কল্যাণে।

মিঃ গান্ধী শেষোক্ত পুস্তকখানিতে বলিয়াছেন যে এই উন্নতি গভর্ণমেণ্টের শিল্প-সংরক্ষন নীতির ফলে সম্ভব হইয়াছে। প্রথম পুস্তকখানিতে মিঃ গান্ধী মত প্রকাশ করিয়াছেন যে চিনি প্রস্তুতের ব্যয় হ্রাস করিলে ও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিলে, বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক পরিমাণের চিনি কাট্‌তি হইবে—ইহাতে লাভের সম্ভাবনা খুব্ বেশীই থাকে।

অনেকে বলেন যে এই সংরক্ষণ-নীতির ফলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় ও ক্রেতাকে আর্থিক অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার উত্তরে মিঃ গান্ধী দেখাইয়াছেন যে এই সংরক্ষণ নীতির ফলে আখের চাষ বাড়িয়া গিয়াছে ও তাহাতে কৃষি অনেক উপকৃত হইয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে আখের চাষের জমির পরিমাণ ছিল ৩০,৭৬ হাজার একার ; ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহার পরিমাণ ছিল ৪২,৩২ হাজার একার। বিশেষতঃ এই শিল্পের জন্য আখের চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায়, চাষীরা আখের মূল্য বেশীই পাইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আমদানী শুল্ক সমেত ভারতবাসীকে বিদেশী চিনির জন্য বাৎসরিক প্রায় ২০ কোটি টাকা দিতে হইত, ১৯২৯-৩০ সালেও ১৫ কোটি দিতে হইয়াছে ; কিন্তু ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতীয় চিনির মূল্যস্বরূপ ক্রেতাকে দিতে হইয়াছে ১২½ কোটি টাকা। যুদ্ধের পূর্ব্বে চিনির উপর আমদানী শুল্ক ছিল শতকরা ৫৲ টাকা, ও ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতীয় চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক (excise duty) হইতেছে প্রতি হন্দরে একটাকা পাঁচ আনা অথবা শতকরা ১৫ টাকা। এই শুল্ক বাদ দিলে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ত্তমানে আমাদিগকে চিনির জন্য অল্প মূল্যই দিতে হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অবশ্য আশা করেন যে চিনির মূল্য আরও হ্রাস করা সম্ভব, সেইজন্যই সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট উৎপাদন শুল্ক দুইটাকায় বৃদ্ধি করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট এই শিল্পের উপর সংরক্ষণ-নীতির ফলাফল ও ইহাসম্বন্ধে ভবিষ্যৎ নীতি নির্দ্ধারণের জন্য বোর্ড নিযুক্ত করিয়াছেন (Sugar Tariff Board)। মনে হয় যে এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের অপেক্ষা করা, ও তাহার পরে কোন নূতন শুল্ক বসান সম্বন্ধে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

যাহা হউক এই শিল্পের উন্নতিতে দেশের অর্থ দেশেই থাকিয়া যায়। সার বিজয়রাঘবা-

চারিয়ার দেখাইয়াছেন যে ১৯৩৪-৩৫ সালের চিনির মূল্যস্বরূপ ১২½ কোটি টাকার মধ্যে আখের মূল্যস্বরূপ চাষীরা পায় ৬ কোটি টাকা, যানবাহনের খরচ যায় ১½ কোটি, শ্রমিকরা মজুরী পায় ২ কোটি টাকা, শিক্ষিত লোকেরা বেতনস্বরূপ পায় ½ কোটি টাকা। ইহাতেই বুঝা যায় যে সংরক্ষণ-নীতি বৃথায় মোটেই হয় নাই। ১৯৩২ সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ করা হইয়াছিল, ইহা ১৯৩৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত চলিবে; তাহার পর পুনরায় ১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নূতন করিয়া সংরক্ষণ-নীতি চলিবে—এবং সেই নীতি স্থির করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমানে Tariff Board নিযুক্ত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সংরক্ষণ-নীতির ফলে ১৯৩২-৩৩ সাল হইতে চিনির আমদানী হ্রাস হইতেছে ও তজ্জন্য আমদানী শুল্কও পাওয়া যাইতেছে না; মিঃ গান্ধী মনে করেন যে ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে এ শুল্ক হইতে কোন আয়ই থাকিবে না। কিন্তু এই রাজস্বের পরিবর্ত্তে গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য রাজস্ব অনেকটা পাইতেছেন কারণ তাঁহারা ভারতে চিনি প্রস্তুতের উপর শুল্ক বসাইয়াছেন এবং সম্প্রতি উহার পরিমাণ এক টাকা পাঁচ আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া প্রতি হন্দরে ২ টাকা ধার্য্য করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট চিনির কারখানা হইতে উপরন্তু ইন্‌কাম ট্যাক্স পাইতেছেন। ইহা ব্যতিরেকে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিতেও গবর্ণমেণ্টের ভূমিকর, পূর্ত্তকর প্রভৃতি উত্তমরূপেই আদায় হইবে বলিয়া মনে হয়। সুতরাং গভর্ণমেণ্টের ক্ষতি সামান্যই বলিয়া মনে হয়।

যাহাই হউক, শর্করা-শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হইয়াছে। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ইহার ভবিষ্যৎ কি?—এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠিতে পারে। চিনি প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না কারণ এ দেশের প্রয়োজনানুরূপ চিনি আমরা আজই ভারতীয় কারখানা হইতে পাই। সুতরাং বিদেশে বিক্রয়ের সুবিধা না পাইয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে নিজেদের মধ্যে অযথা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া কোন ফলই হইবে না। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ প্রসারণকল্পে মিঃ গান্ধী প্রস্তাব করেন যে ইঙ্গ-ভারতীয় বাণিজ্যচুক্তির মধ্যে চিনি রপ্তানী করিবার সুবিধা আদায় করা সরকারের উচিত। রপ্তানী উদ্দেশ্যে চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করিলেও চিনি রপ্তানীর সুবিধা হইতে পারে। রপ্তানীর সুবিধা না হওয়া পর্য্যন্ত, এ শিল্পের মালিকদের কর্ত্তব্য উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস করার দিকে লক্ষ্য রাখা ও অল্প মূল্যে ভারতবাসীকে চিনি সরবরাহ করা। ইহা না হইলে এ শিল্পের উন্নতি অধিক দিন স্থায়ী হওয়া সম্ভব নয়। বিদেশীদের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা অবিলম্বে অর্জ্জন করা উচিত। এ বিষয়ে অন্যান্য প্রতিষেধকের মধ্যে মিঃ গান্ধী আখের মূল্য হ্রাস করিবার উপর বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে বলেন। "The ultimate success of the industry, however, hinges upon the availability of suitable quality of cane at considerably lower prices than at present". এই শিল্পের উন্নতি কল্পে বহু গবেষণা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের

সাহায্যও নিতান্ত আবশ্যক। Tariff Board এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টকে বাৎসরিক ১০ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন; ১৯৩৫ সালে Imperial Council of Agricultural Research-এর Sugar Committee ও এই গবেষণাকার্য্যে গভর্ণমেণ্টকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করিতে বলেন। আখের চাষের উন্নতি বিশেষ প্রয়োজন ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত, শিল্পের মালিকগণেরও এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যানবাহনের ব্যয় হ্রাস করা ও অযথা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান করা একান্ত আবশ্যক। ক্রয় বিক্রয়ের আরও সুবন্দোবস্ত সম্ভব বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করেন। ভারতীয় চিনিও যাহাতে রূপে ও গুণে বিদেশী চিনির সমকক্ষ হইতে পারে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা সবিশেষ কর্ত্তব্য। চিনির কারখানার সংখ্যাও বর্ত্তমানে আর অধিক হইতে দেওয়া উচিত নয়। এগুলি না হইলে শর্করা-শিল্পের উন্নতি চিরস্থায়ী হইতে পারে না ইহাই মিঃ গান্ধীর মূল বক্তব্য।

উপরোক্ত পুস্তক কয়খানি পাঠ করিলে এই শিল্প সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পাওয়া ব্যতীত, সংরক্ষণ-নীতির ফলাফল সম্বন্ধেও অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

শ্রীনীরদকুমার ভট্টাচার্য্য

The Legacy of India—Edited by G. T. Garrat—With an introduction by the Marquess of Zetland. (Oxford, Clarendon Press).

আজ, নানা কারণে, ভারতের বিশেষ অবদান সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ ও তার প্রকৃতি বুঝতে অনেকেই ইচ্ছুক। তার নানা বিভাগ নিয়ে বিস্তর পণ্ডিত বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন। গত তিন মাসের মধ্যেই অন্ততঃ তিনখানি বই প্রকাশিত হয়েছে, রাধাকুমুদ বাবুর Hindoo Civilisation, পরমহংসদেবের শত বার্ষিকী জন্মোৎসব সমিতির প্রকাশিত Cultural Heritage of India এবং বিখ্যাত লেগাসী সিরীজের এই বইখানি। পুস্তকগুলির প্রত্যেকখানি এমন বিশেষজ্ঞের রচনা যাঁদের কারুরই সুনামের কোন অভাব নেই। লেগাসী অব ইণ্ডিয়ার লেখকবৃন্দ দেশী ও বিদেশী। তা ছাড়া, তার ভূমিকা লিখেছেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা, মন্ত্রী জেটল্যাণ্ড, এবং উপসংহারে লিখেছেন মিঃ গ্যারাট। দুজনেরই ভারতবর্ষীয় সভ্যতায় অন্তর্দৃষ্টি আছে, ও উভয়েই অন্ততঃ এক শ্রেণীর রাজনৈতিক চাহিদা সমর্থন করেন বলে গুজোব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পাঠকবর্গের সব আশাই পূরণ হওয়া উচিৎ ছিল।

লেগাসী সিরীজের অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে এই বইখানির তুলনা করা বোধ হয় উচিত হবে না। গ্রীস, রোম, মধ্য যুগ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের চেয়ে পুরাতন। হয়ত

বর্ত্তমান য়ুরোপে গ্রীক, রোম ও মধ্যযুগের দান ও সক্রিয়তা আধুনিক ভারতবর্ষে বৈদিক,বৌদ্ধ কিম্বা মোগল পাঠান যুগের অপেক্ষা অনেক বেশী। অতএব, সন্দেহের বশে কিছু না লেখাই ভাল। তবু এক হিসাবে তুলনা এসেই পড়ে। লেগাসী—অর্থাৎ উত্তরাধিকার যখন পুস্তকের নাম, তখন তার একটি অন্ততঃ সূত্র দেখান চাই, যার অবলম্বনে সব লেখক অগ্রসর হবেন, এবং সব চেয়ে দরকারী কথা—যার সাহায্যে পাঠক অধিকারের ভোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবেন। কেবল তাই নয়, সেই সূত্রের সঙ্গে অন্য নতুন সূত্র কি ভাবে জুড়তে হবে, ও জুড়লে নতুন সমাজবন্ধনী কি উপায়ে প্রস্তুত হবে তার আভাসও রচনায় প্রত্যাশা করাই সঙ্গত। গ্রীস, রোম, মধ্য যুগ, এমন কি ইজরেল-সভ্যতা সংক্রান্ত বইগুলিতে তার সন্ধান কিছু কিছু পেয়েছি। পাই নি লেগাসী অব্ ইসলামে, এবং লেগাসী অব ইণ্ডিয়াতে। এই অভাবের কারণ কি পলিটিক্যাল, না কেবল বিদ্যার অভাব, না দানেরই অক্ষমতা? অবশ্য জ্যোতিষ ঘোষের দেশী সাহিত্য আলোচনায় এই দায়বোধের আভাস পেয়েছি। কিন্তু বুদ্ধি, বস্তু ও জনসাধারণের জীবনের আশ্রয়েই দেশী সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব—এই মত লেখকের নিতান্ত নিজস্ব ও ব্যক্তিগত। তাঁর সিদ্ধান্ত আমি গ্রহণ করি, তবু সেটি তাঁর দেশী সাহিত্যের বিবরণ থেকে স্বতই নিশ্চিতভাবে উদ্ভূত হচ্ছে বলা যায় না। কারণ বোধ হয় এই যে তিনি বাংলা ভিন্ন অন্য প্রাদেশিক সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত নন। বাকী অন্য লেখকের ভারতীয় পরিশীলনের ভবিষ্যত ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে মন্তব্য নিছক বাক্য মাত্র। অর্থাৎ, আজ পশ্চিমী সভ্যতার সাথে ভারতীয় সভ্যতার রফা করা চাই। খাঁটি কথা, কিন্তু কি ভাবে? এর বিজ্ঞানসম্মত সদুত্তর এ বইএ নেই। তাই আমার আকাঙ্খা মিটল না।

সকলেই প্রায় ভারতবর্ষের মধ্যে ও বাইরে কি ভাবে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির সাথে আদান-প্রদান হয়েছে উল্লেখ করেছেন। রলিনসনের হিন্দুস্থান ও য়ুরোপের পুরাতন কালের আদান-প্রদান সম্বন্ধে রচনা এই হিসেবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আব্দুল কাদির ও ব্রীগসের মুসলমান সভ্যতা ও স্থাপত্যের বিবরণ পক্ষপাতদুষ্ট হলেও কিংবা তাতে নতুনত্ব না থাকলেও তাঁরা লেন-দেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। ফক্স ষ্ট্রাঙ্গওয়েজের সঙ্গীত-বিবরণা নিতান্ত মামুলি, তবু তিনি লেগাসী কথাটির অর্থ খানিকটা ধরেছেন, যদিও সে অর্থগ্রহণ একপেশে। অর্থাৎ য়ুরোপীয় লোক-সঙ্গীত ও 'প্লেন'-সঙ্গীত কতটা হিন্দুস্থানী সঙ্গীত থেকে গ্রহণ করতে পারে সেই দিকেই তাঁর আগ্রহ।

ভারতের সংস্কৃতি প্রসারিত হয়ে অন্যদেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে প্রভাম্বিত করেছে তার বিবৃতিও এই বইএ কিছু কিছু আছে। শ্রেষ্ঠ উদাহরণ এফ, ডবলিউ, টমাসের পুরাতন ও মধ্য যুগের সাহিত্য ও পুসিনের বৌদ্ধধর্ম্ম সংক্রান্ত রচনাবলী।

তা ছাড়া বাকী রচনাগুলি প্রাচীন সভ্যতার ছবি মাত্র। সেই হিসেবে সুরেন দাশগুপ্তের 'দর্শন, ক্লার্কের বিজ্ঞান, কডরিংটনের আর্টের বিবরণ সত্যই চমৎকার। ছবি কিন্তু উত্তরাধিকার নয়। একটি অনুগ্রন্থের বিবরণ, অন্যটি সাতত্যের বিচার। রাধাকৃষ্ণনের হিন্দুয়ানী ও মাসানীর

'জাতি (caste) ও সমাজ-গঠন' একটু অন্য ধরণের, অর্থাৎ হিন্দুয়ানী ও জাতি-বিভাগের ব্যাখ্যা ও জোর সমর্থন। রাধাকৃষ্ণনের লেখা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। নিতান্ত মামুলি, এমন কি, এক্ষেত্রে ভাষাও ভাবের জীর্ণতাকে ঢাকতে পারে নি। মাসানি জোর কলমে, এক অস্পৃশ্যতা ছাড়া, জাতি-বিচারের সব অংশই ভাল বলেছেন। কেবল তাই নয়, তার মধ্যে জীবতত্ত্ব, সুপ্রজননবিদ্যা, সোভিয়েট-তন্ত্রের বৃত্তিবিভাগ (functionalism), নীটশে, ওয়েলসের কল্পনার সমর্থন, ন্যায়, শ্রেণী-সমস্যার নিরাকরণের সন্ধান সব কিছুই পেয়েছেন। যদি তাঁর কথা সত্য হয় তবে জাতি-গঠনই (caste structure) ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান। যদি ভুল হয়, যদি এম্পিরিসিজম আর বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকে, যদি জীবতত্ত্ব কতটা এগিয়েছে আমরা জানি, যদি ধনিক-সভ্যতার জোরে শ্রেণী-বিভাগ নিতান্ত সুস্পষ্ট হয়েছে স্বীকৃত হয়, যদি কল্পনা ও বাস্তবতা পৃথক বলে মানি, তবে মাসানির রচনা ১৯০৫ সালের উপযুক্ত, এখনকার পক্ষে নয়।

অতএব লেগাসীর অর্থ অন্ততঃ তিন ভাবে এই বইখানিতে বোঝান হয়েছে :—ঐতিহাসিক ছবি, ভৌগলিক প্রসার ও আদান-প্রদান, এবং রক্ষা ও সমর্থনের সামগ্রী হিসেবে। অবশ্য বিষয়ের ওপরও বিবরণের ভঙ্গী নির্ভর করে। যেমন ক্লার্কের রচনা—ভারতের বিজ্ঞানের সাথে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের আদান-প্রদান অসম্ভব, ফলিত বিদ্যায় অসম্ভব নাও হতে পারে। তাই ক্লার্কের কাছ থেকে আমরা বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের ও তার বিস্তারের বিবরণই প্রত্যাশা করি, ও তাই পেয়েছি। কিন্তু হিন্দুয়ানীর, হিন্দুদর্শনের কি কোন দানই নেই, তার জোরে কি আজও কোথাও কিছু চলছে না, কি চলতে পারে না? যদি আর না চলে, ক্ষোভ নেই, তবে গ্রামে জনসাধারণের মধ্যে এখনও যে চলছে তার কারণ দেখাতে রাধাকৃষ্ণন, ও মাসানি বাধ্য।

জ্যোতিষ ঘোষের ও গ্যারাটের লেখায় দোষ থাকলেও (তাঁরা উভয়েই বিশেষজ্ঞ নন) লেগ্যাসীর অর্থগ্রহণে তাঁদের ভুল হয় নি। জ্যোতিষ ঘোষের বিষয়টি এমনি যে তার বর্ণনায় জনসাধারণের জীবন ও অস্তিত্ব স্বীকৃত হবেই হবে। দেশী সাহিত্য ভক্তির বন্যায় জন্মায়, পালিত হয় গ্রামবাসীর আদরে হাটে মাঠে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কিংবা সভ্যতা নিতান্ত সহুরে ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারায় ও তাদেরই মনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য বোধ হয় গ্যারাটের বিশ্লেষণ অত ভাসা-ভাসা, যদিও তিনি আদান-প্রদান হিসেবে ইন্দো-ইংরেজ সভ্যতার সুচারু পরিচয় দিয়েছেন।

গ্যারাটের উপসংহার এক চটকায় প্রত্যেক ভারতবাসীরই ভাল লাগা উচিৎ। ভারতে ইংরেজ শাসনের দোষ তিনি দেখিয়েছেন ইতিপূর্ব্বে, এই প্রবন্ধেও তিনি কার্পণ্য করেন নি। অতএব তাঁর রচনা নিশ্চয়ই মুখরোচক। কিন্তু এইখানেই আমার গোল বাধে। গ্যারাট ইঙ্গ-ভারতের সম্বন্ধের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বিশ্বাসী, সেটা নিয়তি-গ্রথিত বলেই মনে করেন, নচেৎ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের ইতিহাস লিখতে fulfilment কথা ব্যবহার করতেন না। ইংরেজ শাসনকর্ত্তা ভারতীয় সংস্কৃতি বুঝতে পারেন নি, ভারতের কারুশিল্প ও ফলিত বিজ্ঞান অবহেলা করেছেন,

এবং সেই জন্যই এ-দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজ-শাসনের শত্রু হয়েছেন, এই হল গ্যারাটের বর্ত্তমান সমস্যার সুগভীর বিশ্লেষণ! এ-মত ছিল হ্যাভেলের, জেটল্যাণ্ডেরও তাই উপসিদ্ধান্ত। আমার বিশ্বাস গ্যারাট সাহেব মূলসিদ্ধান্তটি স্বীকার ও প্রচার করতে ভয় পেয়েছেন, এবং সেই ভয় গোপন করতে আত্মনিন্দার বহর খুলেছেন। গ্যারাট নিজে ইংরাজ, ভারতবাসী নন, সত্য কথা জানবার, স্বীকার ও প্রকাশ করবার সুবিধা সুযোগ আমাদের অপেক্ষা তাঁর আছে। কিন্তু তার সদ্ব্যবহার তিনি করেন নি। কারণ কি? ভারতীয় পরিশীলনের প্রতি প্রেম একশ্রেণীর শাসক ও লেখকদের নিতান্তই পলিটিক্যাল। গ্রাম্যভাষায় বলতে গেলে, এঁরা থুতু দিয়ে ছাতু ভেজাতে চান। চেষ্টা করুন তাঁরা, ছাতু কিন্তু ভিজবে না। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ সত্যই নিজেদের কথা বিশ্বাস করেন, এবং ভারতবর্ষে এমন বোকাও আছে যে সে-কথা বেদবাক্য মনে করে। কিন্তু যাঁরা জ্ঞানপাপী তাঁদের মার্জ্জনা করা যায় না। গ্যারাট জ্ঞানপাপী। যে-লেখক হিন্দুস্থানী কারুশিল্পের অবনতি ও অন্তর্দ্ধানের কারণ দেখাত অষ্টাদশ শতাব্দীর mercantilism ও ঊনবিংশের laissez faire policy র উল্লেখ করেন তাঁর শেষ সিদ্ধান্ত অমন টিমটিমে, অমন বাজে, অমন জোলো হওয়ার অন্য কী কারণ হতে পারে? গ্যারাট সাহেব ইংরেজ শাসনের নিন্দা করতে প্রস্তুত, কিন্তু ঐ mercantilism আর ঐ laissez faire policyর পরিণতি, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ উল্লেখ পর্য্যন্ত করতে রাজি নন। ইংরেজ মনের এই ফাঁকিটা স্বাভাবিক; ভারত-সমস্যা সম্বন্ধে সত্য কথা লিখতে তাঁদের জাতি ও শ্রেণীগত স্বার্থে ঘা লাগে, এমন কি গ্যারাটের মতন বুদ্ধিমান লোকেরও। তা ছাড়া শুনেছি মনকে চোখ ঠারা ইংরেজ জাতির বিস্তর সাধনার ফল। মানুষের স্বভাবও খানিকটা তাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণের ওপর জোর দিয়ে প্রাথমিক কারণ চেপে দেওয়া, আত্মনিন্দার দোহাইএ নিরপেক্ষ পরপ্রেমিক প্রমাণিত হওয়া একটি সুপরিচিত মানসিক প্রক্রিয়া। আমার মতে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্যা অন্য ধরণেরই। ইংরেজ-শাসনের প্রতি প্রীতির অভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও তার প্রকৃতি দুই দেশের জনসাধারণের স্বার্থবিরোধ নিয়ে। স্বার্থের মূলে আছে অন্ন—তার ডালপালা কালচার। অন্নের বাটোয়ারায় বৈষম্য, তাই ইন্দো-ব্রিটিশ পরিশীলন এত ফাঁকা। এখানে দোষগুণ, প্রেম-ঘৃণার কথা ওঠেইনা। ঐতিহাসিক নিয়তি, (গ্যারাটের ভাগ্যবিধাতা নয়) দোষগুণের অতিরিক্ত, ব্যক্তিসম্পর্ক রহিত। সেটা চিদাকাশে ঝোলেনা, জঠরে জ্বলে।

বইখানি সম্বন্ধে তাহলে আমরা বক্তব্য এই দাঁড়ায়। এতে ভাল ভাল রচনা পেয়েছি, তবু এর মূলে ও মধ্যে ফাঁকি রয়েছে। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লেখকদের ধারণা হয় অস্পষ্ট, না হয় ভুল, হয় জানিত, না হয় অজানিত ভাবে। উত্তরাধিকার হয় স্থিতিশীল, গচ্ছিতধনের সামিল, আর না হয়, চলন্ত, গতিশীল, নতুন অধিকারের উৎপাদন প্রক্রিয়া। একটি পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার-বাড়ীর ঠাকুরঘরের ঘড়া ভরা তোলা গঙ্গাজল, অন্যটি স্রোতস্বিনী, আবর্ত্ত সৃষ্টি করতে করতে,

দুকূল ছাপিয়ে পাশের জমিতে পলিমাটি ফেলে উর্ব্বর করতে করতে এগুচ্ছে। ইতিহাস সম্বন্ধে আমার ধারণা শেষেরটির মতন। সংস্কারকে স্রষ্টা ও ক্রিয়াশীল হিসেবে এই পুস্তকের অনেক লেখকই দেখেন নি, যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তলিয়ে দেখেন নি, আবার কেউ বা পরকলা পরে দেখেছেন।

ফলে, কেবলমাত্র, ব্রাহ্মণজাতি, বিদগ্ধ সমাজ ও শিক্ষিত সমাজের পরিশীলন, তাদের সাথে ও মধ্যে আদান-প্রদানের কথাই লেখা হয়েছে। জ্যোতিষ ঘোষের লেখা ভিন্ন অন্য কোথাও জনসাধারণের নামগন্ধ নেই, অথচ ইংরেজই বলেন ভারতের সভ্যতা গ্রাম্যপ্রধান। আমার মতে ভারতের এতই যখন ছিল, তার সভ্যতার বাঁধন এতই যদি শক্ত ছিল, তবে তার কতটা অংশ জনসাধারণ পেয়েছে, এবং সেই জনসাধারণ সেই অংশ কতখানি নতুন অধিকার অর্জ্জনে, নতুন সৃষ্টিতে খাটাতে পারে, কত হারে, কতদিনে, কি উপায়ে না লিখলে প্রাচীন সভ্যতার চিত্রাঙ্কন ছাড়া তার উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। এ সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাতে কিম্বা অধ্যাপকের লাইব্রেরীতে লুকানো থাকলেও চলত।

ব্যাপারটা এই—সখের ধনে কারবার চলে না। নতুন পরিশীলনসৃষ্টির প্রয়োজন রয়েছে, এবং সেই অনুযায়ী পুরাতন সম্পত্তির অধিকারের ব্যাখ্যা ভিন্ন লেগাসীর অন্য উপাদেয়, 'বৈজ্ঞানিক' ও পণ্ডিতী ব্যাখ্যা আমি আগ্রাহ্য করি। অনুযায়ী অর্থে যুগোপযোগী, যে যুগের প্রাণ হল সাম্রাজ্যবাদ। ইন্দোব্রিটিশ কালচারের এই হল পরিবেশ। গ্যারাটের রচনায় দু'একটি ভুল খবর আছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্যোতিষ ঘোষের মন্তব্য স্পষ্টবাদিতারই লক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টির নয়। এ-সব কথা বাদ দিচ্ছি।

আশা করি আমার লেখা পড়ে পুস্তকখানির প্রতি কিংবা কোনো লেখকের প্রতি কারুর অশ্রদ্ধা আসবে না। সত্যই, পৃথক ভাবে পড়লে প্রায় সব রচনাই চমৎকার। শিক্ষার্থীরাও উপকৃত হবেন। তবে কর্ত্তব্যের খাতিরে আমি বলছি, এ বইএর গোড়ায় গলদ। এ বই পড়ে কি ভাবে ইতিহাস গড়বে ও কোথায় কেমন করে উত্তরাধিকার খাটান সম্ভব কেউ পরিষ্কার বুঝবে না। কেবল জেটল্যাণ্ড, গ্যারাট সাহেবের মত ভারত-প্রেমিকের সাথে আলাপ করতে ইচ্ছে হবে। আমাদের কপালে অনেক প্রেমিক জুটেছে ও জুটবে, কিন্তু ভারতের ইতিহাস এই প্রকার প্রেমের জোরে লেখা হয় নি, হবে না। থুতুতে চিঁড়ে ভেজেনা।

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

চন্দ্র মল্লিকা—শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র (বনফুল সাহিত্য সমিতি)

কাব্যপ্রদীপ—শ্রীসুধীর কুমার দাস (কলিকাতা)

লে মিজারেব্‌ল্—শ্রীপবিত্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(কমলিনী সাহিত্য মন্দির)

প্রথম বই চন্দ্র মল্লিকার লেখক হরপ্রসাদ মিত্রের আরো কয়েকটি কবিতা ইতিপূর্ব্বে একখানি বই-এ পড়েছিলাম। তাঁর লেখার ভেতর একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের আমেজ পাওয়া যায়—যা এখনকার মতবাদক্লিষ্ট কবিতার যুগে সান্ত্বনাদায়ক। বর্ত্তমান বই-এর কবিতাগুলো আমার বিশেষ ভালো লেগেছে—এদের সুকুমার প্রকাশভঙ্গী ও স্বপ্নালুতা একটু একঘেয়ে ঠেক্‌লেও নবীন লেখকের পক্ষে তা প্রশংসনীয়ই বল্‌তে হবে। তবে তথাকথিত আধুনিক ম্যানারিজ্‌ম্ যেমন ইউক্যালিপটাস্, র‍্যাট্‌ল্ সাপ, গণ্ডার প্রভৃতির প্রতি লেখকের একটু অধিক মাত্রায় লোভ দেখলাম—এটা ভয়ের কথা। নীল পাখী, সাদা বক, দেওদারু বন প্রভৃতি সম্পর্কে পুনারাবৃত্তি-দোষ—অসার্থক বিশেষণ প্রয়োগ এবং অযথা মিষ্ট করার চেষ্টাও ভালো কথা নয়। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য এবং বর্ত্তমান লেখকের দোষ এবং গুণ ঠিক একই জায়গায়—দু'জনেই অনেকটা এক ধাঁচের কবি। এসব কথা লেখকের ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে, নচেৎ তাঁর কবিতার সহজ সারল্যের আমরা প্রশংসাই করি।

দ্বিতীয় বই কাব্যপ্রদীপ একখানি কাব্যালঙ্কার বিষয়ক ছোট বই। এতে কাব্যের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশ, শ্রেণী-বিভাগ, ছন্দ-বিচার প্রভৃতি সম্পর্কে মোটামুটি অনেক কথাই সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। একটু ছাত্রপাঠ্য ধরণের হলেও, এই বইটি অনেকের পক্ষে বিশেষ সুখপাঠ্য হবে আশা করা যায়। রস-বিচারে লেখক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকদের মতামতের সমন্বয়সাধন করতে চেষ্টা করেছেন। ইতিপূর্ব্বে অতুল চন্দ্র গুপ্ত 'কাব্য জিজ্ঞাসায়' এবং যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত 'কাব্য পরিমিতিতে' মূলতঃ লিরিক্ কবিতা নিয়েই আলোচনা করেছিলেন—সুধীর বাবু কাব্যের অপরাপর শাখাগুলির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। আমার মনে হয়, লেখক বিষয়টি নিয়ে পরে একখানি বড় বই লিখলে, ভাষা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকারই হবে। তাঁর ভাষা সতেজ, প্রকাশ ভঙ্গী এবং দৃষ্টান্ত নির্ব্বাচনও সুষ্ঠু। বইটি সত্যিই ভালো হ'য়েছে।

তৃতীয় বই লে মিজারেবল্ ভিক্টর হিউগোর প্রসিদ্ধ উপন্যাসের মর্ম্মানুবাদ। ছেলে মেয়েদের জন্যে বইটি লেখা এবং তদনুযায়ী ছবি ও মুদ্রণ পরিপাট্যে সে উদ্দেশ্য সার্থকই হ'য়েছে। এ কাজে লেখকের খ্যাতি আছে—ইতিপূর্ব্বে তিনি বাংলার ছেলেমেয়েদের মেটারলিঙ্ক উপহার দিয়েছিলেন —এ বই তাঁর পূর্ব্ব খ্যাতিকে অক্ষুন্নই রাখবে। ছেলেমেয়েরা বিশ্বসাহিত্যের প্রসিদ্ধ বইগুলির সঙ্গে মাতৃভাষার সাহায্যে প্রাথমিক পরিচয় স্থাপন করতে পারে, আমাদের দেশে এমন উপায়

বড় একটা করা হয় না। পবিত্র বাবু এ কাজে হস্তক্ষেপ করেছেন দেখে আমরা বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। তাঁর ভাষা যেমন মিষ্ট, গল্প বলার ধরণও তেমনি সুন্দর—বাহুল্যকে বর্জ্জন ও অপরিহার্য্যকে গ্রহণ ব্যাপারেও তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

The Tenure of Agricultural Land—Sachin Sen, M. A., B. L. The Politics Club, Calcutta. Price Rs. 2/8 only.

আলোচ্য পুস্তকের লেখক ইতিপূর্ব্বে Studies in the Land Economics of Bengal গ্রন্থে ভূমিস্বত্ত্ব ও ভূমিসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। ভূমি-বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান পুস্তকটির আকার ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ ও আলোচনা বিশেষজ্ঞের উপযুক্ত হইয়াছে।

পুস্তকটি দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে গ্রন্থকার কৃষি ও ভূমিস্বত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিস্বত্বের মূলনীতি, ভারতবর্ষের ভূমিসত্বের ইতিহাস এবং ভারতবর্ষের ও অন্যান্য দেশের বর্ত্তমান ভূমিসত্বের বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণ অল্প পরিসরের মধ্যে হইলেও বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

পুস্তকটির দ্বিতীয় অংশটিই প্রধান, তাহার কারণ এই অংশে গ্রন্থকার বর্ত্তমানকালের একটি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে শুধু সম্যক আলোচনা নহে, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সমস্যা ভূমিসত্ত্ব আইনের সংস্কার ও বিশেষভাবে স্থায়ী বন্দোবস্ত বা Permanent settlement-এর পরিবর্ত্তনের বাঞ্ছনীয়তা।

এই বিষয়ের পরিষ্কার আলোচনার জন্য গ্রন্থকারের নিকট আমরা ঋণী, কেননা কিছুকাল হইতে বাংলাদেশে জনসাধারণের ও নেতাদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইহার সমাধানের জন্য শীঘ্রই হয়তো ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। গ্রন্থকারের মতে এই সমস্যার প্রকৃষ্টতম সমাধান ভূমিস্বত্ত্ব আইন বা বেঙ্গল টেনান্সি এ্যাক্ট-এর আমূল পরিবর্ত্তন—স্থায়ী বন্দোবস্তের বর্জ্জন নহে। কেননা, তিনি বলেন যে জমীদার ও কৃষকদের মধ্যে যেখানে অন্তরঙ্গ ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে সেখানেই শুধু পরস্পর সহযোগিতায় পরস্পরের ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব, কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ত্ব আইনের ফলে জমীদার ও কৃষকের মধ্যে জোৎদার প্রভৃতি অসংখ্য অন্তরায় উপস্থিত হইয়া অসংখ্য স্বার্থের সৃষ্টি করিয়াছে, ফলে জমীদার ও কৃষক উভয়েরই দুর্দ্দশার অন্ত নাই।

শচীনবাবু আরও বলেন যে যাঁহারা জোর গলায় ভূমিস্বত্ব আইনের সংস্কার ও জমীদারদের উচ্ছেদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অনেকেই প্রকৃত কৃষকের স্বার্থরক্ষার জন্য মোটেই মাথা না ঘামাইয়া, জমীদার ও কৃষকের মধ্যবর্ত্তী একাধিক 'ক্ষুদ্র প্রভুর' অধিকার আরও যাহাতে পাকা হয় শুধু সেইমত পরামর্শ দেন।

সম্প্রতি এই বিষয়ে যে সকল আলোচনা হইয়াছে যাঁহারা তাহার খোঁজ রাখেন, শচীনবাবুর শেষোক্ত উক্তির সহিত তাঁহারা নিতান্ত পক্ষপাতদুষ্ট না হইলে নিশ্চয় সায় দেবেন। কিন্তু তাই বলিয়া স্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমীদারী প্রথার রক্ষা যে প্রজা ও কৃষকসাধারণের পক্ষে হিতকর গ্রন্থকারের এই মত নিরপেক্ষ ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন।

শ্রীহিরণকুমার সান্যাল

Indian Thought and its Development—By Albert Schweitzer, translated from German by Mrs. Charles E. B. Russel, (Hodder and Stoughton Ltd, London).

লেখক 'ওরিয়েন্টালিষ্ট' নন, এবং তা' হবার আকাঙ্খাও রাখেন না। তবে তাঁর এ বই লিখবার জন্য 'ওরিয়েন্টালিষ্টে'র যতটুকু সাহায্য প্রয়োজন তা' তিনি পেয়েছেন Winternitz এর নিকট হতে। সেই কারণে তাঁর বইয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন চিন্তাধারার যে মামুলি বিবরণ আছে তা'তে কোন ভ্রম প্রমাদ চোখে পড়ে নি। তিনি বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্, হতে প্রাচীন যুগের চিন্তার ধারার একটা খসড়া দিয়েছেন, এবং পরবর্ত্তী যুগের দার্শনিক মত যথা সাংখ্য, আর্হত, বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী হিন্দুধর্ম্ম, এবং বর্ত্তমান যুগের চিন্তাধারা হতে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতি কেহই বাদ যান নি।

কিন্তু মূলতঃ গ্রন্থকার ভারতীয় চিন্তার ক্রমবিকাশ আলোচনা করবার জন্য এ বই লেখেন নাই। ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিন্তার ধারার তুলনামূলক বিচার করে একটী নূতন পথ নির্দ্ধারণই হচ্ছে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য। সে কথা তিনি স্পষ্ট করে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়েই বলেছেন।

তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিন্তার ধারা বিশ্লেষণ করে দুটী মূল সূত্র আবিষ্কার করেছেন—

প্রথমটী হচ্ছে—World and life affirmation, জগৎ এবং মানব জীবনকে সত্য বলে গ্রহণ করা।

"World and life affirmation, consists in this : that man regards existence as he experiences it in himself and as it has developed in the world as something of value *per se* and accordingly strives to let it reach perfection in himself whilst within his own sphere of influence he endeavours to preserve and to further it."

দ্বিতীয়টী হচ্ছে World and life negation — অর্থাৎ জগৎ এবং মানব জীবনকে মায়া বলে গ্রহণ করা।

"World and life negation consists in his regarding existence as he experiences it in himself and as it is developed in the world as something meaningless and sorrowful and he resolves accordingly (a) to bring life to a stand-still in himself by mortifying his will to live and (b) to renounce all activity which aims at improvement of the conditions of life in this world."

গ্রন্থকারের মতে প্রথমটী হচ্ছে ইউরোপীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয়টী হচ্ছে ভারতীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য। উভয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তিনি এমন কথা বলেন না যে সমস্ত ভারতবাসীই জগৎ এবং জীবনকে মায়িক মনে করে এবং পরমার্থ সত্যকেই একমাত্র সত্য মনে করে বর্ত্তমান জীবনকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করেন কিম্বা সকল ইউরোপীয় তাদের বর্ত্তমান জীবনকেই পরমার্থ সত্য মনে করেন। দুই দেশেই উভয় প্রকারের চিন্তার খোঁজ পাওয়া যায়। তবে মূলতঃ ইউরোপ প্রথম পথ অবলম্বন করেছে এবং ভারতবর্ষ অবলম্বন করেছে দ্বিতীয় পথ।

গ্রন্থকারের মতে এই দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলে যে নূতন চিন্তার ধারা প্রবর্ত্তন করা যাবে তাতে ইউরোপ ও ভারতের উভয়েরই হবে মঙ্গল। সেই কারণে তিনি বলেছেন—

"From a comparison of European and Indian thought it becomes clear that the great problem of thought in general consists in the attainment of a mysticism of ethical world and life affirmation".

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী

শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ কর্ত্তৃক মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিঃ, ৯০নং লোয়ার সারকুলার রোড, ইটালী, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও শ্রীকুঞ্জভূষণ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক ২৪।৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।